Registered No. C. 583.

১২শ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২৪ সাল। [১ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
"নিউ আর্য্য মিসন প্রেস" ৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসবের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

করুণাময় শ্রীভগবানের করুণায় আপনাদের উৎসব একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিতে চলিল। শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যে উৎসব তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইল, তাহা আপনাদের বিবেচনা-সাপেক্ষ। আপনারা দয়া করিয়া উৎসবকে তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা দিয়া থাকেন তাহাতে সম্প্রতি তাহার ব্যয় সঙ্কুলন হইতেছে না। কাগজ পত্রাদির দুর্ম্মূল্যতা হেতু উৎসবের দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। বিগত বৈশাখ মাস হইতে উৎসবের এক ফর্ম্মা কলেবর বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। ধর্ম্মপিপাসু গ্রাহকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে উৎসবের দীর্ঘজীবন কামনায় আগামী বৎসরের বৈশাখ মাস হইতে উৎসবের মূল্য ২৲ টাকা ধার্য্য করা হইল। বৈশাখের সংখ্যা ভিঃ, পিঃ যোগে আপনাদের নিকট প্রেরিত হইবে যদি কেহ আপনাদের উৎসবকে প্রত্যাখ্যান করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন, নতুবা আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

বর্ষসূচী।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ।] ১৩২৪ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

প্রেমময় তুমি হরি! তোমার করিয়া লও,
শান্তিময় তুমি দেব! মম হৃদে শান্তি দাও,
দয়াময় তুমি নাথ! বেদনা বুঝিয়া লও,
পবিত্র তোমার মূর্ত্তি, আমাতে আঁকিয়া দাও,
তোমার চরণে যেন চিত মোর হয় লীন,
(তব) প্রেমের বারতা যেন কর্ণে শুনি নিশি দিন।
মোহের কুয়াসা ঢাকা অন্ধ এ হিয়ার মাঝে,
আশার অতীতরূপে দাঁড়াবে মোহন সাজে,
পাপ মোহ দূরে যাবে শুভ্র স্বচ্ছ আলোকেতে,
লুটায়ে পড়িব আমি তোমারি শ্রীচরণেতে,
এ জগৎ ভুল হবে, আমার আমিত্ব যাবে
সেদিন আসিবে কবে কে আমারে ব'লে দিবে?

আমাদের সুখ।

তোমাকে ভালবাসাই আমাদের সুখ। অপর লোকে যা'তে সুখ পায়, তা'তে আমরা দেখিয়াছি আমরা সুখ পাই না ; আমরা জানি যারে ভালবাসি, তার জন্য কষ্ট করাতেও সুখ। যারে ভালবাসি তারে স্মরণ করায় সুখ, তারে দেখায় সুখ, তার সেবায় সুখ।

তুমি কি—এই বিচারে সুখ। তোমার নাম জপায় সুখ, তোমার রূপ দেখায় সুখ, তোমার কর্ম্ম ভাবনায় সুখ, তোমার গুণ স্মরণে সুখ, আর সর্ববাপেক্ষা সুখ তোমার স্বরূপ ধারণায়।

তোমার দাস হওয়ায় সুখ, তোমার দাসী হওয়ায় সুখ। তোমায় মাতা বলায় সুখ, তোমায় পিতা বলায় সুখ, তোমায় পুত্র বলায় সুখ, তোমায় কন্যা বলায় সুখ। তোমায় সখা বলায় সুখ, তোমায় সুহৃৎ বলায় সুখ। তোমায় স্বামী বলায় সুখ, তোমায় স্ত্রী বলায় সুখ। তোমাকে সবার সব বলায় সুখ, তোমাকে সকল সাধের সমষ্টি বলায় সুখ। তোমাকে দয়িত বলায় সুখ, তোমাকে দেব বলায় সুখ, তোমায় চপল বলায় সুখ, তোমাকে ঈপ্সিততম বলায় সুখ। তোমাকে পূজা করায় সুখ, তোমাকে প্রদক্ষিণ করায় সুখ। তোমাকে হৃদয়কমলে চিন্তা করায় সুখ, তোমাকে মানসে পূজা করায় সুখ। তোমাকে প্রাণায়ামে উপাসনায় সুখ, তোমাকে গায়ত্রী জপে উপাসনায় সুখ। তোমাকে সর্ববস্তুতে দেখায় সুখ ; তুমিই জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছ ভাবনায় সুখ। তোমাকে বিশ্বের পরিবেষ্টিতা দেখায় সুখ। "তোমার আমি" ভাবনায় সুখ, "তুমি আমার" অনুভবে সুখ, "তুমিই আমি" এই জ্ঞানে সুখ।

তোমায় মনে করিয়া মৃত্যুচিন্তায় সুখ, তোমার জন্য কর্ম্ম করায় সুখ, তোমাকে সর্ববত্র চৈতন্যরূপে অনুসন্ধানে সুখ। তোমার জন্য অন্য "সঙ্কল্প ক্ষয়ে" সুখ, তোমার জন্য "মনোনাশে" সুখ, তোমায় দেখিয়া

দেখিয়া "তত্ত্বাভাসে" সুখ। তোমার জন্য দেহ ছাড়ার ভাবনায় সুখ, তোমার জন্য আতিবাহিক হওয়ায় সুখ। কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধাতে তোমায় দেখা সুখ, তোমাকে কুমার দেখায় সুখ, তোমাকে বৃদ্ধ দেখায় সুখ। তুমি জ্যোতি, তুমি অন্ধকার, তুমি আকাশ, তুমি চন্দ্রতারকা, তুমি বৃক্ষলতা, তুমি পশুপক্ষী, তুমি সব, তুমি সুরূপ, তুমি কুরূপ, তুমি শীত, তুমি গ্রীষ্ম, তুমি বায়ু, তুমি জল, তুমি রোগ, তুমি ঔষধ, তুমি বৈদ্য, তুমি ভবরোগ বৈদ্য—এই সব বলায় সুখ। তোমাকে না ভুলাই সুখ। সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, নিদ্রাতে, জাগরণে, আহারে, বিহারে, স্নানে, একান্তে সদা সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকায় সুখ। তোমাকে হাতের দর্পণ করায় সুখ, তোমাকে চক্ষের তারা বলায় সুখ। তোমাকে কলিজার হার বলায় সুখ, আর কত বলিব? তোমাকে ভালবাসায় বড় সুখ। তোমার জন্য পতিনারায়ণ-ব্রতে সুখ, তোমার জন্য ব্রত উপবাসে সুখ, তোমার জন্য ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী হওয়ায় সুখ।

এত সুখ আমাদের, তবু আমরা দুঃখী কিসে? তোমার জন্য যখন মরাতেও সুখ তখন আমাদের ভয়ই বা কি, দুঃখই বা কি?

ভালবাসার তুমি, তোমাকে সকলে মাখাইয়া ফেলা, তোমাকে দিয়া সব আচ্ছাদন করা—এইত বড় সুখ।

তোমার ছবি দেখিয়া দেখিয়া তোমার সঙ্গে কথা কওয়া, তোমার গুণ, তোমার কর্ম্ম ভাবনা, তোমার কাছে কীর্ত্তন করা, তোমার নাম জপ করা, তোমাকে এই শরীর, এই মন, এই যথাসর্ব্বস্ব দেওয়ায় বড় সুখ। আবার একান্তে তোমায় পাইয়া জিজ্ঞাসা করা তুমি আমার কে—এই জিজ্ঞাসায় সুখ। শেষে তোমার মুখে তুমিই আমি, পরিচ্ছিন্নই অপরিচ্ছিন্ন, খণ্ডই অখণ্ড, এই বুঝিয়া স্থিতিলাভ করায় বড় সুখ। আর সর্ব্বশেষে স্বরূপটি জানিয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া মহামৎস্যের মত জাগ্রৎকূলে, স্বপ্নকূলে স্বেচ্ছায় বিচরণ করা, আবার দর্শন, স্মরণ রূপ মনঃস্পন্দন ছাড়িয়া, সমস্ত ভোগেচ্ছা ছাড়িয়া,

সমস্ত স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া, সবকে এক করিয়া এক হইয়া থাকায় সুখ। আর কিছুই নাই, আমিই আছি, আমিই সেই, এই সব অনুভবে স্থিতি-লাভ করা সর্ব্বোচ্চ সুখ। এক কথায় তুমিই সৃষ্টিস্থিতিনাশকর্ত্তা, আবার তুমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া বলিয়া তোমার পদমূলে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বিসর্জ্জন দেওয়ায় বড় সুখ। বিসর্জ্জন দিয়া তোমার চক্ষু দিয়া দেখা, তোমার শ্রবণে শুনা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র এই হওয়া—এই সকলেই সুখ।

আর তবে দুঃখ করিবে কেন? কোথাও কেহ যায় না, কোথা হইতেও কেহ আসে না, যে আছে সেই আছে, সেই খেলে, সেই খেলা ভাঙ্গে, এই জানিয়া, এই দেখিয়া—তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ হওয়া অথবা বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ অথবা অসঙ্গ শাস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং হইয়া সেই পরিমার্গণের ফলে তাই হইয়া দ্রষ্টৃস্বরূপে থাকিয়া মায়াখেলা দেখা বেশ। ইতি ১৩২৩।৮ চৈত্র, বুধবার, বারুণী, প্রাতঃকাল।

ভালবাসা।

শুধু ভালবাসি,
নাহি কামনার রাশ,
ব্যাকুল সুখের আশ,
বেদনার হাহুতাশ,
জীবন-ত্রাসী
শুধু ভালবাসি।
যাতনা বাড়বানলে,
যখন, হৃদয় জ্বলে,

একটু আঁখির আলো,
একটু হাঁসি।
আর কিছু নাহি চাই,
জীবনে সম্বল তাই,
ওগো! আর কিছু নাই
বেদনা গ্রাসী।
তাই ভালবাসি।

নাহি পিপাসার জ্বালা,
উন্মনা দুকুল ভোলা,
অমৃতে গরল তোলা,
সর্ব্বনাশী
প্রেমের মধুর সুরে,
লয়ে যায় ভাবপুরে
ভরিত হৃদয়ে জাগে
অন্তর্হাসি
শুধু ভালবাসি।

উ

সকলের কথা।

তুমি যেই হও না কেন একটু স্থির হইয়া দেখ, তোমার দুইটি মন। একটি মন শিষ্ট, একটি মন দুষ্ট; একটি মন বরণীয়, একটি মন অবরণীয়। একস্থান ভিন্ন জগতের সর্ব্বত্রই এই দুষ্ট, শিষ্টের ভাগ দেখা যায়। ভর্গও বরণীয়, অবরণীয়; সরস্বতীও দুষ্টা এবং শিষ্টা; লক্ষ্মীও লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মী; বুদ্ধিও সুবুদ্ধি এবং কুবুদ্ধি।

পাপ করে দুষ্টমন। এই দুষ্টমনকে শিষ্টমনের কথা মত চালাইতে পারিলেই তোমার সকল কাজ করা হইল। সেই কথাই বলা হইতেছে। এই কথাই সকলের কথা।

কি করিব বলিতে পার? কিছুতেই ত শান্তি পাই না। যদিও কখন পাই তাহা বড়ই ক্ষণিক। ইহাতে আমার তৃপ্তি নাই।

তুমি ত অর্চ্চনা করনা, তৃপ্তি পাইবে কিরূপে? আর তোমার মতন যাহারা অর্চ্চনা করেনা, তাহারাও কখন তৃপ্তি পাইবেনা।

অর্চ্চনা ত করিতে চাই, কিন্তু করিতে যে পারিনা।

কেন পারনা বলিতে পার?

করিতে গেলেই শত শত ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া পড়ি। শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে গিয়া আরও কত কি ভাবিয়া ফেলি। বিত্ত নাই আর সংসারে রোগও বেশ আছে। ইহাতে সাধনা হইবে কিরূপে? পেটে নাই ভাত—তার উপরে অসুখের জ্বালা, কি করিয়া কি করিব? সব জিনিষই দুর্ম্মূল্য; চারি দিকে উৎপাত; দেশের লোক অন্ন পায়না এই অবস্থায় কি হইবে? আদম সুমারীতে আমাদের সংখ্যা কতই কমিয়া যাইতেছে। এই জাতিটা বুঝি লোপ পায়। এই সব ভাবনা আসিয়া আমাকে এত উৎপীড়িত করে যে, কিছুতেই মন স্থির করিতে পারি না। অর্চ্চনা করিবে কে? আরও আছে। প্রথমে ত কত কি করিয়া ফেলিয়াছি। কত পাপ করিয়াছি, কত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, কত অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছি, একটু স্থির হইয়া বসিতে গেলে সেই সমস্ত দুষ্কৃতির স্মৃতি আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। আমি কি করিব বল?

বুঝিতেছি নানা উৎপাতে পড়িয়াছ। তবুও ত থাকিতে হইতেছে। এই অবস্থায় যতদূর পার তাহাই করিতে বলিতেছি। এরূপ অবস্থাতেও অর্চ্চনা হয়। শুধু করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিবে "কি হইবে"—ইহাকে ভাবনা বলে না। পুরুষের মত প্রতিকার

চিন্তা কর, এই অবস্থা হইতেও উন্নত হইতে পারিবে। ক্রমে সব ভাল হইয়া যাইবে।

বল তবে কি করিতে হইবে?

সবাই সমাজ সমাজ বলিয়া চিৎকার করিবে আর নিজের কর্ত্তব্য করিবে না—এ পথটা উল্টা পথ। নিজের কর্ম্মটি কর, দেখিবে তাহাতে সমাজেরও কার্য্য হইতেছে। ইহা ভিন্ন যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে লোক-হিতকর কার্য্যও কর। ফলে সমকালে নিজের ও দেশের কার্য্য কর। ইহাই ঋষিদিগের পথ। ইহাতেই সমাজে সুশৃঙ্খলা থাকে। নতুবা সবাই যদি সমাজ-সংস্কারক হয়, তবে সংস্কৃত হইবার ত কেহই থাকে না। আপনাকে বাদ দিয়া, আপনাকে সাধু না করিয়া যথার্থভাবে কোন সাধুকর্ম্ম করা যায় না। আপনিও সাধু হও এবং অন্যকেও সাধু হইবার পথে লইয়া চল।

এখনও লোকে খাইতে পাইতেছে। তাহারাও যে কিছু করেনা? যাহাদের এখনও কোনরূপে চলিতেছে, তাহারা নিজের অবস্থায় যাহা পারে তাহাই করুক, তবেই সকলের ভাল হইবে।

দেখ "দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্" দীর্ঘসংসার রোগের ঔষধ হইতেছে বিচার। সকলে ত বিচার করিতে পারে না। কিন্তু তোমার মতন যাহারা পারে, তাহারা বিচার করুক—দেখিবে তাহারাও ভাল হইতেছে। শুধু এই হওয়া উচিত, ঐ হওয়া উচিত, এই চিৎকার করিলে কি হইবে?

আমাদের সমাজে কর্ত্তব্য স্থির করাই আছে। নূতন করিয়া কর্ত্তব্য গড়িতে গেলেই বড় গোলে পড়িবে। যাহারা কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ তাহা-দিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্যই ঋষিগণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা দূর করিয়া উঁহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণতার দিকে চালাইয়া দিতেছেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ হও। সবই হইবে।

স্থির হইতে পার না—শত চিন্তায় উৎপীড়িত হও—এই ত তোমার বিঘ্ন? তুমি পারিবে বলিয়াই বলিতেছি এইটু বিচারপরায়ণ হও।

পাপ করিয়াছিল অবরণীয় মন। তুমি তাহার সহিত জড়িত ছিলে বলিয়া মনের পাপকে নিজের পাপ ভাবিয়া কষ্ট পাইতেছ। এতকাল জড়িত ছিলে বলিয়া ভাল হইতে পার নাই। এখন ত ভাল হইতে চাও? আর ত মন্দ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা নাই? ভাল হইব এই সঙ্কল্প দৃঢ় কর। আর নিজের কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর।

বাড়ীতে রোগগ্রস্তের যাতনা দেখিয়া অস্থির হও—বলিতেছ? তার জন্য যাহা করা উচিত তাহা কর, কিন্তু অন্য সময়ে রোগের ভাবনা করিবে কেন? বলিতেছ ভাবনা যে আসে? উপায় বলিয়া দিতেছি; ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিবে।

মনটাকে সকলের সঙ্গে মাখাইয়া ফেলিয়াছ, এখন একটু দেখ দেখি তোমার অবরণীয় মনটাও কিন্তু বরণীয় মনের সঙ্গে এক নহে। আর তুমি? তুমি বরণীয় ও অবরণীয় দুই মন হইতেই স্বতন্ত্র।

তুমি প্রথমে অবরণীয় মন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বরণীয় মনের সঙ্গে মিশ্রিত হও। হইয়া সর্ব্বদা অবরণীয় মনটাকে কর্ম্ম করাও। পাপী মনটাকে নিত্য উপদেশ কর। সাধক না হইতে পারিলে ছট্‌ফটানি দূর হইবে না। যাঁহারা সাধক তাঁহারা এই মনটাকে উপদেশ করেন। দেখনা "ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন অভয়চরণারবিন্দরে" ইহাতে কাহাকে উপদেশ করা হইতেছে? যখন নিত্যক্রিয়ায় বসিবে তখন প্রথমেই মনকে উপদেশ কর। দেখনা কেন এটা সর্ব্বদা চঞ্চল। সর্ব্বদা কত সঙ্কল্প করিতেছে, কত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছে। এটাকে বেশ করিয়া উপদেশ কর—এ যেন আর সঙ্কল্প লইয়া না থাকে। এ যেন সব অভিলাষ ত্যাগ করিয়া, শুধু নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিব এই চিন্তা করে। শুধু কতকগুলা চিন্তা করিয়া কি হইবে? এটাকে নিত্য কর্ম্ম করাও আর অন্য সময়ে লোকহিতকর কর্ম্ম করাও। আর কোন কিছুই ভাবিতে দিও না। যখন পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ কোন ভাবনা আসিবে,

তখনই উপদেশ দিয়া ইহাকে জপ করাও বা ভাবনা করাও, শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় তিনি যাহা করেন তাহা মঙ্গলেরই জন্য। তুমি তাঁহাকেই ডাক। কি বৈদিক, কি লৌকিক সকল কর্ম্মেই তুমি তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছ ভাবিয়া কর্ম্ম কর। বড় ভাল হইবে।

স্বকর্ম্ম কি তাহা কি জানিয়াছ? স্থূল কথা এই যে, বাহিরের হস্তপদাদি যে কর্ম্ম করে তাহাও স্বকর্ম্ম, মুখ যে কথা কয় তাহাও স্বকর্ম্ম আর মন যাহা করে তাহাও স্বকর্ম্ম। কর্ম্ম, বাক্য ও ভাবনা এই দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা কর। সংসারের কর্ম্ম কর, তাঁহার সেবা করিতেছি ভাবিয়া; আবার নিত্যক্রিয়া কর—তাঁহার সেবা করিতেছি মনে রাখিয়া। সকল কর্ম্ম সেবা করিতেছি বলিয়া করা যায়। কিন্তু অসৎ কর্ম্ম, অসম্বন্ধ প্রলাপ, অনাচার প্রভৃত কর্ম্ম দিয়া তাঁর সেবা হয় না জানিও। তবেই দেখ নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, উন্মত্ত চেষ্টা ছাড়িয়া, শাস্ত্রীয় কর্ম্মে পুরুষার্থ করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনকে উপদেশ কর আর কর্ম্ম করাও। জপ করাও, প্রার্থনা করাও, ক্ষমা ভিক্ষা চাও। এই সমস্ত দ্বারা ইহার চপলতা যাইবে। তখন ইহা ধ্যান করিতে পারিবে। একটা সময় রাখ যখন এটা একটু স্বাধ্যায় করিতে পারে, একটু সৎসঙ্গ করিতে পারে। এটাকে সর্ব্বদা উপদেশ কর—একটি বস্তুই আছে। সেই একের উপরে মায়ার খেলা হইতেছে। মায়ার খেলা মিথ্যা। এ খেলায় আস্থা কি? সকল বস্তুর মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহার নাম তোমার ইষ্টমন্ত্র। তাহা লইয়াই থাক। আহারের সময়েও মন্ত্র জপ করিতে করিতে আহার কর। সদাচার কর, নিত্যক্রিয়া কর। এই সব কর—দেখিবে সব ভাল হইয়া যাইবে।

তার পরে আমি ত আছিই। আমি আদিত্যপথগামিনী। আমিই বরণীয় ভর্গ। আমিই গায়ত্রী। তুমি আমার শরণাপন্ন হও। আমিই তোমাকে পরমপদে পৌঁছাইয়া দিব। জগতে আমি কোথায় নাই? দেখ এই জগতের শোভা কে দিয়াছে? দেখ এই জগতকে সরস কে

করিয়াছে? কে অন্ন দিতেছে? কে তোমার পিপাসার জল? কে তোমার উত্তাপের শীতল বায়ু? আমিই শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে জগৎজীব-ধারিণী। আমার দিকে চাও। তোমার ভাল হইবে। তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আছি। তুমি যেমন অবস্থায় থাকনা কেন, আমার দিকে চাহিবার শক্তি তোমার আছেই, তবে কিজন্য ভয় করিবে? কিজন্য মায়িক ব্যাপারে দুঃখিত হইবে? যা হয় হউক, তুমি আমার দিকে চাহিতে শিক্ষা কর; তোমার শুভ হইবে। আমিকে ভুলিয়া তুমি যাহা কর তাহাতেই বিপদে পড়িবে। আমাকে স্মরিয়া যাহা করিবে, তাহাতেই তুমি তরিয়া যাইবে। আমাকে ভুলিয়া কিছুই করিওনা। ইতি

উপদেশ।

১। অর্থ অর্থ করিয়া সারা হইলে যে? নিজ কর্ম্মের দ্বারা যাহা আসে তাতেই চিত্ত বিনোদন কর। ঐ রকম তৃষ্ণা ত্যাগ কর। বিতৃষ্ণা কর।

২। তুমি খাইতে না দিলে তোমার সংসারের সবলোক মরিয়া যাইবে? কি ভ্রম তোমার? তুমি ভাব তোমার ভাগ্যেই সবাই খায়। কেন আর সকলে কি কোন ভাগ্য লইয়া জন্মে নাই?

৩। তুমি কার, কোথায় আসিয়াছ—ইহার তত্ত্ব চিন্তা কর। শুভ হইবে।

৪। তত্ত্ব-চিন্তা করিলে বুঝিবে সংসার মায়াময়। মায়াময় সংসার মনে মনে ত্যাগ করিতে যদি পার, তবে মনে মনেই ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিতে পারিবে। ব্রহ্মপদ ছাড়িয়া সংসারে আসিয়া কষ্টে ডুবিয়াছিলে। এখন সংসারটা ছাড়িয়া একবার স্বদেশে গিয়া ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর।

৫। সৎসঙ্গ কর পারিবে। জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, মৃত্যুর পরে আবার জন্ম আছে। সংসারে ডুবিয়া থাকিতে চাও—এখানে এই স্ফুটতর দোষ ত আছেই। বল এখানে তোমার সন্তোষ কিরূপে থাকিতেছে ?

৬। পরিগ্রহ-ভোগ ত্যাগ কর। বৈরাগ্যই সুখ।

৭। সর্ব্বত্র সমচিত্ত হও। বিশ্বামিত্র হও। দর্শন পাইবে। বিষ্ণুত্ব পাইবে।

৮। তুমি আমি জগৎ এইগুলি তত্ত্ববিচারে নাই। তোমাতে, আমাতে, অন্যত্রে একমাত্রই বিষ্ণুই বিরাজ করিতেছেন। বৃথা অসহিষ্ণু হইয়া আমার উপর কোপ কর কেন ?

ভজামি শিরসিস্থিতং গুরুপাদারবিন্দদ্বয়ম্ ।

নূতন বৎসরে নবীন উৎসাহে চলিবার জন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে মস্তকস্থিত গুরুপাদপদ্ম দুটি ভজিবার কথা আলোচনা করিতেছি। শ্রীগুরুই জীবের অবলম্বন। মন্ত্র, ইষ্টদেবতা এবং গুরু যে এক ইহা না বুঝিলে ধর্ম্মজগতে উঠিবার সুবিধা হয় না। পূর্ব্ববৎসরে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনায় গুরুর আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। শাস্ত্র বলেন—

অহং ব্রহ্মাস্মি কর্ত্তা চ ভোক্তা চাস্মীতি যে বিদুঃ।
তে নষ্টা জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং নাস্তিকা স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥

যাঁহারা বলেন অমিই ব্রহ্ম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি কর্ত্তা এবং আমি ভোক্তা ইহাও যাঁহাদের সিদ্ধান্ত—তাঁহারা জ্ঞানভ্রষ্ট এবং কর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

মানুষ গুরু মানিতে চায়না সে কেবল 'অকারাদি হকারান্ত নাদবিন্দু সমন্বিত হইয়া। অর্থাৎ সর্ব্বানিষ্টকর অহং-মদিরা পান করিয়া ইহাঁরা

গুরু মানেনা। অন্যপক্ষে যাঁহারা গুরু মানেন তাঁহারা দেখেন গুরুই জগদ্‌গুরু। যাঁহার নিকটে একটি অক্ষর মাত্র শিক্ষা করা যায়, তাঁহার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। জগতে এমন বস্তু কি আছে যেখানে কিছুই শিক্ষা পাওয়া যায় না? কাজেই গুরুর অভাব ত কোথাও নাই। যেমন চৈতন্যের অভাবে জগতের কোন কিছুই দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ শ্রীগুরুর অভাবে জীবের কখন কোন উন্নতি হইতেই পারে না। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, আচার্য্য, শিক্ষক ইহারা গুরুশ্রেণিভুক্ত। যিনি গুরুতত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি কাহারও কাছে অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন না। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ইঁহাদের নিকট মানুষ কতই ঋণী।

গুরুর প্রয়োজন কখন নাই? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধকের ত কথাই নাই—যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ সাধক, যাঁহারা শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা সমাধান প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ সাধনসম্পন্ন, তাঁহাদেরও শেষকার্য্যের জন্য গুরুর প্রয়োজন।

শ্রুতি স্মৃতি অমান্য করিয়া "অকারাদি হকারান্ত নাদবিন্দু সমন্বিত" জনের কথায় গুরুর আবশ্যকতা নাই এ সব কথায় শ্রদ্ধা হইবে কার? শ্রুতি বলেন—

परीक्ष्य लोकान् कर्म्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। १।२।१२ मुण्डक।

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय। येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्।१।२।१३ मुण्डक

কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলোক পর্য্যন্ত লাভ হয়—এইটি বিশেষরূপে জানা চাই। আরও জানা চাই যে, কর্ম্ম দ্বারা কখন মোক্ষলাভ হয় না। এই জন্য ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিবেন।

যিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন তিনি হস্তে সমিধ গ্রহণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর শরণ লইবেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু তখন সমীপস্থিত রাগদ্বেশশূন্য শুদ্ধচিত্ত শমাদিযুক্ত শিষ্যকে সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বতঃ বলিবেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির এবং পরমপদে স্থিতির একমাত্র উপায়। ভগবান্‌ শঙ্কর বলিতেছেন—

দৃঢ়গৃহীতা হি বিদ্যা আত্মনঃ শ্রেয়সে সন্তত্যৈ চ ভবতি। বিদ্যা-সন্ততিশ্চ প্রাণ্যনুগ্রহায় ভবতি। নৌরিব নদীং তিতীর্ষোঃ।

গুরু পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবিদ্যা শিষ্যকে উপদেশ করিবেন যতক্ষণ না শিষ্য দৃঢ়ভাবে এই বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারেন। বিদ্যা দৃঢ়ভাবে গৃহীত হইলে তবে শিষ্যের সংসারনিবৃত্তি হয় এবং শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে বিদ্যারও অবিচ্ছেদ হয়। নদীজলে নিমজ্জিত হইতেছে এমন ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য যেমন কৃপালু ব্যক্তি নৌকা আনিয়া দেন, সেইরূপ সংসার-সাগরে নিমজ্জিত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য এই বিদ্যার প্রবাহ রক্ষা—গুরুপরম্পরাক্রমে হয়।

ছান্দোগ্যশ্রুতি বলেন—ধনধান্যপূর্ণ সমুদ্রপরিবৃত পৃথিবী পাইলেও এই ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকেও দিবে না; কারণ ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।

"যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাৎ এতদেব ততো ভূয়ঃ" ছাঃ ৩।১১।৬

শ্রুতি আরও বলেন—

আচার্য্যবান্‌ পুরুষো বেদ ছাঃ ৬।১৪।২

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা ছাঃ ৪।৯।৩

গুরু না মানিলে এই জ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন আচার্য্যযুক্ত পুরুষ জ্ঞান লাভ করেন। আচার্য্য হইতে বিদ্যা লাভ না করিলে ইহা ফলবতী হয় না। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলেন সংসার-সাগরের উদ্ধারকর্ত্তাই গুরু এবং তত্ত্বজ্ঞানই ভেলা।

শ্রীগীতাও বলেন

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪।৩৪

এইরূপ গুরু কি আর আছে, এই সন্দেহ যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে আমরা বলি যদি তুমি এইরূপ গুরু না পাও, তবে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানও পাইবে না নিশ্চয়। "যব্ গোবিন্দ কৃপা করি তব্ গুরু মিলি যায়" এ কথা সর্ব্বতোভাবে সত্য।

এইরূপ জ্ঞানীগুরু লাভ করিয়া সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন শিষ্য গুরুসমীপে আপন দুঃখ নিবেদন করেন। আহা! এই দুঃখ নিবেদন কত সুন্দর!

স্বামিন্! নমস্তে নতলোকবন্ধো!
কারুণ্যসিন্ধো! পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরাত্মীয় কটাক্ষ দৃষ্ট্যা
ঋজ্বাতি কারুণ্য সুধাভিবৃষ্ট্যা॥ ১

দুর্ব্বারসংসার-দবাগ্নিতপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহিমৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যৎ যদহং ন জানে॥২

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতি কলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈ
র্যুষ্মৎ বাক্‌কলসোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্ব্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়ঃ।
সন্তপ্তং ভবতাপ-দাব-দহন জ্বালাভিরেনং প্রভো
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণ-ক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ॥

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্ম্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽব মাং প্রভো
সংসারদুঃখ ক্ষতি মাতনুষ্ব॥

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো॥

স্বামিন্ আমি প্রণাম করিতেছি। আপনি প্রণতজনের বন্ধু; আপনি করুণাসমুদ্র। হে প্রভো আমি সংসারসাগরে পড়িয়াছি। আপনার সরল, অব্যর্থ কটাক্ষদৃষ্টির সুধাবৃষ্টি দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন।

দুর্ব্বারসংসার-জ্বালামালায় আমি বড়ই জ্বলিতেছি। তাহার উপরে আমার দুরদৃষ্ট-বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া আমাকে মুহুর্মুহু কম্পিত করিতেছে। আমি ভীত হইয়া আপনার শরণ লইয়াছি। আমাকে মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আশ্রয় দিবার আর কেহ আছে কি না জানি না। ব্রহ্মানন্দরসানুভূতি ভরা আপনার বাক্‌কলসক্ষরিত শ্রুতিসুখকর ঐ বাক্যামৃত বড়ই পবিত্র, বড়ই সুশীতল। প্রভো! ইহা আমার উপর বর্ষিত হউক। আমি উগ্র সংসার দুঃখ-দাবানলের ভীষণ জ্বালায় জ্বলিতেছি। যাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও ভবদীয় কৃপাদৃষ্টির পাত্র বলিয়া স্বীকৃত হয়েন তাঁহারাই ধন্য।

জগবন্ধু! এই ভীমভবার্ণব কিরূপে পার হইব? কি বা আমার গতি হইবে? আমার উপায় কি হইবে প্রভু! আমি ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না; কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। এই দুর্ব্বারসংসারদুঃখ ক্ষয় করিয়া আমার উদ্ধার করুন।

কিরূপে জ্ঞান পাই, কিসে মুক্তি হয়, কিরূপেই বা বৈরাগ্য লাভ করি? হে প্রভো! এই সমস্ত আপনি যদি আমায় উপদেশ করেন তবেই ধন্য হইয়া যাই।

যখন আমাদের সর্ব্বজীবে নারায়ণ দেখিবার কথা, তখন কি শ্রীগুরুর মধ্যে নারায়ণ নাই; না পতির মধ্যে নারায়ণ নাই; না মাতার মধ্যে নারায়ণা নাই? নারায়ণ যখন সর্ব্বজীবে বিহার করেন, তখন কি শ্রীগুরুতে বিহার করেন না? নারায়ণের সর্ব্বজীবে বিহার, সর্ব্বদেহে বিহার, সর্ব্বভাবে বিহার, ইহা কি আমরা পূর্ণ মাত্রায় ধারণা করিতে পারি? তিনি তাঁহার আত্মমায়ায় দেহ ধরিয়া নানা রঙ্গে বিহার করেন। সব রঙ্গ আমরা নাই বুঝিলাম। আমাদের প্রয়োজন যাহাতে

সিদ্ধ হয় সেই চৈতন্যের দিকে, সেই স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই ত আমরা তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে ভক্তি করিতে পারি; তাঁহার সেবার জন্য ক্লেশকেও ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার জন্য ত আমরা সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে পারি। এই দেহ তাঁর, সকল দেহ তাঁর, সকল মনও তাঁর, তবে আর দেহের দুঃখ বা মনের কষ্ট গ্রাহ্য করিব কেন? তিনি যাহা করেন তাহাতেই জীবের মঙ্গল হইতেছে এইটুকু বিশ্বাস করিয়া—দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, আর যাহা হয় হউক তাহার দিকে নজর না করিয়া, শত দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার প্রসন্নতার জন্য করিয়া যাই, ইহাই ত ভীমভবার্ণব পারের উপায়।

সব নর নারীই তিনি ও তাঁহার শক্তি। মানুষ তিনি কিরূপে? নামে, রূপে, গুণে, কর্ম্মে মানুষের সহিত ত তাঁর একতা হয় না। সত্যই হয় না। তবে একতা কিসে আছে? আছে স্বরূপে। এই স্বরূপচিন্তাই চৈতন্যচিন্তা; এই স্বরূপচিন্তাই আত্মচিন্তা। এই স্বরূপ-চিন্তাই শ্রীগুরুচিন্তা। গুরু চিন্তা কোথায়, কোন অবলম্বনে করিতে হয় আমরা তাহার কথা লিখিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

যখন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাতেও অবলম্বন আবশ্যক—হৃদয়-কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং ইহাও যখন পাওয়া যায়, তখন শ্রীগুরুর চিন্তা যে সহস্রারে করিতে হয় ইহাই ত ঋষিগণের উপদেশ। যাহার নাম গ্রহণে কাম ক্রোধাদি শান্ত হয়, যাঁহার নাম গ্রহণে প্রাণ সজীব হয় দেখা যায়, এস এস এই সহস্রদলকমল-কন্দলিত দ্বাদশার্ণ সরসীরুহে গুরুর ধ্যান করি।

উপরে কমল নীচে কমল। তন্মধ্যে কর্ণিকাতে ত্রিকোণ। ত্রিকোণের অধে চন্দ্রকলা, ঊর্দ্ধে রক্তবর্ণ সূর্য্যবিন্দু আর মধ্যে মণিপীঠ। সেই মণিপীঠে ইন্দুমকরন্দশীতল কুঙ্কুমাসব নির্ঝরমকরন্দ নাথ চরণার-বিন্দ, এস এস— সেই শিরসিস্থিত গুরুপাদারবিন্দ ভজনা করি।

সর্ব্বোপরি ততো ধ্যায়েৎ পশ্চিমাননপঙ্কজম্।
স্রবন্তমমৃতং নিত্যং দেব্যঙ্গে কমলান্তরে।

কমল হইতে কমলান্তরে দেবী অঙ্গে সুধা বর্ষিত হইতেছে। মায়ের সেই চরণকমল মস্তকে চিন্তা করি এস। দেখনা সব জুড়াইয়া যায় কি না ? দেখনা এই চরণকমল কত সুন্দর !

নিষক্ত মণিপাদুকা নিয়মিতাঘ কোলাহলং
স্ফুরৎ কিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকম্।
পরামৃত সরোবরোদিত সরোজসদ্রোচিষং
ভজামি শিরসিস্থিতং গুরুপাদারবিন্দদ্বয়ম্॥

শ্রীগুরুর পাদুকা হইতেছে পদরক্ষণাধার। পদ্ম, ত্রিকোণ, অন্তর্নাদ বিন্দু, মণিপীঠ, হংস এই পঞ্চ পাদুকা—পদরক্ষণাধার মায়ের। এস এস মায়ের পাদপদ্ম চিন্তা করি। পাদপদ্ম কেমন ? না পাদপদ্মসংলগ্ন মণিময় পাদুকাতে শ্রীগুরু এই চরণ-কমল স্থাপন করিয়াছেন। এই যে জগতের কাক কোলাহল নিরন্তর উঠিতেছে চলনা সেই কুণ্ডলিনীর গমনপথরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট মৃণালপথে একবার আপনার ঘরে। গেলেই সেই মণিপাদুকা দেখিতে পাইবে—ভাবনাতেও দেখ, ভাবনা কর। পাদুকার ভাবনা কর—দেখিবে পাপকোলাহল নিয়মিত হইয়া গিয়াছে ; কাক-কোলাহল নিরস্তীকৃত হইয়াছে। মণিপাদুকার-চিন্তা দ্বারাই অঘ-কোলাহল নিরস্ত হয়। তাহার উপর সেই চরণ-কমল। কত সুন্দর ইহা ! কি সুন্দর এই নব-প্রকাশিত-পল্লব সমূহের ন্যায় অরুণবর্ণ শ্রীগুরুচরণদ্বয়। আর ঐ শ্রীপাদপদ্মের নখ-গুলি ? আহা কতই মনোহর ! স্ফুরৎ কিশলয়ারুণং নখসমুল্লসৎ চন্দ্রকম্। পাদপদ্মের নখগুলি নির্ম্মল প্রকাশমান চন্দ্রের মত। আর কি ? না অমৃতপূর্ণ সরোবরে উদিত যে পদ্ম তাহার মত ইহা নির্ম্মল, ইহা প্রকাশবিশিষ্ট। শ্রীনাথের এই চরণকমল হইতে নিরন্তর পরামৃত ক্ষরিত হইতেছে। এই শ্রেষ্ঠ অমৃত সরোবরের উপরে নাথ চরণযুগল পদ্মের মত ভাসিতেছে। শিরসিস্থিত এই পাদপদ্ম চিন্তা

করিয়া জুড়াইয়া যাও না। যাইবে কি? প্রত্যহ চিন্তা কর; যখন অভ্যস্ত হইবে তখন জুড়াইয়া যাইবেই নিশ্চয়।

পদ্মের মধ্যে কর্ণিকা, তাহার মধ্যে ত্রিকোণ। এই ত্রিকোণকে ক্ষুদ্র ভাবিও না। কখন সমুদ্র দেখিয়াছ? নীলাম্বুরাশি দেখিতে দেখিতে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরে দেখ। দেখিবে নীচে অগাধ নীলাম্বু-রাশি আর উপরে নীল আকাশ। যেন জলের উপরে আকাশের প্রাচীর। এই যে সমন্তাৎপ্রসারিত আকাশ—ইহাকে সহস্রদল কমলের মত ভাবনা করিতে পার। এই পদতলে স্থিত জলবেষ্টিতা এই বিপুলা পৃথ্বী। ইহাকে দ্বাদশার্ণ সরসীরুহ ভাবিয়া লওনা। আর এই ত্রিকোণ? এই বিপুল শূন্যের গায়ে বিদ্যুল্লেখার মত উজ্জ্বল তিনটি রেখা। সেই রেখাত্রয়ের ভিতরে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি। "উৰ্দ্ধমস্য হুতভুক্ শিখা-ত্রয়ং"—বলনা কত দীপ্তি সেই আপনার ঘরে? তার মধ্যে শ্রীগুরু। এই দেহে কত ত্রিকোণ? নাসিকার ছিদ্রদ্বয় হইতে বাম ও দক্ষিণ নয়ন কর্ণান্তে দুই রেখা টান আর দুই ভুরু এক রেখায় সংলগ্ন কর—ত্রিকোণ পাইবে। আবার কূটস্থ হইতে কর্ণান্ত পর্য্যন্ত রেখা টানিয়া সংলগ্ন কর—ত্রিকোণ পাইবে। এইরূপে কণ্ঠবিবর হইতে স্তনদ্বয় পর্য্যন্ত, আবার স্তনদ্বয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত, আবার যোগাসনে বসিয়া পদদ্বয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত কত ত্রিকোণই হয়। এই ত্রিকোণের কোনটি উৰ্দ্ধমুখে, কোনটি অধোমুখে। সর্ব্বোচ্চ ত্রিকোণকে ভিতরে লইয়া চল। ত্রিকোণের প্রতিরেখায় জপ কর। দেখনা মন স্থির হয় কি না? ত্রিরেখা ব্রহ্মরেখা, বিষ্ণুরেখা, শিবরেখা। আর এই ত্রিবিন্দু হইতেছে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক পরমতত্ত্ব। প্রতিরেখায় ষোড়শ ষোড়শ বর্ণ বড় সমুজ্জ্বল। এই তোমার গৃহ। এই গৃহে মন্ত্র গুরু ইষ্টদেবতা এক হইয়া আছেন। এই গৃহে সর্ব্বদা থাকিতে অভ্যাস করিও। সর্ব্বদা এইখানে কথা কও; নাম জপ, মানসে প্রণাম কর, প্রদক্ষিণ কর, ফুলচন্দনে পূজা কর। ধারণা-ভ্যাসী হইয়া যাইবে। বাহিরে আসিও না। বড় ভূতের ভয় বাহিরে। ঘরে থাকিতে অভ্যাস কর। কিছু দিন অভ্যাস কর। ঠিক ঠিক

অভ্যাস যদি করিতে পার, তবে ধারণাভ্যাসী হইয়া আবার বিচারপরায়ণ হইতে পারিবে। তখন আর প্রাণের উৎক্রমণ পর্য্যন্ত নাই। এই খানেই তারে পাইয়া যাইবে। কিছু করিবেনা আর শুধু বলিবে আমার সব হইয়া গিয়াছে। এ আত্মপ্রতারণা ছাড়। আত্মপ্রতারণাই লোকপ্রতারণা। আর কি বলিবার আছে? হে গুরো! আমাদের কি সেই দিন হইবে—যখন আমি ও আমার সবাই উল্লাসে বলিবে—
"ভজামি শিরসিস্থিতং গুরুপাদারবিন্দদ্বয়ম্"?

—o—

কে তুমি সুন্দর রূপ মনোহর
মূরতি আনন্দ-ভরা
পবিত্র নির্ম্মল অতি সুকোমল
ভাবিয়ে আপনা-হারা

(২)

দেখিনা, বুঝিনা, জানিনা, পাইনা
পাইতে পাগল-পারা
অনল অনিলে পত্র-পুষ্প-ফুলে
আছে তব রূপ ঘেরা।

(৩)

জগৎ সাজিলে মানবে ভাসিলে
আপনি আপনি ভরা,
কাঁদালে কাঁদিলে হাঁসিলে হাঁসালে
আপনি আপনি সারা।

(৪)

কে তুমি কি আমি তাই ভাবি আমি
আছে কি এমন ধারা
আত্মা অবতার জগৎ-সংসার
স্বরূপে তুমিই ভরা।

(৫)

যে তুমি সে আমি বলিলে যে তুমি
বড় যে আনন্দ-পোরা
আমিত্ব ছাড়িলে দেহ ভুলে গেলে
তুমি ও সকলে ঘেরা।

(৬)

শ্রীগুরু গোবিন্দ প্রণবাদি মন্ত্র
কিছু নয় তোমা ছাড়া
সুরূপ কুরূপ সব তব রূপ
যেথায় যেমন ধারা।

(৭)

কি ভাবে আসিলে কি কথা শুনালে
বুঝি না কেমন তুমি
নিজেই আসিলে নিজেকে শুনালে
বুঝিনা কেমন আমি।

(৮)

আমি গো মলিন অতি দীনহীন
কিছুই সম্বল নাই
তুমিই ডাকিলে প্রাণে আশা দিলে
আলো যে দেখিনু তাই।

(৯)

সংসার-সাগরে পড়িয়া ফাঁপরে
আসি যাই বারে বার
আর যে পারি না সংসার-যাতনা
(গুরো) কর পার এই বার।

(১০)

কত রূপ লয়ে কত ভাব লয়ে
দেখা দিয়ে যাও চলে
আনন্দে ভরিয়া উঠিগো ফুটিয়া
তোমার পরশ পেলে।

(১১)

আপনা ছাড়িয়া জগৎ ভুলিয়া
আবার দেখিতে আশা
সংসার ছেড়েছে আনন্দ এসেছে
কোথাও নাহি ত বাধা।

(১২)

করিয়া তোমার লও এইবার
ভুলায়ে ভুলনা আর
যা আছে আমার সকলি তোমার
নাহিক দিবার আর।

কথা রামায়ণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কথা-রামায়ণ এইটি নাম। কথার কথা কিছু বলা হইল। রামায়ণের কথাও কিছু বলা আবশ্যক। পরে প্রথম হইতে আরম্ভ করা যাইবে।

রাগশোকাদিবর্জ্জিত তপস্বী বাল্মীকি স্নানার্থে তমসাতীরে গিয়াছেন। সঙ্গে শিষ্য ভরদ্বাজ। শিষ্যের হস্তে পরিধানের বল্কল দিয়া বাল্মীকি "বিচরং স্তমসাতীরে বনে বহুলপাদপে" তমসাতীরবর্ত্তী বহু বৃক্ষলতাপূর্ণ বনে বিচরণ করিতেছেন। পূর্ব্বে দেবর্ষির মুখে তিনি রাম-কথা শ্রবণ করিয়াছেন।

বাল্মীকি স্তত্র দদৃশে পক্ষিণং ব্যাধমারিতং।
পক্ষিণীং রুদতীং শব্দৈঃ করুণৈঃ স বিলাপনৈঃ॥

সহসা ভগবান্ বাল্মীকি সেই বিজন বনে ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনষ্ট হইতে দেখিলেন। আর ক্রৌঞ্চী? ক্রৌঞ্চী নিতান্ত করুণ শব্দে বিলাপ করিতে করিতে মৃত ক্রৌঞ্চের নিকটে ছট্‌ফট্ করিতেছে ইহাও দেখিলেন। মহর্ষি শোকাভিভূত হইলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বাল্মীকি রাগ-শোকাদিবর্জ্জিত।

শোকাবেশো মুনেস্তস্য নোপযুক্তঃ কথঞ্চন।
শোকাদির্যস্য বৈ জ্ঞানং মহর্ষের্নাবগাহত॥

তাদৃশ মহর্ষির অন্তঃকরণে শোকসঞ্চার হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। যে মহর্ষির হৃদয়ে কখনই কোনপ্রকার শোক স্থান পায় নাই, আজ তিনি কি জন্য শোকাক্রান্ত হইলেন, শিষ্য ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই শোককালে আকাশপ্রভবা দেবী সরস্বতী "শোকমোহাদেরযোগ্যং তপসাং নিধিম্" শোকমোহাদির অযোগ্য তপোনিধিকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার শোকশান্তির জন্য কবিত্বশক্তিরূপে তাঁহার আস্যমধ্যে

প্রবেশ করিলেন। ইহা দেখাও যায়—শোক মানুষকে কবি করিয়া তুলে। মহর্ষির মুখ হইতে শোকোচ্ছ্বাসে "মা নিষাদ" এই শ্লোক বাহির হইল। ভগবান্ বাল্মীকি আশ্রমে আসিলেন। আর সাগর হইতে ঊর্ম্মিমালার উত্থানের মত তাঁহার নিকট চিদাকাশ হইতে ব্রহ্মার উদয় হইল। বাল্মীকি ধ্যানস্থ ছিলেন। ব্রহ্মা আসিলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। বাল্মীকির মুখ হইতে বাহির হইল—

স ত্বাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ॥

সেই পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি নিষাদ অকারণে চারুরব সেই ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়া কষ্টদায়ক কর্ম্ম করিয়াছে। এইরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে পুনরুদ্দীপিত সেই শোকে অতিমগ্ন ও তজ্জন্য বাহ্যদৃষ্টিশূন্য ঋষি, ব্রহ্মার সম্মুখেই পুনরায় সেই মা নিষাদ শ্লোক গান করিলেন।

ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিলেন, আর বলিলেন—

শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্য্য বিচারণা।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী॥

হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক; আর কোন বিচার তুমি করিও না।

মা চিন্তাং কুরু বাল্মীকে শ্লোকরূপা সরস্বতী।
তন্মুখে নির্ম্মলা জাতা কবিতা ব্রহ্মরূপিণী॥

চিন্তা করিও না। কবিতা ব্রহ্মরূপিণী আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভগবতী সরস্বতী আমার ইচ্ছাতেই তদীয় আস্য হইতে শ্লোকরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

"রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরুত্বং ঋষিসত্তম।

তুমি রামের চরিত্র এইরূপে শ্লোকদ্বারা রচনা কর। ইহাই রামায়ণ হইবে।

কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাং। তুমি পুণ্যতম মনোরম রামকথা শ্লোকবদ্ধ কর।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণ-কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥
যাবৎ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
তাবৎ ঊর্দ্ধমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি ॥

যতদিন মহীতলে পর্ব্বত ও নদীসকল বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মর্ত্তলোকে তোমার কথিত রামায়ণ-কথা প্রচলিত থাকিবে। যতকাল পর্য্যন্ত ত্বৎকৃত রামায়ণ-কথা প্রচলিত থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত তুমি ঊর্দ্ধ অধলোক পর্য্যন্ত আমার নির্ম্মিত আমার লোকে বাস করিবে। সর্ব্বত্রই তোমার গতি অপ্রতিহত থাকিবে এবং আমার সঙ্গে তোমার মোক্ষ হইবে।

রামায়ণের মহিমা ঋষিগণ বহুস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন।

রামায়ণং মহাকাব্যং আদৌ বাল্মীকিনা কৃতম্।
তন্মূলং সর্ব্বকাব্যানাং ইতিহাস পুরাণয়োঃ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ নামে প্রথমে যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা সমস্ত কাব্যের মূল, সমস্ত ইতিহাস ও পুরাণের মূল। রামায়ণের আদর্শেই হরিগুণালঙ্কৃত মহাভারত, নিখিল পুরাণ ও সংহিতা এবং অন্যান্য গ্রন্থ মহর্ষিগণ প্রণয়ন করিয়াছেন

রামায়ণং পুরাণানি মহাভারতমেব চ।
মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি ধর্ম্মাথানি সদৈব হি ॥
পঠেৎ সমভ্যসেৎ তানি পাঠয়েৎ আচরেদপি।
স এব সখি সংসারাদুত্তীর্ণ ইতি মন্যতে ॥

পার্ব্বতী বলিলেন, হে সখি! রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত, মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহারা পাঠ করেন, অভ্যাস করেন এবং বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত যাঁহারা আচরণ করেন, তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন—আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ভগবান্ হরি আমার সৃষ্টিমধ্যে লীলা করিয়া থাকেন, অতএব তুমি সেই নারায়ণ-লীলা বর্ণন করিয়া মদীয় সৃষ্টির রক্ষাবিধান কর। ভগবান্ হরির

শ্রীরামস্য পরামূর্ত্তিঃ কাব্যং রামায়ণং তব ॥

বিষ্ণুকীর্ত্তি লইয়াই এই কাব্য হইবে। যতদিন এই গগনমণ্ডলে চন্দ্রতারকা দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন রামায়ণ হইতে রামরূপী বিষ্ণুর কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। তৎপ্রণীত রামায়ণ কাব্য শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যমূর্ত্তি।

বড় সত্য কথা—রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যমূর্ত্তি। আবার শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের মূর্ত্তিই এই রামায়ণ। শ্রীরামের প্রতি-অঙ্গের সহিত লীলা এই রামায়ণে কীর্ত্তিত।

ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলিলেন—আমি তোমাকে রামায়ণ কবচ বলিতেছি, ইহার প্রভাবে তুমি রামায়ণ প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ওঁ নমোঽষ্টাদশতত্ত্বরূপায় রামায়ণায় মহামন্ত্রস্বরূপায় মা নিষাদেতি মূলং শিরোঽবতু। অনুক্রমিকা বীজং মুখমবতু। ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানং ঋষির্জ্জিহ্বামবতু। জানকীলাভোঽনুষ্টুপ্ ছন্দোঽবতুগলং কৈকেয্যাজ্ঞাং লীলা লোকদিগের ধর্ম্মস্বরূপিণী ও সর্ব্বপাপবিনাশিনী। অতএব তুমি সেই লীলাময়ের লীলা বর্ণনা করিলে, প্রাণিগণের পরমধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন "যস্ত্বং বেদার্থবক্তাস্যাঃ কাব্যরূপেণ সর্ব্বশঃ" তুমি এক্ষণে কাব্যরূপে বেদার্থ প্রকাশ করিবে।

ব্রহ্মা পুনরায় বলিলেন—

বিষ্ণোঃ কীর্ত্তৌ ভবেৎ কাব্যং স্থাস্যত্যা চন্দ্রতারকম্।

দেবতা হৃদয়মবতু। সীতালক্ষ্মণানুগমন শ্রীরামহর্ষাঃ প্রমাণং জঠরমবতু। ভগবদ্ভক্তিঃ শক্তিরবতু মে মধ্যং শক্তিমান্ ধর্ম্মে মুনীনাং পালনং মমোরূ রক্ষতু। মারীচবচন প্রতিপালনমবতু পাদৌ। সুগ্রীবমৈত্রমর্থোঽবতু স্তনৌ। নির্ণয়ো হনুমচ্চেষ্টাবতু বাহূ। বার্ত্তা সম্পাতি পক্ষোদগমোঽবতু স্কন্ধৌ। প্রয়োজনং বিভীষণরাজ্যং গ্রীবাং মমাবতু। রাবণবধঃ স্বরূপমবতু কর্ণৌ। সীতোদ্ধারো লক্ষ্মণমবতু নাসিকে। অবগম্য মমোঘ স্তরোঽবতু জীবাত্মানং। নরঃ কাল লক্ষ্মণ সংবাদোঽবতু নাভিম্। আচরণায়ং শ্রীরামাদিধর্ম্মং সর্ব্বাঙ্গং মমাবতু

ইতি রামায়ণকবচং রামায়ণবাচকাঃ পঠেয়ুস্তচ্চেদং জপ্ত্বা রামায়ণং কুরু সপ্তকাণ্ডম্ ॥

নারদ, নিষাদ ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া আদিকবি পুস্তক রচনা করিবেন স্থির করিলেন। তুমি আমিও ত পুস্তক লিখি। কিছু কিছু অনুপ্রাণনাও যে না থাকে তাহা নহে। হইতে পারে আজকালকার বহু গ্রন্থকার বা গ্রন্থকর্ত্রী আধখানি ভাব পাইয়া তাহাই বাজারে রাষ্ট্র করিতে ছুটিয়া যান। ইহাতে তাঁহাদের গ্রন্থ, লোকের বিশেষ উপকারেও আইসে না আর সমাজ তার বিশেষ আদরও করে না। এরূপ গ্রন্থ জ্ঞপ্তিদেবীর কটাক্ষ-অগ্নিতে অল্পকালেই যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই যে আধখানি ভাব লইয়া রাশি রাশি গল্পের পুস্তক বাহির হইতেছে—ইহাতে থাকে কি? দুই এক স্থানে প্রতিহত হইয়া—কোথাও বা বামনঠাকুর সাজিয়া কোর্টশিপ করার মত বিবাহ। তারপরে অর্থশূন্য গৃহশূন্য স্বামী প্রণয়িনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বহু চেষ্টায় বড় মানুষ হওয়ার পরে স্ত্রীর সন্ধান করা, তারপর স্ত্রীর মৃত্যু আর স্বামীর আপশোষ—এইরূপ গল্প বানান অনেক হইতেছে সত্য, কিন্তু এসব থাকিবে কতদিন? ভগবান্ বাল্মীকির রামায়ণ কিন্তু "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে"। কেন এমন হয়?

রামায়ণ বলিতেছেন—

শ্রুত্বা বস্তু সমগ্রং তদ্ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ।
উপস্পৃশ্যোদকং সম্যক্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্ম্মেণান্বেষতে গতিম্ ॥
রামলক্ষ্মণসীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সভার্য্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎপ্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ ॥
হসিতং ভাসিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎসর্ব্বং ধর্ম্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি ॥

স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে।
সত্যসন্ধেন রামেণ তৎসর্ব্বঞ্চান্ববৈক্ষত ॥
ততঃ পশ্যতি ধর্ম্মাত্মা তৎ সর্ব্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যত্তত্র নির্ব্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা ॥
তৎসর্ব্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মেণ স মহামতিঃ।
অভিরামস্য রামস্য তৎসর্ব্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥

এইরূপে সাধনা করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। নতুবা অন্য কোনরূপে করিলে চিরদিনের জন্য জীবের জীবন গঠন হইতে পারে না।

ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত।

ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্ত্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা।
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে ॥২৩

আযো, ৯২ সর্গ।

ভরত ভরদ্বাজ আশ্রমে গিয়াছেন। ভরত জানিতে চান রাম চিত্রকূটের কোথায় আশ্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ভরত সমগ্র বলবাহনসহ সৈন্যগণের সহিত একরাত্রি মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে ভরত, মুনিকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভগবান্ ভরদ্বাজ পথ বলিয়া দিলেন। এখান হইতে দেড় যোজন দূরে অর্দ্ধ-তৃতীয়েষু যোজনেষু জনশূন্য অরণ্য। অরণ্যের মধ্যে রমণীয় কানন সমাকীর্ণ বিদীর্ণ পাষাণ চিত্রকূট পর্ব্বত। পর্ব্বতের উত্তর দিক্ দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনী পুষ্পিতদ্রুমতটা এবং রম্য পুষ্পিত-কাননা—রমণীয় কুসুম-কাননা।

প্রয়াগে মহর্ষির আশ্রম। যমুনা নদীর দক্ষিণতীরস্থ পথে কিয়দ্দূর যাইয়া সেই পথের দুইটি শাখাপথ। তাহার মধ্যে বামভাগ দিয়া

দক্ষিণ দিয়া যে পথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ দিয়া তুমি সৈন্য সামন্ত লইয়া যাও, রামচন্দ্রের আশ্রমে পৌঁছিবে।

এখন মহিষীগণ প্রণাম করিতে আসিলেন। যান হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই বেপমানা কৃশা, দীনা, সহ দেব্যা সুমিত্রয়া---কম্পমানা, কৃশাঙ্গী, দুঃখিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা দেবীর সহিত কর দ্বারা মুনির চরণ গ্রহণ করিলেন।

কৌশল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ॥ পরে আসিলেন ব্যর্থমনোরথা, সর্ব্বলোকস্য-গর্হিতা, সলজ্জা কৈকেয়ী। কৈকয়ী প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া দীনমনে ভরতের অদূরেই দাঁড়াইলেন।

তব মাতৄণাং বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি।

তোমার মাতাগণের বিশেষ কিছু জানিতে চাই। ভরদ্বাজ, ভরতকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত বলিতে লাগিলেন—

ভগবান্ এই যে শোকে অনশনে কর্শিতা দেবতামিব—দেবতার ন্যায় যাঁহাকে দেখিতেছেন, ইনি আমার পিতার প্রধানা মহিষী। ইনিই সেই পুরুষব্যাঘ্র সিংহবিক্রান্তগামী রামকে---অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন সেইরূপে প্রসব করিয়াছেন। আর

অস্যা বামভুজং শ্লিষ্টা যৈষা তিষ্ঠতি দুর্ম্মনাঃ।
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্ত্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা।
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে॥

ইঁহার বামভুজ আশ্রয় করিয়া এই যিনি দুর্ম্মনা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইনি দুঃখার্ত্তা মধ্যমা রাজ্ঞী সুমিত্রা। বনমধ্যে পুষ্প বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন দেখায়, ইঁহাকেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে।

এই দেবীর দুই পুত্র। দেবতার মত বর্ণ, সত্য-পরাক্রম বীর, কুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। আর এই যে ইনি

যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথোগতঃ॥২৫॥

আর এই যে ইনি যাঁহার কার্য্যে নরব্যাঘ্র রাজা দশরথ পুত্রবিহীন হইয়া জীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন—এই

ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্য্যকামাং কৈকেয়ীমনার্য্যামার্য্যরূপিণীম্ ॥২৬॥
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধিং নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ ॥২৭॥

এই ক্রোধনস্বভাবা, অসদ্বুদ্ধি, গর্ব্বিতা, সৌভাগ্য-অভিমানিনী, রাজমাতা হইতে যাঁহার বড়ই সাধ, এই কৈকেয়ী, এই অনার্য্যা, অথচ আর্য্যার মত, সাধ্বীর মত প্রতিভাসমানা—ইনিই আমার মাতা আপনি ইহা জানুন। ইনি নিষ্ঠুরস্বভাবা, ইনি পাপনিশ্চয়া। ইঁহাকে আমি আমার মহা-বিপদের মূল বলিয়া দেখিতেছি।

বাষ্প গদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিতে বলিতে নরশার্দ্দূল ভরত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে এই কথা বলিতে শুনিয়া যুক্তিপূর্ণ করুণ-বাক্যে বলিলেন—

ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রাম প্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥৩০।৯২
সুখোদর্কং দেবানামৃষীণাং চ সুখফলম্।

ভরত! তুমি কৈকেয়ীকে এইরূপে দোষ দিও না। রামের এই বনবাস দেবতা ও ঋষিদিগের সুখকর হইবে। ইহাতে কৈকেয়ীর দোষ নাই। দেবতারাই মন্থরা দ্বারা কৈকেয়ীর মোহ উৎপাদন করিয়াছেন।

দেবানাং দানবানাং চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রামপ্রব্রাজনাদিহ ॥৩১।৯২

দেবতাদিগের, দানবদিগের এবং আত্মভাবনাতৎপর ঋষিদিগের রামের প্রব্রজ্যা দ্বারা নিশ্চয়ই হিত হইবে।

ভরত তখন মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন, প্রদক্ষিণ করিলেন, করিয়া সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইতে বলিলেন। তখন সকলে আপন আপন রথে, অশ্বে, আরোহণ করিতে লাগিল।

গজকন্যা সকল (করেণু) আর হস্তিসমূহ স্বর্ণ নির্ম্মিত রজ্জু ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত হইয়া ঘণ্টা শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে মনে হইতেছে যেন বিদ্যুৎস্ফুরিতোদর মেঘসকল গ্রীষ্মশেষে শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

জীমূতা ইব ঘর্ম্মান্তে স ঘোষাঃ সম্প্রতস্থিরে ॥

বিবিধ যান চলিল, পদাতিগণ পদব্রজে চলিল, কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ উৎকৃষ্ট যানে চলিলেন। এক শিবিকা বড়ই সুন্দর। তাহার কোথাও স্ফটিকমণি, কোথাও বা পদ্মরাগমণি ঝক্ মক্ করিতেছে। ভরত সেই নবোদিত চন্দ্রপ্রভাসদৃশী শিবিকাতে চলিলেন। তিনি রাজদর্শনে যাইতেছেন দীনহীন ভাবে যাওয়াত শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

গঙ্গার পশ্চিমকূলে ভরতের এই মহা সেনা পর্ব্বতে নদীতীরে অবস্থিত মৃগপক্ষিকুল সেবিত মহা মেঘমালার ন্যায় শোভমান বনভূমি সকল অতিক্রম করিয়া চলিল।

কলির উপদ্রবে—আমাদের লক্ষ্য।

আমরা দ্বাদশ বৎসরে পড়িলাম। এই বর্ষারম্ভে আর একবার আমাদের লক্ষ্যটি সম্মুখে ধরা উচিত। তবেই আমাদের কর্ম্মোদ্যম শিথিল হইবে না।

বহু উপদ্রবের মধ্যে আমরা পড়িয়াছি। আরও উপদ্রব আসিতেছে। উপদ্রব চিরদিনই থাকে। যাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, উপদ্রবও তাঁহারই এক মূর্ত্তি। প্রকৃতির এক মূর্ত্তি যেমন শুদ্ধ সত্ত্ব, সেইরূপ রজস্তমও ইঁহার অন্যমূর্ত্তি।

শুদ্ধ সত্ত্ব হইতেছেন বরণীয় ভর্গ আর রজস্তম হইতেছে অবরণীয় ভর্গ। বরণীয় ভর্গ দ্বারা অবরণীয় ভর্গকে বশীভূত করা চাই। সত্ত্বগুণ জাগাইয়া রজস্তমকে অধঃকৃত করিতে পারিলেই আমাদের জীবন ধন্য হয়। ইহাই সাধনা। উপদ্রব পড়িলেই হতাশ হওয়া এটা মনুষ্যত্বহীনতার চিহ্ন।

উপদ্রব্যের কথা শাস্ত্রও বলিতেছেন। সকল কালেই ইহা ছিল, কলিকালে ইহা ভীষণ আকার ধারণ করে। কলিযুগের বিঘ্ন শ্রীভাগবত বলিতেছেন —

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥১।১।১০

হে সভ্য! হে সাধো! এই কলিযুগে প্রায় লোকেই অল্পায়ু। যদি বা কাহাকেও দীর্ঘায় দেখা যায় তাহারা কিন্তু মন্দবুদ্ধি। মন্দ বলে তাহাদিগকে যাহারা নিজের প্রকৃত শ্রেয় যে পরমার্থ তাহা জানিতে চায় না। আর যদিই পরমার্থ কি তাহা লোকের মুখে শ্রবণ করে, তথাপি ইহারা সর্ব্বদা উন্মত্ত চেষ্টায় পরাক্রমশালী, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে অলস। যদি আবার কাহাকেও দীর্ঘায়ু দেখা যায় এবং পরমার্থ বিষয়েও উৎসাহসম্পন্ন দেখা যায় কিন্তু ইহারা মন্দমতি হয়। ধর্ম্মকর্ম্মে কিছু উৎসাহ থাকিলে কি হইবে ইহাদের বুদ্ধি অতি অল্প। কেননা পথ পাইয়াও নিজের বুদ্ধির দোষে শ্রীভগবান্‌কে সকল বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হয় কিরূপে তাহা ইহারা ধরিতে পারে না। মূলকাঠিটি শিখিলে কি হইবে, মূলকাঠীর ব্যবহার আদৌ জানে না। তিন বেলায় ইহারা শ্রীভগবতীর কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মূর্ত্তির ধ্যান করে কিন্তু ব্যবহারিক সংসারে কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধায় সেই মাই খেলা করেন কিরূপে ইহা বুঝিতে পারে না—সকলকে দেখিয়া ইহাদের মা মা বলাও হয় না। সুমন্দমতি বলিয়াই ইহারা সর্ব্বত্র শ্রীভগবান্ আছেন কিরূপে ইহা বুঝিতে পারে না। বুঝাইয়া দিলেও ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে না। আবার যদিও কাহারও কাহারও বুঝিবার শক্তি দেখা যায়; দীর্ঘায়ু,

ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহশীল, সুবুদ্ধিমান্ যদিও কেহ কেহ হয়েন—তথাপি তাঁহারাও কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা মন্দভাগ্য। মানুষের ভাগ্য ভাল হয় তখন, যখন তাহাদের পুণ্যকর্ম্ম করা থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে ইহাদের কোন পুণ্যসঞ্চয় নাই, কাজেই ভাল কাজ করিতে গেলেই ইহাদের বহু বাধা আসিয়া জুটে। শ্রীভগবানের শরণাপত্তির অনুকূল বিষয় হইতেছে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গও পূর্ব্বপুণ্য-ফলে লাভ হয়; ইহাদের সেরূপ সঞ্চিত পুণ্য নাই বলিয়া ইহারা সাধু বলিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। পূর্ব্ব পুণ্য নাই বলিয়া ইহারা শাস্ত্র শ্রদ্ধাও করিতে পারে না। ইহারা বুজরুক দেখিয়া ভুলিয়া যায়। আবার যদিও কাহারও পূর্ব্বপুণ্য থাকে এবং সৎসঙ্গও লাভ হয়, কিন্তু এই কলির উপদ্রবে ইহারা সর্ব্বদা উৎপীড়িত হয়, রোগ শোকে ইহারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়; এই জন্য ইহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না।

কলির উপদ্রব ত এইরূপ। তবে মানুষ করিবে কি?

যত উপদ্রব মধ্যেই মানুষ পড়ুক না কেন, কলির স্রোতে গা ঢালিয়া যাহারা দেয় তাহারাই মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে। অতি দুরাচার, অতি পাপীরও উঠিবার পথ আছে। প্রকৃতির অবরণীয় ভর্গ মানুষকে পাপপথে টানে সত্য কিন্তু বরণীয়-ভর্গ-আকারধারী শ্রীভগবান্‌ও মানুষকে কখন ত্যাগ করেন না। মানুষ তাঁহার দিকে চাহিতে চেষ্টা করুক, শত বিঘ্নে পড়িয়াও লুটাইয়া লুটাইয়া সেই করুণাময়ের নিকট নিত্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করুক ইহারা শ্রীভগবানের দয়া অনুভব করিতে পারিবে। নিত্য কর্ম্মগুলি শ্রীভগবানের আজ্ঞা। তাঁহার শাসনবাক্যই শাস্ত্র। শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিতে ইহারা প্রাণপণ করুক; নিশ্চয়ই ইহারা ভাল হইবে, শান্তি পাইবে, সুখও পাইবে। শাস্ত্রকে নিজের নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইয়া, অথবা কুব্যাখ্যা করিয়া, অলস হইয়া, ব্যভিচারী হইয়া, কলির ব্যাপারে গা ঢালিয়া দিলে কি হইবে?

যেমন রজস্তম গুণের সঙ্গে সত্ত্ব থাকে, সেইরূপ কলির মধ্যেও দ্বাপর, ত্রেতা এবং সত্য যুগ আছে। কালের উপদ্রব যতই হউক না কেন এই ঘোর কলিতেও মানুষ দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যযুগের চিন্তা করিয়া করিয়া সেই কালস্রোতের মধ্যে আপনাকে রাখিতে পারে।

ঘোর কলিযুগে অতি পাপীর পরিত্রাণের জন্য শ্রীভগবান্ অনেক লঘূপায়ের, অনেক সহজ সাধনার কথা বলিয়াছেন। এই লঘূপায় হইতেছে সৎশাস্ত্র। সত্যযুগের স্রোতে থাকিতে হইলে শ্রীচণ্ডীর প্রবাহে পড়িতে হইবে, ত্রেতার স্রোতে পড়িতে হইলে শ্রীরামায়ণের প্রবাহ জাগাইতে হইবে এবং দ্বাপরের কালপ্রবাহ আনিতে হইলে শ্রীভাগবত লইয়া থাকিতে হইবে। যখন যখন যেখানে যেখানে ত্রেতা আসিবে, তখন তখনই সেই সেই স্থানে বাল্মীকি-কোকিল রাম রাম কূজন করিবেনই। বসন্ত আসিলে কি কোকিল নীরব থাকিতে পারে?

পুনঃ পুনঃ চণ্ডীর ব্যাপার লইয়া মগ্ন থাক—পুনঃ পুনঃ রামায়ণের ব্যাপারে নিমজ্জিত থাক—পুনঃ পুনঃ শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা কর—দেখিবে কলির আক্রমণে তুমি আত্মহারা হইবে না। শক্তি, রাম, কৃষ্ণ ইঁহারা কলিভীতির নিবারক। নিত্যকর্ম্ম কর—চণ্ডী, রামায়ণ, ভাগবত পড়—তবে সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা, রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে পারিবে। শাস্ত্র বলেন—যে সর্ব্বদা জপ রাখিতে পারে সে জীবন্মুক্ত হয়। এই সৎশাস্ত্রগুলি অবলম্বন কর এবং সৎশাস্ত্রোদ্ভূত সৎসঙ্গ কর, তখন সকল কর্ম্মই ঈশ্বর-প্রীতির জন্য করিতে পারিবে। তবেই গতি লাগিবে।

কি জন্য আমরা সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র চাই? ইহারই উত্তরে আমরা আমাদের লক্ষ্যের কথা পাড়িব।

আমাদের লক্ষ্য কি?

সকল জাতির নরনারী যাহা প্রাণে প্রাণে চায় তাহাই আমাদের লক্ষ্য? কি তাহা?

পুরুষের পবিত্র চরিত্র, স্ত্রীলোকের সতীত্ব, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের মনের একাগ্রতা এবং সর্ব্বোচ্চ যিনি তাঁহার জন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ এই চারিটিই মনুষ্যনামধারী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণে প্রাণে চাহিবার বস্তু। চরিত্র, সতীত্ব, একাগ্রতা ও নিরোধ এই চারিটি রক্ষা কর, যাহাতে ইহাদের রক্ষা হয় সেইরূপ কার্য্য কর। ইহাদিগকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর যাহা করিতে চাও কর, বিজ্ঞানজনিত যত উন্নতি সমাজে চালাইতে চাও চালাও—তোমার নিজের মঙ্গল হইবে, পরিবারে শান্তি থাকিবে, সমাজ উন্নত হইবে আর মনুষ্য জাতি সেই রমণীয়-দর্শনের প্রাপ্তিপথে চলিবে।

চরিত্র, সতীত্ব, মনের একাগ্রতা ও নিরোধ এই চারিটিতে লক্ষ্য রাখিয়া ঋষিগণ সমাজ গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন, তুমি আমি সকলকেই এই চারিটিতে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

পবিত্রতা অনুভবের বস্তু। পবিত্রতার ব্যাখ্যা, পবিত্রতার বক্তৃতা—এই সবে পবিত্রতার অনুভব হয় না। চিনির ব্যাখ্যাতে চিনির অনুভব হয় না। চিনি খাইলে চিনি অনুভূত হয়। পবিত্রতার জন্য আচার ও আহার শুদ্ধি চাই। পবিত্র হইবার কার্য্য করা চাই। শরীরকে পবিত্র করা চাই, মনকে পবিত্র করা চাই। শরীরকে রক্ষা করে প্রাণ। প্রাণকে ছন্দমত স্পন্দিত করিতে পারিলে তবে শরীর পবিত্র থাকিবে। দুরাচার-রত হইলে এবং যাহা তাহা আহার করিলে, প্রাণ কিছুতেই ছন্দমত স্পন্দিত হইতে পারে না, প্রাণ কিছুতেই সুস্থ থাকিতে পারে না। এই জন্য সাত্ত্বিক আহার ও শুদ্ধাচার দ্বারা শরীরকে পবিত্র করা চাই।

আবার মনকে পবিত্র করিতে হইলে মনকে ছন্দমত স্পন্দিত করা চাই। বিনা ঈশ্বরোপাসনায় মনের ছন্দমত স্পন্দন হইতেই পারে না। মনকে পবিত্র করিবার জন্য ত্রিসন্ধ্যায় শাস্ত্রমত নিত্যক্রিয়ায় শ্রীভগবানের উপাসনা করাই চাই। এইরূপে যোগাগ্নি দ্বারা শরীরকে পবিত্র কর এবং নিত্য উপাসনা দ্বারা মনকে রাগদ্বেষবর্জ্জিত করিয়া

পবিত্র কর, তবেই তুমি চরিত্রবান্ হইতে পারিবে। শুধু কতকগুলি শুষ্ক নীতিবাক্যে চরিত্র গঠন হয় না। নীতির রস হইতেছে শ্রীভগবান্। হৃদয়ের রাজাকে না ধরিলে তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ নীতিবাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ চরিত্র গঠন কখনই হইতে পারে না।

এইরূপে সতী হইতে হইলে শরীর ও মনকে পবিত্র করা চাই। তজ্জন্য প্রাণ ও মনের ছন্দমত স্পন্দন চাই। আর যত দিন না পতি, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে নারায়ণভাবে দেখা যায়, ততক্ষণ সতী হওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ সৎ এবং ভগবতীই সতী। শ্রীভগবান্ ও ভগবতীকে বাদ দিয়া কখনও সৎসঙ্গ হয় না। আরও দেখা আবশ্যক যে অসৎ সঙ্গে, অসৎ আলাপে সতীত্বের হানি আছেই। বহু দুষ্টলোকে যদি সতীকে লালসার সহিত চিন্তা করে, তাহা হইলেও সতীত্বের হানি হয়। এই জন্যই সতীর স্বগৃহই দুর্গ। অধিক এ সম্বন্ধে লেখা গেল না।

ইহার পরে একাগ্রতা। এক অগ্রে স্ফুরিত করার নাম একাগ্রতা। কবিতা লিখিলে, পুস্তক লিখিতে পারিলে, বা ছবি আঁকিতে পারিলেই যে মনকে একাগ্র করা হইল তাহা নহে। ইহাতে যে একটু একাগ্রতা হয়, তাহা ক্ষণিক। একাগ্রতা লাভের জন্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ, বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ এবং প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। তবেই মনকে একটী বস্তুতে ধরিয়া রাখা যায়। আপনার ঘরে মনকে ধরিয়া রাখাই ধারণা। ধারণার পরে ধ্যান। ধ্যানে একাগ্রতা হয়। আবার পূর্ণ একাগ্রতায় হয় সমাধি। এই সমাধি আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে বুঝিতে পারা যায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ জিনিষটি কি? নিরোধ ভিন্ন নিত্যস্থিতি হইতেই পারে না।

তাই বলিতেছিলাম এই পবিত্রতা, সতীত্ব, একাগ্র ভাব ও নিরোধ ভাব লাভের জন্য কোন্ জাতি কি উপায় করিয়াছেন? আমরা অন্য জাতির মধ্যে একটু আধটু এক আধটির অনুষ্ঠান দেখিতে পাই সত্য, কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে এই চারিটিই সুন্দরভাবে দেখি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের অনুষ্ঠান আছে। এই জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে মেরুদণ্ড করিয়া, ঋষিগণ সমাজ গঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শিথিলতাই পুরুষের চরিত্রহীনতার কারণ, স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিঘ্নের কারণ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মত অনুষ্ঠান নাই বলিয়াই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বাড়ী, গাড়ী, ফ্যান, লাইট, সাজ, পোষাক—সুখের এই সমস্ত আয়োজন করিয়াও মানুষ মনের একাগ্রতার অনুষ্ঠানশূন্য বলিয়া সুখ ভোগ করিতে পারে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে আর সে ভাবে দেখে না। নিজের ব্যভিচার এত প্রবল করিয়াছে যে, এমন কি পিতা মাতার জন্যও নিজের স্বার্থ বিন্দুমাত্রও ত্যাগ করিতে পারে না। তোমার যাহা হয় হউক, আমি আমার নিজের মত চলিবই। এক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানহীনতায় ব্যক্তির মধ্যে, পরিবারের মধ্যে,সমাজের মধ্যে, এমন কি মনুষ্যজাতির মধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এখন আবার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মত অনুষ্ঠান করিবার ও করাইবার সময় আসিয়াছে। যদি মানবজাতি ইহার অনুষ্ঠান আবার আদর করিয়া গ্রহণ করে, তবে জীবের দুরবস্থার অনেক শান্তি হয়, আর যে জাতি পূর্ণমাত্রায় ইহার অনুষ্ঠান করিবে, সেই জাতি যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। ইয়ুরোপেও বর্ণাশ্রমের ডিণ্ডিমধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। ইয়ুরোপের কোন চিন্তাশীল গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

The author was a profound believer in the value of tradition, in the value of general discipline lasting over long periods. He knew that all that is great and lasting and is intensely moving has been the result of the *Law of Caste* or of the laws governing the individual members of a caste throughout many generations.

গ্রন্থকার আবার বলিতেছেন—This building up of the rare-

man, of the greatman (of the cultivated type in a Darwinian sense) as every scientiest is aware, is utterly frustrated by anything in the way of injudicious and careless cross-breeding.

গ্রন্থকার বলিতেছেন সাম্যবাদটা শুনিতে ভাল, কিন্তু জগতে সাম্য কোথাও দেখা যায় না। আমরাও বলি—বৈষম্যেই সৃষ্টি আর সাম্যে প্রলয়। ঋষিরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যখন পশুদিগের মধ্যে সিংহজাতি, ব্যাঘ্রজাতি ইত্যাদি পরিষ্কাররূপে পাওয়া যায়, তখন মানুষের মধ্যেও ব্রাহ্মণজাতি, শূদ্রজাতি এই জাতিভেদ প্রকৃতির নিয়মেই হইয়া থাকে। আরও চিন্তা এই করিতে হয়—সিংহের শক্তি প্রকাশের জন্য যে যন্ত্র আবশ্যক—ব্যাঘ্রের শক্তিকে ব্যক্তাবস্থায় আনিতে হইলে, যন্ত্রটি সিংহের যন্ত্র মত হইতেই পারে না। এইরূপে ব্রাহ্মণের শক্তি প্রস্ফুট করিবার জন্য যে যন্ত্র আবশ্যক,—শূদ্রের শক্তি বিকাশ জন্য সে যন্ত্র ঈশ্বর তাহাকে দেন নাই। গ্রন্থকার বলিতেছেন -The author could not help but advocate the rearing of a select and aristocratic caste, and in none of his exhortations is he more sincere than when he appeals to higher men to sow the seeds of a nobility for the future.

যখন অর্থের গৌরবে বিদ্যার গৌরব অধঃকৃত হয়, তখনই অধঃপতন। গ্রন্থকার বলেন—verily, ye shall not become a nobility one might buy, like Shopkeepers' with Shopkeepers' gold. For all that hath its fixed price is of little value.

আমাদের দেশে ভগবান্ মনু যে ভাবে সমাজের বন্দোবস্ত করার কথা বলিয়াছেন, আজ ইয়ুরোপে তাহাই আদৃত হইতে চলিল, কিন্তু আমাদের দেশের লোকে জাতিভেদ উঠাইতে এখনও বিরত হইতেছেন

না। আমরা আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকদিগের জন্য আরও দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

It is ridiculous to pretend to treat every one without regard to those natural distinctions which are manifested by superior intellectuality, or exceptional muscular strength, or mediocrity of spiritual and bodily powers or inferiority of both. The biographer says that the author tells us it is not the legislator, but nature herself who establishes these broad classes, and to ignore them when forming a society would be just as foolish as to ignore the order of rank among materials and structural principles when building a monument.

আরও স্পষ্ট কথায় তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির বিভাগ ভিন্ন যে কোন সমাজ উন্নত হইতে পারে না তাহাই বলিতেছেন—

Thus he would have the intellectually superior, those who can bear responsibility and endure hardships, at the head. Beneath them are the warriors, the physically strong, who are "The guardians of right, the keepers of order and security, the king above all as the highest formula of warrior, judge, and keeper of the law. The second in rauk are the executive of the most intellectual." And below this cast are the mediocre. "Handicraft, trade, agriculture, *Science*, the greater part of art, in a word, the whole *compass* of business activity, is exclusively compatible with an average amount of ability and pretension." At the very base of the social edifice, the author sees the class of man who thrives best when he is well

looked after and closely observed the man who is happy to serve, not because he must, but because he is what he is,—the man uncorrupted by political and religious lies concerning equality, liberty, and fraternity,—who is half conscious ot the abyss which separates his from his superiors, and who is happiest when performing those acts which are not beyond his limitations.

আজকালকার এই চিন্তা ইয়ুরোপে নূতন সন্দেহ নাই, আর আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা ইয়ুরোপের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃভাবের অনুকরণ করিয়া সমাজকে ভ্রান্তপথে লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই সমস্ত চিন্তা নূতন। কিন্তু শাস্ত্রবিশ্বাসী প্রাচীন আমাদের জাতির নিকটে ইহা নূতন নহে। ইহা সেই সনাতন ধর্ম্মেরই নূতন অভ্যুত্থান। চারিদিকেই যখন সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার আয়োজন হইতেছে, তখন সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে আপন আপন জাতিতে ফিরিতে হইবে। সৎ ব্রাহ্মণ ও সৎ শূদ্র আবার যদি হয়, তবে জগতের কল্যাণ হইবে। এই চারি জাতিকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। আবার সেই প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের কালধর্ম্মমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে দলাদলি সম্প্রদায় না থাকে, যাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে হিংসা ও ঘৃণা না থাকে সেই শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতেই জাতির উন্নতি হইবে।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা প্রবন্ধের শেষ করিতেছি। স্ত্রীলোককে শূদ্রের সঙ্গে সমান বলা হইয়াছে। কারণ ইহারা অবলম্বন ভিন্ন কখন প্রকৃত উন্নতির পথে যাইতে পারিবে না। যখন সমাজে স্ত্রীলোকগণও পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইতে চেষ্টা করিতেছেন তখন এই সমস্ত কথা যে লোকের মুখরোচক হইবে না,—ইহা আমরা

জানি কিন্তু মুখরোচক চারু বাক্যই সর্ব্বনাশের মূলীভূত চার্ব্বাক মত। এই চার্ব্বাক মতের প্রচলনেই ইয়ুরোপের আজ এই দুর্গতি আমাদের দেশের আর কথা কি? পুরুষের পবিত্রতা, স্ত্রীজাতির সতীত্ব, মনের একাগ্রতা এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধ—এই চারিটি অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে সকলকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মতই চলিতে হইবে। ইতি—

শেষ-খেয়া।

আমি ব'সে আছি একা তীরে।
সান্ধ্য-তরণী ওকে বেয়ে যাও—
চঞ্চল নদী পারে?
এসো, ফিরায়ে নাবিক;
লয়ে যাও তুমি মোরে।
মোর রাখাল সাথীটি বাঁশরী বাজায়,
গোঠ হ'তে ধেনু গৃহ পানে ধায়—
ঐ গ্রামের অনেক দূরে।
সুদূর পথের প্রবাসী পান্থ!
কে যাও তুমি ও পারে?
মাঠের ওধারে গ্রাম খানি পরে,
আমার আপন বিজন কুটীরে,
আকাশ খসিয়া প'ড়িছে যেনরে—
স্বর্ণ-তরু-রাজি শিরে।
কে যাও তুমি গো প্রবাসী পান্থ,
সুদূর অজানা পথে।
মোর যতটকু ব্যথা—যতটকু প্রাণ,
উঠে তার সনে যতটকু গান,
তরণী ভরিয়া দিব আমি দান—
করুণা মলয় বহে যদি ধীরে ধীরে।
সুদূর পথের পান্থ তুমি হে—
লয়ে যাও মোরে পারে।

শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ।] ১৩২৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা

শ্রীগুরু।

এমন দয়াল তুমি, এমন ক্ষমার সার
পতিত জনের তুমি, লও উদ্ধারের ভার
গুরুরূপে দয়া ক'রে, এসেছ মোদের মাঝে।
ও রাঙ্গাচরণ যেন সতত হৃদয়ে রাজে।
সংসারের মোহজালে, আপনা ভুলেছি প্রভু।
তুমি যে গো ভয়ত্রাতা, ভুলেতে ভাবিনি কভু।
কি পবিত্র সুধাধারে করাও সবারে স্নান
পাপ তাপ ভুলে সবে পায় চরণেতে স্থান।
অজ্ঞানেতে অন্ধ আছি, বিন্দুমাত্র শক্তি নাই।
(তব) সুনির্ম্মল আশীর্ব্বাদে প্রাণে বড় আশা পাই।
এমন করুণামাখা মধুময় স্নিগ্ধ হাসি
(দেখিলে) মলিনতা দূরে যায়, পবিত্রতা উঠে ভাসি

সংসারের কোলাহলে সংসারের সব কাজে
সর্ব্বদাই মন যেন কুটস্থেতে শান্ত থাকে।
ঐ চরণেতে প্রভু এই মাত্র ভিক্ষা চাই
লক্ষ্য স্থির রেখে যেন, দিনশেষে চ'লে যাই।

২১

জ্ঞানে ভক্তি।

পরিপূর্ণ নিরাকার একমাত্র যিনি
জ্ঞানানন্দ শান্ত, স্থির "আপনি আপনি"
পূর্ণ চতুষ্পাদ সেই তাঁরি একদেশে
খেলিবার সাধে তাঁর মায়ারূপ ভাসে।
তাঁহারে লইয়া মায়া বিশ্বরূপ হয়
অন্তরে পুরুষে ধরি প্রকৃতি খেলায়।
মায়ারে করিয়া খণ্ড জীবরূপে সাজে
অণু পরমাণু মাঝে মিশায়ে বিরাজে।
দুষ্টের দমন আর ভক্তের কারণ
যুগবিপর্য্যয়ে রূপ করেন গ্রহণ।
চৈতন্য চৈতন্যময় সকল সময়
স্বরূপে খুঁজিলে, তাঁরে পূর্ণ দেখা হয়।
মন্ত্র গুরু ইষ্টভেদ কোথায় তখন ?
তাঁরে ল'য়ে পরিপূর্ণ এ তিন ভুবন।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম সেই পূর্ণ একাকার
স্থূলেতেও মিশাইয়া আছেন আবার।
অখণ্ডের খণ্ডজ্ঞান খেলিবার তরে
বুঝেছে যে জন সেই পেয়েছে অন্তরে।
অজ্ঞানী অধম দেব, পারিনি ধরিতে
কত ভাব তাই প্রভু, উঠে এই চিতে।

কভু ভাবি সূক্ষ্ম তুমি, কভু ভাবি স্থূল
কভু ভাবি গুরু তুমি কিম্বা মন্ত্রমূল।
কভু দেখি বিশ্বরূপ অখণ্ড অপার
স্বরূপে সকলি তুমি পূর্ণ একাকার
তোমারি করুণা-গুণে তোমারে স্মরিয়া
রহিব তোমাতে মিশি তোমারি হইয়া।
থাকিবে না খণ্ডভাব তোমাতে আমার
তুমি আমি এক হয়ে রহিব আবার।

লী

—০—

সাকার নিরাকার তত্ত্বের বিবাদভঞ্জন প্রয়াস।

(১)

কেন এই প্রয়াস ? গোল মিটাইতে, না গোল বাড়াইতে ?

কি না জান তুমি ? এক ধর্ম্ম না হইলে দলাদলি সম্প্রদায় বাড়িয়াই যায়। ধর্ম্মের দলাদলি সম্প্রদায় হইতেই জগতের অধিকাংশ দুঃখের জন্ম। সকল মানুষের মতগুলি যে এক হইবে ইহা আশা করা বাতুলতা। ইহা কখন হয় নাই, কখন হইবেও না। আর বোধ হয় হওয়াটাও অস্বাভাবিক।

গঙ্গা এক বটে কিন্তু অবতরণ-ঘাট অনেক। সেইরূপ ঈশ্বর এক সত্য, কিন্তু ঈশ্বরে অবগাহন-প্রণালী অনেক। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ এই বৈচিত্র্যময় জগতে জীবে জীবে ভেদ থাকিবেই। প্রকৃতিগত পার্থক্যই ইহার জনক। সত্ত্ব রজ তম গুণের বৈষম্যেই সৃষ্টি। আর সাম্যে সৃষ্টি নাই। যদি সাম্যকেই মূলমন্ত্র করিতে হয়, তবে বৈষম্যের ভিতরে যে সাম্য তাহাই ধরিতে হয়। তবেই হইল এক ঈশ্বরকেই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে আরাধনা করাতেই সাম্য হইতে পারে। আমরা বলিলাম ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁহাকে ভজিবার প্রণালী বহু।

ভাল করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে মতভেদ কাহারও থাকিতে পারে না। তথাপি যদি মতভেদ হয় তবে সে মতভেদ অবিচারজনিত, অন্ধতাজনিত। ইতিহাসও ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মে রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট ইত্যাদি সম্প্রদায়, মুসলমান ধর্ম্মে সিয়া সুন্নী ইত্যাদি সম্প্রদায়, ব্রাহ্মধর্ম্মে নববিধান, আদিসমাজ ইত্যাদি সম্প্রদায়, হিন্দু বা আর্য্য ধর্ম্মে শাক্ত বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় কিসের সাক্ষ্য দেয়?

সকল ধর্ম্মই এক ঈশ্বরকে ভজনা করিতে বলিতেছেন। কিন্তু যখনই কোন সম্প্রদায় এক রকমের সাধনপ্রণালী বাঁধিয়া দিতেছেন, তখনই এক প্রকার ভজনে সকলের সুবিধা হইতেছে না—বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতেছে। কাজেই বলিতে হয়—গঙ্গাস্নানের ঘাট যদি একটি মাত্র থাকে তবে যেমন বহুলোকের গঙ্গাস্নানটাই হইতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বরের ভজনপ্রণালী যদি একই প্রকার হয়, তবে একদলভুক্ত অনেকের ভগবান্‌কে ডাকাই হয় না। অনেকের ধর্ম্ম করা শুধু মৌখিক আড়ম্বর মাত্র হইয়া যায়।

আবার বলি ঈশ্বর এক, কিন্তু সেই একের ভজনপ্রণালী বহু। উপস্থিত যে দলাদলি সম্প্রদায়ে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া হীনবল হইয়া যাইতেছে তাহার মূল কারণ কিন্তু ঈশ্বরকেই বহু মনে করা। আমরা বিভিন্ন ভজনের কথা পরে আলোচনা করিব; এখানে বিবাদভঞ্জনের মূল কোথায় তাহাই দেখাইতেছি।

বিবাদভঞ্জন করিতে হইলে বিবাদটি প্রথমে জানা চাই। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ইহার অনিশ্চয়তাই বিবাদের মূল। শক্তি অব্যক্ত অবস্থায় অমূর্ত্ত—এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন অথবা একটি আধার ভিন্ন অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিতেই পারে না। অগ্নির আকার কি তাহা কিরূপে নিশ্চয় করা যায়? একটি কাষ্ঠখণ্ডের ভিতরে অগ্নি আছে; কিন্তু অব্যক্ত অবস্থায় আছে। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে যখন অগ্নি ব্যক্তাবস্থায় আসেন, যখন অগ্নির প্রকাশ হয়—তখন সেই ব্যক্ত অগ্নির আকার কিরূপ? কাষ্ঠ-

ব্যাপী অগ্নির আকার সেই আধারভূত কাষ্ঠেরই মত। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া কঠশ্রুতি বলিতেছেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
এক স্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

এক অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া প্রতি দাহ্য বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন আকার অনুসারে সেই সেই আকার ধারণ করে, সেইরূপ এক আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাধির সদৃশ আকার ধারণ করেন। শ্রুতি আরও বলেন "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" স্মৃতিও বলেন "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু"।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এ কথা কি মিথ্যা? মিথ্যা ত হইতেই পারে না। তবে বলা উচিত স্বরূপে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য, তবেই কথাটি স্পষ্ট হয়। আবার ঈশ্বর আকারবান্ এ কথা কি মিথ্যা? মিথ্যা হইবে কিরূপে? অগ্নি অমূর্ত্ত্য হইয়াও যেমন দাহ্যবস্তুর আকারে আকারিত হয়েন, সেইরূপ স্বরূপে বা আপনি আপনি ভাবে যিনি অমূর্ত্ত্য তিনি যখন যে আধার অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হয়েন—সেই আধারই তাঁহার আকার। যখন আপনি আপনি ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী হইয়া প্রকট হয়েন তখন তিনি বিশ্বরূপ। যখন পৃথিবীর বিপর্য্যয়কালে অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে সাধুর পরিত্রাণ ও অসাধুর বিনাশ জন্য মৎস্য কূর্ম্ম মানুষ মানুষী দেহকে আধার স্বরূপ করিয়া ভাসেন, তখন তিনি মৎস্য কূর্ম্মাকার বা মায়া-মানুষ, মায়া-মানুষী আকার ধারণ করেন। আবার সেই অখণ্ড চৈতন্য যখন ঘটে ঘটে প্রবেশ করেন তখন তিনি অখণ্ডস্বরূপে থাকিয়াও জীবে জীবে উপাধিতে উপাধিতে জীবচৈতন্য নাম ধারণ করেন। শ্রুতির এইমীমাংসা বিবাদ-ভঞ্জনে সমর্থ। কিন্তু যাঁহারা বলেন ঈশ্বর নিরাকার তাঁহারা যেমন তাঁহার স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলেন, সেইরূপ যাঁহারা বলেন ঈশ্বর সাকার তাঁহারাও তাঁহার প্রকাশের আধার লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলেন।

এইখানে বিবাদ উপস্থিত হয় তখন, যখন প্রথম শ্রেণীর লোকে বলেন নিরাকার ঈশ্বর কখন সাকার হইতে পারেন না, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে যখন বলেন সাকার ঈশ্বর কখন নিরাকার নহেন।

এই দুই সম্প্রদায় আপন আপন মত সমর্থন জন্য নানাপ্রকার যুক্তিও দেখাইয়া থাকেন। ইঁহাদের সকল যুক্তি প্রদর্শন করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। প্রধান প্রধান দুই একটি যুক্তি দেখিলেই বুঝা যাইবে এ সমস্ত যুক্তি কতদূর সঙ্গত।

রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরের আকার নাথাকা সম্বন্ধে যুক্তি দেখাইলেন এই :—ঈশ্বর সমস্তই করিতে পারেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বরূপের বিনাশ কখনও করেন না। ঈশ্বর যদি মানুষ মূর্ত্তি বা কোন প্রকার আকার ধারণ করেন, তবে তাঁহার স্বরূপের ধ্বংস হয়। অতএব ঈশ্বর আকার ধারণ করিতে পারেন না। তবে আমাদের জাতি যে সমস্ত মূর্ত্তি পূজা করে সে সমস্ত মূর্ত্তি মানুষের কল্পিত—এই জন্য অশ্রদ্ধেয়।

আর্য্য ঋষিগণ ইহা স্বীকার করেন না যে খণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিলে অখণ্ড ঈশ্বরের স্বরূপ ধ্বংস হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ঈশ্বর চৈতন্য আপন অখণ্ড স্বরূপে থাকিয়াও সমকালে খণ্ডমূর্ত্তিও ধারণ করিতে পারেন। শ্রুতিও বলেন—অহং বহুস্যাম্। এক কি কখন বহু হয়? এক, এক থাকিয়াই মায়ার সাহায্যে আপনাকে যেন বহু করেন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলেন—মানুষের মন অনন্ত সংকল্প বিকল্পময় হইলেও মানুষ যখন একটি সঙ্কল্পে অভিমান করে, তখন মনটা ঐ সঙ্কল্প আকারে আকারিত হইলেও মনের সকল সঙ্কল্পময়ত্ব দূর হয় না অর্থাৎ মন সঙ্কল্পপূর্ণ থাকিয়াও একটি সঙ্কল্প ধরিয়া মূর্ত্তিমান্ হয়। আমরাও দেখি বৃদ্ধ আপন পুত্রের সহিত ঘোড়া ঘোড়া যখন খেলে তখন আপনাকে বৃদ্ধ জানিয়াও বালক সাজিয়া খেলা করিতে পারে—তাহাতে তাহার বৃদ্ধ-স্বরূপের ধ্বংস হয় না। অথবা যাত্রার দলের বালক কৃষ্ণ সাজিয়া অভিনয়ে কৃষ্ণকার্য্য দেখাইলেও,

আপনার কৈবর্ত্ত-স্বরূপের ধ্বংস-দোষে দুষ্ট হয় না। সে, যে কৈবর্ত্ত সেই কৈবর্ত্ত থাকিয়াও কৃষ্ণ সাজিয়া অভিনয় করিতে পারে। মানুষ এক হইয়াও যখন অপর কিছু সাজিয়া অভিনয় করিতে পারে, তখন ঈশ্বর স্বস্বরূপে থাকিয়াও মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার-রঙ্গ দেখাইতে না পারিবেন কেন? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার রূপ ধরিবার শক্তিটিরই কি অভাব থাকিবে? এই জন্য ইহা যুক্তিযুক্ত যে, ঈশ্বর আপন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও বিশ্বরূপ, আত্মারূপ ও অবতার রূপ সমকালে ধারণ করিতেপারেন।

আবার ঐ যে বলা হয় ঈশ্বরের রূপ মানুষের কল্পনামাত্র—ঋষিগণ ইহা স্বীকার করেন না।

> চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরীণঃ।
> উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥

ব্রহ্মের রূপ কে কল্পনা করে ইহার বিচার যাঁহারা না করেন তাঁহারাই, মানুষেই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে এইরূপ বলেন। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার শক্তির নামই মায়া। মায়াই ঈশ্বরকে রূপ ধরান। "স্বয়মন্ন ইবোল্লসন্" আপনি আপনিই আছেন তথাপি যে অন্যমত হয়েন এই তাঁহার আত্মমায়া। পূর্ব্বেও বলিলাম অহং বহুস্যাম্ এই শ্রুতিবাক্যেও দেখা যায়—তিনি আপনস্বরূপে সর্ব্বদাই আপনি আপনি এক। এক যাহা, তাহা কোন প্রকারেই বহু হইতে পারে না। ব্রহ্মের এই বহু হওয়া মায়ারই সাহায্যে। আবার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে কল্পনা কথাটির ব্যবহার দেখা যায়—তাহার ধাতুগত অর্থ দেখিলেই ঋষিদের ব্যাখ্যা সমীচীন বুঝা যায়। কৃপ সামর্থ্যে। ব্রহ্মের রূপ ধরিবার সামর্থ্য বা শক্তি আছে। এই শক্তিই তাঁহার অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া। এই মায়া যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহারা কিছুতেই ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি কিরূপে হয় তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। শ্রীগীতাও অবতার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিস্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

ঋষিগণের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মায়া ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার জগৎ হইতে পারে না—ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মের মূর্ত্তি হইতে পারে না এপক্ষে যে যুক্তি দিয়াছেন দেখান হইল; আরও দেখান হইল ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের যুক্তিতে রাজার যুক্তি ভ্রমাত্মক।

অন্য পক্ষে ব্রহ্ম যে সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার ইহা মানুষের বিচারে আসিলেও ইহার অনুভূতি বিশেষ সাধনার উপর নির্ভর করে। যাঁহারা সাধনায় কিছু অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে কূটস্থে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও চলন, বলন, গমন, রোদন, আহার, বিহার সবই করা যায়। তারপর শ্রীগীতা বলেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমিই জগৎ ব্যাপিয়া আছি। যিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন তিনি এককালেই কেদার বদরীনারায়ণের শীত ও কলিকাতার গ্রীষ্ম না অনুভব করিবেন কেন? যিনি সর্ব্বহৃদয়ে সমকালে বিরাজ করিতেছেন, তিনি পুত্রবিনাশের শোক ও পুত্রজন্মের হর্ষ—এই শোক ও হর্ষ সমকালে অনুভব না করিবেন কেন? মানুষে এককালে শীত উষ্ণ বা শোক হর্ষ অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু শ্রীভগবানে ইহা অসম্ভব কেন হইবে? যিনি সমকালে জাগ্রতস্থান, স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তস্থান অথচ সর্ব্বদাই আপন তুরীয় স্বভাবে অবস্থিত, তিনি সমকালে জাগিয়াও স্বপ্ন না দেখিবেন কেন? যখন মানুষ ভাবনারাজ্যে থাকিয়াও চলা ফিরা কথা কওয়া সবই পারে তখন সর্ব্বশক্তিমান্ আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভিনয় সমকালে না পারিবেন কেন? ফলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি মায়ার গতাগতিতে তাঁহারাই উপরে যায় আসে মাত্র। সমুদ্রের একদেশে ঝড়, অন্যদেশ শান্ত—সমস্ত সমুদ্রব্যাপী যিনি, তিনি ঝড় ও ঝড়ের

অভাব এক সময়ে অনুভব না করিবেন কেন? মানুষে যাহা পারে না তাহা যে তিনিও পারেন না—একথা বলিলে তাঁহাকে একটি আদর্শ মানুষই বলিতে হয়। কিন্তু এই মানুষই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তাঁহার স্বরূপে স্থিতি লাভ করে।

দ্বিতীয় মতে বলা হয় ঈশ্বর চিরদিনই সাকার, তিনি নিরাকার হইতেই পারেন না। ইহাও যুক্তি ও শ্রুতি বিরুদ্ধ। কারণ যাঁহার স্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান সেই জ্ঞানরূপী, আনন্দরূপী, নিত্যচৈতন্যের আকার কি? তিনি যখন আপনি আপনি থাকেন, মহাপ্রলয়ে জল, স্থল, অম্বরতল, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত, জীব, জন্তু, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু এই সব যখন কিছুই থাকেনা তখন যিনি থাকেন—তাঁর আকার কি? যাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় "যন্নবেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতং ন যত্র বাক্ প্রভবতি" সেই আপনি আপনি অবস্থায় বেদও যাঁহাকে জানেন না, মন যে সীমাশূন্য বস্তুকে চিন্তা দ্বারা সীমাবিশিষ্ট করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, যেখানে বাক্যের প্রসার হইতে পারে না—সেই একমেবাদ্বিতীয়ের আকারই বা কি, তাঁহাকে আকারবিশিষ্ট দেখিবেই বা কে? জাগ্রৎকালে অনেক বস্তুর অনেক স্থূল আকার দেখা যায়, স্বপ্নে কিন্তু স্থূল আকার ত থাকে না, থাকে সূক্ষ্ম আকার। ইহাও যে থাকে তাহা মনঃস্পন্দন থাকে বলিয়া। জাগ্রতে হয় দর্শন আর স্বপ্নে হয় দৃষ্টের স্মরণ। কিন্তু সুষুপ্তিতে যখন নৈশতমাচ্ছাদিত বস্তু সকলের মত সকল বস্তু এক ঘনতমাচ্ছন্ন হইয়া একীভূত হইয়া যায়, যখন পুরুষ এক আপনাকে আপনি জানার অভাবে নিরায়াস পদে আনন্দময় আনন্দভুক্‌রূপে থাকেন, সেকালে তিনি আর কোন প্রকার মনঃস্পন্দনের ক্লেশ পর্য্যন্ত অনুভব করেন না বলিয়া অনায়াস পদে স্থিত হন, **যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি** সেই সুষুপ্তিতে স্থূল সূক্ষ্ম আকারের কোন্ আকার তাঁহাতে থাকে? যখন তিনি ঘনপ্রজ্ঞ—অন্তঃপ্রজ্ঞও নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞও নহেন, তখন

তাঁহার আকার কিরূপ ? যদিও তখন তমঃ আকার বিশিষ্ট তাঁহাকে বলা যায়, কিন্তু সাধন সম্পত্তি দ্বারা যখন তুরীয় অবস্থায় তিনি উপনীত হয়েন তখন তাঁহার আকার কি ? শ্রুতি ত ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। শ্রুতি ত ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন—**অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্, অগ্রাহ্যম্, অলক্ষণম্, অচিন্ত্যম্, অব্যপদেশ্যম্, একাত্মপ্রত্যয়সারম্, প্রপঞ্চোপশমম্, শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।** এই তুরীয়কে কোন কিছু দিয়া ত বলা যায় না। মনন মাত্র করা যায়—তাও বলার জন্য বলা তিনি শিবমদ্বৈতং। কিন্তু ইহার আকার তখন কি ? শ্রুতি ত এই পর্য্যন্ত বলিলেন। এই তুরীয় যখন মায়াকে আশ্রয় করেন, তখন মায়ার আকারই তাঁহার আকার হয়। মায়া যখন সাম্যাবস্থারূপিণী অব্যক্তা, তখন তিনিও যেন অব্যক্ত। মায়া যখন সঙ্কল্পস্পন্দনে স্পন্দরূপিণী, তখন তিনিও সঙ্কল্পময় দেহে আতিবাহিক হিরণ্যগর্ভ। আবার মায়া যখন স্থূল আকার বিশিষ্টা তখন তিনি সমষ্টি স্থূল দেহ ধরিয়া বিরাট্। শ্রুতি ত ইহাই বলিতেছেন।

তবেই দেখা গেল নিরাকার কখন সাকার হইতে পারেন না আবার সাকারও কখন নিরাকার হইতে পারেন না—এই দুই আধুনিক মতের সহিত ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের কোন সাদৃশ্য নাই। ঋষিগণ বলেন—তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার আবার সাকার হইয়াও নিরাকার।

সবার এক ধর্ম্ম হইবে তখন, যখন মানুষ বুঝিতে পারিবে তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার আবার সাকার হইয়াও নিরাকার। এ সিদ্ধান্তে মানুষ কি উপনীত হইতে পারিবে ? বিবাদভঞ্জনের মূল কথা মানুষ কি বুঝিতে চেষ্টা করিবে ?

(২)

নিরাকার সাকার উপাসনা-প্রণালীর বিবাদভঞ্জন প্রয়াস।

উপস্থিত সময়ে নিরাকার উপাসকগণ সাকারের সাহায্য না লইয়াই উপাসনা করিতে চান আর সাকার উপাসকগণও নিরাকারকে লক্ষ্য না করিয়াই উপাসনা করেন। প্রথম প্রণালীর দোষ সাংসারিক সুবিধার জন্য ক্ষণস্থায়ী ঈশ্বরভাব আশ্রয়—ইহাতে ধারণা, ধ্যান, সমাধিস্থিতি ইত্যাদির অভাব। দ্বিতীয় প্রণালীর দোষ পূর্ণ চৈতন্যের অভাব জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে স্থিতি এবং দলাদলি সম্প্রদায়ের বিরোধ। ঋষিগণ যে উপাসনা করিতেন তাহাতে এই দোষের কোন কিছুই থাকে না। আমরা ঋষিগণের উপাসনাটিই এখানে দেখাইতেছি।

ঋষিগণ সাকার সাহায্যেই নিরাকারে স্থিতিলাভ করিতে বলিতেছেন। তন্ত্র বলিতেছেন—

সাকারেণ মহেশানি ! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি ! নিরাকারং ন পশ্যতি ॥
সাকার মূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্যতি।
অভ্যাসেন সদা দেবি ! নিরাকারং প্রপশ্যতি ॥

কুব্জিকা তন্ত্রে নবম পটলে।

সাকার অবলম্বন করিয়াই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম ভাবনা করিতে হয়। সাকারের সাহায্য ভিন্ন নিরাকারকে দেখা যায় না। নিরাকারকে দেখা কি ? না নিরাকার হইয়া স্থিতিলাভ করা অর্থাৎ মনকে কোন আকারে একাগ্র করিলে যখন মন তদাকার কারিত হইয়া নিরোধ অবস্থা লাভ করে, যখন দ্রষ্টা দৃশ্য আর থাকে না তখন হয় নিরাকারে স্থিতি। ইহাকেই বলা হইয়াছে নিরাকারের দর্শন। তন্ত্র আবার বলিতেছেন সমস্তইসাকার মূলক। দেখা যাহা—তাহা সাকার লইয়াই। কিন্তু মনঃস্পন্দনের নিরোধ অভ্যাস করিতে যাঁহারা পারেন তাঁহারা হে দেবি ! সেই অভ্যাস দ্বারাই নিরাকারকে দেখিতে পারেন অর্থাৎ নিরাকারে স্থিতিলাভ করেন।

যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার প্রণালী দেখাইয়া দিতেছেন তাহাও প্রথমে ধ্যান করিবার জন্য অর্থাৎ অবলম্বনের বস্তুটি

ধরিবার জন্য বলিতেছেন "হৃদয়কমল মধ্যে"। ব্রহ্ম চৈতন্যকে অষ্টদল কমল মধ্যে ধ্যান করিতে হইবে।

ভগবান্ অগস্ত্য, অগস্ত্যসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন—

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥

যিনি সর্ব্বেশ্বর, যিনি সর্ব্বময়, যিনি সর্ব্বভূতহিতে রত—তিনিই সকলের উপকারের জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন। অবতারের রূপ তবে মানুষের কল্পনা নহে। সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি তাঁহার মায়াকে অবলম্বন করিয়াই আকার ধারণ করেন।

ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন

"ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ"

যাঁহার জন্ম নাই সেই অজ পুরুষই ভক্তচিত্তানুসারে আকার ধরিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরোধ মনের এই পাঁচ অবস্থা। তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থায় সাধনা হয় না। একাগ্র হইবার প্রয়াস হইতে সাধনা আরম্ভ। একাগ্র হইতে হইলে কোন একটিকে অগ্রে স্ফুরিত করিতে হইবে। সেই একটিই অবলম্বন। একাগ্র হইবার অবলম্বনটি ধরিয়াই সাধনা করিতে করিতে নিরোধ অবস্থা আইসে। নিরোধ হইলেই নিরাকারে পৌঁছান যায়।

ঋষিগণের উপাসনা-প্রণালীতে সর্ব্বত্রই দেখা যায় তাঁহারা উপাস্য বস্তুটিকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ ও কর্ম্মগুলির চিন্তা করিতেই বলেন। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ভগবান্ অগস্ত্য শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে আশ্রমে আগত দেখিয়া তাঁহার সম্মুখেই বলিতে লাগিলেন—

সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীন্নির্ব্বিকল্পোঽনুপাধিকঃ।
ত্বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়া তে শক্তিরুচ্যতে॥

ত্বামেব নির্গুণং শক্তিরাবৃণোতি যদা তদা।
অব্যাকৃতমিতি প্রাহুর্বেদান্ত পরিনিষ্ঠিতাঃ॥
মূল প্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহুর্ম্মায়েতি কেচন।
অবিদ্যা সংস্থতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে॥
ত্বয়া সংক্ষোভ্যমানা সা মহত্তত্ত্বং প্রসূয়তে।
মহত্তত্ত্বাদহঙ্কারস্তয়া সংচোদিতাদভূৎ॥
অহঙ্কারো মহত্তত্ত্ব সংবৃত স্ত্রিবিধোঽভবৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভণ্যতে॥
তামসাৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যাসন্ ভূতান্যতঃ পরম্।
স্থূলানি ক্রমশো রাম ক্রমোত্তর গুণানি হ॥
রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ।
তেভ্যোঽভবৎ সূত্ররূপং লিঙ্গং সর্ব্বগতং মহৎ॥
ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ স্থূলাৎ ভূতকদম্বকাৎ।
বিরাজঃ পুরুষাৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্॥
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাশ্চ কাল কর্ম্মক্রমেণতু।
ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগতঃ সর্ব্বকারণম্॥
সত্ত্বাদ্বিষ্ণুস্তমেবাস্য পালকঃ সদ্ভিরুচ্যতে।
লয়ে রুদ্রস্তমেবাস্য তন্ময়া গুণভেদতঃ॥
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাখ্যা বৃত্তয়ো বুদ্ধিজৈর্গুণৈঃ।
তাসাং বিলক্ষণো রাম ত্বং সাক্ষী চিন্ময়োঽব্যয়ঃ॥
সৃষ্টিলীলাং যদা কর্ত্তুমীহসে রঘুনন্দন।
অঙ্গীকরোষি মায়া ত্বং তদা বৈ গুণবানিব॥ ইত্যাদি

এই ভাবে তখন উপাসনা চলিত। কালে যখন দলাদলি সম্প্রদায় জাগিয়া উঠিল তখন স্বরূপচিন্তা-বিবর্জ্জিত শুধু আকারের নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম পর্য্যন্তই চিন্তা করা হইতে লাগিল। ইহা কিন্তু ঋষিগণের প্রথা নহে। স্বরূপ বাদ দিয়া কিছু করিতে গেলেই পৌত্তলিকতার দিকে হেলিতে হইবে এবং দলাদলি সম্প্রদায়ও হইবে। ভগবান্

শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত ঋষিগণের প্রথাই চলিত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ গোবিন্দপাদের শিষ্য। ভগবান্ গোবিন্দপাদ ভগবান্ গৌড়পাদাচার্য্যের শিষ্য। ভগব্যন্ গৌড়পাদ আবার ভগবান্ শুকদেবের শিষ্য। কাজেই ইঁহারা সকলেই ঋষিগণের অনুসরণ করিয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উপাসনা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে বলিতেছেন—উপাসনং নাম উপাস্যার্থবাদে যথা দেবতাদি স্বরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে তথা মনসোপগম্য আসনং চিন্তনং লৌকিকপ্রত্যয়া ব্যবধানেন যাবৎ তদ্দেবতাদি স্বরূপাত্মাভিমানাভিব্যক্তিরিতি লৌকিকাত্মাভিমানবৎ "দেবোভূত্বা দেবানপ্যেতি" "কিন্দেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসি" ইত্যেবমাদি শ্রুতিভ্যঃ। ১।৩।১৮।৯ পৃঃ ১৩০

উপাসনা হইতেছে উপাস্য দেবতার অর্থবাদ বাক্যে অর্থাৎ প্রশংসা বাক্যে যে স্বরূপ বর্ণিত আছে মনে মনে ঠিক সেই রূপটির নিকটে উপস্থিত হইয়া চিন্তা করা অর্থাৎ সেই দেবতার সহিত নিজের অভেদ ভাবনা করাই উপাসনা। উক্ত চিন্তাতে জাগতিক অন্য কোন চিন্তা থাকিবে না। যতক্ষণ লৌকিক অভিমানের ন্যায় সেই উপাস্য দেবতাদিস্বরূপে আত্মাভিমান অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল ঐরূপ চিন্তা বা ধ্যান প্রতিনিয়ত করিতে হইবে। কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—"ভাবনাবলে দেবতাভিমানী হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়" তুমি এই পূর্ব্বদিকে কোন্ দেবতাভিমানী হইয়া দেবতারূপে বর্ত্তমান আছ?" ইত্যাদি।

দলাদলি সম্প্রদায় ছাড়িয়া আবার কি এই জাতি যথার্থ উপাসনা করিতে শিখিবে?

লাঞ্ছিতা।

আজি

কি সাজে সাজায়ে পাঠালে আমারে
কেমনে দাঁড়াব লোকের মাঝে
গুরুগরজন জানতো সকলি
চেয়োনা অমন মরিগো লাজে !

বঁধু !

বিরলে বিজনে মনো-বনভূমে
যেথায় বাঁশরী কাতরে খুঁজে ;
নয়ন নিমিষে শতযুগ বাসে
সেথায় সকলি নিয়োগো পুঁছে।

আজিত

সাধের ভূষণ লাঞ্ছনা গঞ্জনা,
ক'রেছি হিয়ার হার ;
একুলে ওকুলে বলগো দুকুলে,
কে আছে আমার আর ?

তাই

জাগরণে মোর সদাই ভাবনা
কি জানি যদি বা শেষে—
অযতনে পাছে মাণিক খোয়াই
অভাগী করম-দোষে।

ভাবি

নিদ্রার আবেশে যদি বা হারাই
শয়নে সোয়াস্তি নাই !

চমকি জাগিয়া নিরখি গোপনে
হৃদয়ে আছে বা নাই।

বল ?
এ হিয়া-রতনে রাখিব কোথায়
আমি কি যতন জানি ?
(মোর) ফণিশিরে মণি নয়নেরি তারা
পরাণে পরাণ মানি।

আহা! এ
সাগর-সিঞ্চিত অচল মাণিকে
কুড়ায়ে পেয়েছি আমি।
(তাই) সদা মনে ভয় হারাই হারাই
পলকে প্রলয় গণি ॥

মৃঃ

ভালবাসার ধর্ম্ম।

কৈ ভালবাসিলাম ? যারে ভালবাসি তার ভাবনা কি একবারও ছাড়া যায় ? তারে ভুলিয়া কি আর কিছু করা যায় ? যারে ভালবাসি তার কথা পালন করিতে কি কোন ক্লেশ হয় ? যারে ভালবাসি, তারে ভুলিয়া কি আর কোন কিছুতে ক্ষণকালের জন্যও নিমগ্ন হওয়া যায় ? তা যায় না। ভালবাসাতে দুঃখটা আদৌ থাকে না। দুঃখ যদি আইসে, ভালবাসার কথা মনে করিলে দুঃখটাও একক্ষণেই সুখ হইয়া যায়। ভালবাসিয়া যাহা করা যায় তাহাই সুখ। ভালবাসা জিনিষটি এমনি যে, ভালবাসিলেই একটি আনন্দপ্রবাহে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা হইয়া যায়।

এই ভালবাসায় কিন্তু স্বার্থ থাকে না ; এই ভালবাসায় কিন্তু আমার আরামের দিকে দৃষ্টি থাকে না ; আমার কি হয়, কি না হয়—তাহাতে নজর পড়ে না। ভালবাসায় নজর থাকে,—সর্ব্বদা যারে ভালবাসি তার দিকে। তারে প্রসন্ন করা ভিন্ন ভালবাসায় নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। আমি যেমনই থাকিনা কেন, তারে প্রসন্ন দেখিয়া, তার সুখের প্রতিচ্ছায়াই আমাকে সুখ দেয় এই লইয়া থাকা হয়। সে সুখী তাই আমার সুখ।

ভালবাসায় কোন কিছু চাওয়া থাকে না। থাকে দেওয়া। আমার যা কিছু, সব তার। এই দেহ তার, এই বৈভব তার, আমার কিছুই নাই। আমার যাহা থাকে—তাহা সেবা। আমি সব দিয়া তারে সেবা করিব ইহা ভিন্ন অন্য সাধ আর কিছুই থাকে না। ভাবনায় তারে সেবা করি, বাক্যে তারে সেবা করি, সকল কর্ম্মে তারে সেবা করি এ ভিন্ন কিছুই করিনা।

লোকে বলে দুইটি অক্ষরের আবৃত্তিরূপ যে জপ, তাহা কি রোজ ভাল লাগে ? আমি বলি রোজ কি বলিতেছ, অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া সেই নাম জপ মিষ্ট লাগিবে যদি ভালবাসা যায়। যারে ভালবাসি তার নাম বড় মধুর। তার সবই মধুর। তার নাম মধুর, তার গুণ মধুর, তার কর্ম্ম মধুর, তার রূপ মধুর, তার স্বরূপ মধুর। ভালবাসায় দোষ চক্ষে পড়ে না। ভালবাসায় কোন কিছুই মন্দ ভাবা যায় না। ভালবাসায় সমালোচনা হয় না। ভালবাসায় কোন কিছুই কদর্য্য থাকে না। ভালবাসায় সব সুন্দর হইয়া যায় :

ভালবাসায় অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং ; ভালবাসায় বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরং চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং ; ভালবাসায় বেণুর্ম্মধুরো রেণুর্ম্মধুরঃ পাণির্ম্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং ; ভালবাসার গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং রূপং মধুরং তিলকং

মধুরং ; ভালবাসায় করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরং এমন কি ভালবাসায় বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং ; ভালবাসায় গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা সলিলং মধুরং কমলং মধুরং ; ভালবাসায় গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং : ভালবাসায় গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টির্মধুরা স্বষ্টির্মধুরা দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং আর কি বলা যাইবে, ভালবাসায় মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।

ভালবাসায় সঙ্কল্পসিদ্ধি বলিয়া কিছুই থাকেনা। যেখানে সব দিতে ইচ্ছা করে, সেখানে স্বার্থসিদ্ধি কি থাকে? সেখানে মিলনও মধুর, সেখানে বিরহও মধুর। সেখানে নিকটে থাকায় সুখ, তারে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাওয়া যায় বলিয়া—তারই মধ্যে পূর্ণত্ব পাওয়া যায় বলিয়া, আবার দূরে থাকাও সুখ ; কেননা তারে সব সাজিয়া থাকিতে দেখিয়া। নিকট দূর ভালবাসায় থাকে না। তবুও নিকটটি যেন অতি মধুর। তাই বুঝি শ্রীগীতা বলিতেছেন—যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র আর সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

এ ভালবাসা কিন্তু ক্ষুদ্রে থাকেনা। এ ভালবাসা ভূমা। শ্রুতি বুঝি তাই বলিতেছেন—যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। সীমাশূন্য যাহা, তাহাই সুখ ; অল্পে সুখ থাকেনা।

ভালবাসায় তার ক্লেশ দেখা যায়না। তারে ক্লেশ ত দেওয়াই যায়না। কেহ তারে ক্লেশ দিবার কথা বলিলেও তাহা সওয়া যায়না। তাই বুঝি শ্রীরাম কার্য্যকরণে প্রথিতৈক বীরঃ যিনি, তিনি বলিয়াছিলেন—মানুষ কেন আমার প্রভুকে বিপদ উদ্ধারের জন্য ডাকে ; তাঁরে ক্লেশ দিতে না ডাকিয়া আমাকেই কেন ডাকে না? আমি তাঁর দাস। আমিই জীবের সকল দুঃখ দূর করিয়া দিব। তাঁরে দুঃখ দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় না। তাই বুঝি চন্দ্রা যখন শ্রীমতীর যাতনা দেখিয়া বলিয়াছিল—আমি তারে বাঁধিয়া আনিয়া দিব ; তখন শ্রীমতী কাতরা হইয়া চন্দ্রাকে বলিয়াছিলেন—চন্দ্রা এ কর্ম্ম তোর দ্বারা হয় না।

দেখ্‌রে যে অঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত করিতে আমি ভয় পাই পাছে সে ব্যথা পায়—তুই তাঁরে বাঁধিবি চন্দ্রা ? এ কাজ তোরে দিয়া হইবেনা।

তাই বলি, কৈ তারে ভালবাসিলাম ? কৈ তারে স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিলাম ? আর যদি ভাল করিয়া ভাল না বাসিয়া তারে ডাকিলাম, তবে ত তেমন কিছুই হইল না। কৈ তারে ভরা-প্রাণে ডাকা হয় ? কৈ তারে ভালবাসিয়া "অব্ সব বিষসম লাগই" বলা হইল ? কৈ কবে বলা হইল—উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষে শরীরং রাঘবং বিনা ? কৈ কবে বলা হইল—জীবিতেন ফলং কি স্যান্মম রক্ষোধিমধ্যতঃ ? কৈ কবে বলা হইল—"মম মরণমেব বরমতি বিতথ কেতনা" আমার মরণই মঙ্গল, কৃষ্ণবিরহে আমার দেহধারণ নিতান্তই ব্যর্থ।

ভালই যদি না বাসিলাম, অনুরাগই যদি না জন্মিল তবে চিরদিনই কি কর্ত্তব্যজ্ঞানে জপ পূজা করিব ? চিরদিনই কি আশায় ভজিব ? চিরদিনই কি ভয়ে ভজিব ? হরি হরি—অনুরাগে কি ভজা হইবেনা ? বুঝিলাম বিনা বৈরাগ্যে সুখ হইবে না।

দেহ-প্রেমিক না আমি-প্রেমিক।

অনেক ত শুনিলাম। কিছু যে না করি তাও ত নয়। তবুও যেন হইতেছে না। তাই জিজ্ঞাসা করি কি করিব ?

সর্ব্বদা আমায় লইয়া থাক।

আমায় লইয়া থাক ? আমায় কে ?

সর্ব্বদা আমিকে লইয়া থাক। বুঝিতেছ ?

আমার আমিকে না তোমার আমিকে ?

একটি আমিই আছি। তোমাতে গিয়া তোমার আমি, আমাতে আসিয়া আমার আমি। আমি কিন্তু একটি।

আমার আমিই কি তোমার আমি ? আমার আমিই কি তুমি ? আমি ত তোমাকেই ভালবাসি। তুমি ইষ্ট, তুমিই গুরু, তুমিই মন্ত্র।

তোমার আমিই ত আমার সর্ব্বস্ব। আমি ত আমার আমিটাকে বিসর্জ্জন দিয়া, তোমার আমি হইয়াই থাকিতে চাই। তোমার আমিতেই মিশিতে চাই।

বলিলাম ত তোমার আমিও আমি আর আমার আমিও মূলে সেই আমি। আমিটি লইয়া সর্ব্বদা থাক। বাহিরে কোথায় ছুটাছুটি করিবে বল? বাহিরে কোথায় মিলিবে বল? শরীরে শরীরে মিলন হয় না। আমিই গুরু, আমিই ইষ্ট, আমিই মন্ত্র। ইষ্টের নামরূপ-বিশিষ্ট দেহে তোমার দেহ মিলিবে না। গুরুর শরীরে তোমার শরীর মিলিবে না। এ মিলন হইবে গুরুর আমিতে, ইষ্টের আমিতে, তোমার আমির। ঘটাকাশের ঘটের সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী মহাকাশের পৃথিবীর মিলন হইবে না। মিলন হয় ঘটাকাশের আকাশের সঙ্গে, পৃথিবীব্যাপী মহাকাশের মহাকাশে। কাজেই কোথাও ছুটাছুটি করিতে হইবেনা। আজ ৺কাশী ভাল লাগে, কাল কলিকাতা ভাল লাগে, পরশু ৺পুরী ভাল লাগে,—গুরু আছেন বলিয়া এসব কিন্তু ঠিক নহে। গুরুর দেহ যেখানে সেখানে থাকিতে পারে, আবার ইহা কোথাও না থাকিতেও পারে, কিন্তু গুরুর দেহ অবলম্বন করিয়া গুরুর আমিটিকেই চিনিতে হয়। সেই আমিকে চিনিবার জন্য তোমার আমি লইয়াই সর্ব্বদা থাকিতে হয়। ইহাই সাধনা। বুঝিতেছ?

আমার আমি লইয়া থাকিতে পারিলে সর্ব্বদা তোমার আমি লইয়া থাকা হয়? এতকাল ধরিয়া কি ইহাই বলিতেছ?

চৈতন্যটি লইয়া সর্ব্বদা থাকা চাই। আমিও যে চৈতন্য, তুমিও সেই চৈতন্য। একটা অজ্ঞানে আকাশটা শুধু ঘটটাকে দেখিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। ঘটটা না দেখিয়া আকাশটা আকাশকেই দেখুক, তবেই আপনার হৃদয়ে সর্ব্বদা মহাকাশকে পাইবে। শুধু কি তাই? মহাকাশকে পৃথিবীব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বল। কিন্তু যে চৈতন্য তোমাকে ব্যাপিয়া আছেন, যে চৈতন্য বিরাট্ বিশ্ব শরীর ব্যাপিয়া আছেন, তাহা কি ব্যাপ্য বস্তু ব্যাপায় শেষ হইয়া গিয়াছে? না না,

তাহা হয় নাই। ব্যাপ্য বস্তুর বাহিরেও তিনি আছেন। এত আছেন যে তাঁর সীমা করা যায় না। বিষ্ণু যিনি, তিনি বিষ্ণুর এই পুরোবর্ত্তী মূর্ত্তি ব্যাপিয়া অথবা বিষ্ণুর এই পরিদৃশ্যমান বিরাট্ শরীর ব্যাপিয়াই শেষ হইয়া যান নাই। বাহিরে অনেক আছেন। তাঁর পরিমাণ হয় না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাদ্"। শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি বলিতেছেন—তিনি সীমাশূন্য তথাপি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়পাদস্বরূপ তাঁহাকে বলা হয়। বলা হয় চতুষ্পাদ ব্রহ্মের অজ্ঞান পাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উঠিতেছে। আর ত্রিপাদ সর্ব্বদা চলনরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপে সর্ব্বদা আছেন। মায়ার চলন যেখানে নাই, তাহাই তৎ বিষ্ণুর পরমপদ। তোমাকে সেই স্থানে স্থিতিলাভ করিতে হইবে। তবেই আর পতনের ভয় থাকিবে না। অনুরাগে না ভজিলে পতনের ভয় আছে। অনুরাগ একবার আসিয়াছিল। কিন্তু দেহপ্রেমিক হইয়া গিয়াছিলে বলিয়া সে অনুরাগ রাখিতে পার নাই। অনুরাগ আবার আসিয়াছে বলিতেছ। এবার আর সে ভ্রম করিও না। দেহপ্রেমিক হইও না। চৈতন্যপ্রেমিক হও। শরীর-প্রেমিক হইও না। আমি-প্রেমিক হও। আমি-প্রেমিকা হও। আমি-প্রেমিক হইতে হইলে, আমি লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে হইবে।

আমি লইয়া সর্ব্বদা থাকার জন্যই সর্ব্বদা জপ করিতে বলি। আমি লইয়া সর্ব্বদা ত তিন বেলায় নিত্যক্রিয়া করিবেই, কিন্তু সর্ব্বদা জপ করিতে করিতে আমি লইয়া থাক। ব্যবহারিক জগতেও একবারও আমি হারাইও না। তবেই আমি-প্রেমিক বা আমি-প্রেমিকা হইতে পারিবে।

যাহার নাম সর্ব্বদা জপ সে কে? সেই আমি। সেটি পরম-পদেরই নাম। সেইটিই সবার গুরু। তাই বলা হয়—মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ। তবেই ত হইল মন্ত্রগুরু ও ইষ্ট এক। সর্ব্বদা নাম জপ। আর লক্ষ্য রাখ আমি জপিতেছি। ইহাই সর্ব্বদা আমি লইয়া থাকা। ইহাই আমি-প্রেমিক, আমি-প্রেমিকা হওয়া।

আহা বুঝিতেছি তুমি আবার বল।

তিন বেলায় নিত্যক্রিয়া কর, স্বাধ্যায় কর, আর সর্ব্বদা জপ কর। কিন্তু আমি লইয়া করিও। আমা হারাইয়া নহে। ইহা করিতে পারিলে দ্রষ্টাভাবে থাকার অভ্যাস হইতে থাকিবে। ক্রমে যত আমিতে লক্ষ্য স্থির হইবে, ততই দেখিবে ঘটাকাশের হৃদয়ে যেমন মহাকাশ সর্ব্বদা আছেন, তেমনি তোমার আমির হৃদয়ে গুরুর আমি, ইষ্টের আমি আছে। সর্ব্বদা গুরু সঙ্গ হইতেছে। শ্রীগুরুই, শ্রীনামই যাঁহার, তিনিই তোমার আমির পূর্ণত্ব। গুরু একক্ষণের জন্যও শিষ্যকে ছাড়িয়া নাই। সর্ব্বদা নাম জপিতে জপিতে যখন একবারও আমি ভুল করিবে না, তখন একটা আনন্দ ভাব আসিবে। সেই আনন্দ উঠিলেই ঠিক ঠিক সঙ্গ নিত্য হইতে লাগিল। তখন হইবে চৈতন্য-প্রেমিক বা চৈতন্য-প্রেমিকা।

আচ্ছা আমিতে লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে গেলেও ত সময়ে সময়ে আমি হারাইয়া যায়। এ কেন হয়? এসব যাইবে কবে?

আমি যে হারাইয়া যাইতেছে ইহা ধরিতে পারাও সাধনা। অন্য চিন্তা আসিলেই ভীত হইও না। কত জন্মের কত সংস্কার আছে। ইহারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক আসিবেই। ইহাতে কিন্তু কর্ম্মবন্ধন হইবে না। ইহারা প্রারব্ধভোগ করাইয়া দিতেছে। এ সমস্ত যাইবে কবে জান? যখন তোমার বৈরাগ্য অভ্যাস ঠিক হইবে, তখন আর এসব উঠিবে না। প্রত্যহ নিত্যক্রিয়ার পূর্ব্বে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া তবে নিত্যক্রিয়ায় বসিও। যে দিন ভাল থাক সে দিনও বৈরাগ্য অভ্যাস করিও। একমাত্র চৈতন্যই সকলের আধার। তাঁহার উপরেই জগৎ, দেহ ও মনরূপ ইন্দ্রজাল উঠিয়াছে। এই জন্য ইন্দ্রজালকে মিথ্যা ভাবনা করিও। ব্যবহারিক জগতেও জগৎ যে মিথ্যা ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে চেষ্টা করিও। সেই জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছে। মিথ্যা নামরূপে, জগৎ আকারে আকারিত সেই। সর্ব্বদা চৈতন্যপুরুষে লক্ষ্য রাখিতে প্রাণপণ কর। আপনার চৈতন্য ধরিয়া সকলই এই চৈতন্য—এই ভাবনা

দৃঢ় কর। চৈতন্যের উপরে যাহা উঠিয়াছে তাহা মিথ্যা। মিথ্যা বলিয়া ইহা অনাস্থার বস্তু। এই ভাবে বৈরাগ্য পাকা কর আর অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠিবে না। ভোগে রুচি যখন থাকিবে না আর মনঃস্পন্দনরূপ কল্পনা উঠে কি না একান্তে যখন ইহা দেখিতে থাকিবে, তখন দেখিও মন আপন ধ্যেয় বস্তুতে এক হইয়া গিয়াছে। তবেই কোন জগৎ নাই একমাত্র তুমিই আছ। ইহা নিশ্চয় করিয়া ধ্যানের অবলম্বন যে তোমার ইষ্টদেবতা—সেই দেবতাতে যখন আমি ডুবাইবে, যখন ইষ্ট দেবতাকে দেখিয়া দেখিয়া ভাবিতে পারিবে তুমি যুগে যুগে আসিয়া থাক, তুমিই আমার খণ্ডচৈতন্য ধরিয়া অখণ্ড আত্মা হইয়া আছ, তুমিই বিশ্বরূপে সর্ব্বত্র ভাসিতেছ আবার সব যখন মহা-প্রলয়ে নষ্ট হইয়া যায় তখন তুমি থাক আপনি আপনি। এই যে নাম জপি ইহা তোমার নাম। এই যে রূপ দেখিতেছি ইহা তোমার রূপ। এই যে তোমার গুণ, তোমার কর্ম্ম চিন্তা করি—ইহার কোলে কোলে তোমার স্বরূপ আছে। এক কথায় নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম এই সমস্তই সেই স্বরূপকেই স্মরণ করাইয়া দেয় এই ভাবে সাধনা কর, নিত্য কর। দেখিবে মন সকল সঙ্কল্প ছাড়িয়া তোমাতে মজিয়া, তোমাতে রসিয়া, তোমাতে মিশিয়া আত্মবধ নাটকের অভিনয় করিয়াছে। এই ভাবে সঙ্কল্পক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস সমকালে অভ্যাস কর—বড় ভাল হইবে। কর, শুধু শুনিলে পড়িলে কি হইবে। সাধনা কর, তপস্যা কর—সবই মিলিবে, জুড়াইয়া যাইবে। ইতি

অনেকে এক।

নমামি শ্রীসূর্য্যদেব নয়ন-দেবতা
নমো বায়ু নমো নম ত্বগিন্দ্রিয়-ধাতা
রসনার রাজা নম পয়-অধীশ্বর
অশ্বিনীকুমার নম ঘ্রাণের ঈশ্বর

শ্রোত্র অধিষ্ঠাতা নম দিক্ মহাশয়
এ পঞ্চ দেবতা তুমি! লইনু আশ্রয়।
(সে যে) অরুণ লোচনে স্নিগ্ধ স্নেহ ধারা
অনন্ত শশাঙ্ক প্রায়
(তার) উজ্জ্বল আলোকে জীবন কৌমুদী
ফুটিয়া উঠুক তায়।
সে পরশ মণি পরশ তরঙ্গে
প্লাবিত হউক প্রাণ
(যেন) চমকি দামিনী আর না লুকায়
সরস মধুর দান।
সে অঙ্গ সৌরভে অনুখন যেন
নাসিকা রহেগো বন্ধ
কটু তীক্ষ্ণ আর কে করে বিচার
বিরস বিষয় গন্ধ।
বহু রসাধার রসনা আমার
কতই প্রলাপ গায়
ধর্ষিয়া মথিয়া পরাস্ত হইনু
শরণ লইনু পায়।
(আহো) তব তুষ্টি তরে অতৃপ্ত লালসা
যতনে সঞ্চিনু কত
ভোগ সুখ সাধ তবুত গেলনা
ধিক্কারি তোমায় শত।
(তব) ইঙ্গিতে করেছি আদেশ পালন
জনম জনম ভোর
হয়োনা কৃতঘ্ন বড় অসময়
দেখরে আগত মোর।
(কর) হরি নাম গান নাম রস পান

(সে যে) অব্যক্ত সুতার রস
লোলুপ রসনা হও সঙ্কুচিত
ক্রমশঃ হইবে বশ।
কি শুনিবে বল কাক কোলাহল
নিতি আসে নিতি যায়
চঞ্চলে অচল চির-শান্তি সুধা
বল কে কোথায় পায়?

(২৭-২)

পুষ্প শুদ্ধি

(ওঁ) পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়।

(ওঁ) পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পশোভিতে পুষ্প-চয়াবকীর্ণে (হুঁফট্ স্বাহা)।

কি সুন্দর এই পুষ্পশুদ্ধির মন্ত্র! যিনি ফুলে ফুলে লুকাইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়া আত্মগোপন করিতেছেন, লুকোচুরি খেলিতেছেন; যিনি মধুর কুসুমসম্ভার শোভায় বিরাজমান; যিনি কুসুমসুষমা-সুন্দর নানারূপে মহনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বরূপ ঢাকিয়া বিশ্বরূপ সাজিয়াছেন—ফুল দেখিলে যাকে মনে পড়ে, "ফুল দেখে মনে পড়ে যারে যারে ভাল বাসি" যাহার রূপে ফুল সুন্দর, মধুর ও লোভনীয় এই মন্ত্রে সেই অরূপ বিশ্বরূপের উপাসনা।

উপাসনার আরম্ভ হয় স্থূলে, সুরূপে, সান্তে; পর্য্যবসিত হয় সূক্ষ্মে, বিশ্বরূপে, অনন্তে ও অরূপে। যিনি নির্লেপ নিরঞ্জন নিত্য ভূমা তিনিই লোহিত শুক্ল-কৃষ্ণা উমার সহিত "সম্যক্ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া অপরূপ বিশ্বরূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন। এই দম্পতির হাস্যচ্ছটা কুসুমরূপে কুসুমসুন্দর বিশ্বরূপে বিকাশমান হইতেছে। এই ভাবে

বিশ্বরূপ দর্শন অভ্যস্ত হইলে কুরূপ সুরূপ হয়, বিশ্ব মধুময় ও কুসুম-কমনীয়, হয় কণ্টকাস্তরণ পুষ্পশয্যা হয়। পুষ্পশুদ্ধিতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়। উপাসনার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। দৈনন্দিনের সাধনায় আভাস পাওয়া যায়—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি"।

আবার "মধু বাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ইত্যাদি ঋষিবাক্য প্রাণে প্রাণে তখন সার্থক অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমে উমা মহেশ্বরের ভূমানন্দে আত্মহারা হইয়া সাধকের সান্ত, অনন্তে ডুবিয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম—এই পুষ্পশুদ্ধির মন্ত্র অদ্ভুত, অপরূপ। ইহাতে অরূপ বিশ্বরূপের উপাসনার তত্ত্বেরই সঙ্কেত করা হইতেছে। সাধক, তুমি এই মন্ত্রের অর্থোপলব্ধি করিয়া পূজায় মনোনিবেশ কর। "যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা" অনুরাগে মাতোয়ারা হইয়া পূজা কর। তুমি ধন্য হইবে, জীবিতোদ্দেশ্য সফল হইবে। নিম্নে মন্ত্রার্থের একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে।

১ম মন্ত্র।

ফুলের ন্যায় সুন্দর জগতে আর কি আছে! ফুল দেখিয়া সাধকের হৃদয়কন্দরে আনন্দ সরিৎ কুল্ কুল্ করিয়া প্রবাহিত হইল। a thing of beauty is a joy forever স্বরূপ নিত্যই আনন্দের খনি। স্বহস্তচিত কুসুমের সুষমা দর্শনে হৃদয় যখন আনন্দে ভরিয়া যায়, তখন সেই সাত্ত্বিক মুহূর্ত্তে সাধক স্বতঃই তাহার রমণীয়-দর্শনকে (রণায় চক্ষসে) মনে করে তখন তাহাকে কি বলিয়া দিতে হয়—কি দিয়া এই রমণীয় মধুর কুসুম রাশিকে শুদ্ধ করিবে? যিনি সর্ব্বরূপের, সর্ব্বশুদ্ধির আধার, তাঁহাকেই তখন স্মরণ করে। তাই কুসুম দর্শনে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সরস বিশদ নির্ম্মল প্রাণেও বেদ-পুরুষ ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়া এই ১ম মন্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। হে পরমদেব! তুমি পুষ্পকেতু কুসুম তোমার চিহ্ন—তোমাকে কে

চিনিতে পারে? তুমি কুসুমরূপ চিহ্ন দ্বারা তোমাকে চিনিবার সঙ্কেত করিয়াছ; তাই তুমি পুষ্পকেতু, তুমি রাজা, কারণ তুমি সর্ব্ব-দীপ্তির আধার—(রাজ্‌দীপ্তৌ) রাজতে ইতি রাজা। বহ্নি যেমন ধূমকেতু, তুমিও সেইরূপ পুষ্পকেতু, আবার তুমি পরমপ্রেমা, তুমি সকলকে অনুরাগ-রঞ্জিত করিতেছ, অতএব তুমি রাজা "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"। রাজরাজেশ্বর তুমি ভিন্ন আর কে? আবার তুমিই সর্ব্ব পূজার স্থান, সর্ব্বপ্রকারের অর্চ্চনার (পূজার) একমাত্র যোগ্য পাত্র, অতএব তুমি অর্হন্ (অর্হমহ পূজায়াম্), কাজেই তোমার দোহাই দিয়া এই পুষ্পশুদ্ধি করিতেছি—দোহাই তোমার, তোমার এই কুসুমময়ী মূর্ত্তি, এই অর্চ্চনার কুসুমচয় তোমার নামের হিল্লোলে যেন পবিত্র হয়। তুমি শত শত রূপে বিশ্বরূপে ফুটিয়াছ, অতএব তুমি শতায়, তুমিই সম্যক সম্বন্ধ, কারণ তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই সমীচীন, অন্য সম্বন্ধ সব ফাঁকি, সব ঝুটা। আমি আর ছুটাছুটি করিয়া করিয়া কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়া তোমার অর্চ্চনার এই কুসুম শুদ্ধ করিতে যাইব—কারণ তুমিই একমাত্র আমার সমীচীন সম্বন্ধী। ঠাকুর আমার এই প্রার্থনা তুমি অগ্রাহ্য করিও না, কারণ আমার আর যে কেহই নাই, অতএব হে ভূতনাথ! "নাহসিন্বম্ সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুন্"।

২য় মন্ত্র।

সজীব হৃদয়কুসুম ও পাত্রস্থ নির্জীব কুসুম পরমপুরুষের ভাবে ভাবিত করিতে করিতে সাধক যখন সেই পুরুষের কোলে কোলে সর্ব্বকুসুমাভরণশোভাঢ্যা কুসুমময়ী নানা রাগ-রঞ্জিতা প্রকৃতিকে দর্শন করিলেন, তখন সাধক বা ঋষির প্রাণের অন্তস্তলে বেদপুরুষ আবার ঝঙ্কার করিলেন, পুষ্পে পুষ্পে ইত্যাদি পুষ্প যার আছে—তিনিই পুষ্পা (অর্শ আদিভ্য অৎ) আর বড়ই আদরে সাধক পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগি-লেন—মা তুমি পুষ্পা! পুষ্পে! তুমি যে শোভন-পুষ্পশালিনী, তুমি যে নানা পুষ্পশোভিতা কত কত সুন্দর সুন্দর, কোমল, মর, নশ্বর

কুসুমরূপে হৃদয়-কুসুম, সহৃদয়কুসুম, জীবকুসুম ও শিবকুসুমরূপ কুসুমের হাসিরূপে, মকরন্দরূপ মাধুরীপুরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছ, পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ; তুমি কেবলই পুষ্পা, সুপুষ্পা, মহাপুষ্পা, কেবলই সুন্দর, মধুর ও কোমল—মধুরম্, মধুরম্। তুমিই ফুল, তোমারই ফুল—তুমিই পবিত্র কর মা। তাই পুষ্পকে আদর করিয়া অন্যত্র শ্রুতি বলিতেছেন—শ্রীরসিময়ি রসস্ব। আমরা দেখিতেছি পুষ্পশুদ্ধির মন্ত্রদ্বয়ে প্রকৃতিবিজড়িত পুরুষ (প্রথম মন্ত্র) এবং পুরুষালিঙ্গিতা প্রকৃতিকে (২য় মন্ত্র) সঙ্কেত করা হইতেছে। সাধক তোমার চিরবাঞ্ছিত অর্দ্ধনারীশ্বর, হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা কুসুমের হাসিরূপে তোমার সন্নিধানে বিরাজমান, তুমি তোমার হৃদয়-পুণ্ডরীকে তোমার চিরারাধ্যের মধুর হাসি, দয়মান-দীর্ঘনয়ন চন্দ্রকোটী সুশীতল স্পর্শময় কোটীসূর্য্যপ্রতিকাশরূপ মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া চরিতার্থ হও। অতৃপ্ত পিপাসা-ক্লিষ্ট নিখিল ইন্দ্রিয়গ্রাম সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুক।

গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হও, আচমনের দ্বারা নিজে চেতন হইয়া মন্ত্রচৈতন্য কর, পূজার উপাদান চেতন হইবে; তবেই তুমি পরম-চেতনে চিরশান্তি, চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। জীব, মৃত তুমি, অমৃত হইবে। অহরহঃ এইরূপ অমৃততত্ত্বের অভিনয় করিতে করিতে এক দিন অমৃত হইয়া যাইবে, আর মরিতে হইবে না। পূজায়, উপাসনায় এইরূপ মহাতত্ত্বের সঙ্কেত দেখিতে পাইবে। হাতগড়া মন্ত্রে যথার্থ পূজোপাসনা হয় না, সৎকার সাধনা হয়, মনকে 'চোখঠার' দেওয়া হয় মাত্র। রসভাবভরিত-হৃদয়ে অনুষ্ঠান কর, তোমার সাধনায় সুধা উঠিবে।

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম, এ।

মানস-পূজা।

বেহাগ—একতালা।

করেছি মা পূজার আয়োজন।
কর অধিষ্ঠান, খুলে দিলাম প্রাণ, হৃদিপদ্ম দিলাম রত্নসিংহাসন।
হৃদয়-কোঠায় মা তোমার ও স্থল,
শিরে হউক ছত্র দশ শতদল,
কর মা পবিত্র হৃদয়মণ্ডল, দাও রাঙ্গা চরণ।
ধৌত ক'রে দিই এবে পদ ছলে
চরণ দু'খানি নয়নেরই জলে,
মন-অর্ঘ্য এ চরণকমলে,
লওগো জননী দিতেছি এখন।
আর কি দিব মা, তোমায় দশভুজা,
ভাবময়ি! লও মা ভাব-পুষ্পে পূজা,
সশ্রদ্ধা চন্দন অম্লান পঙ্কজ চরণে অর্পণ,
কারুণ্য-সোহাগ-অন্তরে গো শিবে,
ধূপ দীপরূপে জ্বলুক মা এবে,
লও মা নৈবেদ্য কল্পনা যা দিবে,
যথাসাধ্য মম আছে আহরণ।
জয় মা, জয় মা, বিবেক-কৃপাণে হউক বলিদান লও রিপুগণে,
পাপ, মহিষাগ্নি লও নিজগুণে, মম নিবেদন।
চিত্ত বৃত্তিগণ সহ উপকরণ লও মা পলান্ন বিবিধ ব্যঞ্জন,
পানীয় বিমল জাহ্নবীর জল,
আচমন কর পুনরাচমন।
জ্বলুক পঞ্চ জ্ঞান, হউক আরতি দেখুক নয়ন গদ্‌গদ অতি,
হউক প্রেম-ধূনা-ধূমে পূর্ণ তথি সুবাস-করণ।

আনন্দ-বাজনা স্বর্গকে ভেদিয়ে, করুক উতরোল অন্তর-নিলয়ে
মায়ের নিকটে গলবস্ত্র হ'য়ে
নতি স্তুতি করুক চামর ব্যজন।
কর মা বিশ্রাম সঙ্গে লয়ে ভব, ভক্তি আসি করুক চরণসেবা তব,
সুখী হয়ে বাসে, সুখী কর দাসে এই আকিঞ্চন।
নিত্য পূজা মাগো দিলাম শঙ্করি, রাখিলাম আমি নয়নপ্রহরী
নিশি দিন যেন দুর্গা দুর্গা স্মরি
হয় গোপালের জীবন যাপন।

অনুষ্ঠানতত্ত্ব।

এ সংসারে সকলেই নিজের সম্মুখে এক একটা আদর্শ ধরিয়া তদনুযায়ী চলিতে চলিতে, অসৎ আদর্শের ফলে কেহ চিরদুঃখময় স্থানে ও সৎ আদর্শের ফলে কেহ বা চিরআনন্দময় রাজ্যে শেষে উপস্থিত হয়। আপাতমধুরের সুখাস্বাদে মুগ্ধ হইয়া দুর্ব্বলচিত্ত মানব পাছে স্বীয় পরকালের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে এই আশঙ্কায় শৈশবপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম-গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে ও সহৃদয় গ্রন্থকারগণ আপাতমধুরের হলাহল, ও আপাতবিরসের সুখকর পরিণতির বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিয়া বিশদরূপে বোঝাইবার জন্য অধিকাংশ স্থলেই এক একটা উদাহরণ দেখাইয়াছেন। ক্ষারসংযুক্ত বস্ত্র পুনঃ পুনঃ আছড়াইতে আছড়াইতে যেমন ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়, সেইরূপ শিক্ষাগ্রন্থে ও গুরুবাক্যে ভক্তিমান্ ব্যক্তির অসতের অসৎ ও সতের সৎ পরিণতির বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে হৃদয়স্থিত পাপ পরিষ্কার হয়, তাই মনে রাখা কর্ত্তব্য অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে হইলে গুরুবাক্যরূপ প্রদীপে বিশ্বাসরূপ তৈল রাখিয়া সৎগ্রন্থরূপ বর্ত্তিকায় আলো জ্বালিতে হয়। বাল্যকালে

কোন মাহাত্মার জীবনচরিত পড়িবার সময় যদি সেই জীবনচরিতকে উপকথা বলিয়া ধারণা হয় তাহা হইলে তাহার আদর্শে কেহই স্বীয় চরিত্র গড়িতে সচেষ্ট হইতে পারে না। যাঁহাদের প্রত্যক্ষ করা যায় না, কালের অন্তরালে যাঁহারা অবস্থান করিতেছেন—তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত উপকথা ভাবা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। অনেকে ত পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করেন না, কিন্তু তাঁহারা যে ছিলেন না এ কথা ত কেহই বলেন না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিত যাঁহারা গাঁজাখুরী গল্প বা উপকথা না ভাবেন তাঁহারাই সেই সেই মাহাত্মাদিগের আদর্শে জীবন গঠিত করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিয়া যান। হৃদয় অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলে ভাল মন্দ বোঝা দায় হয়—অন্ধকারে লৌহ-কাঞ্চনের প্রভেদ বোঁঝা যায় না, সেই জন্য গুরুবাক্য-বিশ্বাস ও সৎগ্রন্থের সাহায্যে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করা আবশ্যক।

বাল্যকালের মধুর স্মৃতি স্মরণপথে আসিলে বড় আনন্দ হয়, তখন মনে হয় কেমন বিশ্বাস, কেমন ঐকান্তিকতা ছিল—শিক্ষকের নিকট যাহা পড়িতাম, যাহা শুনিতাম, তাহাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান হইত। হায়, যৌবনে এখন গর্ব্ব, অহঙ্কার, অবিশ্বাস প্রভৃতি দস্যুগণ সে অমূল্য ধন হইতে বঞ্চিত করিতেছে। বাল্যের সেই বিশ্বাস, সেই ঐকান্তিকতা এ সময়ে একবার আসিলে অনেক জ্বালার নিবৃত্তি হয়।

কলির পীড়নে হৃদয় ব্যথিত। এ কলিব্যাধির ঔষধ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা জাগিলেই অবিশ্বাস-দস্যু সগর্ব্বে বলে—ওরে ভ্রান্ত ইহার ঔষধ নাই। বিশ্বাস এখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর তাই অবিশ্বাসের কথায় প্রতিবাদ করিতে পারি না। দস্যুকে দস্যু ভাবিয়া তাহাকে 'আমল' না দিয়া বাল্যকালের বিশ্বাস এ হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া যদি কোন মহাত্মার আদর্শে জীবন গঠিতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে "যেমন কুকুর তেমনি মুগুর" পড়ে। দুর্ব্বল চিত্ত অবিশ্বাসীর কথা—কলিব্যাধির ঔষধ নাই। বিশ্বাসী শোকশান্তিকারী ধর্ম্মশাস্ত্রকেই বলেন ঔষধ।

"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং ॥

কর্কোটক নামক নাগ, দময়ন্তী, নল ও ঋতুপর্ণ রাজর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলে কলির প্রভাব নষ্ট হয়।

অন্ধকারের প্রভাব, দুঃখের প্রভাব দূর হইলেই আলোক-সুখ দেখা দেয়। যন্ত্রণা গেলে সুখী হওয়া যায়। কলির প্রভাব কমিলে শোক শান্তি হয়।

অনেকেই বোধ হয় জানেন—অশেষগুণসম্পন্ন অলোকসামান্য-রূপবান্ সংযমী শ্রেষ্ঠ নিষধাধিপতি নলকে, ত্রিলোকসুন্দরী সুরেন্দ্র-বাঞ্ছিতা দময়ন্তী সয়ম্বর সভায় পতিত্বে বরণ করিলে—ইন্দ্রাদিদেব সকাশে এ সংবাদ অবগত হইয়া অকারণ-বৈরী ক্রূরস্বভাব কলি, কৌশলে নলদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা দিবার মানসে অনেক দিন ধরিয়া ছল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এত আর এখনকার সংযম-হারা তোমার আমার দেহ নয় যে, পাপপ্রবেশের জন্য শত শত দ্বার উন্মুক্ত, এ দেহ সেই সংযমীশ্রেষ্ঠ নলের—যিনি স্বীয় প্রণয়িণী দময়ন্তীর সকাশে দেবগণের দূতরূপে যাইয়া অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—হে ভাগ্যবতি! ইন্দ্র, অগ্নি, শমন পবন তোমার পাণিপ্রার্থী। হে দেবারাধ্যে! ইঁহাদের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর। এ দেহ সেই সংযমীর যাঁহার সংযম দেখিয়া দেবগণ স্তম্ভিত, বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিসাহায্য ব্যতীত রন্ধন করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি দিয়া নিজেদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সংযমীর দেহ—তাই কলি বহুদিন ধরিয়া ছল অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যিনি সমরে জয়ী হন তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে, তাই নলের যুদ্ধের দিন আসিল সংযমী একদিন অনুষ্ঠানহারা হইলেন; জলপূর্ণ কলসে যদি একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রের দ্বারা সমস্ত জল পড়িয়া যায়, দেহে একটু দ্বার পাইলে পাপপ্রবেশের আর বাধা থাকে না। পাপ "ছুঁচ হ'য়ে ঢোকে আর ফাল হ'য়ে বেরোয়"।

ক্রমশঃ।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ।] ১৩২৪ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

গীত।

আলেয়া—একতালা।

ওহে বংশীধারী, কবে কৃপা করি, শুনা'বে তোমার ও বাঁশীর গান।
বসি' কুতূহলে, রাঙ্গা পদতলে, শুনিয়া জুড়া'ব তাপিত পরাণ।
নয় ছিদ্রে বুঝি বাঁশরী তোমার,
নয় চক্রে * করে সৃষ্টির প্রচার?
পঞ্চভূত মন বুদ্ধি অহঙ্কার, আর বিশ্বজীব তাহে বিদ্যমান।
সৃজন কামনা হেতু কি তোমার,
কামবীজ † করে বাঁশীতে ঝঙ্কার?

* নব চক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোম পঞ্চকম্।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নাম ধারকঃ॥ তন্ত্রবচন।

নব চক্রের প্রত্যেক চক্র মানবদেহের কোন্ কোন্ স্থানে আছে তাহা "প্রাণতোষিণী" পুস্তকে বর্ণিত আছে।

† ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহুঃ শ্রুতেগিরঃ।

ক্ষিতি জল তেজ অনিল অম্বর, জনমে সে বীজে সৃষ্টি উপাদান।
নব রস ঝরে ও বাঁশীর গানে,
জীবাত্মা-রাধিকা ‡ হৃদি-কুঞ্জবনে,
অপরা প্রকৃতি অষ্ট সখী সনে, সে মধুর রস করে সুখে পান।
ভব কোলাহলে পাইনা শুনিতে,
যে মধুর গান বাজে ও বাঁশীতে,
দয়া করি' হরি শুনাও এ সুতে, বহাও হৃদয়ে আনন্দ তুফান।

কথা রামায়ণ।

অবতরণিকা (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শেষ কথা সর্ব্বদা স্মরিবার কথা—সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবার কথা। এই নিত্য কাজের কথা কহিয়া অবতরণিকার উপসংহার হউক।

দুরন্ত কলি নিষ্ঠুরভাবে মানুষের মন কলুষিত করিতেছে। পুরুষ নারী—কোথাও যেন আর ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই। কোথাও যেন আর পবিত্রতা নাই। পুরুষের চরিত্র, রমণীর সতীত্ব এর উপরও অনাদর হইয়াছে; মনের একাগ্রতা, চিত্তবৃত্তির নিরোধ এ সব মাত্র নামে আছে—কার্য্যে বুঝি আর নাই। অভিনয় ভঙ্গে রঙ্গমঞ্চের দুই একটি ক্ষীণ আলোকের মত এখানে সেখানে দুই একজন একাগ্রতা ও নিরোধের জন্য, সতীত্ব ও পবিত্র চরিত্রের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু সবাই এত উপদ্রুত যে, কাহারও যেন করিয়া উঠিবার উপায় নাই। আচার নাই, সন্ধ্যা উপাসনা নাই, পতিনারায়ণ ব্রত নাই, পিতা মাতা আচার্য্য প্রভৃতিকে

লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জল সম্ভবঃ।
ঈকারাদগ্নিররুৎপন্নো নাদাৎ বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতার্থকো মনুঃ॥ (গৌতমীয় তন্ত্র)

‡ অষ্ট অপরা প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে গীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নারায়ণভাবে দেখা নাই; মন্ত্র ইষ্টদেবতা গুরু এক করিয়া তপস্যা করা নাই। আছে কি? আছে বচন-চাতুরী, আছে গলাবাজী, আছে গালবাদ্য, আছে নাম জারী, আছে বক্তৃতার জন্য সভা। আর সৎযুক্তি যেন নাই আর সৎপরামর্শ যেন নাই। আর শাস্ত্র বিশ্বাস নাই শাস্ত্র মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা নাই। আছে দলাদলি, আছে পৃথক্ পৃথক্ মত। আছে দম্ভ, আছে অহঙ্কার, আছে আমি বড়। এ সব লিখিয়া আর কি হইবে? দুঃখ আমরা সবাই দেখিতেছি, সবাই সহিতেছি। এই দুঃখ পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া ঋষিগণ ইহারও প্রতিকার করিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন লঘূপায়েন কেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ। আমাদের মত কৃতঘ্ন, আমাদের মত মূঢ়বুদ্ধি জনের গতির জন্য কোন সহজ উপায় আছে কি না দেবর্ষি ইহাই লোকপতিকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহাই সাধন দুর্ব্বল, ক্ষীণ বীর্য্য, ক্ষীণজীবী আমাদের পরিত্রাণের উপায়। এই অবতরণিকায় সেই কথাই শেষ কথা হউক।

কেহ ডাকেনা কিন্তু বসন্তে কোকিল আপনি আসে। কেহ বলে না তবু কোকিল এই কালে আপনি ডাকে। না ডাকিয়া থাকিতে পারে না তাই ডাকে।

কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগ চাই তবেই কোকিল বড় মধুর স্বরে ডাকিবেই। বসন্ত চাই, মলয় চাই, আম্রমুকুলের গন্ধ ছুটা চাই—এই গুলির যোগাযোগ হইলেই কোকিল ডাকিবেই।

বাল্মীকি কোকিলও রাম রাম না করিয়া থাকিতে পারেন না। যখন কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগ হয় যখন ত্রেতা যুগ আইসে। যতবার যতবার ত্রেতাযুগ আসিয়াছিল, ততবার ততবার বাল্মীকি-কোকিল বড় মধুর করিয়া বড় মধুরাক্ষরে রামায়ণ-রসাল তরুতে বসিয়া রাম রাম করিয়াছেন। আবার ত্রেতা আসিবে আবার তিনিও আসিবেন তিনিও ডাকিবেন। কেন ডাকিবেন? তিনি এখনও অতৃপ্ত। ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার আশা মিটে নাই।

তুমি এই ঘোর কলিযুগে পড়িয়াছ। কিন্তু যদি তুমি রামায়ণ শুনিয়া শুনিয়া নিজের হৃদয়ে ত্রেতাযুগের প্রবাহ আনিতে পার; যদি তুমি নিরন্তর ভাবনা করিয়া ত্রেতার লোকের সঙ্গ করিতে পার, সঙ্গ করিয়া করিয়া যদি ত্রেতার মানুষ হইয়া যাইতে পার তবে রামনাম বড় মধুর লাগিবে, এত মধুর লাগিয়া যাইবে যে এনাম আর ছাড়া যাইবে না। সদা সর্ব্বদা রাম রাম রসের সহিত করিবার ভারি সুন্দর সঙ্কেত এই।

এইরূপে সত্যযুগের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সত্যযুগের মানুষ হইয়া যাও মা নাম বড়ই মধুর লাগিবে—মা সাধনা বড়ই রসের সহিত করিতে পারিবে। আবার দ্বাপরের প্রবাহে পড় কৃষ্ণনাম বড় মধুর লাগিবে।

এই হইল লঘূপায়। যাতে যাতে এই লঘূপায়ে কার্য্য হয় তাই করা যাক এসনা—দেখনা আবার সেই সব সাধক আসে কি না? আবার তপস্যা চলে কিনা? আসিবেই চলিবেই। এ চেষ্টাও কতকটা তাই। কিরূপে যুগচিন্তা করা যাইবে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহার উত্তর আমরা এইরূপ ভাবনা করিতে বলি।

শ্রীভগবানের পটে আঁকা মূর্ত্তিটি সম্মুখে রাখ; রাখিয়া তাহারদিকে চাহিয়া চাহিয়া কথা কহিতে থাক প্রত্যহ নিয়ম করিয়া কথা কহিবার অভ্যাস কর। ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণে কত কথা কহিয়াছেন। তুমি নিজে বা কি কথা কহিতে জান? দুই চারিটি কথা কহিলেই তোমার পুঁজি ফুরাইয়া যায়—কাজেই রোজ একরকম কথা কহিতে গেলে তুমি রস পাওনা। তাই রামায়ণের কথা অবলম্বনে রোজ ঐ পটের ছবির সঙ্গে কথা কহিতে অভ্যাস করিতে বলি। কিছু দিন অভ্যাস কর, দেখিবে পটের ছবি আর পটে নাই আসিয়াছে হৃদয়পটে; আর ভগবান্ বাল্মীকির কথাতে উহা জীবন্ত হইয়া হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে। তুমি তখন সর্ব্বদা ঐ হৃদয়ের রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া ভাবনা বাক্য ও কর্ম্ম করিতে পারিতেছ। আর সর্ব্বদা রাম রাম করাতে সুখ পাইতেছ।

সর্ব্বদা দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করা নীরস ভাবিও না। সর্ব্বদা নাম করা তার স্বাভাবিক যে একটু তারে ভাল বাসিয়াছে। দেখনা তুমিও একদিন কারেও ভাল বাসিয়াছিলে। আজ না হয় সে অনুরাগ নাই। তুমি সেই দেববাঞ্ছিত অনুরাগ লইয়া কত কি করিয়া ফেলিয়াছ তাই অনুরাগ তোমায় ছাড়িয়া গিয়াছে। পুষ্পশয্যা না হইলে যিনি শয়ন করিতে পারেন না তাঁকে তুমি আঁইস শয্যায় শোয়াইতে চাও—বল সে থাকিবে কিরূপে? তোমার দোষেই সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন সে ছিল তখন ভাবিয়া দেখনা নাম মধুর লাগিত কি না? একনাম কতবার করিতে তবু নাম করার সাধ মিটিত না। বাল্মীকি যে রামকে ভাল বাসিয়াছিলেন। তাই রাম নাম করিয়া ভগবান্ বাল্মীকি এখনও অতৃপ্ত। তুমি একটু তারে ভালবাস তবেই নাম করায় কত সুখ তাহা আপনিই বুঝিবে।

কিরূপে কি করিবে তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই অংশ শেষ করা হউক।

ছবির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বল হ্যাঁ গা কবে তুমি এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলে? আর কি জন্যই বা আসিয়াছিলে? তোমাকে এখানে আনিবার জন্য কেই বা সাধ্য সাধনা করিয়াছিল?

ঠিক! সে সময়ে ত্রেতাযুগের শেষ কাল। স্বর্গ ও মর্ত্তের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মানুষ বড় উপদ্রুত। দেবতারাও নিতান্ত বিব্রত। মানুষ আর দেবতার জন্য কিছুই করিতে পায় না। কোন কিছু করিতে গেলে রাক্ষসে বড় উপদ্রব করে। দেবতার তৃপ্তিসাধন জন্য যজ্ঞ আর হয় না। যজ্ঞের প্রধান দ্রব্য হবি আর হয় না। আহারশুদ্ধির উপায় আর নাই। কাজেই দেহশুদ্ধি আর হয় না। দেহশুদ্ধি নাই কাজেই চিত্তশুদ্ধিও নাই। পিতৃকর্ম্ম প্রায় লোপ পাইয়াছে। মানুষের কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম যদিও একটু আধটু হয়—তাহা যথাস্থানে পৌঁছেনা।

মানুষ ত এইরূপে ধর্ম্মভ্রষ্ট বা কর্ম্মভ্রষ্ট বা নাশপথে। প্রায়

লোকেই ত করেনা। যাহারাও চেষ্টা করে তাহারাও উপদ্রুত। রোগে শোকে বিয়োগে অন্নাভাবে বড়ই উৎপীড়িত।

আর দেবতাগণ? তাঁহারাও রাবণের লঙ্কায় মজুরী করেন। না করিয়া উপায় নাই। বায়ু সেখানে প্রচণ্ড বেগে বহে না, অগ্নি সেখানে জ্বালা বিস্তার করিতে পারেন না; মৃত্যু সেখানে অশ্বের আহার যোগান—সব দেবতাই সশঙ্কিত। মানুষের অভাব পূরণ করিবে কে? যথাসময়ে বৃষ্টি নাই, নদীর স্রোত বিপরীত পথে লওয়া হইয়াছে; কৃত্রিম ব্যাপারে অকৃত্রিম আর কিছুই নাই।

পৃথিবী পাপভারে পীড়িতা। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী আর যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ছদ্মবেশে পিতার নিকটে গিয়াছেন। পিতা সব শুনিলেন। তখন তিনি কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদশায়ী শ্রীভগবানের নিকটে গমন করিলেন। বেদপ্রচারিত স্তবে শ্রীমন্নারায়ণকে ডাকিলেন। তখন শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বদিকের অন্ধকার সরাইয়া আবির্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মা দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন; মহাবিষ্ণু প্রতীকার করিবেন বলিলেন। পূর্ণব্রহ্ম নরদেহ ধারণ করিবেন জানাইলেন। এরূপ দেহধারণের আরও কারণ ছিল। কশ্যপ ও অদিতি বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য। তাঁহারাই এখন রাজারাণী। শ্রীভগবান্ বলিলেন আমি আসিতেছি, আমার যোগমায়া ভিন্ন আমার কোন কার্য্য হয় না। তিনিও জনকালয়ে উদিত হইবেন। তোমারাও আমার সাহায্যার্থ বানররূপে অপেক্ষা করিতে থাকে।

আহা এই অপেক্ষা কত সুন্দর! তিনি আসিবেন। এস আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করি। এস আমরা তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য সাধনালব্ধ বলে বলীয়ান্ হই।

তাঁহার কার্য্যের সহায়তা?

এই কার্য্য কি?

তিনি রাবণ বিনাশের জন্য আত্মত্যাগ করিবেন। এ আত্মত্যাগ বনগমন ও তাঁহার সীতাহরণ।

কে এই সীতা ?

ইনি ব্রহ্মবিদ্যা।

মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥

ব্রহ্মবিদ্যা দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধি জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন। আর রাম সেই ব্রহ্মবিদ্যা সহায়ে পৃথিবীভার স্বরূপ রাবণকে বিনাশ করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন অজ্ঞানের নাশ আর কিছু দিয়া কি হয় ?

এই ভাবে ত্রেতাযুগের ভাবনা করিতে থাক। করিতে করিতে দেখিবে তুমি যেন ত্রেতার মধ্যে রহিয়াছ। তখন সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গ করিতে পারিবে।

সঙ্গে সঙ্গে রামের স্বরূপটি, সেই অখণ্ড চৈতন্যটি, আপন খণ্ডমত চৈতন্যের কে তাহাও ভাবনা করিতে থাক। ঘটাকাশ যেমন আপন হৃদয়ে মহাকাশকে দেখিতে পারে সেইরূপ তুমিও খণ্ডচৈতন্য বক্ষে অখণ্ড চৈতন্যকে বসাইয়া যে কর্ম্মদ্বারা এই ধ্যান হয় তাহাই অভ্যাস করিতে থাক। বড় ভাল হইবে।

এই যে কথা—রামায়ণের অবতরণিকা দিতেছ ইহাতে রস আছে সত্য। ত্রেতাযুগের প্রবাহ নিজের হৃদয়ে প্রবাহিত করা, পটের ছবি দেখিয়া দেখিয়া তাহার সহিত ভগবান্ বাল্মীকির কথামত কথা কওয়া বোধ হয় কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে হৃদয়ে একটা সরসতা আসিতে পারে কিন্তু আরও সহজে যাহাতে অতি সাধারণ লোকেও শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে রস লইয়া থাকিতে পারে সেইরূপ কিছু বলিলে ভাল হয়।

আচ্ছা তাহাই হউক।

দেখ সাধারণ লোকে রস পায় কিসে ? সাধারণ লোকে নিজে বড় একটা চিন্তা করিতে পারে না। একটা হুজুগ তুলিয়া দাও বালক

বালিকা পর্য্যন্ত তাহাতে মত্ত হইয়া বেশ আগ্রহে কর্ম্ম করিতে লাগিয়া যাইবে। মনে কর একজন বড় বক্তা আনিয়া সভা করিবার হুজুগ তুমি বহাইলে। তখুনি দেখিবে কত ছেলে তাঁহার সম্ভাষণের জন্য বুকে একটা একটা চিহ্ন ধরিয়া পতাকা হাতে ছুটিল, কেহ বা দেবদারুপাতা, ফুলের মালা যোগাড় করিয়া সভা সাজাইতে লাগিয়া গেল। এই সবে একটা উৎসাহ অতিসাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়। এমন কি নিজেরা ঘোড়া হইয়া বক্তার গাড়ী বহিয়া আনিল। এ সব উৎসাহের চিহ্ন সন্দেহ নাই। যাহারা একদণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে পারে না, ধ্যান ধারণা জপে অতিশয় পরিশ্রম বোধ করে তাহারাও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে বেশ মনোযোগের সহিত খাটিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সাধক তাঁহাদের উৎসাহ হইবে অন্যদিকে। একা বসিতে অভ্যাস তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। একা বসিয়া বসিয়া ভাবনায় রস তাঁহাদিগকে আনিতে হইবে। শ্রীভগবানের লীলা চিন্তা যাঁহারা করেন তাঁহারা সাধক বটেন। এই চিন্তায় মনের কার্য্য অনেক আছে। এখানে মনকে একটা হুজুগে মাতাইতে হইবে।

দেখ কিরূপে ইহা হয়। রস সাধারণ লোকে বাহিরের কার্য্যে পায়। কোন দিন বাদলা হইল অমনি সাধারণের ইচ্ছা জাগিল আজ খিঁচুড়ী খাইতে হইবে। চল কোন নির্জ্জন প্রদেশে আমরা ইয়ার বন্ধু জুটিয়া খিঁচুড়ী খাই। ইহাতে ইঁহাদের বেশ উৎসাহ জাগে। সবাই নানা কার্য্যে লাগিয়া যান। বেশ উৎসাহের সহিত সবাই কর্ম্মও করেন আর আমোদে প্রমোদে বেশ আনন্দ ইহাদের উছলিয়া উঠে।

পূর্ব্বেত বলিয়াছি সাধকের আনন্দ স্থূলে নহে সূক্ষ্মে। ভোজ খাওয়ায় নহে ভোজ দেওয়ায়। শ্রীভগবান্‌কে লইয়াই তাঁহাদের সুখ। শ্রীভগবানকে মানসে পূজা করায় তাঁহাদের সুখ। শ্রীভগবানকে মানসে খাওনায় তাঁহাদের সুখ। শ্রীভগবানের সেবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে ভোজ দেওয়ার জন্য খাটায় তাঁহাদের সুখ। তাই মীরা-বাই নন্দলালাকে বলিতেছেন মোকো চাকর রাখ জী। শ্যামবরিয়া গিরিধারী লাল

শ্যামবরিয়া আগে নাচু ঔড়া পীতাম্বর শাড়ী। মোকো চাকর রাখো জী। ঝাড়ু দিউঙ্গা চৌকী দিউঙ্গা গোবর উঠাঁউ বাসী সাঁজ সবিরে জল ভরি লিয়াঁয়ু সব সন্তনকো দাসী মোকো চাকর রাখো জী। তোমার জন্য ফুলের বাগান করিব, রোজ ফুলের তোড়া সাজাইয়া তোমায় দিব আর তুমি আমার দিকে একটু চাহিয়া একবার হাসিয়া আমার রচিত ফুলের তোড়াটি আমার হাত হইতে লইয়া আঘ্রাণ করিবে আর আমার দিকে চাহিয়া আমাকে কি একরকম করিয়া দিবে। সাধক এই সুখ বড় চান। এইগুলি ভক্তিমার্গের সুখ। এখানে করা ধরা অনেক আছে। কিন্তু যখন সে আমায় ভালবাসিয়া আমার কাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকিতে লাগিল তখনকার কাজ তাঁরে জিজ্ঞাসা করা হ্যাগা তুমি আমার কে? আমিই বা তোমার কে? আর তোমার এই খেলার জগৎটাই বা কি? এ সব কিন্তু জ্ঞানমার্গের কার্য্য। সে তখন নিজে বিচার করিয়া দেখাইয়া দেয় "আমি তোমার" সাধনাটি প্রথম, তারপরে "তুমি আমার," শেষে "তুমি আমি এক।"

আমরা বলিতেছিলাম প্রবৃত্ত সাধক বেশ উৎসাহে ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিবে কিরূপে?

উত্তরে বলি—নিজের মনে যে ইচ্ছা উঠিবে সেইটিকে যদি ভগবৎ ইচ্ছায় মিলাইতে পারে তবেই বেশ আনন্দে সে কার্য্য করিতে পারিবে। সাধক একা বসিয়া যখন ভাবনারাজ্যের কার্য্য করিবে তখন সে কার্য্য হইবে সূক্ষ্মে, ভাবনায়,—স্থূলে নহে। নিজের ইচ্ছা তার ইচ্ছায় মিলাইতে হইলে ভাবনায় ইহা অভ্যাস করিতে হইবে।

মনে কর বাদলার দিনে খিঁচুড়ী খাইবার ইচ্ছা জাগিল। যিনি সাধক তিনি খাইবার ইচ্ছা হইলে নিজে খাননা, শ্রীভগবান্‌কে খাওয়ান। ভিতরে তাঁহাকে খাওয়াইয়া যদি কিছু থাকে তবে বাহিরে লোকরূপী শ্রীভগবান্‌কে খাওয়ান। সাধুরা তাই ভাণ্ডারা দিয়া থাকেন। আপনার খাবার ইচ্ছা জাগিলে অন্যকে যখন খাওয়ান যায়, তখন একটা অপূর্ব্ব আত্ম-তৃপ্তি আইসে। যিনি ইহা করিয়াছেন তিনিই ইহা

জানেন। কিন্তু প্রথমে ভাবনায় শ্রীভগবানের জন্য খিঁচুড়ী ভোগ দাও।

শ্রীভগবানের খিঁচুড়ী খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গ সবাই মহাআনন্দে তাহার যোগাড় করিতে লাগিয়া গিয়াছে। তুমিও তার সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছ। ঝাড়ু দিউঙ্গা, চৌকি দিউঙ্গা, গোবর উঠাঁউ বাসী—তুমি না হয় এই কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছ। না হয় উনুন ধরান, চাল বাছা, ডাল বাছা, চাল ডাল ধোয়া, তরকারী বানান এই সব ভার তুমি পাইয়াছ। খুব উৎসাহের সহিত এই সব করিতে লাগিয়া গিয়াছ অথবা সুন্দর করিয়া পান সাজিতেছ। আর শ্রীভগবান্ ত কাছেই আছেন—এক একবার সেই সুখপ্রসন্ন মুখ দেখিতেছ আর আনন্দে ভরিয়া যাইতেছ, উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাও তোমার উপাসনার অঙ্গ।

অথবা মনে কর শ্রীভগবান্ শীকারে যাইবেন। তুমি ঘোড়া ধরিয়া চলিতেছ। যতক্ষণ শ্রীভগবান আসিয়া ঘোড়ায় না চড়িতেছেন ততক্ষণ তুমি ঘোড়া সাজাইতেছ ঘোড়ার গায়ে মাছি মশা না বসে সেই জন্য ঝাড়ন দিয়া বাতাস করিতেছ। শ্রীভগবান্ আসিলেন। তুমি রেকাব ঠিক করিয়া ধরিলে, তুমি শ্রীভগবানের পদস্পর্শ করিলে। তারপর তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া অল্প অল্প ঘোড়া ছুটাইতেছেন, তুমি দৌড়িয়া দৌড়িয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলে। পূজার এই সব ব্যাপারেও বেশ সুখ আছে।

রোজ একরকম মানস পূজায় রস না পাও শ্রীভগবানের সেবা শত সহস্র প্রকার আছে। মনে কর মা জানকী যখন সেবা করিতেন, তখনও ত তাঁর কার্য্যে সহায়তা জন্য কত দাসীর আবশ্যক হইত। যখন সপ্তাবরণের শেষ আবরণে বিমলাদি সখীগণ নৃত্যগীতের আয়োজন করেন, তুমি তখন তাঁহাদের সাহায্য জন্য সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া আছ। যখন যাহা বলিতেছেন তুমি বড় আনন্দে তাহাই করিতেছ। এইরূপে নিজের বাসনা যাহা জাগিবে তাহাকেই যদি ভগবৎ ইচ্ছায়

পরিণত করিতে পার তবে ভক্তিমার্গের সাধনা তোমার বেশ রসের সহিত চলিবে। এইভাবে অভ্যাস করিয়া চলনা—দেখনা তুমি রসের সহিত সাধনায় অগ্রসর হইতে পার কি না ?

এই সব ত ঋষিগণের লঘূপায়। ঘোর কলিযুগে যখন লোকে বড় দুরাচার হয়, যখন সত্যবার্ত্তা-পরাঙ্মুখ হয়, যখন পরাপবাদ-নিরত হয়, যখন পরদ্রব্যাভিলাষী হয়, যখন প্রায় মানুষই স্ত্রীদেবা-কামকিঙ্করা হয়, যখন প্রায় স্ত্রীলোক স্বামীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভ্রষ্টা ভাব প্রাপ্ত হয়, যখন ব্রাহ্মণে ধনার্জ্জনার্থ বিদ্যাশিক্ষা করে আবার সেই বিদ্যা মদে বা অবিদ্যা মদে লেখাপড়ার গর্ব্ব করে, যখন ক্ষত্রিয়াদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে এবং তদ্বৎ শূদ্রাশ্চ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাচারতৎপরা হয় অর্থাৎ শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দেয়, ব্রাহ্মণকে প্রসাদ দেয়, ব্রাহ্মণকে পদধূলি দেয়, শূদ্রেরা সন্ন্যাসী হইয়া সকলের প্রণাম গ্রহণ করে—কলির এই সব উপদ্রব যখন হয় তখন ধর্ম্মভ্রষ্ট ও কর্ম্মভ্রষ্ট লোকের গতির জন্য ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত লঘূপায় ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু এখানেও সতর্কতা চাই। লঘূপায় অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া কখন নিত্যকর্ম্মগুলি বাদ দিতে পাইবে না। নিত্যকর্ম্মগুলি শাস্ত্রমত ভাল করিয়া করিবার জন্যই লঘূপায়। ইহা যদি না মান তবে তুমি বিধবা পিসী মাসীর বিবাহও দিবে আর মুরগাদি বহু ভক্ষ্য ভোজ্যও রাখিবে আর লোকের কাছে রটাইবে তুমি ভারি বৈষ্ণব। সন্ন্যাসী হইয়া মুরগাদি সেবা করা এই কলিদোষ-দুষ্ট গাজুরী সন্ন্যাসীর কার্য্য।

এখন একটা কর্ম্মের তালিকা দিয়া অবতরণিকা শেষ কর। আচ্ছা শ্রবণ কর।

চিত্তের বিষয়-চিন্তা এবং অসম্বন্ধ-প্রলাপ ছাড়াইবার জন্য আখালি পাখালি জপটিকে করিয়া ফেল সর্ব্বদার কার্য্য। মনে যে বেগে বিষয়-চিন্তা আসিবে তদপেক্ষা দ্রুতবেগে আখালি পাখালি জপ করিয়া ঐ চিন্তা ছাড়াইবে। কখন বা হাততালি দিয়া অঙ্গ নাচাইতে নাচাইতে

ইহা করিবে, কখন বা লম্বা লম্বা পাউড়ি ফেলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ইহা করার অভ্যাস কর—হইবে।

তারপরে নিত্যকর্ম্ম যেরূপ করিবে তাহা শ্রবণ কর।

(১) স্নাত্বা প্রাতঃ শুভ জলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকা ক্রিয়াঃ।

(ক) শয্যাকৃত্য-গুরুপাদুকা-ধ্যান, কুক্কুটাসন, প্রাণায়ামাদি।

(খ) কোন প্রকার স্নান সন্ধ্যা পূজা প্রাণায়াম স্বাধ্যায়াদি।

(গ) সুখাসনে একান্তে বসিয়া চক্ষু কর্ণাদিকে শ্রীভগবানের দিকে প্রবাহিত করা। আপনার ঘরে বসিয়া ধ্যানসহ জপে ইহা হইবে।

(২) ইহার পর প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ। দোষ করিয়াছে অবরণীয় মন। তোমার বরণীয় মন এই পাপী মনটাকে ইহার পাপের কথা স্মরণ করিয়া ইহাকে কাতর করিয়া, মৃত্যুচিন্তা দ্বারা বৈরাগ্য আনিয়া এটাকে নিত্যকর্ম্ম করাইতেছে। আর তুমি? তুমি ইহাদের দ্রষ্টা। তুমি সাক্ষী চৈতন্য। তুমি দেহ হইতেও ভিন্ন, মন হইতেও ভিন্ন। তুমি চেতন। তুমি অসঙ্গ। প্রত্যহ এই বিচার কর। ইহাতেই মায়িক জগৎ ছাড়িয়া আপনি আপনি স্বরূপে স্থিতিরূপ পরম বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবে।

(৩) যদি স্থিতি না হয় তবে সগুণং দেবমাশ্রয়। এইখানে মানস পূজা ইত্যাদি। এইভাবে ত্রিসন্ধ্যায় কর্ম্ম কর দেখিবে অদূরে মোক্ষসাম্রাজ্য দেখা যাইতেছে।

বর্ষায়।

তোমারে যে পড়ে মনে ঘনশ্যাম বরিষায়
বরষার বারিধারা তোমারে জাগায়ে দেয়॥
শ্যামল প্রকৃতি মাঝে নবীন মেঘের সনে
হে শ্যাম তোমার কথা তব রূপ পড়ে মনে

এমনি সে বরষার পড়ে কিনা পড়ে মনে
তুমি যে লুকাতে সখা নবীন তমাল বনে॥
তোমারে খুঁজিয়া আমি সারা কুঞ্জবন ঘুরি
বারেক ডাকিলে পরে অমনি আসিতে ফিরি॥
আজও সে তমালে হেরি তোমারে ভাবিয়ে তাই
আকুল আবেগে শ্যাম তারে আলিঙ্গিতে যাই॥
আজও যে তেমনি করে কুঞ্জবন খুঁজে মরি
তেমনি কাঁদিয়া ডাকি তুমি এসনাত হরি ?
এমনি এমনি করে কত রাতি কেটে যায়
কত যে কাঁদিয়া ডাকি ফিরেনাত শ্যামরায়॥
এমনি সে এক ভাবে কতদিন কেটে গেছে
শ্যাম মোর গেছে চলি স্মৃতি শুধু প'ড়ে আছে॥
সে মধু মিলন কথা ঘন বরষার দিনে
শ্যামের সে হাসি খেলা পড়ে শুধু পড়ে মনে॥
সেই শ্যাম বরষা যে কত আসে কত যায়
ব্রজে কিগো ফিরিবেনা পুনঃ মোর শ্যামরায় ?

নিঃ—

কি করিলে ভাল হয়।

নদীর গন্তব্য স্থান সমুদ্র। সমুদ্র নদীকে আকর্ষণ করে, নদীও সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নদীজীবনের সার্থকতা লাভ করে।

পৃথিবীতে কত নদী আছে। সকল নদীই সমুদ্রে মিশিতে চায় সত্য, কিন্তু সকল নদীই কি সমুদ্রে মিশিতে পারে? পারে না। কেন পারে না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীপ্রবাহ যদি বৃহৎ নদীপ্রবাহে মিলিত হয়, তবে সাগরগামিনী বৃহৎ নদীর সাহায্যে ছোট ছোট নদীগুলিও

সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। শুধু কি তাই? নদীবক্ষে যে বুদ্ বুদ্ ভাসে, ভাঙ্গে—যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা উঠে, পড়ে—তাহারাও সমুদ্রে মিশিবার সাধ রাখে। ক্ষুদ্র জলকণা অনন্ত জলরাশিতেই মিলিতে চায় মিশিতে চায়, মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অনন্ত হইয়াই চিরদিন থাকিতে চায়। চিরদিন থাকি সবারই এই সাধ। শুখাইয়া যাই এ অভিলাষ কাহারও নাই। কারণ ইহা অস্বাভাবিক।

জগতের মনুষ্যসঙ্ঘের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ; মনুষ্য-সঙ্ঘের মত এক একটি নর নারীর দিকেও একবার চাহিয়া দেখ। কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি, কি বৃহৎ সমষ্টি অথবা এক একটি ব্যষ্টি জীব ইহারা সকলেই সেই জীবসাগরে মিশিতে চায়। ইহা ভিন্ন কি জাতি কি ব্যষ্টি জীব কাহারও শান্তি নাই; কাহারও সুখ নাই কাহারও জীবনের সার্থকতা হইতে পারে না। জীবনবিন্দু সেই মহাসিন্ধুতে মিশিয়া এক হইয়াই থাকিতে চায়।

যে মহাসিন্ধুতে মিশিবার সাধ রাখেনা, যে মহাসিন্ধুতে মিশ্রিত হওয়াই যে জীবনের লক্ষ্য ইহা ধারণা করিতে পারে না, সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের মত এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন বল বুদ্ধি হারাইয়া মধ্যপথে শুখাইয়া যায়। তাই নর নারীকে সঙ্ঘের সহিত মিশিতে হয়; মনুষ্যসঙ্ঘকে বৃহৎ সঙ্ঘের সহিত মিশিতে হয়—শেষে সমুদ্র প্রাপ্তি। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নিয়ম। কিন্তু মহাপুরুষ দিগের কথা স্বতন্ত্র।

এক একটি মহাপুরুষ সাগরগামিনী প্রবল নদীপ্রবাহের মত। ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইঁহারা বহু জলপ্রবাহকে, বহু জলবুদ্‌বুদকে সমুদ্রে লইয়া যাইবার সামর্থ্য রাখেন। এই সমস্ত মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহারের মধ্যে জন্মিলেও লক্ষ্য সকলেরই এক। সাগরে মিশিবার লক্ষ্য যাঁহাদের নাই তাঁহারা জীবের উপকারের জন্য যাহাই কিছু করুন না কেন, তাঁহারা খাঁটি মহাপুরুষ নহেন।

আমরা বলিতেছিলাম শ্রীভগবানে মিশ্রিত হওয়াই জীবের লক্ষ্য। জীব, জীবসঙ্ঘ—সবাই চায় এক ভগবান্। জীবের ভিতরে অমরত্ব আছে। একটা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া জীব মনে করে তাহাকে মরিতে হইবে। অজ্ঞানটাই মৃত্যু। অজ্ঞানটা সরানই জ্ঞান। অজ্ঞানটা দূর করিতে পারিলেই জীব আপনার অমরত্বে স্থিতিলাভ করে; জীব-চৈতন্য আপনাকে সেই মহাচৈতন্য জানিয়া নিত্য জ্ঞানে এবং নিত্য আনন্দে স্থিতিলাভ করে। ইহাই অমরত্ব। অমরত্ব আয়ত্ত করিয়া স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তিতে বিহার করাই জীবন্মুক্তের কার্য্য। ইহা ইঁহারা করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন অথবা অন্যরূপ করিতেও পারেন, ইঁহারা স্বেচ্ছাময়।

কখন কখন দেখা যায় আজীবন পরিশ্রম করিয়াও কেহ কেহ সাগরে মিশিতে পারে না। ক্ষুদ্র নদী পর্ব্বতবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ আপন বক্ষে টানিয়া লইয়া কত মৃত্তিকা প্রস্তর, কত বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া সাগরের পানে ধাইয়া আইসে। সাগরের অতি নিকটে আইসে। সাগরের জলকল্লোল কর্ণে শ্রবণ করে, সাগরের তরঙ্গমালা চক্ষে দেখে—কিন্তু কি পরিতাপ! যাহার সঙ্গে মিলিত হওয়াই জীবনের সার্থকতা তাহার অতি নিকটে আসিয়াও, তাহার রূপ, তাহার স্বর তাহার আকার ব্যবহার দর্শন স্মরণ করিয়াও কি এক দুষ্কৃতিবশে সেই নয়নাভিরাম, সেই মনোভিরাম, সেই শ্রবণাভিরাম, সেই বচোভিরামের সহিত মিলন হয় না, তাহার বক্ষে বক্ষ রাখিয়া জুড়াইয়া যাওয়া হয় না, বড় হাহুতাশ তখন উঠে, বড় গুরু দুঃখভার তখন নিষ্পেষিত করে। কেন মিলন হয় না? এত নিকটে আসিয়াও সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়া যায় না কেন? নদী ও সমুদ্রের মধ্যে ভারি এক বালুকাস্তূপ এই মিলনের বিঘ্ন উৎপাদন করে।

৺পুরীধামের সাগরের নিকটে চক্রতীর্থের নদীর এই অবস্থা। সমুদ্র গোপনে চক্রতীর্থের নদীর জল শুকাইতে দেয় না। নদীকে সাগর বাঁচাইয়া রাখে মরিতে দেয় না কিন্তু সাগর ঐ বালুকা-

স্তূপ ভাঙ্গিয়াও নদীকে সর্ব্বদা বক্ষে টানিয়া লয়না। নদী তাই বড় হা-হুতাশ করে। কিন্তু চিরদিনই কি ঐরূপ থাকে? না তা থাকে না। সাগর সময় বুঝিয়া কখন কখন নদীর সঙ্গ করে তাই নদী আবার সেই মিলন সুখের আশায় মরিতে পারে না।

শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহেও এই জন্য জীবন রাখিতে পারিতেন। তাহার সঙ্গ যে একবার করে, সে যে মরিতেই পারে না। উৎকট বিরহে শ্রীমতীও বলিয়াছিলেন--

না পুড়ায়ো রাধার অঙ্গ না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালেরি ডালে।
শ্যাম এলে তারে দেখাইবি গো।

কেন—এ সাধ কেন হয়? শ্যামের অঙ্গস্পর্শে আবার আমার জীবন আসিবে তাই।

ঐ যে বলা হইতেছিল সময় বুঝিয়া সাগর বালুকাস্তূপ সরাইয়া নদীর বক্ষে বক্ষ মিশায়, ইহা কি মিথ্যা কথা? পূর্ণিমার রাত্রে চক্রতীর্থে ইহা দেখিও আর বসন্তাগমে একবার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিও।

শ্রীভগবান্ এখনও আসেন। বাহিরের প্রকৃতিতেও আসেন আবার ভিতরের মানব প্রকৃতিতে আসেন। নতুবা মানুষ কি বাঁচিতে পারে? না শীতের এই শুষ্ক প্রকৃতি এমন সরসবতী আবার হয়?

বসন্তে একবার নবীন পল্লবের দিকে—নবীন ফুলের ফলের দিকে ভাল করিয়া দেখনা! আর দেখ, ঐ আম্রমুকুল আস্বাদন করিয়া ভ্রমরের কি হয়? আর নবীন আম্রমুকুলের সুমধুর গন্ধে কোকিলের কি হয়? এত মত্ততা, এত প্রাণভরা উচ্ছ্বাস আর কি কেহ দিতে পারে? সে আসিয়া প্রকৃতিকে আদর করে তাই না তার চরণের অলক্তে গোলাপ অত সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে! সে আসিয়া মানুষের হৃদয়পদ্মে দাঁড়ায় বলিয়াই না হৃদয়পদ্ম অত বিকশিত হয়! আহা সে যখন মানুষকে ছুঁইয়া যায়, সে যখন নরনারীকে অজ্ঞাতসারে আদর করিয়া যায় তখনই না মানুষ সুখময় হইয়া উঠে! তার আগমনে

সবই সুখময় দেখায়। চিরপুরাতন এই আকাশ, এই বায়ু, এই জলস্থল এই চন্দ্রতারকা, এই পাখিপশু, এই নরনারী কেহই আর তখন পুরাতন থাকে না! কি এক নূতন ভাবে যেন সকলকে দেখা হইয়া যায়! কোথাও আর ঘৃণা বিদ্বেষ থাকে না, কোথাও আর বাদ বিসম্বাদ থাকে না; সবাই সুন্দর, সবাই মধুর। তখন মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব ঃ—আহা কি সুখের অবস্থা ইহা। তার আগমনে সবাই এত মধুর হয় যে সকলকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, সকলকে সেবা করিতে ইচ্ছা করে, সকলকে আনন্দ দিতে ইচ্ছা করে।

সকলের জীবনেই ইহা কখন না কখন হয়। তবেই ত হইল তাহাকে পাইলেই মানুষ মধুময় হইয়া যায়। তুমি কিছু কর বা না কর, কখন না কখন ইহা তুমি অনুভব করিয়াছ।

মানুষ কত কথা কয়, কত যুক্তি করে। কিন্তু একজন নিরক্ষর কৃষককেও সৎযুক্তি প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। তাহার সব যুক্তিই যে নির্ভুল হয় তাহা নহে। কিন্তু কখন কখন নির্ভুল যুক্তিও সে দিতে পারে।

এই যে দুঃখের সমুদ্রেও আপনা হইতে কখন কখন আনন্দ আইসে, অনেক আবল তাবল কথার মধ্যেও সাধু কথার উদয় হয়—এই আনন্দ এই সৎযুক্তি কিরূপে আইসে? যাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, যাঁহারা কিরূপে ইহা হয় দেখিতে পান—তাঁহারাই সেই কৌশলটি সাধারণে প্রকাশ করেন যাহাতে মানুষ সর্ব্বদা অসৎ ছাড়িয়া, হা হুতাশ ছাড়িয়া সেই আনন্দকে ভাল করিয়া ধরিতে পারে। আনন্দলাভের এই বিজ্ঞানটি হইতেছে সাধনা। এই বিজ্ঞানটিই হইতেছে উপাসনা। উপাসনা স্বাভাবিক। উপাসনা আপনা হইতেই সকলের মধ্যে কখন না কখন উদিত হয়। যে প্রকারে ইহা হয় তাহা জানিয়া উপাসনা করিতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়।

কিরূপে ইহা হয় যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলিব—যতদিন রজস্তমে ডুবিয়া থাকিবে, যতদিন সত্ত্বগুণ না জাগিবে, ততদিন তুমি তোমার ঐ

জ্বালামালাময় সংসারে সুখ পাইবে না। রজস্তমকে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণ জাগাইবার জন্যই সাধনা নিজে করিতে হয় এবং অন্যকেও করাইতে হয়।

তমোগুণকে তাঁহারা সত্ত্বমুখে লইয়া যাইবার কৌশল বলিয়াগিয়াছেন রজগুণকেও সত্ত্বে পরিণত করিবার কৌশল তাঁহারা শিখাইয়াছেন— আমরা সে কৌশল শুনিয়াছি, কিন্তু করিয়া না দেখিলে আমরা তাহা লাভ করিব কিরূপে?

রজস্তম পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণে থাকাই সাধনা। ইহারই জন্য তমোগুণাক্রান্ত মানুষকে তাঁহারা মৃত্যুচিন্তায় বৈরাগ্য আনিতে বলেন, রজোগুণাক্রান্ত নরনারীকে তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিতে বলেন। ইহারই জন্য নিষিদ্ধকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে ইহারই জন্য বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে ইহারই জন্য পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা চিত্ত হইতে রাগ দ্বেষ বিগলিত যখন হয় তখন চিত্ত সেই রসময়ে সেই আনন্দময়ে নিত্য একাগ্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। তখন হয় উপাসনা। নতুবা সাধনা না করিয়া রজস্তমকে বশীভূত করিতে বা শিখিয়া শুধু প্রার্থনা লইয়াই যদি থাক, শুধু বিশ্বাস লইয়াই যদি থাক, তবে তুমি নিত্য ভগবান্‌কে লইয়া থাকিতে পারিবে না। মূর্খ কৃষকের মত কখন কখন ভাল কথা তুমি বলিতে পারিবে সত্য কিন্তু ইহাতে চরিত্রগঠনও হইবে না, সুখকেও আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

এই নূতন বৎসর আসিয়াছে। এস একবার ভাল করিয়া সাধনা করা যাউক। সাধনা করিয়া আমরা সংসারকে সংসার আশ্রম করি এস। সংসার আশ্রমে আবার বালক বালিকা, পিতা মাতাকে দেবতা বলিয়া দেখিতে শিক্ষা করুক; আচার্য্যকে দেবতা বলিয়া দেখুক; পিতা মাতা আচার্য্যের জন্য নিজের সুখ অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা দাও আবার পিতা মাতাকেও শিক্ষা দাও—ভালবাস, ভালবাসিয়া শিক্ষা দাও। পত্নীকে শিক্ষা দাও পতিকে নারায়ণভাবে দেখাই স্ত্রীজাতির

সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার নিজ সুখইচ্ছারূপ কাম যেন ইহাদের ঘৃণার বস্তু হয়। সংসার আবার প্রেমের সংসার হউক। স্বার্থপরতার সংসার ইহা যেন আর না থাকে। বিনা সাধনায় ইহা হইবে না। সময় আসিতেছে, সময় আসিয়াছে যখন মানুষকে ব্যভিচার ছাড়িয়া, নিজের ইচ্ছামত কার্য্য ছাড়িয়া, নিজের মতামতকে সাধু মহাপুরুষের মতের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে।

আমরা বহুদিন হইতে এই কথাই বলিতেছি। বর্ষ সমালোচনায় আমরা আবার ইহাই বলিলাম। আমরা স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রমের কথাও আলোচনা করিয়াছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে অনুষ্ঠানের শিক্ষা হউক। মানুষ নিজে অনুষ্ঠান করুক, অন্যকে অনুষ্ঠান শিক্ষা দিউক। সৎশাস্ত্র নিজে পাঠ করুক অন্যকে বুঝাইয়া দিতে থাকুক। এই সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতে আবার সমাজের পবিত্রতা আসিবে। আবার পুরুষ চরিত্রবান্ হইবে, স্ত্রালোক সতী হইবে; মন রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া একাগ্র হইবে; শেষে সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দরাজ্যে বাস করিতে পারিবে।

এই চরিত্র, সতীত্ব, একাগ্রভাব ও নিরোধভাব এইগুলি যত্ন করিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। এইগুলির ভিত্তি হইতেছে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা ঈশ্বরকে সর্ব্বহৃদয়ে দেখিবার সাধনা করা, শ্রীভগবান্‌কে লইয়া সর্ব্বদা থাকিবার প্রয়াস করা। ইহারই জন্য আচারবান্ হইতে হইবে, ইহারই জন্য আহারশুদ্ধি করিতে হইবে। নতুবা শরীর পবিত্র, মন পবিত্র কখনই হইবে না।

বর্ষ সমালোচনায় আর এক কথা আমরা বলিব। ভারতবর্ষ পঞ্চোপাসকের দেশ। পঞ্চোপাসনায় সেই একেরই উপাসনা হয় ইহা নিজে বুঝিতে হইবে, সকলকে বুঝাইতে হইবে।

আমরা নাম রামায়ণ কীর্ত্তন বলিয়া একখানি দেড় ফর্ম্মার পুস্তক গত চৈত্রের উৎসবে পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিয়া বাহির করিয়াছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পুস্তক ও মান্দ্রাজের অন্য একখানি পুস্তক দেখিয়া এবং

মূল রামায়ণ হইতেও সংগ্রহ করিয়া ইহা আমরা প্রকাশ করিয়াছি ইহার সঙ্গে স্তব স্তুতিও আছে। পুস্তকখানি তাড়াতাড়ি ছাপা হওয়ায় কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। যে ভাব প্রচারের জন্য ইহা সঙ্কলিত তাহাতে এইরূপ ভুলে সাধনার কোন ক্ষতি হয় না। তথাপি বাবান্তরে আমরা ইহা নির্ভুল করিয়া দিব। এইরূপ শক্তি সম্বন্ধে, শিব সম্বন্ধে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে, সূর্য্য সম্বন্ধে, গণপতি সম্বন্ধে কীর্ত্তন-পুস্তক হওয়া উচিত। এক ফর্ম্মায় বা দেড় ফর্ম্মায় এই ভাবে পুস্তক লিখিয়া যিনি পাঠাইবেন আমরা তাহা আদর করিয়া উৎসব পত্রিকায় প্রকাশ করিব।

উৎসবে প্রকাশের জন্য আমরা সময়ে সময়ে কবিতা পাই। কিন্তু শুধু কবিতায় কি হইবে? সাধনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখাও কর্ত্তব্য। শুধু মা এস, মা আমাদের বড় দুঃখ—এ ভাবে উচ্ছ্বাসে প্রবন্ধ পূর্ণ করিলে বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না। যিনি যেরূপ সাধনা দ্বারা যখন যে ভাবে চিত্তস্থির করিতে পারেন তাহাই যদি প্রবন্ধাকারে লিখিয়া পাঠান, তাহা আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব। সমাজের কল্যাণ করিতে হইলে শুধু এক জনের উপরে নির্ভর করা উচিত নহে। অনেকের ইহাতে চেষ্টা করা উচিত। আর দলাদলি সম্প্রদায়ের মূল কোথায় তাহাও দেখাইয়া দেওয়া উচিত। যে উপায়ে দলাদলি সম্প্রদায় দলাদলি ছাড়িয়া এক হইতে পারে তাহাও সাধারণে প্রচার করা আবশ্যক। মানুষকে মানুষ করিবার সাধনাগুলি দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রবণ হইয়াছে অনেক, এখন করাই বাকি। নূতন বর্ষ হইতে আমরা নূতনভাবে সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আবার আলোচনা করিতেছি।

নব বর্ষে।

১

বর্ষ যায়, স্মৃতি যায়, চলে যায় সোণার স্বপন,
বৃথা তায় ধরে রাখা, ব্যর্থ আজি ক্ষীণ আলিঙ্গন।

বালুমাঝে রচিয়াছ কত শত হেম হর্ম্ম্যরাজি,
অতৃপ্তির দেশে বন্ধু সাধ তব পূরেছে কি আজি!

২

চূর্ণ আশা, বক্ষে ব্যথা, চক্ষে তব বহে শতধারা
সুখদুঃখ ঝঞ্ঝাবাতে নাহি জানি হলে কত সারা।
হায়! ভ্রান্ত তবু ধাও রজ্জুভ্রমে সর্প ধরিবারে,
কত পথ বৃথা এলে একবার চাহিলে না ফিরে!

৩

সাধের জনম এই কিবা কাজে লভিলে হেথায়,
একবার ভাবিলে না কত যুগ বৃথা ব'য়ে যায়;
কৃষ্ণ নাম ভুলে গিয়ে ওরে বদ্ধ পিঞ্জরের পাখী,
কামিনী-কাঞ্চন ধ্যানে মগ্ন কেন মুদে দু'টি আঁখি॥

৪

বিরূপে মজিয়ে আঁখি ভুলিল না হেরি পীতবাস
জপে না মজিল কর্ণ, অঙ্গ ঘ্রাণ নাহি নিল নাস,
দিল না অঞ্জলি হস্ত, ধাইল না পদ কৃষ্ণ যেথা
মজিল না, মনভৃঙ্গ, গাহিল না সদা কৃষ্ণ কথা।

৫

কৃষ্ণবিলাসের দেহে নাহি হ'ল ইষ্ট পরশন,
স্থূল সূক্ষ্ম কারণের ব্যর্থ বোঝা বহ অনুক্ষণ।
শুধু কিগো এই মত আশা যাওয়া হবে তব সার,
লীলারঙ্গে পড়ি হায় বারবার হবে ছারখার॥

৬

দিন যায়, বর্ষ যায়, কর্ম্মঘোর ঘেরিছে তোমায়
প্রতি পরমাণু তোমা লৌহবাঁধে বাঁধিতেছে হায়!
জাগো বন্ধু জাগো ওগো চেতনের হৃদয়ের ধন
চারি কোষ ভেদিবারে কর আজি আত্মসমর্পণ।

৭

হের হৃদিপদ্ম মাঝে নির্ব্বিশেষ নিরীহ চেতন
হরি হর বিধি বেদ্য অকল্মষ নিত্য নিরঞ্জন।
সেই পূর্ণ অংশ তুমি মায়াবশে বদ্ধ অচেতন
দেহভ্রমে ওগো দেহী ভুলিয়াছ স্বরূপ আপন

আমি খোঁজা।

প্রাতে ৫০০।—৩১।—১। মানস পূজা। প্রাতঃসন্ধ্যা। গীতা পাঠ।

৭ই কার্ত্তিক ১৩২৩।

আমি যখন আমার আমিকে খুঁজি, তখন কি পাই? তখন ত ঠাকুর তুমি ছাড়া আমি আর কিছুই পাই না। আমার স্বরূপ যা তা ত তুমি। তবে আমি কি তুমি? আমি যে তুমি, এ কথা ভাবিতে গেলে যে কেমন হইয়া যাই? আমি যদি তুমি হই, তাহলে ত আমার সবই তোমার মত হবে। আমার সবই কি তোমার মতন? আমার নাম ত তোমার নাম নয়। আমার রূপ ত তোমার রূপ নয়। আমার গুণ ও কর্ম্ম ত তোমার গুণ ও কর্ম্ম নয়। তবে আমার কি তোমার মতন? আমার স্বরূপটি তোমার মতন। কিন্তু আমার সবই তোমার মতন হয় এই ত আমি চাই। গুণ কর্ম্ম সবই তোমার মতন হওয়া চাই। হয় না কেন? হায়! আমি যে আমার আমিকে কত জায়গায় হারাইয়াছি। আমি তোমার মতন হইব কিরূপে? আমার দেহ, আমার মন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশা, বাসনা, কতকির মধ্যেই যে আমার আমি হারাইয়া ফেলি। সব হ'তে আমার আমিকে খুঁজে এনে আমার যে স্বরূপ তার মধ্যে নিয়ে যেতে হ'বে। তবেই আমার রাজার ছেলের চামার অভিমানরূপ ভুল ভেঙ্গে যাবে। আমার স্বরূপটি সর্ব্বদা মনে রাখ্‌লে আমি তোমার হ'য়ে যাব, আমি তোমার হইলে তবে তুমি আমার হইবে। আর তুমি আমার হইলেই শেষে আমি তুমি এক হ'য়ে যাব।

আহা, সে কত সুন্দর! তোমার আমি না হইলে যে তুমি আমার হ'বেনা। তোমার হ'তে হ'লে আমায় তোমার মত হ'তে হ'বে। কত-দিনে ঠাকুর! আমি তোমার হ'ব? আমি ত তোমারি হ'তে চাই। মুখে ত বলি হ'তে চাইকিন্তু কি চেষ্টা তার জন্য করিলাম? কিবা ত্যাগ করিলাম? কিছু না ত্যাগ করিলে কিছু কি ধরা যায়? হাত যে অন্য জায়গায় আটকাইয়া রহিল তোমায় ধরিব কিরূপে? মন যে অন্য জায়গায় আটকাইয়া রহিল তোমার কাছে থা কিবে কিরূপে?

কৈ কোন্ জিনিষে আমার বৈরাগ্য হইল? বৈরাগ্য! বৈরাগ্য! কবে তুমি আমার উপর প্রসন্ন হইবে? কত ভাবেই তুমি আমায় দেখা দিয়া গিয়াছ! হায়! আমি তোমায় আদর করিয়া বুকে ধরিলাম কৈ? অনেক চিতায় ত অনেক প্রিয়জনকে অর্পণ করিয়া দগ্ধ হইতে দেখিলাম? কৈ হৃদয়ে সর্ব্বদা কার চিতা সাজাইয়া রাখিলাম? সংসার ত সত্যই শ্মশান—মহাশ্মশান। শ্মশানকে হৃদয়ে আনিতে না পারিলে কি শ্মশানবাসিনীর নৃত্য নিরবধি হৃদয়ে দেখা যায়? হায়! বৈরাগ্য বিনা যে ধর্ম্ম হইতেই পারে না। গুরু যে প্রত্যহ বৈরাগ্য চিন্তা করিতে বলিলেন। বৈরাগ্যই যে তোমার ভিত্তি। কতই ত গেছে, কতই ত যাইতেছে—আহা! তবু কেন বৈরাগ্য আসেনা? বৈরাগ্য কি তাও বেশ বুঝাইয়াছ।

কত লোক ত চলিয়াগেল! মৃত্যুকালের সেই কাতরতা, সেই যমযাতনা, সেই ব্যাকুল ভাব—আহা! ইহা স্মরিয়া আমি ব্যাকুল কেন হই না? আমার কি এমন দিন হইবে যখন আমি সেই কাতরতা সেই সময়ের মত হৃদয়ে আনিতে পারিব? কৈ আমি প্রস্তুত হইলাম? এত দেখেও ত স্মরণ থাকে না? আশ্চর্য্য মোহ! আশ্চর্য্য মায়া! দাও আমার মোহ কাটাইয়া! দাও মা আমায় বৈরাগ্য! হায়! সদা বৈরাগ্য থাকে না বলিয়াই বুঝি সদা তোমায় লইয়া থাকিতে পারি না। তুমি ত মনের মধ্যেই রয়েছ। বুঝি বৈরাগ্য নাই বলিয়া তোমায় ধরিতে পারি না। যদি বৈরাগ্য থাকিত তবে কি তোমার অনুরাগ

কখন যায় ? বৈরাগ্য জন্য যে অনুরাগ তা কি কখন যায় ? অনুরাগ! আহা কি স্বর্গীয় জিনিষ! মনে হয় যার প্রাণে বৈরাগ্যজ ভগবৎ-চিন্তা জাগে, তার কি আর কোন বাসনা থাকে ? সে কি আর কোন কিছুতে আসক্ত হইতে পারে ? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লয়, বিক্ষেপ কিছুই তারে বিচলিত করিতে পারেনা। মা! আমায় শক্তি দাও। তোমার প্রসন্নতার জন্য যেন তোমার আজ্ঞাপালনেই প্রাণ অন্ত হয়। তোমার প্রসন্নতার জন্য যদি এ দেহ যায় আহা তাতে কতই সুখ! এ দেহটা তোমার আজ্ঞাপালন করিতে করিতে শেষ হইলেই ত তোমার কাছে যেতে পারব। আমার হারাণ রাজ্য পাইব! সে কত সুখের রাজ্য! যাওয়া আসা শেষ হয়ে যাবে! নাও মা! নিজগুণে তোমার আমিকে কোলে টেনে নাও।

আজ ৮ই কার্ত্তিক ১৩২৩।—৩০।—২৫। প্রাতঃসন্ধ্যা। মানস-পূজা। কাল কত কাঁদিলাম, আজ বুঝি তাই এই হইতেছে। এটা বা কি হয় মা ? আসনে বসিয়া প্রথমে সকলকে প্রণাম করি। তার পর একটু পূজা করিতে সাধ হয়। তাই আসনে বসিয়া প্রথমে স্থির হইয়া কতকক্ষণ থাকি। তারপরে মনে মনে জপ করিতে করিতে পূজা করি। মা তোমার পূজাই ত চাই। করিও তোমার পূজা। কিন্তু মূর্ত্তি চিন্তা করিতে গেলে তার মধ্যে আর একটি মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। সেও বুঝি তুমি ? সে কি সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি! মনে করি তোমার পূজাই করিতেছি। দেখি দুই রূপই ত এক। সেবার পূজার কিছুই ত জানি না। তবুও মনে যা হয় তেমনি করি। যেমন পারি তেমনি সাজাই। মালা গাঁথি সে মালা পরাইতে যাই। আবার যেন পরাতে পারি না। আবার পরাই। আবার যেন মনোমত হয় না বলিয়া মালা খুলি। আবার গাঁথি। আবার পরাই। কি জানি কি তখন হয়। পাদ্য অর্ঘ্য দি। ধূপ দীপ দি। আরতি করি। আবার সচন্দন তুলসী সেই চরণে দি। কত রাশি রাশি সদ্য ফোটা ফুল নিয়ে অঞ্জলি করে চরণ ভরিয়ে চরণে দি।

চামর ব্যজন করি। কাছে বসিয়া থাকি। আর দেখি। খুব দেখি। প্রাণ ভ'রে যায়। যেন কত কথা ও হয়। যা মনে হয় তা বলি। প্রার্থনাও করি। তার পরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার যেন কি হয় বুঝিনা। কিন্তু আবার মনে হয় একি, হ'লনা? বুঝি পূজা করা হ'লনা। তখন বলি পূজার যে মা কিছুই জানি না। আবার কতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকি। মনে করি আবায় সাজাই আবার খাওয়াই। তাই করি তবুও যেন ঠিক হয় না। দাও না মা আমায় ডাকার মতন ডাকা শিখিয়ে? কত দিনে যে ঠিক ক'রে ডাক্‌তে শিখ্‌ব? কত দিনে ঠিক ক'রে পূজা শিখ্‌ব? একবার দেখা দাও মা! সবাই ত তোমায় দেখে। আমারও যে বড় সাধ তোমায় দেখি। পটের ছবি আর ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি দেখেই ত এতদিন পূজা করিলাম। কিন্তু এখন যে তোমায় দেখ্‌তে বড় সাধ হয়। ষে মূর্ত্তির কথা, যাহার ভাব এত মিষ্টি না জানি তুমি কেমন? আচ্ছা ইহাতে আমির আমি খোঁজা কিরূপ হয়? হয় বৈকি। আমি দেখি কর্ম্ম যে করে সেটা সংসারী মন। আর যিনি করান তিনি হইলেন নিবৃত্তি মন। আর আমি? আমি চেতন! আমি দ্রষ্টা। আমি সাক্ষী। আমি দেখি নিবৃত্তি মন প্রবৃত্তি মনকে জপ করাইতেছে, পূজা করাইতেছে, উপদেশ করিতেছে, কখন আদর করি-তেছে, কখন ধমকাইতেছে। আমি কিন্তু দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে যখন জপের অর্থ জাগিয়া উঠে তখন দেখি যার নাম জপ করি সেই আমার আমির পূর্ণত্ব। আমি কে দেখিতে দেখিতে যখন আনন্দ আইসে, তখন যেন আর কিছুই দেখিনা একটা কিসে যেন স্থির হইয়া যাই। যখন সেই স্থির ভাব সরিয়া যায় তখন স্মৃতিতে পূর্ব্বের অনুভব যেন আবার অনুভূত হয়। তখন যেন কিসে আটকাইয়া থাকি। থাকিয়া যেন কাহাকে লইয়া সর্ব্বদা থাকি। এমন কি ব্যবহারিক কার্য্যেও যেন এক স্থানে থাকিয়া কাজ করি। এইরূপ করায় কি আমি খোঁজা পাকা হইবে? আমার ভাবনা বাক্য ও কর্ম্মে তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করি। তারপর তুমি যেখানে ইচ্ছা আমায় লইয়া যাইও। ইতি (২৮৮৪)

কি মন্ত্র বা কাণে দিলে।

বিস'রি সকল কথা আমি ত ছিলাম ভুলে
কোথা হ'তে কে গো তুমি কি মন্ত্র বা কাণে দিলে ?
জানিতে তোমারে প্রভু !   বাসনা জাগিল মনে
প্রাণের বাসনা যাহা নিবেদিনু ও চরণে।
তুমি গো অন্তর যামী বুঝিলে সকল কথা
স'রে গেল হৃদয়ের শান্তিহীন মনোব্যথা।
রূপ লয়ে দেখা দিলে আনন্দে হইনু মাখা
নিবিড় আঁধার মাঝে দেখিনু আলোক-রেখা।
সংসার কেমন দেব দাওনি বুঝিতে মোরে
দেখিয়াই না চিনিতে আপনি গিয়াছে স'রে।
এখন জানালে নাথ জগৎ কিছুই নয়
আপনারে চিনিলে যে সকলি আনন্দময়।
ভালবাসা ছাড়া যেন কিছুই নাই হেথায়
রূপরসস্পর্শ ভুলে থাকি ভ'রে আপনায়।
জগৎ সংসার আর আত্ম বন্ধু পরিজন
কিছুই কিছুই নয় সকলি দীর্ঘ-স্বপন।
কি জানি কিছুই যেন পরাণে জাগে না আর
মিশিতে তোমার সাথে বাসনা শুধু আমার।
সম্বল নাহিক মোর ভক্তি প্রেম অনুরাগ
শুনেছি শুনেছি দেব, তোমার স্নেহের ডাক্।
করিয়া তোমার প্রভু লও মোরে এই বার
মিটেছে সকল সাধ চাহিনা কিছুই আর।

(২৮।৪)

তোমার কথা।

এত নীরব কেন? এত চুপ চাপ কি থাকা যায়? একটু কথা কওনা? একটু জুড়াইয়া দেও না। আমার যে জুড়াইবার স্থান আর কোথাও নাই। লোকসঙ্গে দেখি আরো জ্বালা। তুমি ত ভুলাইতে ছাড়িবে না। ভুলানই যে তোমার স্বভাব। লোকের সঙ্গ তোমার নিকট হইতে আরো দূরে লইয়া যায়। তোমা ছাড়া হইয়া কেহ কি কখন শান্তি পাইয়াছে যে আমি পাইব? দ্বিগুণ অশান্তি লইয়া যে ফিরিতে হয়। লোক দেখিলে আমার যেন ভয় হয়। উহারা ত তোমার কথা বলেনা। আমার তুমি ভিন্ন আর কে আছে বল? আমি আর কোথায় যাইব? তোমায় আমি কোথায় পাইব? একটু বলিয়া দাও না? অমনই কি নীরব রহিবে? চিরদিনই কি দূরে দূরে থাকিবে, দূরে রাখিবে? সত্যই কি তাই? দেখি আমি ত তোমায় চাহিতে জানিনা; তুমি আমার চেয়ে আমায় শতগুণে চাও। তোমার চাওয়া দেখিয়া আমি সরমে যেন কি হইয়া যাইতে চাই। বল ত আমার কোন্ গুণে তুমি আমায় এত চাও? রূপ নাই তুমি রূপ দিয়াছ তাই তোমার রূপে আজ রূপবতী হইয়াছি। কোন গুণ নাই তোমার আপন গুণে আজ আমায় গুণময়ী করিয়াছ। তাই আজ তোমার আদর মাখিয়া আমি সোহাগিনী হইয়াছি। কিন্তু তুমি জান আমি কি। আর তোমার আদর? তোমার আদর যে একবার পাইয়াছে সে কি আর কিছু চায়? তোমার কথা—একথা যে শুনিয়াছে আর কোন কথা কি তাহার ভাল লাগিতে পারে? শতবার শুনিয়াও অতৃপ্তি রহিয়া যায়, পিপাসা বাড়িয়াই যায়; চিরদিন জন্ম জন্ম ধরিয়া শুনি এমনি সাধ রহিয়া যায়। তুমি এত কথা কি বল—বল ত? দেখি তোমার কথায় আকাশ পরিপূর্ণ। বাতাস তোমারি বার্ত্তা বহিয়া আনে। নদীর কল কল ভাষায় তোমার কথা বলা যেন ফুরায় না। বিহগকণ্ঠে কত "পিও" "পিও" প্রিয় বুলিই ধরাইয়াছ!

যেন প্রিয় সম্বোধনের পিপাসা কত মধুর করিয়া বলিয়া বলিয়াও সাধ মিটিতেছে না। ফুলের মধ্যে অত মধুর হইয়া কি বলিতে চাও? শিশির-সিক্ত কোমলাধর মৃদুস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া কত কথাই সুধাইতে ব্যগ্র হয়। কত কথা পাতার আড়ালে লুকান থাকে, সব কথা কি বলা যায়? সে তোমার কে? যাকে বলিবার জন্য, যাকে দেখাইবার জন্য তুমি এতরূপে সাজিয়াছ? এত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছ? অনলে, তপনে, চন্দ্রে, তারকামালায়, জলদে, জলধিজলে, পর্ব্বতে, কাননে, বৃক্ষে, লতায়, পুষ্পে, পল্লবে, কোমলে, কঠিনে, সর্ব্বত্রে, সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য্য, সকল শোভায় তোমার বাণী মুখরিত। তোমারি আদেশে বায়ু প্রবাহিত, নদী সকল আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবমান হইতেছে। সৃষ্টির সকল পদার্থে থাকিয়া, সকলকে সকল শোভায় শোভান্বিত করিয়া তুমিই সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ। তোমার সকল ছাড়া আমি নই, তুমিই আমাকে চালাইতেছ। আমার মধ্যে থাকিয়া তুমিই কত মধুর হইয়া কথা কহিতেছ—তাই 'তোমার কথায় আজ আমার—দত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহারে আমরা আপনাকে কুৎসিত করিয়া তুলি। নহিলে তুমি চিরমঙ্গলময়, তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া কখন কি অমঙ্গলের সৃজন হয়? তোমাকে হারাইয়াই যত দুঃখ। তোমার কৃপা অনন্ত। আবার তোমার কৃপায় যখন তোমায় হৃদয়ে পাই—দেখি সৃষ্টির সকল বস্তুতে তুমি। তুমি-মাখা নয়নে যে দিকে দেখি,—দেখি কত সুন্দর তুমি, আমার দৃষ্টিতে পুলক মাখাইয়া আমার অনুরাগ বাড়াইবার জন্য কত মধুর হইয়া চাহিয়া চাহিয়া কৃপা বিতরণ কর। কত কথা বল—সকল কথা কি আমি বুঝিতে পারি? আমি শুধু অবাক্ নয়নে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি। বলনা! এত সুন্দর আর কে? এত গুণ কার? এমন আর কে? সকল গুণে গুণময়, সকল রূপে রূপ মিশাইয়া এমন নয়নাভিরাম, এমন সদাভিরাম, এমন আর আমি কোথায় পাইব? সূর্য্যমণ্ডলের জ্যোতি সে ত তোমার জ্যোতিতেই অত সুন্দর। আমি আর তোমায় কি বলিব? তোমার

চরণে লুটাইয়া চিরদিন তোমায় প্রণাম করি—এই আমার সাধ! প্রভু ইহা তোমারি চরণের নির্ম্মাল্য। কেমন করিয়া নিবেদন করিলে চরণে নিবেদিত হইবে—তুমি প্রসন্ন হইবে জানিনা। যেমন ফুটাইয়াছ তেমনি ফুটিয়াছে। প্রসন্ন হইবে কি? ইতি (২৫।৭)

ভক্ত ও দেবতা।

দেবমন্দির—দেবতা স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, হাস্য-স্ফুরিত করুণামণ্ডিত উজ্জ্বল দীপ্তিপূর্ণ বদনে, মন্দিরমধ্যস্থ প্রদীপের আলো হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আলোক, আঁধারে মিশাইয়া সে শ্যামরূপ মধুর হইতে আরো মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে। নিম্নে রাতুল পদতলে ভক্ত উপবিষ্ট, পার্শ্বে ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল আপনাদিগকে দগ্ধ করিয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, অন্য এক দিকে পুষ্পপাত্রে রাশীকৃত পুষ্প তুলসীদল। ভক্ত আজ ভাবে বিভোর, যেন আজ কত যুগ-যুগান্তের সাধনার পর, কত দীর্ঘ বিরহের পর দেবতার আগমনের পূর্ব্বাভাস, আপনার হৃদয়মধ্যে অনুভব করিতেছেন; যেমন হেমন্তের শেষে বসন্তের আগমনের পূর্ব্বাভাস সকলকে আকুল করিয়া একদিন হঠাৎ জানাইয়া যায়, এযে ঠিক তেমনটী তা নয়; ইহার যে উপমা নাই, প্রিয়সম্মিলন বলিয়া যে বুঝান যায় না, মানব-ভাষায় ইহার স্থানাভাব, ইহা শুধুই অনুভব-যোগ্য; যাহার হইয়াছে সেই এ মধুরতম ভাবের কণামাত্র অনুভব করিতে পারে। ভক্ত আজ তাঁহার প্রিয়তমের পূজা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, দেবতাকে সাজাইতে গিয়া আপনি সাজিয়া বসিতেছেন, আবার ক্ষণেক পরে জ্ঞানলাভ করিয়া দেখিয়া মাথা খুঁড়িতে-ছেন, তবুও দেবতা এখনও লুকাচুরি খেলিতেছেন। ভক্তের আত্মবিহ্বল ভাব প্রেমময় প্রেমভরা মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছেন, যেন সে দৃষ্টিতে প্রেম উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে, আবার ভক্তের ইষ্টলাভ জন্য মাথা ফাটাইয়া রক্ত বাহির করিবার ভঙ্গিমাতেও হাসিতেছেন,

তবুও এখনও সেই লুকাচুরী। ভক্ত এবার অধীর হইয়া উঠিলেন,কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—তবে কি তুমি আমায় দেখা দেবেনা, আমার এ দীর্ঘজীবনব্যাপী সাধনাতেও কি তুমি তুষ্ট হ'লেনা ? বল একবার বল তোমায় কিরূপে পূজা করিলে তুমি দেখা দাও, বল একবার বল কি ভাবে ভাব্‌লে তুমি এস, কি ব'লে ডাক্‌লে তুমি শোন, তুমি দয়া ক'রে এ দাসকে কৃপা ক'রে জানাও, আমি তোমায় সেইভাবে ভাব্‌ব ; সেইরূপে চিন্তা কর্‌ব। শুনেছি সকলে তোমায় দয়াময় বলে কিন্তু কই এতদিনেও তো তোমার দয়া হ'ল না। তুমি আপনা হ'তে এ দীনহীনে দয়া কর ; তুমি নিজগুণে কৃপা না কর্‌লে আমার আর উপায় নাই। ওগো আমি নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে ও রঙ্গাপায় পড়েছি—এ দীনকে কৃপা ক'রে কৃপাময় স্থান দাও। শুনেছি যে তোমার ও রাতুল পদতলে কখনও দীনহীনের স্থানাভাব হয় নাই ; ওগো আমি কি এতই পতিত যে তোমার চরণেও আমার স্থান নাই ? এস দেবতা এস, আমার এ ভাঙ্গা বুকের ভিতর আসিয়া দাঁড়াও— বলিয়া ভক্ত মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, কিন্তু দেবতা নিশ্চল। এইবার ভক্ত এক ভীষণ কার্য্যে উদ্যত হইলেন—পার্শ্বেই চন্দন ঘসিবার প্রস্তরের চন্দন-পাটা রহিয়াছে ; দেবতার শ্রীমুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—তবে তুমি আমায় দেখা দেবেনা ? এই দেখ এইবার আমি কি করি—বলিয়াই চন্দন-পাটা লইয়া সজোরে মস্তকে এক আঘাত করিলেন।

রক্ত ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইয়া দেবতার রাতুল পদতল ধৌত করিয়া দিল ; পুনরায় আঘাত, তদুপরি আঘাত,আঘাতের উপর আঘাত। হঠাৎ একি প্রদীপ নিভিয়া গেল, সমস্ত মন্দির এক স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সহসা শত বীণা ঝঙ্কারিল, কে যেন মধু হইতেও মধুময় স্বরে বলিয়া উঠিল—এই যে আমি। ভক্ত আবেগ-বিহ্বল চিত্তে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন তাঁহার চিরসাধনার ধন আজন্ম-বাঞ্ছিত—তাঁহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম মধুময় শ্যামরূপ ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্ত সে মনোমোহন রূপ দর্শন করিয়া নীরব, নিশ্চল। ভক্ত

আবেগ-বিহ্বল চিত্তে মনোময়ের মধুময় রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন, হঠাৎ একি, ভক্ত বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—দেখিলেন দেবতার মস্তক হইতে দরদর-ধারে রক্ত বহিয়া ভক্তকে সিক্ত করিতেছে; ভক্ত কম্পিত-স্বরে কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—একি ঠাকুর! ঠাকুর মধুর হইতেও মধুর হাসিয়া মধুময় কণ্ঠে বলিলেন-ভক্তই আমার প্রাণ, ভক্তের শরীরে আঘাত করিলে আমাকেই আঘাত করা হয়। ভক্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে শ্রীমুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; রহিয়া রহিয়া বলিয়া উঠিলেন; এত দয়া তোমার, কে ব'ল তোমায় নিষ্ঠুর, ওগো চতুর একি চতুরালি তোমার! এত যদি ভালবাস তবে কাঁদাও কেন? কাঁদাইয়া কি সুখ পাও? ওগো এই জন্যই তোমার নাম ব্যথাহারী। তুমি ব্যথা দিয়া আবার তুমিই আদর ক'রে স্বহস্তে ব্যথা মুছে দাও। লীলাময়! একি লীলা তোমার! তুমিই ব্যথা দাও দিয়ে আবার তুমিই দেখাও যে ব্যথা তোদের দিয়াছি সে ব্যথা আমারই বুকে বেজে আছে। প্রভু! মায়ে যেমন আপন সন্তানকে সৎ করবার জন্য বেদনাপূর্ণ বুকেতে শাসন করেন—ওগো সে শাসনে সন্তানের যত না লাগে, মায়ের বুকেতে যে তার দ্বিগুণ লাগে। তুমি আমায় শুধু তোমার ক'রে নাও, আমায় আর কোথাও যেতে দিও না, কিছু শুনতে দিও না, কিছুই দেখতে দিও না, শুধু তুমি আমার থাক। তুমি আর আমায় একা ফেলে কোথাও যেও না। দেখ তুমি চলে গেলে আর আমার কিছুই মনে থাকে না—আমি আমি সব ভুলে যাই, আবার আমি যে অধম সেই অধম হ'য়ে যাই। বল প্রিয়তম বল তুমি আমায় আর ছেড়ে যাবে না? বলিয়া ভক্ত তাঁহার প্রাণারামের শ্রীমুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। দেবতা মৃদুমন্দ মধুর হাসির সহিত মধুময় কণ্ঠে বলিলেন—আমি কোথায় যাব? যেখানে ভক্ত সেখানে আমি। ভক্তই আমার প্রাণ, ভক্তই আমার সর্ব্বস্ব; ভক্তের অন্তরেই আমি নিরাকার, ভক্তের নয়নেই আমি সাকার, ভক্তের অন্তরেই আমি নির্গুণ, আবার ভক্তের ইচ্ছাতেই আমি গুণময়। এইবার ভক্ত উত্তর করিলেন, তবে প্রভু, তবে দেবতা এই—এইখানে এই দীন

হীন কাঙ্গালের এ শশ্মান হৃদয়ের মাঝখানে এস; তোমার আগমনে মরুভূমি স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত হোক্; প্রাণে আমার চির-বসন্ত বিরাজমান থাক্। সেই মরুভূমির মাঝখানে প্রেম-যমুনা কুলু কুলু নাদে বহে যাক, আর তুমি তার তীরে সেই—সেই বহুদিন আগে যে ভাবে শ্রীমতীর সঙ্গে লীলা করেছিলে—এস প্রিয়তম এস, এ অধম পতিতকে যদি দয়া ক'রে এলে, তবে সেই ভাবে একবার এ ভাঙ্গা বুকের মাঝখানে দাঁড়াও। আমি দেখি, মন প্রাণ হৃদয়পুরে দেখি। শুধুই দেখব, আর কিছুই না, য়েন শুধু দেখার মতন দেখ্‌তে পারি—এস আমার অন্তরে বাহিরে সেই ভাবে এস। বলিয়া ভক্ত,ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে নয়ন নিমীলিত করিলেন; ভিতরে সেই মনোমোহন রূপ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন দরবিগলিত ধারে নয়নধারা গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। আবার নয়ন উন্মীলন করিলেন—বাহিরেও সেই মধুময় মধুর মূরতি দেখিতে দেখিতে ভাবে বিহ্বল হইয়া, আবেগে মুগ্ধ হইয়া ভক্ত প্রিয়তমের মধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতেসমাধিস্থ হইলেন। (২০।৩)

প্রাপ্তি স্বীকার।

অদ্বৈত সিদ্ধিঃ, সিদ্ধান্ত লেশঃ, খণ্ডন খণ্ডনখাদ্য এবং চিৎসুখী এই চারিখানি পুস্তক একসঙ্গে খণ্ডাকারে বাহির হইতেছে। তিনখণ্ড পুস্তক আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ এই পুস্তক প্রচারের ভার লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী চিৎসুখীর অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সিদ্ধান্ত লেশের অনুবাদক। প্রাপ্তিস্থান (১) লোটাস্ লাইব্রেরী ২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট এবং (২) ৪নং আরপুলি লেন বহুবাজার কলিকাতা সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ইহার প্রণীত নব্যনায় সটীক সানুবাদ ব্যাপ্তিপঞ্চকও আমরা পাইয়াছি। যথার্থ জ্ঞানের প্রচারে রাজেন্দ্রনাথ যে পরিশ্রম করিতেছেন, যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থ তিনি যিনি সংস্কৃত ভালরূপ জানেন না এরূপ পাঠকের নিকট বঙ্গানুবাদ করিয়া ধরিতেছেন তজ্জন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ তাঁহার নিকট ঋণী। আজকাল "সোহং জ্ঞানের" উপকথা "আমি ব্রহ্মের" গল্প অনেকের মুখেই শুনা যায় কিন্তু জ্ঞান কোন বস্তু তাহা জানিতে হইলে অনুষ্ঠানের সহিত এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করা উচিত। আমরা এই প্রকারের অন্যরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পুস্তকগুলি মনের মত করিয়া দেখিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিতে পারি মানুষ যতই মনুষ্যত্ব লাভ করিবে ততই এই সমস্ত গ্রন্থের আদর হইবে। চিৎসুখীর স্বপ্রকাশ বস্তুটি কি ইহার বিচার যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন আমাদের শাস্ত্র জানাটা কিরূপ? আমরা "জিজ্ঞাসু" সকলকেই অনুরোধ করি তাঁহারা এই সমস্ত পুস্তক আনাইয়া যদি পাঠ করেন তবে শাস্ত্র কি তাহা যথার্থ রূপে জানিতে পারিবেন এবং বিশেষ লাভবান্ হইবেন।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ।] ১৩২৪ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীজয়দেবে-মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ।

মুরারি মারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ।
সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্॥

অসৌ পূর্ব্বোক্তা শ্রীরাধিকায়াঃ সখী আরাৎ অনতিদূরে সমবস্থিতং মুরারিং সমক্ষং অক্ষোঃ সমীপে অঙ্গুলীসঙ্কেতেন উপদর্শয়ন্তী প্রদর্শয়ন্তী পুনঃ রাধিকাম্ আহ।

যে সখীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "সরসমিদমুচে সহচরী" যে সখী শ্রীকৃষ্ণানুসরণকালে শ্রীরাধিকার সঙ্গে কান্তারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, যে সহচরী ভাব উদ্দীপনের জন্য এই সরস বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার শ্রীমতীর অন্তশ্চক্ষে বড় সরস করিয়া ফুটাইবার জন্য সেই "ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিধ কৃষ্ণানুসরণাম্ বলদ্বাধাং রাধাং" পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল বলিতেছিলেন—সেই পূর্ব্বোক্তা সখী ভাবোদ্দীপ্তা শ্রীমতীকে ভাবনা-রাজ্যের বৃক্ষান্তরাল হইতে অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইয়া

দিতেছেন—ঐ দেখ সখি! "হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে"—ঐ দেখ সখি! বিলাসিনী কেলি-পরায়ণা মুগ্ধব্রজবধূগণের সহিত শ্রীহরি কেমন বিহার করিতেছেন দেখ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীজয়দেব শরতের রাসলীলা বসন্তে আনিয়াছিলেন। কোথায় আনিয়াছিলেন যদি জিজ্ঞাসা কর—বলিব নিজের হৃদয়ে আনিয়াছিলেন আর "আপনি আচরি" সাধকের জন্য—জগৎবাসীর জন্য শ্রীগীতগোবিন্দে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি আমি "যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ" করিতে চাই, যদি শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে মন সরস করিতে ইচ্ছা করি—তবে শ্রীজয়দেবের সাধনানুসরণে ভাবমার্গের সাধককে ইহাই করিতে হয়। শুধু শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়িলে কি হইবে? শুধু শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের নূতন নূতন সংস্করণ বাহির করিলে কি হইবে? করা ত চাই। জয়দেব আপনি আচরণ করিয়া যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহার অভ্যাস করা চাই, তাহার সাধনা চাই। নতুবা "যথা খরশ্চন্দন ভারবাহী" হইয়া লাভ কি? গর্দ্দভ অনেক চন্দনকাষ্ঠের ভার বহন করিল কিন্তু চর্চ্চিত চন্দনের সুগন্ধ গ্রহণ করিল না। বৈষ্ণব হইয়া ভারবাহী গর্দ্দভের মত নরগর্দ্দভ হওয়ায় কি লাভ হইবে?

এস না তেমনি করিয়া একটু হরিস্মরণ করি! এস না এই সংসারদগ্ধ মনকে হরিস্মরণে একটু সরস করি।

এই যে শ্রীহরির রাসলীলা একি শুধু বৃন্দাবনে দ্বাপরের কোন শরতেই হইয়াছিল—একি এখন আর হয় না? জয়দেব ত শরতের রাসলীলা বসন্তে আনিতে পারিয়াছিলেন! দ্বাপরের রাসলীলা ঘোর কলিতে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! বৃন্দাবনের রাসলীলা হৃদয়বৃন্দাবনে আনিতে পারিয়াছিলেন! তুমি আমি কি এই কালেও তাহা আনিতে প্রয়াস করিতে পারিব না?

শ্রীভগবানের কৃপা চাই, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ চাই ইহা সকলেই বলেন। একজন 'কৃপা' কথাটি বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন—কৃ কর

আর পা পাও। 'কৃপা হইলে হইবে' এই যে সাধারণের কথা, ইহার অর্থ হইতেছে কর, সাধনা কর, চেষ্টা কর—পাইবে। চেষ্টা করাটাই যে সূক্ষ্মভাবে তাঁহার কাছে যাওয়া, ইহা যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সেইরূপ "অনুগ্রহ" হইলেই হয় যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হয় অনুগ্রহ কথার অর্থটী কি ? অনুগ্রহ হইতেছে অনু পশ্চাৎ আর গ্রহ গ্রহণ অর্থাৎ অগ্রে তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর পশ্চাৎ তিনি যে তোমাকে গ্রহণ করেন তাহা বুঝিতে বাকী থাকিবে না। কৃপা বা অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে করাটা চাই। এই করা বা করিতে চেষ্টা এইটি হইতেছে সাধনা। যত প্রকার সাধনা আছে তাহাদের ক্রম হইতেছে—প্রথম "আমি তোমার", মধ্যে "তুমি আমার" এবং শেষে "তুমিই আমি"। বড় সুখের সাধনা ইহা। এই সাধনার প্রতি পদক্ষেপে আনন্দ। সে আনন্দ তাঁহার কাছে লইয়া যায়, শেষে তাঁহার সহিত মিশাইয়া দেয়।

সাধারণ লোকেও যে বিষয়ে চেষ্টা করে সে বিষয়ে ইষ্টদেবের কৃপা পায়, সাধারণ লোকেও ইষ্টদেবের অনুগ্রহ পায়। তাহাদের এ ইষ্টদেবতা কে ? এ অনুগ্রহ-কর্ত্তা কে ? সাধারণ জীবের ইষ্টদেবতা কে ? কোন্ ইষ্টদেবতার কর্ম্ম সাধারণে করে ? ইহা সত্য যে, যার কর্ম্ম ইহারা করে তারেই ইহারা পায়। যারে গ্রহণ করে তিনিই পশ্চাৎ গ্রহণ করেন। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কর্ম্ম অবিদ্যার কর্ম্ম—যমের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিলে যমকেই পাওয়া যায়। যমকে অগ্রে গ্রহণ করিলে যমই পশ্চাৎ গ্রহণ করেন। অসংযমীর উপরে কৃপা হয় যমের। অসংযমীকে অনুগ্রহ করেন যমরাজ। এই কৃপা, এই অনুগ্রহ জন্য চেষ্টা না করিয়া শ্রীভগবানের কৃপা, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহার এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করি এস।

বলিতেছিলাম এ লীলা কি এখন হয় না ? পূর্ব্বে স্কন্দপুরাণ হইতে দেখান হইয়াছে—বৃন্দাবনে দ্বাপরের রাসলীলাও যেমন সত্য, জীবহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রাসলীলাও তেমনি সত্য।

রাসলীলা নিত্যলীলা। কথাটা বড়ই সত্য যে "অদ্যাপিও সেই লীলা করে যদুরায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়"। এই ভাগ্যবান্ কে?

এই ভাগ্যবান্ সেই ব্যক্তি যিনি জীবহৃদয়ের এই নিত্য রাসলীলা বুঝিতে চেষ্টা করেন। বৃন্দাবনের রাসলীলার কথা ত সবাই শুনিয়াছেন, সেই সময়ে যাঁহারা ছিলেন সেই সকল ভাগ্যবান্ তাহা দেখিয়াও-ছিলেন। শ্রীভাগবতে সেই লীলার কথা লেখাও আছে। আর শ্রীভাগবতের লেখা দেখিয়া শ্রীজয়দেবের মত ভাগ্যবান্ এইকালেও নিজের হৃদয়ে সেই লীলা আনয়ন করিয়া তাহারই সংবাদ শ্রীগীত-গোবিন্দে লিখিয়া গিয়াছেন। তুমি আমি যদি ভাগ্যবান্ হইবার জন্য একটু চেষ্টা করি তাহাতে আপত্তি কি?

এস এস জীবহৃদয়ের এই নিত্য রাসলীলা একটু বুঝিতে চেষ্টা করি।

রাসলীলার সংবাদ প্রথমে দিয়াছেন শ্রুতি। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই আবার বাহিরে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহিরের আচরণটি কি? আত্মা সম্বন্ধে বাহির ভিতর হইতেছে ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় কোন কিছু আসিলেই আমরা বলি বস্তুটি ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। যে রাসলীলা সকলের কাছে অব্যক্ত ছিল মাতেবহিতকারিণী শ্রুতি প্রথমে তাহার কথাই ব্যক্ত করিলেন। বৃহদারণ্যকে চক্ষুগোলক হইতে কণ্ঠায় এবং কণ্ঠ হইতে হৃদয়কমলে শক্তি ও শক্তিমানের নিত্য গমনাগমনের কথা স্পষ্টভাবে বিবৃত আছে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন চক্ষে ভাসে তখন জীবের জাগ্রদবস্থা। আর এই স্থূল জগৎ ছাড়িয়া জীব যখন সূক্ষ্ম ভাবনারাজ্যে গমন করে, তখন জীবের স্বপ্না-বস্থা। ভাবনারাজ্যের অনুভূতি হয় স্মরণে। স্থূল অনুভবের নাম দর্শন আর সূক্ষ্মভাবনার নাম স্মরণ। আবার যে অবস্থায় দর্শন ও স্মরণ কোনটিই থাকে না তাহা হইল সুষুপ্তি। যত্র "সুপ্তো ন কঞ্চন

কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্”। পুরুষ যেখানে শয়ন করিলে কোন ভোগেচ্ছা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না—তাহাই সুষুপ্তি। সুপ্ত পুরুষ কোন লীলা করেন না। সুপ্ত অবস্থাতেও একটা অনুভব থাকে, সে অনুভবটি ভাবাভাব জড়িত। সুষুপ্তির অনুভব “আর কিছুই নাই—আমিই আছি”। ইহারও উপরে তুরীয়াবস্থা। এই অবস্থা হইতেছে ‘আপনি আপনি’ ভাব। কোন শব্দ দ্বারা এই তুরীয়কে, এই নির্ব্বিশেষকে ব্যক্ত করা যায় না। নিষেধ মুখে ইহাকে বলা যায়। ইহা নয়—ইহা নয় এই ভাবে শ্রুতি তুরীয়ের কথা বলেন। বিধিমুখে যাহা বলেন তাহাতে বলা হয়—**प्रपञ्चोपशमं शान्तं तुरीयं स आत्मा स विज्ञेयः।**

দৃশ্যদর্শন মার্জ্জনা করিলে যে শান্ত চতুর্থরূপ ‘আপনি আপনি,’ তিনিই তুরীয়। তিনিই আত্মা। তিনিই জানিবার বিষয়। তুরীয়ে স্থিতি হয় কিন্তু বাক্য দ্বারা ইঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। এই সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত তুরীয়ে কোন লীলা হয় না। লীলা হয় মায়িক স্বপ্নাবস্থায়।

সুষুপ্তি হইতে জাগ্রৎ পুরুষই লীলা করেন। “সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি” সুষুপ্ত যখন স্বপ্নবৎ প্রকাশ পান, তখনই ভাবনা-রাজ্যে এই লীলা। সুপ্ত পুরুষ আপনি আপনি থাকিয়াও আত্মমায়া, আত্মশক্তি লইয়াই সুপ্ত হন। সেই সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রৎ হইয়াই আপন প্রকৃতি লইয়া এই লীলা করেন।

জাগ্রৎ অবস্থায় পুরুষ থাকেন দক্ষিণ চক্ষুতে আর প্রকৃতি থাকেন বাম চক্ষুতে। প্রকৃতির সম্মুখে এই পরিদৃশ্যমান সংসার। প্রকৃতির অবরণীয় রজস্তম অংশ এই সংসারকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া বহুপ্রকারের ক্লেশ অনুভব করে। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতি যদিও রজস্তম প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে একবারে পারে না বলিয়া উহার সহিত জড়িত থাকে, তথাপি কিন্তু ইহা সর্ব্বদা পুরুষের সঙ্গে মিলিতে চায়।

সংসারটা প্রকৃতির ক্লীব স্বামী। সংসারটাই আয়ান ঘোষ।

আয়ান বহু চেষ্টা ক'রে শ্রীরাধিকাকে বক্ষে ধরিতে। শ্রীরাধা জানেন ক্লীব স্বামীর আলিঙ্গনে কোন সুখ নাই। তাই ইনি আয়ানকে, জটিলা-কুটিলাকে লুকাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতে চান। বাম চক্ষে প্রকৃতি আর দক্ষিণ চক্ষে পুরুষ। মধ্যে একটা বালির বাঁধ। নদী সমুদ্রকে দেখে, কিন্তু বালির বাঁধ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে না। প্রকৃতি তাই কাল অপেক্ষা করেন।

যখন কাল সহায়তা করে তখন শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিবার জন্য অভিসার করেন। এ অভিসার হয় ভাবনা-রাজ্যে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই কুঞ্জে গিয়া সঙ্কেত করেন আর শ্রীমতী সেই খানে তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই মিলন হয় স্বপ্নরাজ্যে। তারপরে মিলনের পর মিশ্রণ। ইহা হয় সেই একীভূত প্রজ্ঞানঘন সুষুপ্তিতে। তাহার পরে যে অবস্থা সেখানে কাহারও অস্তিত্ব নাই। যিনি আছেন তিনিই সেখানে আছেন। সে আপনি আপনি ভাব।

শ্রুতি বলিলেন—বাহিরে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আর অতি ভিতরে সেই রসরূপে আপনি আপনি স্থিতি আর মধ্যদেশে এই রসমিলন বা রাসলীলা। সকল প্রকার সাধককেই এই রসমিলনে একবার মিলিত হইতে হয়। ভক্তির রাসলীলা ভিন্ন জ্ঞানের রসমিশ্রণে স্থিতির দ্বিতীয় পথ নাই।

আমরা প্রত্যক্ষ করি কোন প্রকার শোক, কোন প্রকার দুঃখ—কোন জীবই চায় না। সকলেই শোক-শান্তি চায়। সংসারে কখন কি শোক-শান্তি হয়? হয় বৈকি।

দেখা গিয়াছে পুত্রশোকে যিনি নিদারুণ যাতনা পাইতেছেন, তিনিও ঘুমাইয়া পড়েন। আর ঘুমাইয়া পড়িতে পারিলে শোক থাকে না। ঘুমাইয়া পড়াই সাধারণের প্রকৃতি-কৃত শোক-শান্তির উপায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ সংসারের সংস্কার লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে বলিয়া, স্বপ্নেও কখন কখন দুঃখ পায়। আর স্বপ্নও তাহাদের ক্ষণস্থায়ী। সেই জন্য শোক-শান্তিও সাধারণের বড় ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ীকে যিনি

যত দীর্ঘ স্থায়ী করিতে পারেন তিনি ততই শোক-শান্তিকেও দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারেন।

যাঁহারা সাধক তাঁহারাও ঘুমাইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে লইয়া ভাবনা রাজ্যে ঘুমাইয়া পড়েন। শ্রীভগবান্‌কে লইয়া সংসার-রাজ্য ছাড়িয়া স্বপ্নরাজ্যে বড় সুখের স্বপ্নে লীলা করেন। সেই লীলাই এই রাসলীলা।

কোন সাধক এই লীলার সাধনা কালে বলিতেছেন—

তেরে গওনেকা দিন লগিচ আনা,
সোহাগিন্ চেত করোরি।

প্রিয়তমের ঘরে যাইবার দিন নিকট হইয়া আসিল। রে সোহাগিনি! চিত্তকে জাগাও। উঠ উঠ মঙ্গল-গীত গাও। ভজন কর। তোমার সর্ব্ব অঙ্গে মধুর রাগিণী ঝঙ্কার দিতেছে দেখিতেছনা? এই মধুর প্রবাহ স্থির হইয়া দেখ—এই মধুর রাগিণী মন দিয়া শোন। এ রাগিণী এ জগতের নয়। এ জগতে ইহা বাজেনা। তাই বলিতেছি, ভাল করিয়া দেখ—সেখানে দেখিবে চন্দ্র বিনা কুমুদিনী হাসিতেছে। যেখানে সেখানে যন্ত্র বিনা রাগ রাগিণী ভাসিয়াছে। কি জানি কোন্ অমৃতময় পুরুষের জন্য তালে তালে কত সুন্দর গীত উঠিতেছে। কত মূরলী সপ্তস্বরে বাজিতেছে। কত প্রেমের ঝঙ্কার উঠিতেছে। কি রমণীয় সুগন্ধ, শূন্যে শূন্যে এই ঘরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আনন্দের কি অনুপম বীণা বাজিতেছে। কোটি ভানুর মত উজ্জ্বল আবার চন্দ্রকোটি সুশীতল রূপ ধরিয়া রাগ রাগিণী দেখা দিয়াছে। সোহাগিনি! শ্রবণ পাতিয়া শোন। প্রাণবল্লভের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

জাগরী মেরি সুরত সোহাগিন্ জাগরী।

জাগ! আমার প্রেম-সোহাগিনী জাগ। আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই।

যেখানে প্রেমের কথা সেইখানেই এই কথা। সখীর সহিত শ্রীরাধিকার কৃষ্ণানুসন্ধান-চেষ্টা ফলবতী হইল। শ্রীকৃষ্ণ নেত্রপথবর্ত্তী

হইলেন। আহা! এই সজল-জলদ-শ্যাম-অঙ্গ গোপ-তরুণী বিদ্যুতে নিরতিশয় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, বড় চিত্তাকর্ষণকারী হইয়া ভাসিতেছে। আহা! মনোহর কেলি-বিষয়ে ই'হার ঔৎসুক্য যেন অঙ্গ ফুটিয়া বাহির হইতেছে! মর্ম্ম-সখী তাই শ্রীমতীকে দেখিাইয়া দিতেছেন।

মুরারি মারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ

সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্॥

শ্রীমতীর সখী অঙ্গুলী-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেছেন—ঐ দেখ সখি! তোমার চ'ক্ষের সম্মুখে কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? দেখ দেখ কত সুন্দর!

চন্দন-চর্চ্চিত নীল-কলেবর পীত-বসন বনমালী!

কেলিচলম্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগ-স্মিতশালী!

আহা! সখি! নীল-কলেবর চন্দন বিলেপনে কত সুন্দর দেখাইতেছে! শ্রীকৃষ্ণ পীত বসন পরিধান করিয়াছেন আর তাঁহার গলদেশে বনমালা দুলিতেছে! দেখ দেখ কেলিভরে বিচলিত মণিময় কুণ্ডল-মণ্ডিত মৃদুহাস্য ভরিত কপোলদেশ! আহা! কি সুন্দর! কত সুন্দর ভাবে মণিকুণ্ডলের কিরণচ্ছটায় শ্রীকৃষ্ণের হাস্যভরিত কপোলযুগল রঞ্জিত হইতেছে। বিলাসিনি! একবার দেখনা এই বৃন্দাবন-বিপিনে শ্রীহরি কেলিপরায়ণা, হাবভাবসম্পন্না মুগ্ধবধূগণের সহিত বিহার কিরূপ করিতেছেন?

শ্রীমতীর সখী অন্তরাল হইতে শ্রীরাধিকাকে ইহা দেখাইতেছেন আর রাধিকা দেখিতে দেখিতে কি হইয়া যাইতেছেন!

আবার বলি শরতের রাসলীলা ভাবনা-রাজ্যে বসন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থান, কাল সকলি ভাবনা-রাজ্যে। দৃশ্য জগৎ আর চ'ক্ষের উপরে ভাসিতেছে না। ভাবনা রাজ্যে স্মরণে এই রাসলীলা প্রকট হইয়াছে। দর্শনে যাহা ক্ষণস্থায়ী, স্মরণে তাহা চিরস্থায়ী। দর্শনে যাহাতে পলকের ব্যবচ্ছেদ থাকে, স্মরণে তাহা একটানা ভাবে চলিতে থাকে। স্মরণে আর ব্যবচ্ছেদ থাকে না।

শ্রীমতী দেখিতেছেন কেহ প্রবল অনুরাগে কৃষ্ণ-অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া পঞ্চমস্বরে কৃষ্ণের সহিত গান গাহিতেছে; শ্রীকৃষ্ণ বা কাহারও প্রতি আপনার চঞ্চল নয়ন-যুগলের সরস কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে মোহিত করিতেছেন আর ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন-বদন-সরোজম্। কোন নবীনা শ্রীমধুসূদনের বদন-সরোজ কত একাগ্র নয়নে বিলোকন করিতেছে। শ্রীমতী দেখিতেছেন—কেহ শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে কথা কহিবার ছলে অবশ হইয়া কি করিয়া ফেলিতেছে; কেহ বা আদর করিয়া বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে; কেহ বা করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত-কলস্বন-বংশে-রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে। কেহ বা রাসে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে করতালি দিতেছে আর তাহার চঞ্চল বলয় সকলের অভিঘাতজনিত মধুর শব্দ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীধ্বনির সহিত মিলিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার পটুতা দর্শনে কতই প্রশংসা করিতেছেন।

শ্রীরাধিকার সখী দেখাইয়া দিতেছেন আর শ্রীমতী দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ বিভ্রমক্রমে কোন অঙ্গনাকে শ্রীরাধা বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছেন—আর সেই অঙ্গনা অভিমানিনী হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ আবার কতই অনুনয় বিনয় দ্বারা তাহার কোপ অপনয়ন করিতেছেন!

মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার এই শ্রীকৃষ্ণ। ইঁহার বিলাস-রহস্য অতি মনোহর, অতি বিচিত্র। যিনি ইহা হৃদয়ে আনিতে পারেন, তিনিই ধন্য। আর শ্রীজয়দেব বলিতেছেন—শ্রীরাসমণ্ডলে প্রেমমুগ্ধা শ্রীরাধা সকল প্রকার লজ্জা ত্যাগ করিয়া সকলের সমক্ষেই শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আহা নাথ! তোমার বদন-সরোজ কি সুধারাশির আধার?" আর সঙ্গীতের প্রশংসাচ্ছলে সেই মুখকমল চুম্বন করিয়াছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার প্রেমাসক্তি দেখিয়া বড় মধুর হাস্য করিয়াছিলেন—এই শ্রীকৃষ্ণ তোমা দিগকে রক্ষা করুন।

পূর্ব্বকথা।

"পুনঃ দেখা দিব" বলে,
সেই যে চলিয়া গেলে ;
পাষাণে যে পড়ে দাগ যায় কি মুছিয়া ?
যে কথা গিয়েছ বলে ;—
ভেবেছ কি গেছি ভুলে ?
হোক্ সে অণুর অনু বালিকার হিয়া।
কিশোর কোমল প্রাণে
তুমি ভরেছিলে দানে ;
বিশ্বে চাহি বিলাইতে তোমারি রহিয়া।
কেন সে অতীতে ডাকা ?
রয়েচে যা থাক্ ঢাকা।
মুছায়ে দিতেছ আঁখি পড়িছে ঝরিয়া।
"তোমারে ছুঁইয়া রহে
নিশ্বাসে মলয় বহে
তোমার তোমারি আছে যায়নি মরিয়া।
মুছাতে হৃদয় ব্যথা,
শুনালে মধুর কথা ;
তুমিই সাজালে কবি মরমে মথিয়া।
সান্ত বলি হৃদিহারে—
গিয়েছিনু ধরিবারে,
অনন্ত আকাশ ব্যাপি দাঁড়ালে ছাইয়া ;
নিমেষে ভাঙালে ভুল
হারায়ে পেলাম কুল
"আমার আমারি আছ যাওনি ফেলিয়া"

নয়ন ভৃঙ্গার ভরি
চরণ ধোবার বারি
রেখেছি মালিকা গাঁথি প্রীতি-ফুলে রচিয়া।
কত কথা বলি নাই
সে বলা ফুরাতে চাই
মিটিবে কি সেবা সাধ চরণে লুটিয়া ?

২০।৭

অনুষ্ঠানতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নলদেহে কলি প্রবিষ্ট হইয়া নলের বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়া দিল, পাপ হৃদয়ে প্রবেশ করিলে বুদ্ধি ভ্রংশ ত হবেই। ভ্রাতার সহিত কপট অক্ষ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্য সম্পদ হারাইয়া নল বনবাসী হইতে বাধ্য হইলেন, পাপবান্ ব্যক্তির ধন সম্পৎ উত্তপ্ত পাষাণে পতিত জল-বিন্দুর ন্যায় নিমিষে অন্তর্হিত হয়। নল বনবাসী হইলে কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার ন্যায় সহধর্ম্মিণী দময়ন্তী স্বামীর সহিত বনে গেলেন ও নানারূপ প্রবোধ বাক্যে স্বামীকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, উভয়ের পরিধানে মাত্র দুইখানি বসন ছিল। বনমধ্যে মায়া-স্বর্ণ-বিহঙ্গম ধরিতে যাইয়া নল স্বীয় পরিধেয় বসনখানি পর্য্যন্ত হারাইলেন, হৃদয়ে পাপ প্রশ্রয় পাইলে কুৎসিতকে সুন্দর, বেশ্যাকে দেবী, অরিকে মিত্র, অসম্ভবকে সম্ভব, বলিয়া বোধ হয়, সদুপদেশ তখন "আবল তাবল" বাক্য বলিয়া জ্ঞান হয় তাই দময়ন্তীর নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মায়া-বিহঙ্গম ধরিতে যাইয়া নিষধাধিপতি আজ পরিধেয় বসন খানি পর্য্যন্ত হারাইয়া দময়ন্তীর বসনার্দ্ধে লজ্জা নিবারণ

করিতে বাধ্য হইলেন। পাপবানের সাড় কিছুতেই হয় না,এততেও নলের সাঁড় নাই, এখনও মনে ইচ্ছা জাগিতে লাগিল দময়ন্তীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে কারণ দময়ন্তী আমার সঙ্গে থাকিলে নানাবিধ যাতনা পাইবে। তাই নল আজ সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ছলে পুণ্যময় সংসর্গ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা পাপবানের সর্ব্বদাই হয়, কারণ পুণ্যময় সংসর্গ তাহার বিষের মত জ্ঞান হয়। পথশ্রান্তা দময়ন্তী নল-ক্রোড়ে নিদ্রিতা হইলে সেই সুযোগে তাহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া একটী বাধা নল লক্ষ্য করিলেন, বাধা এই এক বসন উভয়ের পরিধানে; অস্ত্রাদিও নাই যে কৌশলে বসন ছেদন করিয়া পলায়ন করেন। পাপপথের অনেক সুযোগ, পাপবান্ যখন যে বিঘ্ন অনুভব করে স্বয়ং পাপ তাহার সে বিঘ্ন সযতনে দূর করে, তাই কলি প্রেরিত অস্ত্র বনমধ্যে পাইলেন, কোথা হইতে আসিল, কে দিল এসব চিন্তা নলের মনেও তখন উদয় হইল না, কোনও পাপবান্ অসৎ ও সর্ব্বনাশকর পথে যাইবার সময় এ চিন্তা করেও না। নিদ্রিতা দময়ন্তীকে নিরাশ্রয়া রাখিয়া নল পাপীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সুযোগ দিবার জন্যই যেন গহন বনে প্রবেশ করিলেন। জ্ঞান আজ বিচারশক্তি হারা হইল। নিদ্রোত্থিতা দময়ন্তী সম্মুখে পতিকে না দেখিতে পাইয়া বাণবিদ্ধা বিহঙ্গিণীর মত কাতরস্বরে ক্রন্দন ও চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক অজাগর সর্পের কবলে পড়িয়া অধিকতর আর্ত্তনাদ করিলে এক ব্যাধ ত্বরিত পদে আসিয়া সর্পের প্রাণ সংহার করিয়া দময়ন্তীর প্রাণ বাঁচাইয়া দময়ন্তীর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যোগী হইলে সতী ক্রোধা-নলে ভস্মীভূত হইল, পতঙ্গ অগ্নিশিখায় পড়িয়া প্রাণ হারাইল। বহু অনুসন্ধানেও নলের কোনরূপ সন্ধান না পাওয়ায়, একাকিনী অসহায়া বনেও থাকা নিরাপদ নহে এই বিবেচনা করিয়া কতিপয় বণিকের সাহায্যে দময়ন্তী চেদীরাজ্যে গিয়া রাজতনয়া সুনন্দার সখী হইয়া মূর্ত্তিমতী বিরহিণীরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও মনে মনে শাঁপ দিলেন, যে পাপ হৃদয়ে প্রবেশ করায় দেবোপম আমার স্বামী নানাবিধ

যাতনা পাইতেছেন, সেই আমার স্বামি-হৃদয়স্থিত পাপ দিবানিশি আশী-বিষের জ্বালায় দগ্ধ হউক। এদিকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে নল দেখিলেন এক স্থানে দাবাগ্নি জ্বলিতেছে, শুনিলেন কে আর্ত্তনাদ করিতেছে "কে আছ কোথায় রক্ষা কর"। ত্বরিত পদে যাইয়া সেই ভীষণ দাবানলের কবল হইতে এক সর্পের প্রাণ রক্ষা করিলেন, সর্প নলদেহে দংশন করিল দেখিতে দেখিতে নল বিরূপ হইলেন, তখন সর্প বলিল, মহারাজ! আপনার হিতের জন্যই আপনাকে দংশন করিলাম, বিরূপ হওয়ায় কেহ আপনাকে চিনিতে পারিবে না আপনি বাহুক পরিচয়ে অযোধ্যা অধিপতি ঋতুপর্ণ রাজার নিকট থাকিয়া অবশেষে তাঁহার সকাশে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভ্রাতাকে অক্ষ ক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া রাজ্য সম্পৎ পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এই যুগ্ম বসন গ্রহণ করুণ যখনই ধারণ করিবেন তখনই পূর্ব্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, আরও আপনার দেহস্থিত পাপ দিবানিশি আশীবিষের জ্বালায় দগ্ধ হইবে ইহাই সতীর শাঁপ। আমি কর্কোটক নামক নাগকুলের অন্যতম, নারদ-শাঁপে আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, আপনার দর্শন পাইয়া উদ্ধার হইলাম, এই বলিয়া সর্প বিদায় গ্রহণ করিলে, অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ সকাশে নল যাইয়া বাহুক পরিচয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভরাজ ভীম, কন্যা ও জামাতার সন্ধানে দেশ বিদেশে চর প্রেরণ করিলেন, চরমুখে সংবাদ জ্ঞাত হইয়া চেদী রাজ্য হইতে স্বীয় কন্যা দময়ন্তীকে স্বভবনে আনাইলেন, কিন্তু জামাতার কোনও সন্ধান পাইলেন না। দময়ন্তী বড়ই বিষাদিনী। অবশেষে দময়ন্তীর আদেশ মত চরগণ দেশ বিদেশে এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল "নিরাশ্রয়া সহধর্ম্মিণীকে বিজন বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া কি স্বামীর কর্ত্তব্য? যাইবার সময় একবারও ভাবা উচিত ছিল না যে আমি গেলে এ অনাথিনীর কি দশা হইতে পারে?" এক ব্রাহ্মণ অযোধ্যা দেশে একথা বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন; বাহুক শুনিল, নির্জ্জনে ব্রাহ্মণকে পাইয়া বলিল, "সে স্বেচ্ছায় এ কার্য্য করে নাই, স্বেচ্ছায় কে কবে পতিপ্রাণাকে

পরিত্যাগ করে ? সে হৃদয়স্থিত পাপ কলির প্রতারণায় এরূপ কার্য্য করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া পতিপ্রাণার আশ্বস্ত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ বাহুকের কথা দময়ন্তীর নিকট জানাইল, সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তি একখণ্ড কাষ্ঠ খণ্ড পাইলেও তাহার সাহায্যে তীরে আসিতে চেষ্টা করে, এতদিনের পর দময়ন্তী একটী সূত্র পাইলেন। মায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ছল করিয়া নলকে আনিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে তিনিই আমার সেই আরাধ্য দেবতা কি না ? যদি তিনি আমার দেবতা হন, দেব বরে তিনি বিনা অগ্নির সাহায্যে রন্ধন করিতে পারিবেন ও অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ এই বহু যোজন পথ তিনি একদিনের মধ্যে আসিতে পারিবেন। এই সকল আলোচনা করিয়া গোপনে অযোধ্যাপতির সকাশে এমন ভাবে একখানি পত্র লিখিলেন যে যাহা পড়িয়া ঋতুপর্ণ বুঝিবেন "কাল দময়ন্তীর পুনঃ সয়ম্বর"। পত্র পাইয়া "দময়ন্তী লাভ আশে ঋতুপর্ণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন কিন্তু এক মহা বিপদ্। কাল সয়ম্বর, একদিনে এ সুদীর্ঘ পথ কিরূপে যাইবেন ? বাহুক সব শুনিল। একবার দময়ন্তী দেখিবার জন্য প্রাণে বড়ই আকাঙ্ক্ষা জাগিল, বাহুক ঋতুপর্ণ রাজার নিকট আসিয়া বলিল, মহারাজ! আমি কল্য প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই আপনাকে বিদর্ভে পৌছাইয়া দিব রথে আরোহণ করুণ। নক্ষত্র বেগে রথ ছুটিল, রথবেগ দেখিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট। পথিমধ্যে স্বীয় অক্ষবিদ্যার পরিবর্ত্তে তাহার নিকট রথচালনা বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। আর বিষের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণপুরুষ কলি নল দেহ হইতে নির্গত হইয়া করজোড়ে বলিল—মহারাজ! আপনাকে কষ্ট দিবার মানসে আপনার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমি দিবানিশি আশীবিষের জ্বালায় জ্বলিয়াছি, ও হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি সাধকের কাছে আমার প্রভাব অতিক্ষীণ, আপনি সেই পুণ্যবতীর উদ্দেশ্যে যাইতেছেন আমার সাধ্য নাই যে আর আপনার দেহে থাকি, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি আমাকে মার্জ্জনা করুণ, আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—অনুষ্ঠানহারা অবিশ্বাসী দুষ্কার্য্যশীল ব্যক্তির

কাছেই আমার "হাঁকা ডুকা, যে আপনার এই উপাখ্যান প্রত্যহ স্মরণ করিবে তাহার কাছেও আমার প্রভাব কমিয়া আসিবে। কলি বিদায় গ্রহণ করিল। ঋতুপর্ণ রাজা বিদর্ভ রাজ্যে গিয়া দেখিলেন স্বয়ম্বরের কোনই আয়োজন নাই, তাই তিনি বিদর্ভরাজকে বলিলেন আপনাকে বহুদিন দেখি নাই তাই একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি ও মনে মনে ভাবিলেন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে একটা গুপ্ত রহস্য আছে। সখীদ্বারা নানারূপে দময়ন্তী নলকে পরীক্ষা করিলেন, নল পরীক্ষাত্তীর্ণ হইয়া কর্কোটক দত্ত সেই যুগ্মবসন পরিধান করিয়া পূর্ব্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন! সকল সন্দেহ নাশ হইল। তৃষিতা চাতকিনী বহুদিন পরে নবনীরদের শীতল বারি পাইয়া কৃতার্থা হইল। বহুদিন পরে স্বামী পদ বক্ষে ধারণ করিয়া দময়ন্তী আজ আনন্দ সাগরে মগ্ন। ঋতুপর্ণের কৌতুহল চরিতার্থ হইল। রাজ্যময় আনন্দের উৎস ছুটিল, স্বর্গে দেবদুন্দভি বাজিল, দুন্দুভি যেন বলিল হে ভ্রান্ত জীব কলি আক্রমণ করিলে প্রতীকার করা অসম্ভব ভাবিয়া পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দুস্তর নরকে গিয়া "ডুল্‌জার" করিও না। পাপের বিরুদ্ধে সাধনা লইয়া দণ্ডায়মান হইও। এই ঘটনার পত্র, প্রশাখা, মুল স্বরূপ কর্কোটক নাগ ঋতুপর্ণ রাজা দময়ন্তী ও নল।

প্রতি প্রভাতে তাঁহাদের স্মরণ করিলে সাধকের প্রতাপ মনে পড়িবে কলি ব্যাধির ঔষধ পাইবে তাই শাস্ত্রকারগণ প্রতি প্রভাতে স্মরণ করিতে বলেন—

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥

ভাটপাড়া,—শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ।

—০—

অভিমান।

সবাই বলে আমিতে অভিমানটাই সকল দুঃখের কারণ। আমি জিজ্ঞাসা করি তাই কি? অভিমান কি সুখ দেয় না?

মানুষ ত সব রকম অভিমান করিতে পারে। মানুষের ভিতরের তিন রকমের জিনিষে মানুষ অভিমান করিতে পারে। মানুষ আপনার রজস্তম রূপিণী বহিঃসঞ্চারিণী প্রবৃত্তিতে অভিমান করিতে পারে আবার শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপিণী অন্তঃপ্রবাহিনী নিবৃত্তিতেও অভিমান করিতে পারে আবার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া আপনার চৈতন্যে আপনার নিঃসঙ্গ স্বরূপেও অভিমান করিতে পারে। এই তিন প্রকার অভিমানের ভিতরে আরও দুই প্রকার অভিমান পাওয়া যায়। রজস্তম প্রবৃত্তির অভিমানকেও রাজসিক ও তামসিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতেও দেখা যায় আবার চৈতন্য অভিমানকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্রষ্টাভাবে ও রাখা যায় আর দ্রষ্টৃস্বরূপেও রাখা যায়।

এই অভিমান করিবার স্বাধীনতা একমাত্র মানুষেরই আছে অন্য জীবে নাই। মানুষের মধ্যে আবার যাহারা সাধক তাহাদেরই ইহা আয়ত্ব হয়—সাধারণ মানুষ এই অভিমানকে ইচ্ছামত নানা স্থানে রাখিতে পারে না।

যখন মানুষ প্রবৃত্তি প্রকৃতিতে অভিমান করে তখন বড় দুঃখ পায়। যখন নিবৃত্তি প্রকৃতিতে অভিমান করে তখন শ্রীভগবানকে লইয়া মানুষ বড় আনন্দে থাকে। এই অবস্থায় মানুষ শ্রীভগবানের উপর মান অভিমান সবই পারে। এইটি ভক্তিপথ। আবার যখন শুদ্ধ চৈতন্যে অভিমান করে তখন মানুষ প্রকৃতির স্বামী হইতে পারে। তখনই দুঃখ নিবৃত্তি চিরতরে হয়। ইতি

—•—

কথা।

বন্ধু।

একদা একজন তাঁহার কোন প্রিয়তম বন্ধুর বাড়া গিয়া তাহার দ্বারে করাঘাত করিল। তাঁহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। ভিতর হইতে বন্ধুটি বলিলেন—"কে তুমি ?" অভ্যাগত বন্ধু উত্তর দিলেন—"আমি"। বন্ধু উত্তর শুনিয়া বলিলেন—"এখানে প্রবেশ করিতে পাইবে না। এই উৎসববাসরে কাঁচা দ্রব্যের স্থান নাই ; এখানে সমস্তই সুসিদ্ধ ও সুপক্ক দ্রব্য। বিরহ-বিচ্ছেদাগ্নি ভিন্ন কিছুতেই কাঁচা, সুসিদ্ধ ও সুপক্ক হইবে না ও তাহার কৃত্রিমতা নষ্ট হইবে না। যখন তোমার "আমিত্ব" এখনও লোপ পায় নাই—তখন তোমাকে প্রচণ্ড অগ্নিতাপে দগ্ধ হইতে হইবে।" গরীব বেচারী চলিয়া গেল ; একটী বৎসর ধরিয়া বন্ধু বিরহে পুড়িতে পুড়িতে মনোদুঃখে, পথে পথে ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া গলিয়া গেল। অনন্তর তিনি আবার সেই প্রিয়তম বন্ধুর বাটীতে গিয়া পাছে তাঁহার মুখ হইতে কোন অনবহিত বাক্য বাহির হয়, এই ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারে করাঘাত করিলেন। দ্বারে করাঘাত শব্দ শুনিয়াই বন্ধু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"কে দ্বারে দাঁড়াইয়া ?" তিনি উত্তর করিলেন—"প্রিয়তম, তুমিই দ্বারে দাঁড়াইয়া"। তখন তাঁহার বন্ধু তাহা শুনিয়া বলিলেন—"আমি ? তবে আমাকে ভিতরে আসিতে দাও।" এক বাড়ীতে দুইটি "আমি"র থাকিবার স্থান নাই। তাই তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

—o—

নাম ডাকান।

অন্যে নাম ডাকিবে সেই সময়ে ; কিন্তু এই সময় হইতে আপনার নাম আপনি ডাকিয়া যাও না। নাম এখন হইতে শোনাও শেষ সময়ে বড় সুবিধা হইবে। শ্রুতিতে কলিসন্তারণ জন্য নাম দেওয়া হইয়াছে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

অধুনা সমাজে নাম ডাকান হয়

ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।

কখন কখন প্রথমের প্রণবটি জাতিবিশেষে বাদ দিয়া গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্মের পরে ইষ্ট দেবতার নাম যুক্ত করিয়া নাম ডাকান হয়।

সে সময়ের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখন হইতেই আথালি পাথালি নাম ডাকাও। শোনাও না হরে রাম হইতে নারায়ণ ব্রহ্ম জয় কালী বা জয় দুর্গা বা জয় জগদ্ধাত্রী বা জয় সীতারাম বা জয় অন্নপূর্ণা বা জয় শিবরাম বা জয় হর হর মহাদেব।

লোকে ডাকিবে সে সময়ে ; সে ত ভাল। কিন্তু যদি তখন কেহ না ডাকে ? যদি এমন স্থানে দেহ ছুটিয়া যায় যেখানে তোমার কাছে তোমার শেষ দরদী কেহ না থাকে তবে বল কি হইবে ? তাই বলি আপনাকে আপনি এখন হইতে নাম শুনাও। সেই দিনের জন্য অপেক্ষা আর করিও না। এখন হইতে কাজ সারিয়া রাখ।

এ কথায় হাসিলে কি হইবে ? মরিবেই ত। তেমন কাজ কৈ করিলে যে প্রাণের উৎক্রমণ আর হইবে না ? তেমন কাজ কৈ করিতেছ যাহাতে সর্ব্বদা আপনার ঘরে সর্ব্বদা তাহাকে লইয়া আছ ? ব্যবহারিক জগতে একবারও ভুল হইতেছে না ? সব দেখিয়াও কিছু দেখনা তারেই দেখ ? নিন্দাতে বা স্তুতিতে সেই একজনকেই ভাবিতে পার কৈ ? স্বরূপে কুরূপে সেই এককেই দেখা অভ্যাস হইল কি ? পাপের পুণ্যের দৃশ্যে সেই এককেই দেখিয়া পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ আর চক্ষে ঠেকে না, ইহা হইল কৈ ? পাখীর রবে আর পশুর রবে সেই একই কথা কহিতেছে সর্ব্বদা মনে থাকে কৈ ? সব বৈখরীই সেই পরা ইহা স্মরণ থাকে কৈ ? আকাশ দেখিয়া, সমুদ্র দেখিয়া, বায়ুর শব্দ শুনিয়া বা স্পর্শ পাইয়া বা অগ্নির রূপ দেখিয়া তারে মনে পড়ে কৈ ? কুমারী যুবতী বৃদ্ধা দেখিয়া বা কুমার যুবক বৃদ্ধ দেখিয়া বা জীর্ণ দণ্ড

দেখিয়া তারে মনে পড়ে কৈ ? এ যদি না হয় তবে তুমি ভক্ত হইলে কিরূপে ? সর্ব্বদা কৃষ্ণ ভাবনা যাহার অভ্যস্ত না হইয়াছে তাহার যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ইহা কি হয় ? সর্ব্বদা ব্রহ্ম ভাবনা যাহার না হয় তার কি কখন হয় "যত্র যত্র মনো যাতি" যেখানে যেখানে মন যাইবে সেই সেই খানে ব্রহ্ম দর্শন হইবে ? না যিনি ব্রহ্মকে ভাল করিয়া ধারণা না করিয়াছেন তিনি বলিতে পারেন

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কি দীনং ইব ধাবসি।

সাগরে যেমন তরঙ্গ সেই চৈতন্যেই এই জগৎ স্ফুরিত হইতেছে। চৈতন্য ভিন্ন ইহা কিছুই নয়। সেই চৈতন্যই আমি এইটি জান। দীনের মত এখানে ওখানে ছুটিলে কি হইবে ? ঋষিগণের উপদেশ

হরো যদ্যুপদেষ্টাতে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে॥

হর হরি ব্রহ্মা যদি তোমার উপদেষ্টা হয়েন তথাপি তুমি সুস্থ কিছুতেই হইতে পারিবে না যতক্ষণ না তুমি এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্তই ভুলিতে পারিতেছ।

আমি মুক্ত আমি মুক্ত মুখে এই চীৎকার করিলেই কি মুক্ত হইবে ? দেখ শাস্ত্র সাধকদিগের সম্বন্ধেও কোন্ কথা বলেন ? সত্য সত্য যাহারা যোগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী তাঁহাদিগকেও শাস্ত্র ছাড়েন না তুমি ত মুখে যোগী, গল্পের জ্ঞানী আর উপকথার ভক্ত ও কর্ম্মী তোমার কথা কি বল ? শাস্ত্র বলেন

যোগী দেহাভিমানী স্যাৎ ভোগী কর্ম্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিমান্যেব তত্ত্বজ্ঞে নাভিমানিতা॥

যোগী দেহে অভিমান রাখেন; ভোগী কর্ম্মতৎপর আর জ্ঞানী করেন মোক্ষে অভিমান কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিমান ত্যাগ হয় না। তুমি অন্ততঃ সৎ বিষয়ে অভিমানটা রাখ তবে অসৎ অভিমান ত্যাগ করিতে পারিবে।

তাই বলিতেছি বড় বড় কথা ছাড়। মনে কর—সর্ব্বদা মনে ভাব তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। সর্ব্বদা ভাব তেরে শিরপর যম খাড়া হ্যায়। শাস্ত্রও ত তাই বলেন "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"। ধর্ম্ম আচরণই যদি করা সাব্যস্থ কর তবে যমে তোমার চুলের ঝুঁটি ধরিয়াছে এইটি সর্ব্বদা মনে রাখ। তবেই বুঝিবে সর্ব্বদা তুমি মৃত্যু শয্যায়। কাজেই নাম শুনাও। আপনাকে আপনি মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত নাম শুনাইয়া যাও।

"মরণে মৎ স্মৃতিং লভেৎ" মরণে আমার স্মৃতি জাগিবে শ্রীভগবান্ এই যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা কার হয় জান? যে সর্ব্বদা তার অনুভব লইয়া থাকিতে চেষ্টা করে তারই ইহা হয়। অনুভব নাই স্মরণ হইবে কি মুখের কথায়? এর মধ্যেও আত্মপ্রতারণা আছে। সে যে তোমার দেহে, সে যে সর্ব্ব দেহে, সে যে স্থাবরে জঙ্গমে, সেই যে ক্ষিতি মূর্ত্তি, অপ্ মূর্ত্তি, তেজ মূর্ত্তি, মরুৎ মূর্ত্তি, ব্যোম মূর্ত্তি, সেই যে সূর্য্য মূর্ত্তি, চন্দ্র মূর্ত্তি, সর্ব্ব মূর্ত্তি, সে যে প্রাণমূর্ত্তি বাক্যমূর্ত্তি—এই ভাবটি অন্ততঃ বিশ্বাস কর, করিয়া তাহাকে একটু বুঝিতেও চেষ্টা কর। বুঝিয়া ব্যবহারিক জগতে সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্ব বাক্যে সর্ব্ব ভাবনায় সর্ব্ব মূর্ত্তিতে তারে স্মরণ কর আর নিত্যকর্ম্মে তারে ভজ আর যখন তখন আথালি পাথালি তারই নাম মরণশয্যায় শায়িত তোমার অবরণীয় মনকে শুনাও বড় ভাল হইবে। গতি লাগিবে। ইতি।

তোমার সেবা।

"দেখ, কত কথাই ত তোমায় জানাইতে আসি, তুমি শুন বা না শুন আমি তোমায় জানাইয়া সুখ পাই। বল, আমার আর কে আছে? শুনি বাক্য দ্বারাও তোমার সেবা হয়। তুমি বলিয়াছ—"দেবতার উদ্দেশে যে দ্রব্য ত্যাগ তাহাই পূজা, তাহাকেই কর্ম্ম সংজ্ঞা

দেওয়া হয়"। এই কর্ম্ম দ্বারাই তোমার পূজা হয়। তোমার ভাবনা, তোমার উদ্দ্যেশে বাক্য প্রয়োগ, তোমার জন্য কর্ম্ম করা ইহা দ্বারাই ত তোমার সেবা হয়? বল, আমার ভাবনা, আমার বাক্য আমার কর্ম্ম কি করিয়া তোমাতে অর্পিত হইবে? তুমি আনন্দ-স্বরূপ চির-প্রসন্নময় তথাপি আমার সাধ যায় আমি কর্ম্ম দ্বারা তোমায় প্রসন্ন করি। বল, এ সাধ কি আমার পূর্ণ হইবে? আমার সর্ব্বকর্ম্ম কবে তোমাতে অর্পিত হইবে? কবে আমার সেবার সাধ পূর্ণ করিবে? তুমি কি আমার সকল কথা শুন? শুনি তুমি "মহতো মহীয়ান্" আর আমি দীনের দীন কত ক্ষুদ্র কতটুকু, স্বরূপে তুমিই সব, নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্র, সৃষ্টি সম্পর্ক বিহীন, সকল গুণ রহিত নির্গুণ ব্রহ্ম, তটস্থে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা স্বগুণ ব্রহ্ম, এবং সৃষ্টি বিপর্য্যয়ে অবতার, আবার প্রতি দেহ গেহে তুমিই আত্মা আর আমি—আমি কি তোমারই নয়? তুমি অন্তর্যামী, তুমি "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং"—সকল ভূতের সখা; বিশেষ তুমি আমার আমার প্রাণের প্রাণ, আমার আত্মা, সখা, গুরু, দয়িত, আমার হৃদয়ের রাজা আমি তোমার নিকট হৃদয় খুলিয়া বড় সুখ পাই। আমার সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা তুমি, তোমাকে জানাইয়া, তোমাকে দেখাইয়া, তোমার প্রীতির জন্য তোমার আজ্ঞা ক্রমে যখন কর্ম্ম হয় বল, সে কর্ম্ম কি তোমাতে অর্পিত হয় না? তুমি কি দেখ না? অনন্ত আকাশভরা তোমার দৃষ্টি, তোমার দৃষ্টি হইতে আমিত কোথাও লুকাইতে পারি না। বাহিরের দেখা বন্ধ করিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলে অন্তরে তোমার দৃষ্টি যেন আরো ঘন হইয়া ফুটিয়া উঠে। কোনও অনাদি কালের কর্ম্মসমষ্টি যেন এই জীব দেহ ধারণ করিয়াছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জীবকে কতই কর্ম্ম করিতে হয়, প্রতি কর্ম্মের আদিতে যদি তোমার স্মরণ হয় তবে কর্ম্মটী গৌণ এবং তোমার স্মরণটী মুখ্য হয়। আর তোমার স্মরণের পবিত্রতা যেন কর্ম্ম করিবার কেন্দ্র এই চিত্তটাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া পরিষ্কৃত করিয়া সকল মোহজাল সরাইয়া তোমার করিয়া লয়।

তোমাকে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করা কি এতই কঠিন? জগৎজীব তোমাতে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু তুমিত কাহারও সহিত জড়িত হও না। তুমি আপন স্বভাব হইতে কখন বিচ্যুত হও না। তোমার স্বভাবটী ধরিতে পারিলে স্ব স্ব ভাবে থাকিয়া কর্ম্ম করা কিরূপ তাহা অনুভব হয়। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ ত কিছুতেই থাকে না, পূর্ব্বাভ্যাসে বার বার ভুল হইয়া গেলেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলে তুমি আসিয়া সকল অপরাধ মুছাইয়া দাও। কখনও বা ভুলিতে গিয়াও ভুলিতে দাও না নিজে আসিয়া ডাক; যেন যত দায় ভার তোমার, আমার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, কে তোমায় এত সাধিয়াছিল? এত ঋণে ঋণী আছ কাহার নিকট? যে জন্ম জন্ম ধরিয়া সকল ভার বহিয়া আসিলে তবু শুধিলনা ধার। সোনার অঙ্গ ধুলায় লুটাইয়াছ কত কাঁদিয়া মাটি ভিজাইয়াছ, তোমার রঙ্গ বুঝা ভার। তোমার কথা যতই শুনি ততই অবাক হইয়া ও বিচিত্র রঙ্গের চরিত্রধ্যানে আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলি। তাইত জিজ্ঞাসা করি কি তুমি, কেমন তুমি, তোমায় আমি কেমন করিয়া পাইব? কত সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দাও, তবু আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, অথবা কি বুঝিলাম বলিতে পারি না। তোমার চরিত্র বেদের অগম্য। কত করুণা করিয়া কত মধুর কণ্ঠে ডাক, তোমার ব্যাকুলতা আমার প্রাণে বিন্দুর মাঝে সিন্ধু বহাইয়া আনে। আমি অণুর অণু তোমারি চরণ রেণু। কেন আমার জন্য অত ব্যাকুল হও? তোমার আদরে হাঁসিয়া কাঁদিয়া বলা কি হয় না,—"কেন এত ডাকাডাকি, তোমারি ত আছি। এতটুকুও সহিতে পার না? দেখি সত্যই তাই, আমার একটু ব্যাভিচার দেখিলে তুমি কত ব্যাথিত হও; এত কষ্ট ত আর কাহারো হয় না। তোমার ছল ছল নয়নের করুণা পূর্ণ দৃষ্টি আমায় বড় ব্যাকুল করিয়া দেয় আমায় যে স্থির হইতে দেয় না। বর্ত্তমান কোথায় হারাইয়া যায়, জাগ্রত স্বপ্নে পরিণত হয়, আর স্বপ্নই জাগ্রত রূপে ভাসিয়া উঠে। আহা! কবে এই ক্ষণমুহূর্ত্ত মহামুহূর্ত্তে পরিণত হইবে? পুরা-

কালের সেই চির-নূতন দৃশ্য, কত কবিত্ব পরিপূর্ণ কত মাধুর্য্যের চিত্র স্বর্ণ তুলিকায় মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই শান্ত স্নিগ্ধ সকল জন্তু বিবর্জ্জিত উপেক্ষিত পবিত্র তপোবন, গৌতম বধূর পাষাণ দেহ সর্ব্বলোক লোচনের বহির্ভূত হইয়া, শীতবাতাতপ সব সহ্য করিয়া কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ সেই লোচন অভিরাম তনুঘন শ্যাম রামাভিরামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শোভিত "যোগীন্দ্র মানস মধুব্রত সেব্যমান্" শীতলচরণের কোমল স্পর্শানুভব, সেই নব জলধরের স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠের আশ্বাসবাণী "রামোঽহমিতি" আমায় কোন স্বপ্ন জগতে লইয়া যায় কে জানে? একে একে চিত্রপটের পরিবর্ত্তনের ন্যায় তোমার মধুর লীলার কত চিত্র নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তখন ত আর আড়াল থাকে না, তখন আর তোমার সম্বন্ধে অন্তর বাহির কি? সর্ব্বত্রে তোমার প্রকাশ কি ঘনীভূত হইয়া উঠে না? উছল নদীতে বান ডাকিতে থাকে, না আসিয়া থাকিতে পার কি তুমি? এমন করিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া প্রাণের হাসি ফুটাইয়া বক্ষের গুরুভার নামাইতে আর ত কেহই পারে না। নুপুর শোভিত স্নিগ্ধ চরণ-কমল-পরাগ স্পর্শে চিত্ত-কমল মুকুলিত হইয়া উঠে, তোমার ভালবাসা তোমার অন্তর্জ্যোতি ভাসিত রমণীয় মূর্ত্তিকে অঙ্গরাগ করিয়া বড় সুন্দর সাজাইয়া তোলে। শত সাধ ভরা নয়নের মধুর দৃষ্টি সেই নয়নে নয়নাবদ্ধ নবীন কিশোর কিশোরীর নব জলধর জড়িত বিজলীর মিলনাভিসার; বিদায় মুহূর্ত্তের সেই করুণ কণ্ঠের বিদায় বাণী যেন

ছল ছল আঁখি জলে কত কথা গেল বলে;
মিনতি নয়নে দুটী করে কর ধরিয়া;
"যেতে হবে" বাণী মোর পরাণে বিঁধিয়া॥

কিন্তু মিনতি করি আর আমায় বলিতে বলিও না, কি যেন কি তোমাতে আছে সকল কথা না বলিয়াও বাঁচি না। কিন্তু রমণী হৃদয়ের গুপ্ত কথা সে যে অন্তঃশীলা ফল্গুর মতন। কেন বলত ফুটাইতে চাও?

প্রকাশে কি সুখ পাও? তুমি যে অন্তরের ধন তাই গোপন পূজায় আমার বড় আনন্দ হয়। বাহিরে যে বড় ধুলা, কাদা, ঝড়, জল, তাই বাহিরের মলিনতা হইতে সর্ব্বদাই লুকাইয়া রাখিতে চাই। আহা! অন্তর চেরা বড় যে প্রিয় ধন, তার বিরুদ্ধে এতটুকু কথাও যে প্রাণে সয় না। তুমি ত অন্তরযামী! সবই ত জান, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার অন্তরের ধন! আমার অন্তরের কোন্ গুপ্ত স্থলে থাকিয়া তুমি আমার সকল কথা শোন বল ত? যখন একান্তে বসিয়া মানসে শুভ্র মালতী পুষ্পের মালা গাঁথিয়া হৃদয়-চন্দনে সুরভিত করিয়া তোমার অপেক্ষায় তোমার চাওয়া অভ্যাস করি প্রতি নিমিষে যখন বৎসর কাটিতে থাকে—"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপয়ানম্"। না থাক্। তখনকার কথা আর বলা গেল না। তোমার গুণ তোমার কর্ম্ম চিন্তার রস যে একবার পাইয়াছে সে কি এ অমৃতের আস্বাদন কখনও ছাড়িতে পারে? কি আর বলিব তোমায় আমি, তুমি প্রসন্ন হও। এ জ্বলিত মস্তক আর ত কোথাও রাখিয়া জুড়াইতে পারি না। তোমার ঐ চন্দ্রকোটী সুশীতল চরণতলে মস্তক লুণ্ঠন করিতে করিতে যেন চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যাই। তোমার বিচিত্র জন্ম কর্ম্ম তোমাররূপ, তোমার গুণ, তোমার লীলা তোমার বিশ্বরূপ, তোমার স্বরূপ স্মরণ আমায় এমন করিয়া করাইয়া লও যেন আমি চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়া যাই। তুমি আসিয়া আমায় প্রাপ্ত হও তবেই আমি তোমায় পাইব। এস! এস! আমার দয়িত, আমার বল্লভ, আমার "গতি ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" আমার সকল সাধের সমষ্টি, সর্ব্বজন বরণীয়, হে সর্ব্বভাব প্রসবিতা দ্যুলোকের ধারয়িতা; আমার যাইবার যোগ্যতা নাই তুমি এস! পরিশ্রান্ত ধেনুকুল যেমন গ্রামকে প্রাপ্ত হয়, স্বামী যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হন, যোদ্ধা যেমন আপন প্রিয়তম অশ্বকে প্রাপ্ত হয়, দুগ্ধবতী গাভী যেমন আপন বৎসকে প্রাপ্ত হয় তুমি তেমনি আমায় প্রাপ্ত হও। এ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিবার আরত কেহই নাই, আমি আর কাহার

কাছে যাইব ? তুমি সব ছাড়িয়া তোমায় ভজিতে বলিয়াছ, আমি বড় কর্ম্ম দুরাচার আমি ত তা পারি না। আমার কর্ম্ম আমায় তোমার সঙ্গসুখ হইতে তোমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে চায়। তুমি দীনের আশ্রয়দাতা তাই আমি তোমার স্মরণ গ্রহণ করিয়াছি তুমি আমায় চরণাশ্রয় দিয়া চির দিনের জন্য নির্ভয় করিয়া দাও। তুমি আমায় ছাড়িও না। কি আর দিব তোমায়! আমার এই শত শত প্রণাম গ্রহণ কর। তুমি নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া আমায় তোমার করিয়া লও। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া আমার বলিতে যা কিছু আছে সব দিয়া তোমার দাসী হই দেহি-ভক্তিঞ্চ দাস্যম্ ইহাই প্রার্থনা। ইতি ২০।৭

মামনুস্মর।

কত কর্ম্ম তুমি কর। গৃহী তুমি, একবার ভাবিয়া দেখ বাল্যকাল হইতে তোমাকে এই কার্য্যের যোগ্যতা লাভ জন্য কতবিধ কর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শ্রীভগবানকে ডাকিবার কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তুমি গৃহস্থাশ্রম রক্ষা জন্য কর্ম্ম করিতেছ; সঙ্গে সঙ্গে পূজা আহ্নিক, জপতপ, ধারণা ধ্যান ইহারও জন্য কিছু কিছু কর্ম্ম করিতেছ। আরও দশের সেবা জন্য কতক কতক কর্ম্মও করিয়া থাক। তোমার সমস্ত কর্ম্মত এই।

কিন্তু কেন এই সব কর্ম্ম তোমাকে করান হয় তাহা কি চিন্তা করিয়াছ ? কখন কি ঠিক করিয়াছ তোমার জীবনের লক্ষ্য কি ? তোমার গন্তব্য স্থান কোথায় ? অর্থোপার্জ্জন করিলে, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রতিপালন করিলে, পাঁচ জনকে শিক্ষা দিলে, ভাল ঘর বাড়ী করিলে, গাড়ীযুড়ী করিলে, বাগানবাড়ী করিলে, তোষাখানা সাজাইলে, বিদ্যালয় ঔষধালয় করিয়া দিলে বেশ ভালই করিলে। নিজের, দশের, দেশেরও উন্নতির উপায় করিয়া ভালই করিলে। কিন্তু একবার ত ভাবিতে

হয় এ সব কর্ম্মের শেষ লক্ষ্য কি ? ভাবিতে ত হয় সবই ত ফেলিয়া যাইতে হইবে ? কিন্তু যাইব কোথায় ? লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য কত ত করি কিন্তু লোককে কি দিলে লোকের দুঃখ চিরতরে দূর হয় ? আমি কোথায় গেলে চিরতরে দুঃখ দূর করিতে পারি ?

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন কর্ম্ম কর কিন্তু এমন করিয়া কর্ম্ম কর যাহাতে আমাকেই পাইতে পার। আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমার দুঃখ কখনই চিরতরে দূর হইবে না। আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত কাহারও দুঃখ তুমি চিরতরে দূর করিতে পারিবে না ; আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত জগৎ কখন সুখের অবস্থায় আসিতে পারিবে না। শ্রীভগবান্ তাই বলিতেছেন আমার কথা মত কর্ম্ম কর করিলে "মামেবৈষ্যসি" আমাকেই পাইবে। মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ। আমাকেই পাইবে ইহাতে সংশয় নাই।

কিরূপ করিয়া কর্ম্ম করিলে আমাকে পাইবে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলি—

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ।
মব্যর্পিতমনোবুদ্ধির্ম্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥৮।৭

সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর আর স্বধর্ম্ম কর। কর্ম্ম দ্বারা আমায় স্মরণ করিতে যখন তোমার অভ্যাস হইয়া যাইবে—যখন সর্ব্বদা আমার স্মরণ তুমি করিতে পারিবে তখন তোমার মনকে ও বুদ্ধিকে আমাতে অর্পণ করিতে পারিবে। তাহা হইলে আমাকেই পাইবে ইহাতে সংশয় নাই। আমি একাই তোমার মধ্যে, তোমার পরিবার-বর্গের মধ্যে, তোমার সমাজ মধ্যে, তোমার জাতির মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে, সবার মধ্যে আছি। তোমার সকল প্রকার কর্ম্ম দ্বারা আমার স্মরণে আমার সেবা কর। সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর এইটি তোমার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিলে তোমার অন্য কার্য্য হয় না এই না তোমার সংশয় ? আমাকে স্মরণ সর্ব্বদা করিতে করিতে সকল কার্য্য করা যায়। তুমি ক্ষত্রিয় তোমার স্বধর্ম্ম হইতেছে যুদ্ধ

করা। মামনুস্মর যুদ্ধ চ। আমার স্মরণ কর সর্ব্বদা আর যুদ্ধও কর। ইহা পারা যায়।

চৈতন্যরূপী আমি। আমি চিৎ। আমি জ্ঞান স্বরূপ। আমার শক্তি হইতেছে চিৎশক্তি। এই শক্তিই সকলকে চালাইতেছে, ফিরাইতেছে, বলাইতেছে। এ কথা সত্য। চৈতন্য আছে বলিয়া জড় চলে। মানুষ চলিতেছে—তুমি কখন কি ভাবিয়াছ চৈতন্য আছেন বলিয়া চিৎশক্তি জড় দেহটাকে চালাইতেছে ? সকল স্পন্দনে চৈতন্যে লক্ষ্য রাখ, রাখিয়া সকল কর্ম্ম কর। ইহাই মামনুস্মর যুদ্ধ চ।

কি চাই ? কেন চাই ?

আর এক রকমে এই কথাই আলোচনা করা হউক।

প্রথম কথা আমরা কি চাই ?

আমরা যেই কেন হইনা আমরা চাই মঙ্গল। আমার শুভ হউক, সকলের শুভ হউক এই আমরা চাই।

কি করিলে শুভ হইবে ? কি করিলে মঙ্গল হইবে ?

আমি যেখানে যেখানে থাকি সেই সেই স্থানে যাহাতে কল্যাণকর কার্য্য হয় তাহাই আমরা চাই। এখন দেখ কোথায় কোথায় আমাকে থাকিতে হয় ? প্রথমতঃ আমাকে থাকিতে হয় এই দেহে। এই দেহের মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার চলিতেছে। এই দেহের কার্য্য-গুলিকে বেশ গুছাইয়া করিতে পারিলে এখানকার মঙ্গল সাধিত হইবে।

দ্বিতীয় আমাকে থাকিতে হয় মাতা পিতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র লইয়া। এই সব লইয়া হয় পরিবার। পারিবারিক মঙ্গল আমরা চাই।

তৃতীয় আমি ও আমার পরিবারবর্গ ইহাদিগকে থাকিতে হয় সমাজে। কাজেই সমাজের মঙ্গলও আমরা চাই।

আবার আমার সমাজকে থাকিতে হয় জাতির মধ্যে। আমাদের সমাজ জাতিরই অঙ্গ কাজেই জাতির মঙ্গলও আমরা চাই।

চতুর্থ আমার জাতি মানবজাতির অঙ্গ। কাজেই সমগ্র মানব-জাতির মঙ্গলও আমি চাই। শুধু কি তাই? সমস্ত জীবের মঙ্গলও আমি চাই।

আমাকে কোথায় কোথায় থাকিতে হয় দেখান হইল। আর সেই সেই স্থানে মঙ্গল সাধিত হইলে যে নিরন্তর মঙ্গল লইয়াই থাকিতে পারি এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

কি করিলে মঙ্গল হইবে এই প্রশ্নের তবে এই উত্তর পাইলাম যে আমাদের দেহে যাহারা আছে তাহাদের কর্ম্মগুলি যদি শুভপথে চলে, আমার পরিবারের কর্ম্মগুলি যদি শুভপথে চলে, সামাজিক কর্ম্মগুলি যদি শুভপথে চলে, জাতির সকলের কর্ম্মগুলি এবং সকল জাতির সকলের কর্ম্মগুলি যদি শুভপথে চলে তবেই বলিব আমি যাহা চাই, তাহা লাভ হইল।

এখন দেখি এস আমি আমার পরিবারবর্গ, আমার সমাজ, আমার জাতি, আর সমগ্র মানবজাতি যে মঙ্গল চায় সে মঙ্গলটি কি?

মঙ্গল ত অনেক রকমের। সকল রকমের মঙ্গল উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কেননা একজনের সকল প্রকার মঙ্গল যে অন্যের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সঙ্গে মিলিবে ইহা অস্বাভাবিক। শুভ বিষয়েও পার্থক্য থাকিবে। মঙ্গলও ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। অনেক বিষয়ে গরমিল থাকিলেও কতকগুলি মঙ্গলকর কার্য্য এমন আছে যাহাতে কোন মানুষের বা কোন জাতির সে সম্বন্ধে ভিন্ন মত হইতেই পারে না। অর্থাৎ এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা সকল নরনারী, সকল বালক-বৃদ্ধ, সকল যুবক-যুবতী চায়। এই সকলের—বরণীয় কার্য্যগুলি কি তাহাই আমরা ধরিতে চেষ্টা করিব। সেইগুলি যদি আমরা দেখাইতে পারি—যাহা সকল জাতি, সকল প্রকার নরনারী আদর করিয়া গ্রহণ করিতে চায় তবেই সেই সার্ব্বজনীন মঙ্গলই আমাদের প্রয়োজন।

কি সেই সার্ব্বজনীন মঙ্গল ?

আমরা চারি প্রকারের মঙ্গলকে সার্ব্বজনীন মঙ্গল বলিয়া বলি। ইহা ব্যক্তি পরিবার সমাজ জাতি সকলকেই শুভ পথে লইয়া যাইবে। যে যেমন প্রকারের মানুষ হউক না কেন তাহার পক্ষেই ইহা শুভ। সেই চারিটি জিনিষ হইতেছে এই ঃ—

(১) পুরুষের পবিত্র চরিত্র।

(৩) স্ত্রীলোকের সতীত্ব।

(৩) কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের মনের একাগ্রতা।

(৪) সর্ব্বশেষে সকল মনের নিরোধ অবস্থা।

স্ত্রী হও বা পুরুষ হও লোক সঙ্গে থাকিতে হইলেই পবিত্র চরিত্র থাকাই চাই, আর সতীত্বও থাকা চাই। কোন জাতির নরনরী ইহা চাইনা ইহা বলিবে না। কিরূপে চরিত্র পবিত্র হইবে কিরূপে সতীত্ব থাকিবে ইহার খুঁটিনাটি বিচার আমরা এখানে করিব না। যাহা অবলম্বন করিলে এই চরিত্র ও সতীত্ব অক্ষুন্ন থাকে সেই একটি বস্তুর কথাই বলিব। পরে বলিতেছি।

আর মানুষের যে মনটি আছে সেটিকে সুস্থ রাখিতে হইবে। মন সুস্থ না রাখিতে পারিলে বাহিরের ইলেকট্রিক লাইট, ইলেকট্রিক ফ্যান, বাগান বাড়ী, যুড়ী গাড়ী, চসমা, ছড়ী, ভাল রাস্তা আর ট্রাম, মোটর ; রেল, জাহাজ, ছবি, বই এসকলে বিশেষ কিছুই লাভ নাই। মন ভাল না থাকিলে এসবে স্থায়ী সুখ কিছুই দিতে পারে না। ক্ষণিক তৃপ্তি একটা হইতে পারে। সেটা কিন্তু সুখ নহে। সেটা দুঃখেরই অন্য মূর্ত্তি। শ্রুতি তাই বলেন "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। অল্পে কখন সুখ নাই। যিনি ভূমা যিনি অনন্ত তিনিই সুখ।

যিনি ভূমা যিনি অনন্ত তাঁহার মুখ দেখিতে যাঁহার প্রয়াস নাই তিনি কখন প্রকৃত সুখে সুখী হইতে পারেন না। মনটিকে তাঁহাতে একাগ্র করা চাই তাহাতে যে সুখ তাহাই অনন্ত সুখের দিকে লইয়া যায় আবার মনটি যখন সেই ভূমাতে ডুবিয়া যায় যখন তাঁহাতে ডুবিয়া

বিষয়ে একবারে নিরুদ্ধ হইয়া হয় তখন হয় সুখ স্বরূপে স্থিতি। ইহা লাভ করিয়া তাঁহার মত জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক যে গতাগতি তাহাই হইল জীবন্মুক্তি।

যেমন পবিত্র চরিত্র ও সতীত্ব লাভ গৃহীর কর্ত্তব্য সেইরূপ ভক্তের কর্ত্তব্য শ্রীভগবানে মনকে একাগ্র করা আর জ্ঞানীর লক্ষ্য চিত্তের সমস্ত বৃত্তি রোধ করিয়া তাঁহাতে স্থিতি লাভ করা ও তাঁহার মত হইয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি লইয়া খেলা করা।

আর ঐ যে বলিতেছিলাম পুরুষের পবিত্র চরিত্র ও স্ত্রীজনের সতীত্ব যে একটি বস্তু অবলম্বন করিলে লাভ করা যায় তাহার কথা পরে আলোচনা করিব—তাহাও এই শ্রীভগবানকে অবলম্বন করা।

শ্রীভগবান একটিই। তিনি এই দেহে আছেন, পরিবারবর্গের সকলের মধ্যে আছেন, সমাজের, জাতির এমন কি স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যে তিনিই আছেন। তিনি চৈতন্যরূপে নরনারীর মধ্যে আছেন, স্থাবর জঙ্গমের মধ্যেও আছেন। আপনার চৈতন্য ভাবটি জীবকে ধরাইবার জন্য তিনিই জীবের বিপৎকালে, জগতের বিপর্য্যয় কালে মায়ামানুষ মায়ামানুষী হইয়া আপনি আচরণ করিয়া অন্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সেই ভগবানটিই সেবার বস্তু। যতদিন না নিজের ভাবনা, নিজের বাক্য, নিজের কর্ম্ম দিয়া সেই একের অর্চ্চনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছ ততদিন পবিত্র চরিত্র লাভ করিতেও তুমি পারিবে না আর সতী হওয়াও তোমার হইবে না।

পিতার হাড়মাসকে নারায়ণ বলনা; মাতার হাড়মাসকেও ভগবতী বলনা, স্বামী দেহকেও ভগবান বলনা। পিতা, মাতা, আচার্য্য, স্বামী এই সকলের মধ্যে যে চৈতন্যরূপী আছেন, তিনি আছেন বলিয়াই ইঁহারা গুরুজন, তোমার সেবার পাত্র। এখন দেখ সর্ব্বজীবেই তোমার উপাস্য বস্তুটি চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্ব বস্তুতে তিনিই নারায়ণরূপে আছেন! তুমি যাঁহাকে নিজের মধ্যে ধ্যান ধারণায়

মানসপূজায় ভজিতে চাও তাঁহাকেই বাহিরেও সকলের মধ্যে সেবা করাই তোমার সকল মঙ্গলের কারণ। যতক্ষণ না তুমি ভাবনা বাক্য ও কর্ম্মে সেই নিজরূপী ও বহুরূপী নারায়ণকে ভজিতে অভ্যাস করিতেছ ততক্ষণ তোমার রাগদ্বেষের কারণগুলি থাকিবেই। যতদিন রাগ, দ্বেষ, অহং, মম এই ভাব তোমার থাকিবে ততদিন তোমার চিত্ত অশুদ্ধই থাকিবে। চিত্ত অশুদ্ধ যতদিন থাকিয়া যাইতেছে ততদিন যদি পুরুষ হও তোমার পবিত্র চরিত্র লাভ হইতেই পারে না আর যদি স্ত্রীলোক হও তবে তোমার সতী হওয়াও হইবে না। তাই বলিতেছিলাম—সেই এককে সবার মধ্যে দেখ আর স্বকর্ম্মে তাঁহার অর্চ্চনা কর। যাহা চাও তাহা হইবে ইতি।

—০:০—

মর্ম্মবাণী।

বল প্রভু! দুঃখ কথা কারে নিবেদিব
তুমি না বুঝিলে বেদনা?
তুমি না মুছালে নয়নের বারি
যাবেনা আমার যাতনা।

আজ করমহীনের দারুণ করম
দহিছে নিভৃত মরমে;
বলিবার ভাষা ফুরাল কি তার,
লুকায়ে রহিবে মরমে?

এ বিন্দু পরাণে নাথ জাগাইলে কেন
বিশাল সিন্ধু পিয়াসা?

তৃষিতের তৃষা বাড়াইয়া ফল ?
মিটাবেনা যদি এ আশা ?

যবে শুকাতে চাহিল অফুট কলিকা
প্রখর রবির দাহনে,
ছায়া দিয়া তারে ঝরিতে দিলে না
দিনেকের পলে যতনে।

এবে ফুটিবার সাধ জাগালে যদিগো,
বিরলে আসন রচিয়া,
মরমের শ্বাস গোপন কথাটী
চরণে লুটিবে ঝরিয়া।

জগতের সুখ পারেনি তৃপ্তি বহিতে ;
অতৃপ্ত হৃদয় ভরিয়া,
বুক ভরা আশা কাঙাল কামনা
আকণ্ঠ উঠেছে পুরিয়া

আজো মেটেনি আমার আধখানি সাধ
যায়নি বিন্দু বিষাদ ;
পূজাহীন দিন বিফলে কেটেছে
সেবাহীন কত রাত ॥

২০।২৭

———

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।
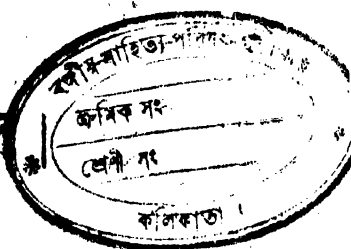
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

ভাদ্র।

ভাদো ভরম মিটাবো গুরুকি সেবা কছু করনা,
গগন গুফাকে মারগমে তুম্ ধীরজ সে চলনা,
খম্ভা এক কেওয়াড়ী দ্বাদশ জিস্‌মে হয় লাগি,
বৈকুণ্ঠপুরী বো দশম দ্বারা জঁহা জ্যোতি জাগি,
ন লগে ওঁহা কাল ফাঁসা।
সত্যনামকা ধ্যান্ তুম্‌হারা পূরণ হো আশা॥

ব্রহ্মর্ষি

কামাখ্যা দর্শনে।

কামাখ্যে বরদে দেখি! নীলপর্ব্বতবাসিনি!
ত্বং দেবি জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তুতে॥

ত্রিজগন্মাতা কামাখ্য দেবী নীল পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। এখানে

কোন মূর্ত্তি নাই। এই পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দশমহাবিদ্যার যোনি পীঠ। মায়ের মন্দিরে তিনটি যোনিপীঠ। মন্দিরের ভিতরে কামাখ্যা দেবী। ইনি ষোড়শী। ইঁহার পার্শ্বে কমলা ও মাতঙ্গী। অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ভুবনেশ্বরী। অন্য অন্য স্থানে কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, বগলা, ভৈরবী ও ধূমাবতী।

কালিকা পুরাণে দেখা যায়

ময়ি লিঙ্গত্বমাপন্নে শিলায়াং যোনিমণ্ডলে।
সর্ব্বে শিলাত্বমগমশ্চৈলরূপাশ্চ নির্জ্জরাঃ॥

সতীদেহের যোনিমণ্ডল এই স্থানে পতিত হইলে দেবতাগণ শৈলরূপে এইখানে মায়ের চরণে প্রণত হইয়া আছেন। যেখানে যেখানে মায়ের পীঠ সেই সেই স্থানে মহাদেব ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এখানকার ভৈরবের নাম উমানন্দ। ব্রহ্মপুত্র নদীর গর্ভে একটি ক্ষুদ্র শৈল। সেই শৈলে উমানন্দ ভৈরব। কি সুন্দর স্থান। প্রথমেই নৌকা যোগে উমানন্দ ভৈরবে গিয়া মাতৃদর্শনের অনুমতি লইতে হয়। উর্ব্বশীকুণ্ডে প্রথমে স্নান করিয়া উমানন্দ দর্শন করিতে হয়। উর্ব্বশী কুণ্ড এখন ব্রহ্মপুত্র গর্ভে।

আমরা এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ পরে পত্রস্থ করিব। এবারে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে কোন যাত্রী যেন অম্বুবাচীতে কামাখ্য দর্শনে না জান। বর্ষাকালে পার্ব্বতীয় সমস্ত দেশই অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। এখানকার পাণ্ডাগণ অধিকাংশই সজ্জন। আমরা পাণ্ডাদিগের গৃহে ছিলাম না। ছিলাম শ্রীমৎ অভয়ানন্দ তীর্থ স্বামীর ধর্ম্মশালায়। অতি রমণীয় স্থান এই ধর্ম্মশালা। ইহা কামাখ্যা মন্দিরের পশ্চাৎবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। স্বামীজী ভিক্ষা করিয়া ৬২ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া এই পর্ব্বতের বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ৭।৮ খানি টিনের ঘর তুলিয়া ধর্ম্মশালা করিতেছেন। এখনও ধর্ম্মশালাটি সম্পূর্ণ হয় নাই। তথাপি যাত্রীরা এখানে বাস করিতে পারে। স্বামীজীর যত্ন ও সেবাতে

যাত্রিগণ কোন প্রকার ক্লেশ অনুভব করে না। আমরা স্বামীজীর নিকটে কায়িক, আর্থিক কতই যে অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহাতে আমরা চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতে নাই তথাপি আমরা ইঁহার উপরোধ এড়াইতে পারি নাই। আমরা পরবারে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিব। যদিও পাণ্ডা মহাশয়দের গৃহে ছিলাম না এবং এই সুন্দর ধর্ম্মশালায় ছিলাম তথাপি ঐখানে থাকিতে থাকিতেই আমাদের একজনের জ্বর হয়। জ্বর একবারে ১০৫।১০৬ ডিক্রী। স্থানীয় সরকারী উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বরদাচরণ সেন মহাশয় গৌহাটী হইতে এই পাহাড়ে আসিয়া আমাদের সঙ্গের রোগীর চিকিৎসা করেন। আমরা জেদ করিলেও তিনি আমাদের নিকট কিছুই গ্রহণ করেন নাই। কোনরূপে জ্বর বন্ধ করিয়া কুইনিন দিয়া আমরা চলিয়া আসি। রাস্তায় আসিতে আসিতে আর একজনের জ্বর হয়! কলিকাতায় আসিয়া অনেকেরই জ্বর হইয়াছে। জ্বরও অতি ভয়ানক। এই জন্য আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি কেহ যেন বর্ষায় এই অম্বুবাচার সময়ে কামাখ্যা দর্শনে না যান। আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এই প্রদেশ অতি রমণীয়।

এই স্থানের একটি বিশেষত্ব এই যে পর্ব্বতের যে কোন স্থানে উপবেশন করিয়া জপ তপাদি কিছু করিলেই চিত্ত এমন স্থির হইয়া যায় যেন মনে হয় আর জগৎ সংসার নাই।' যেন আমরা কোন এক অপূর্ব্ব দেশে পৌঁছিয়াছি। আমরা এই ধর্ম্মশালার বিভিন্ন স্থানে বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক জপাদি করিয়া দেখিয়াছি সমস্ত স্থানেই কিছু প্রাণায়ামাদি করিতে করিতেই দেহ ভুল হইয়া যায় জগৎ ভুল হইয়া যায় আর চিত্ত এক চমৎকার অবস্থায় উপনীত হয়। অন্য কোন তীর্থে এত দীর্ঘকাল এই অবস্থা স্থায়ী হইতে দেখি নাই। উমানন্দ ভৈরব হইতে কামাখ্যা পর্ব্বত দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় তিনটি পর্ব্বত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা পর্ব্বতরূপী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। শিবপর্ব্বতে কামাখ্যার

মন্দির। আমরা ধর্ম্মশালায় এই পর্ব্বতে প্রাণায়ামাদিকালে সুন্দর রূপে অনুভব করিতাম যেন মাতৃক্রোড়ে বসিয়া আছি। চারিদিকে সুন্দর পার্ব্বতীয় দৃশ্য। উপরে নীলপর্ব্বতের মস্তকে সাদা সাদা মেঘ খেলা করিতেছে। আরও উর্দ্ধে নীল আকাশ কত যে সুন্দর তাহা না দেখাইলে অনুভব করান যায় না। মধ্যে মধ্যে বন্য হরিণাদির শব্দ আর চারিধারে নানাবিধ পক্ষীর কাকলী। বৃক্ষলতা পক্ষী আকাশ মেঘ যেন মায়ের দেহ হইয়া কি এক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। নিতান্ত সংসারীও এখানে সংসার ভুলিয়া কি যেন কি হইয়া যায়।

আবার বলি আমরা এই রক্তপাষাণরূপিণী মনোভবগুহা মধ্যবর্ত্তিনী জগন্মাতার অর্চ্চনার কথা পরবারে বিশেষরূপে আলোচনা করিবার আশা রাখি। গৌহাটী সহরের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ইহা মহাভারতের ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এই দেশকে কামরূপ বলে কারণ মহাদেব কর্ত্তৃক কামদেব ভস্মীভূত হইবার পর এইস্থানে কামদেব আবার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। আরও এককারণে ইহাকে কামরূপ বলে।

কৃতে কর্ম্মণি সিধ্যেত কামনাশু সুরেশ্বরি।
ততো মর্ত্ত্যঃ কামরূপমিতিরূপমকল্পয়ৎ॥

কামনা করিয়া জপ পূজা করিলে সাধক অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন এই জন্য ইহা কামরূপ বলিয়া বিখ্যাত।

নীলপর্ব্বতে—গান।

কবে হবে প্রেমে সে জ্ঞান সঞ্চার
হবে এক ভক্তি সদা অনুরক্তি
যথা তথা প্রেমে উদয় তোমার॥

আপনা ভুলিয়ে তোমা লয়ে রব জগতের জীবে তোমায় নিরখিব

যেখানে সেখানে তোমারে পাইব
সাকারে সাকারে মিল্‌বে নিরাকার ॥

ক্ষুধা নিদ্রা ভয় আরত রবেনা প্রাণের উৎক্রমণ মরণে হবেনা
দেহান্তে কোথাও যাওয়া রহিবে না
তোমাতে মিশিয়া রব অনিবার ॥

যখন—কিছু না দেখিব কিছু না স্মরিব সুপ্তমত আমি তোমায় ডুবে রব
নিন্দা স্তুতি কথা শুনেও না শুনিব
ভরিত আদরে দেখ্‌ব একাকার ॥

এক হয়ে মাগো শ্রীভর্গরূপিণী ঘরে ঘরে কি সে সবার ঘরণী
মৌন ব্যাখ্যা শুধু জুড়াবে পরাণী
জন্ম মৃত্যু সব মায়ার বিকার ॥

সারাটি বিশ্বে শুধু সীতারাম যেই সীতারাম সেই রাধাশ্যাম
সবার মাঝে দেখ্‌ব নয়নাভিরাম
কবে—গিরিনভ হবে শ্রীগৌরীশঙ্কর ॥

কবে—শ্যাম শ্যামরূপে জগৎ ভরে যাবে অঙ্গে মেখে রাই গরবে দাঁড়াবে
(তোমার) আগমন চিহ্ন গন্ধ জানাইবে
কবে—সর্ব্বেন্দ্রিয় সদা করবে নমস্কার ॥

শ্রী আমি তোদের ডেকে এই বলে ইহা হ'তে সুখ নাইক ভূমণ্ডলে
চেয়ে চেয়ে ডাক ত্রিকোণে কমলে
হবে আশাপূর্ণ ঘুচ্‌বে হাহাকার ॥

তবু ভাবনা ? তবু ভয় ?

আমি যে তোমায় বিশ্বাস করিয়াছি। তবু ভাবনা তবু ভয় আমার থাকিবে ? না না ইহা হইতেই পারে না। আমার গতি লাগিবেই। আমি এখনও নিদ্রা জয় করিতে পারি নাই, আমি এখনও আহার জয়

করিতে পারি নাই, আমি এখনও ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির সম্মুখে পড়িলে নির্ভয় হইয়া যাই নাই, আমি এখনও তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম লইয়া নিরন্তর থাকিতে পারি না, আমি সর্ব্বদা জপ লইয়া থাকিতে চাই সর্ব্বদা ধ্যান লইয়া থাকিতে চাই বা সর্ব্বদা সেই সুন্দর মন মুগ্ধকর বংশীধ্বনা লইয়া থাকিতে চাই কিন্তু কোন একটী কিছু লইয়া আমি নিরন্তর থাকিতে পারি না, আমার পূর্ব্বকৃত অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মপ্রবাহ আমায় বাধা দেয় তবুও আমি নির্ভয়। কিছু করিতে পারি বা না পারি তাতেও আমার কোন উদ্বেগ হয় না। কেন হয় না? আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার আছ। আমার যখন যে অবস্থা আসুক না কেন, আমি যখন যে অবস্থায় পড়িনা কেন, যতই বিপদ, যতই রোগ শোক আসুক না কেন, তবু বলি তুমি জগতের গতি, তুমি জগতের পতি, তুমি জগৎজনের নিবাসস্থল, তুমি সর্ব্বজীবের সুহৃৎ; তবে আমার ভাবনা কেন থাকিবে? আমি শুধু দেখিয়া যাই আমার আর কোন ভোগের ইচ্ছা আছে কি না? আর কোন কামনা আছে কি না? আমার একমাত্র ইচ্ছা তোমার কাছে থাকি, তোমার সেবা করি, তোমার সঙ্গে কথা কই, তোমার কার্য্যই করি। ইহা ভিন্ন সত্যসত্যই আর কোন সুখ প্রার্থনা করি না। ইহা ছাড়া আর কোন কিছু সুখের বস্তু আছে ইহা আমি ধারনাই করিয়া উঠিতে পারি না। সত্যসত্যই আমি আর কোন কিছুই প্রার্থনা করি না। তবে আমার ভয় কেন থাকিবে? তবে আমার কোন ভাবনা কেন থাকিবে?

তুমি কি—যখন ভাবনা করি তখন মনে হয় সকল দুঃখের প্রতীকার কর্ত্তা একমাত্র তুমিই। জগতের লোকের যখন কোন দুঃখ হয় তখন তোমার দিকে চাহিলেই, তোমাকে ডাকিলেই, তুমি তোমার আশ্রিতকে কখনও ত্যাগ কর না, তুমি তোমার জনকে কখনও ফেলিয়া দাও না।

সেই যে যখন নারায়ণ অনন্তজলরাশির উপরে অনন্তনাগের ফণা তলে শয়ানছিলেন, আর তাঁহার নাভি কমল হইতে ব্রহ্মা ভাসিয়া

উঠিয়া ধ্যান মগ্ন ছিলেন, তখন নারায়ণের কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্য উঠিয়া কারণ জলে খেলা করিতেছিল, পরে তাহারা তপস্যা করিল, করিয়া সিদ্ধিলাভ করিল, আর তাহারা তোমার নিকট হইতে ইচ্ছামৃত্যু এই বর লাভ করিল। এই বর পাইয়া ঐ দুই দৈত্য মদগর্ব্বে অনন্তজলরাশির মধ্যে ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মাকে বিনাশ করিবার জন্য আগমন করিল তখন ব্রহ্মা বড়ই ভীত হইলেন। ভীত হইয়া তিনি নারায়ণকে কতই ডাকিলেন তথাপি নারায়ণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আসিলেন না। বড় বিব্রত হইয়া ব্রহ্মা তখন দেখিলেন নারায়ণ যোগ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। তখন ব্রহ্মা সেই নিদ্রারূপিণী তোমাকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন—

কস্তে চরিত্রমখিলং ভুবি বেদ ধীমান্
নাহং হরি র্ন চ ভবো ন সুরাস্তথান্যে।
জ্ঞাতুং ক্ষমাশ্চ মুনয়ো ন মমাত্মজাশ্চ
দুর্ব্বাচ্য এব মহিমা তব সর্ব্বলোকে ॥

মা! কে তোমার চরিত্র সম্যক্ বুঝিবে? আমি ব্রহ্মা হরিহর অন্যান্য সুরগণ ও আত্মজ নারদাদি যখন তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তখন ভূমণ্ডলে এমন বুদ্ধিমান্ কে হইবে যে তোমাকে সম্যক্‌রূপে বুঝিবে?

মা! একথা সত্য যে কার্য্য যাহা তাহা কখন কারণকে জানিতে পারে না। কাজেই বেদও তোমার স্বরূপ জানেন না। হে সর্ব্বভূত মনোবিলাসিনি! হে জননি! আমি মূঢ়! আমি তোমার তত্ত্ব জানিব কিরূপে? মা! তোমায় জানিনা সত্য কিন্তু ইহা জানি যে সকল দেবতার—আর তাই কেন সকল জীবের বৃত্তিদায়িনী তুমি। সকল জীবকে রক্ষাও কর তুমি। তুমিই পূর্ব্বকল্পে আমাদিগকে ভীত দেখিয়া দানব ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। মা! আমি বুঝিতেছি তুমিই যোগনিদ্রারূপে ভগবান্ বিষ্ণুকে আচ্ছন্ন করায় তিনি আমার দুঃখ

বুঝিতেছেন না। হে অম্ব! ভগবান্ বিষ্ণুকে জগৎ পালনার্থ সাত্বিকী শক্তি তুমিই দিয়াছ। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহাই করিতেছ।

ভীতোঽস্মি দেবি বরদে শরণং গতোঽস্মি।
ঘোরং নিরীক্ষ্য মধুনা সহ কৈটভঞ্চ।

দেবি বরদে! আমি ভীত হইয়াছি। ঘোর মধুকৈটভ দেখিয়া আমি ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

জ্ঞাতং ময়া তব বিচেষ্টিতমদ্ভুতং বৈ
কৃত্বাখিলং জগদিদং রমসে স্বতন্ত্রা।
লীনং করোষি সকলং কিল মাং তথৈব
হন্তুং ত্বমিচ্ছসি ভবানি কিমত্র চিত্রম্॥

মা! আমি তোমার অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় কতক কতক জানিতে পারিয়াছি। তুমি এই অখিল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র থাকিয়া নিয়তই এই জগতে ক্রীড়া করিতেছ এবং প্রলয়ে তুমি তোমাতেই এই সমস্ত জগৎ লীন কর। মা ভবরাণি! আমাকেও যে সেইরূপ সংহার করিতে বাসনা করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? মা আপনি যদি আপন ইচ্ছানুসারে আমার বধ সাধন করেন তাহাতে মরণ জন্য আমার দুঃখ কেন হইবে?

ব্রহ্মাও যখন এইরূপ করিয়াছিলেন তখন তোমার আমার আর কথা কি? মা তুমি যখন ব্রহ্মার জননী তখন আমাদের সকলেরই জননী তুমি। একথায় মা যার আছে, মা যার সর্ব্বশক্তিময়ী, তার সংসারে আর কি ভয় থাকিতে পারে? আমরা তোমায় ডাকিতে মাত্র চেষ্টা করিতে পারি। বিপদে পড়িলেই তোমার স্মরণ মাত্র আমাদের সম্বল। আর কার স্মরণ করিব মা? জীবকে রক্ষা করিতে আর কে পারে। তোমার সন্তান সন্ততি আমরা। আর তুমি মাত্র আমাদের রক্ষাকর্ত্রী তবে আমাদের ভয় কেন থাকিবে? ভাবনাই বা

কেন থাকিবে? আমাদের কর্ত্তৃত্ব কোথায় মা? তবে আমি তোমায় নিরন্তর লইয়া থাকিব এই যে ইচ্ছা এই ইচ্ছার স্বাধীনতা তুমিই দিয়াছ সত্য। আমরা ইহার জন্যই চেষ্টা করিব। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যে দেহ পাইয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে যে সব উপদ্রব আমাদিগকে বিব্রত করিতেছে—সে সকলের মধ্যে আমরা আর কি করিব? তোমাকে জানান ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় আর কি আছে? পুনঃ পুনঃ তোমার নাম করিতে করিতে, তোমার ধ্যান করিতে করিতে, তোমার আত্ম বিচার করিতে করিতে, আমরা চেষ্টা মাত্রই করিব, তারপরে তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই আমাদের হইবে। সংহার করিতে ইচ্ছা কর তাহাই হউক আর রক্ষা করিতে ইচ্ছা যদি তোমার হয় তাহাই হউক। আমাদের আর ত বলিবার কিছুই নাই।

তুমি আমার সবার সব এই বিশ্বাসেই আমার সম্বল। ভাবনাও ত অনেক আইসে। কিন্তু ভাবনা করা বিফল। তোমার নাম করিয়া করিয়া সকল ভাবনা অগ্রাহ্য করাই আমাদের একমাত্র করণীয়। যাহা তোমার ইচ্ছা তুমি কর আমাদের ভাবনারও বিষয় নাই ভয়েরও কারণ নাই। তুমি যখন আমাদের আছ তখন ভাবনা বা ভয়ের কি থাকিতে পারে? তোমার ক্ষেত্রে তোমার এই কামাক্ষ্যা পর্ব্বতে তুমিই এই বুদ্ধি দিতেছ তাই তোমাকেই ইহা জানাইয়া রাখিলাম। আমি তোমার নাম করিয়া করিয়া সব ভাবনা সব ভয় তাড়াইতে চেষ্টা করিব—পারি বা না পারি সে ভার তোমার। আর কি বলিব? তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ইতি

মানস-পূজা।

(এক)

কি দিয়ে পূজিব ভেবে কেন বৃথা আকুল বল।
স্থির হ'য়ে বস পূজায় পাবে উপচার সকল॥

অষ্টদল হৃদ কমলে "কান্তি" আসন বিছায়ে দাও,
সহস্রার গলিত সুধা পাদ্য করি চরণ ধূয়াও,
মনকে অর্ঘ্যে কর দান,
সুধায় আচমন স্নান,
আকাশ তত্ত্ব দাও গো বসন সে অতিশয় নিরমল।
কিবা প্রয়োজন অন্য গন্ধে করম তত্ত্বে গন্ধ কর,
চিত্ত-তত্ত্ব থাকিতে ভ্রান্ত কেন বাজে ফুল খুঁজে মর,
পঞ্চপ্রাণকে করি ধূপ,
তেজঃ তত্ত্বে উজল দীপ
নৈবেদ্য দাও সুধার সাগর খাঁটী পূজার পাবে ফল।
হইতেছে অবিরত যং যং যং অনাহত ধ্বনি
তারে ঘণ্টা করি কর্‌রে বায়ুতত্ত্বে চামর ব্যজনী
সহস্রার পদ্মে ছত্র,
শব্দতত্ত্বে করি গীত
ইন্দ্রিয় কর্ম্মকে নৃত্য করাও জনম হবে সফল॥

—০—

(দুই)

ওই যে এলি মা তুই হৃদয় আসন পরে
জানিনা অর্চ্চনা স্তুতি পূজিব কি উপচারে।
অতি শুদ্ধ স্বচ্ছ মাগো, নিরমল সে চরণ
তাহাতে কি দিব আমি, পাদ্য অর্ঘ্য আচমন ?
অর্দ্ধ নারীশ্বর হয়ে, থাক যবে আজ্ঞাপরে
জ্ঞানানন্দ ঘন রস, কি যেন অমৃত ক্ষরে।
অঞ্জলি ভরিয়া তাহা, রেখেছি যতনে তুলে,
আচমন স্নানাদি মা, করিবে গো, সেই জলে।
কি অর্ঘ্যে তুষিব তোরে, কি আর রেখেছ মোর
সঙ্কল্প বিকল্পমাখা, মনটা গ্রহণ কর।

কত জ্বালা দেয় মোরে, জানত মা ও শঙ্করী
লহ অর্ঘ্য স্বরূপে মা, এ মনে, প্রদান করি।
সর্ব্ব আবরণ হীনে, কি বস্ত্র দিব মা তোরে
তথাপি আকাশ তত্ত্বে, সাজাইব মা তোমারে।
সর্ব্বপুষ্পগন্ধময়ী, তুমি যে মা ব্রহ্মময়ী
কিবা গন্ধ প্রদানিব, মন দুঃখ কারে কই।
সৃজিল কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যে গন্ধ তন্মাত্র দিয়ে
তুমি মা প্রসন্না হও, তোমার সে গন্ধ লয়ে।
জগৎ সুন্দরী তুমি সাজাইব কোন ফুলে
চিত্ত পুষ্প দিব তোরে, গঙ্গা হবে অশ্রুজলে।
তুমি যে গো স্বপ্রকাশা, সতত রয়েছ ভবে,
তেজস্তত্ত্বে ধূপ দীপে, কি আর প্রকাশ হবে?
নিজ তৃপ্ত দয়াময়ী, নৈবেদ্যের কিবা আছে,
রসতত্ত্বে তৃপ্ত হয়ে, থেকো চির, হৃদি মাঝে।
যে স্পর্শে তন্মাত্র মাগো এ বিশ্ব বিজয় কর
হে সর্ব্বমঙ্গলময়ি! তাহাই হবে চামর।
ঘণ্টা নিনাদিত হবে, অনাহত ধ্বনি রাশি,
সহস্রদল কমল, ছত্র ধরিবে গো আসি।
আছে ছাগ দুরন্ত সে কাম ক্রোধ লোভ তাই
তব অগ্রে দিব বলি মনে ভাবিয়াছি তাই।
বেদাগম বাক্যাতীতা, তুমি যে গো মা আমার
কোন্ স্তবে হবে তুষ্ট, শুনে লাগে চমৎকার।
কোথা বিসর্জ্জন আজি, করিব গো মা তোমারে,
অন্তর বাহির তুমি ব্যাপ্ত সদা চরাচরে।
সেবা অপরাধ মা গো, লইও না তনয়ার
হৃদয়ে বিরাজ কর ভক্তিহীনা এ দীনার।
আর কিছু বলিব না, অনুপমা রূপ হেরে

ভবপার হ'ব আমি, ও দুটি চরণ ধরে।
ও রাঙ্গা চরণদ্বয়, দাও মা মস্তক'পর
প্রসন্না হইয়া আজি, এ পূজা গ্রহণ কর।
ক্ষম শত অপরাধ, ক্ষেমঙ্করী নাম মাতঃ
ও রাঙ্গা চরণে মাগো প্রণমি মা শত শত।

২৫।২

—০—

(তিন)

প্রতিমায় কেন মায় মনরে কর আরাধন।
বাহ্য পূজা মনের ভ্রমে (জীব) স্বর্গান্তে সংসারে ভ্রমে
অন্তর্জ্জগৎ পুণ্যাশ্রমে কররে সাধন ॥
হৃদি সুধাসিন্ধু মাঝে কর মণিদ্বীপ সৃজন্
কল্পনা কররে তাতে পারিজাত কানন
সেই কাননের মধ্যস্থলে বিমল কল্পতরুতলে
চিন্তামণি গৃহ মাঝে কর্‌রে স্থাপন ॥
পূর্ণানন্দময়ী মায়ের কর জ্যোতিঃ রূপটি ধ্যান
সহস্রার গলিতামৃতে কর পাদ্য দান
তাতেই হবে স্নান আচমন, অর্ঘ্যরূপে সঁপরে মন
অসৎ সঙ্গ গোপন মুদ্রা করাওরে দর্শন ॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আদি পুষ্প পঞ্চদশ
পৃথ্বিতত্ত্ব গন্ধ যোগে দেও নিশি দিবস
তেজস্তত্ত্বের প্রদীপ জ্বালো প্রাণের ধূপ দান বড় ভাল
জলতত্ত্ব রসের কর নৈবেদ্য অর্পণ ॥
দশদিগ্ দাও বসনরূপে দাও সূর্য্যকে দর্পণ।
চন্দ্রমা হ'ক ছত্র মায়ের চামর সমীরণ
কাম ক্রোধ বলির প্রথা কুণ্ডলিনী সূত্রে গাঁধা
পঞ্চাশত বর্ণের মালা জপরে সঘন ॥

মূলাধার হেমকুণ্ডে কর চিদগ্নি স্থাপন
ধর্ম্মাধর্ম্মে দাও আহুতি জন্মের মতন
হোমান্তে মন! এই কাজ কর সোঽহং মন্ত্রের শান্তি পড়
দক্ষিণা দ্বিজ গোবিন্দের আত্ম সমর্পণ॥

—০—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে।

ধ্যানের অবলম্বনটি সম্মুখে রাখিয়া তিনিই বরণীয় ভর্গ এই ভাবনা করিতে করিতে গায়ত্রী জপ করিতেছিলাম। জপের সংখ্যা পূর্ণ হইল তবুও জপ ছাড়িতে চায় না দেখিলাম। জপ করিতেছি কিন্তু আর সংখ্যা রাখা নাই। আর মনে মনে প্রার্থনা আসিতেছে তুমি আমায় লইয়া চল! তোমার স্বরূপে লইয়া চল। সেই পরম পদে মিশাইয়া দাও। পরম পদে পরম ব্যোমে যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ— যে পরম পদে যে পরম ব্যোমে দেবতা সকল সেইরূপ হইয়া আছেন—পরম ব্যোম হইয়াও সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ যে পরম পদে—যে পরম পদ তোমার স্বরূপ যে পরম আমারও স্বরূপ যে পরম পদ সবার স্বরূপ যে পরম পদই নিত্য যখন জপের সঙ্গে প্রার্থনা মিশিয়া মনে হইতেছিল আমায় লইয়া চল—আমার আপনার যাইবার সাধ্য ত সেখানে নাই কতক্ষণ পরে শুধু জপ হইতেছে আর দেখিতেছি মনে উঠিতেছে কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে।

তখন ত বিচার করি নাই এখন বহু বিচার হইতেছে সত্য। সে সব না হয় পরে লিখিতেছি। তখন কিন্তু যখন মনে উঠিল কি দিব কি দিব বঁধু তখনই ত সব তারে চকিত মধ্যে দেওয়া হইয়া গেল। যখন হুঁস হইল তখন দেখিলাম বলিতেছি আমার যা আছে সব তোমার। দেখিলাম বলিতেছি এই চক্ষু তোমার। তোমার চক্ষু লইয়া এখন তুমি দেখ। এই কর্ণ তোমার এই হস্ত তোমার এই চরণ তোমার এই দেহ

তোমার, এই প্রাণ তোমার, এই মন তোমার, এই চৈতন্য তোমার। সব তোমার গো। আমার কিছুই নাই। আমার আমিও নাই, আমার আমিও তোমার। তোমার চক্ষে তুমি দেখিতেছ কত সুখ। তোমার কর্ণে তুমি শুনিতেছ কত সুখ। তোমার কথা তুমি বলিতেছ কত সুখ। আহা! এই আত্মসমর্পণে কত সুখ। তোমার বাক্ তোমার প্রাণ—মুখ্য প্রাণ; ইঁহাদের খেলার এই জগৎ—আহা! আত্মসমর্পণে এই ত হইবে।

ক্ষণিকের তরে ত হইল তোমার চক্ষু দিয়া তুমি দেখিতেছ, তোমার ইন্দ্রিয় দিয়া তুমি সব করিতেছ, তোমার অন্তরিন্দ্রিয় দিয়া তুমি অন্তর্জগতে কত রঙ্গ করিতেছ, কিন্তু আর ত এই আত্ম সমর্পণ ভুল হইবে না?

একবার কোন কিছু আসিলেই কি চিরতরে ইহা হইয়া যাইবে? এ আশা যে বাতুলের আশা। এটি যে অভ্যাসের বস্তু। এইটি প্রতিদিনের কর্ম্মে অভ্যাস করিতে হইবে। বহু বহু দিন ধরিয়া অভ্যাস করিলে তবে না ক্ষণটি মহাক্ষণে পরিণত হইবে? অভ্যাস করিলে তবে ত সর্ব্বদা তোমার চক্ষে আমি দেখিতেছি হইবে। এই অভ্যাসই ত সাধনা। শুধু একবার বুঝিলে কি হইবে? শুধু একবার বিচারে কি বস্তুটি লাভ হয়? সাধনা চাই নতুবা তোমার কোন ভাবই স্থিরত্ব লাভ করিবে না।

আহা! তাহাই করিব। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াই সাধনা করিব।

এই ত আবার অন্য কর্ম্মও করিতে হয়? তা হউক না। সকল কর্ম্মেরই ত বিরাম কাল আছে। সেই বিরাম কালে কেন দুটি অক্ষরে সেই পরম পদকে চিন্তা করনা। দুটি অক্ষরে সেই বিশ্বরূপ, সেই আত্মারূপ, সেই আমার একমাত্র অবলম্ব স্বরূপ ইষ্টরূপ, দুটি অক্ষরে সর্ব্বদাই কেন ইঁহাকে লইয়া থাকিবার অভ্যাস কর না! সেই তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতেছে পুনঃ পুনঃ কেন এই

ভাব স্মরণ কর না, অভ্যাস কর না, সাধনা কর না। আর একটু বেশী অবসরে কেন আবার ভাবনা কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে।

ভাবিবে কি? দেখনা এই ভাবনায় কত সুখ। তুমি আমার বঁধু? এ কথা কি আমি বলিতে সাহস করিতাম? বঁধু কি আমি তোমায় বলিতে পারিতাম? পারিতাম না। তুমিই বলিতে বলিয়াছ বলিয়া বুঝি বলি। তুমি আদর করিয়া সকলকে বল আমি বন্ধু তাই বুঝি জীব বঁধু বলিতে পারে।

তুমিই যে বলিয়া দিয়াছ "সুহৃদং সর্ব্ব ভূতানাম্"। তুমিই বলিয়া দিয়াছ প্রত্যুপকার পাইবার অপেক্ষা না রাখিয়া তুমি উপকার কর, এইটি জানিতে পারিলে তবে জীব সত্য সত্য তোমায় সুহৃৎ বলিতে পারে। তুমিই বলিয়াছ

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষীনিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

সবার গতি তুমি। সবার পতি—পোষণকর্ত্তা কর্ম্মফল প্রদাতা তুমি। সবার প্রভু—নিয়ন্তা-অন্তর্যামী স্বামী তুমি। সবার সাক্ষী-শুভাশুভ দ্রষ্টা তুমি। সবার নিবাস স্থান—ভোগ স্থান—অধিষ্ঠান তুমি। সবার শরণ-আর্ত্তিহর তুমি। সবার সুহৃৎ প্রত্যুপকার পাইবার অপেক্ষা না রাখিয়াই উপকার কর তুমি। তাই ত তোমায় জীব বঁধু বলিতে পারে। তুমি বলিতে বলিয়াছ বলিয়া বলিতে পারে। তুমি সত্য সত্যই বঁধু ইহা বুঝিবার সাধনা করিয়াই জীব সত্য সত্যই তোমায় বঁধু বলিতে পারে। নতুবা কি পারিত? তোমায় আজ দীনবন্ধু কেনা বলে? যে বড়ই অহঙ্কার করে, অসুরের মত দর্প করে তুমি তাহারও উপর কৃপা করিয়া তাহাকেও দীনহীন করিয়া তাহার নিকটে দীনবন্ধু হও। কত দয়া তোমার! তাই তোমায় বঁধু বলিতে সাহস হয়। মাকেও বঁধু বলিতে সাহস হয়।

বঁধু! তোমায় কি দিব কি দিব করি। কবি বলিয়াছেন—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে।

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হ'য়ে রব হে।

আমি বলি তোমারই ত সব। সবই তোমায় দিতে ইচ্ছা হয়। সবই যখন তোমায় দি তখন আর কি থাকে? থাক তুমি। তোমার তুমি—সব দিলেও তুমিই থাক। তোমার তুমি তুমিই লইয়া আছ। তবুও আবার নাও। কিছুই ত আর থাকে না। তবু একটা কিছু যেন থাকে। এটা আমার দাসী হইয়া থাকা। তোমার এইটি আমার আমি লইয়া খেলা। স্বপ্ন জাগ্রতে খেলা। আর একটু উপরে আমাকে তুমিতে ডুবাইয়া দেওয়া আরও উপরে তুমি, তুমি থাক। সর্ব্বোপরি পরম পদে স্থিতি। কে আছে কি আছে কেহ দেখিবার না থাকা।

দীর্ঘ সংসারে রোগস্থ বিচারোহি মহৌষধং।

আচ্ছা বল দেখি মন তুমি কি চাও? জীবনাবধি কতই তো চাহিয়া আসিতেছ আর কতই তো পাইয়াছ সাধ কি মেটে নাই? হায় হায় কি দুষ্কৃতি তোর, তুমি আপনার অবস্থা একবার চিন্তা কর না, কি দুর্দ্দৈব। একবার বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি, একবার তাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তুমি কোথায় আটকাইয়া গিয়াছ? সংসারের মায়া মরীচিকায় অজ্ঞানতা বশতঃ লক্ষভ্রষ্ট হইয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া বিকার গ্রস্ত রোগীর মত ও কি প্রলাপ তুলিতেছ? এই হাসি কান্না, ভালবাসা, সুখ দুঃখ, শোক ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভয়, জন্ম মৃত্যু এসব মায়ার বিকার, এগুলি সব মিথ্যা, এগুলি সব ভ্রম, সব স্বপ্ন, হায় অবোধ মন! কবে তোমার এ দীর্ঘ স্বপ্নের মোহ ঘুম ভাঙ্গিবে? মায়াবীর প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাইয়া মায়াতীতের শরণ লইতে কবে পারিবে? এই স্বপ্ন দেখে হেঁসে কেঁদে, চিরটা কাল কাটাইবে? চিরটা কাল কি এই মিথ্যার মাঝে ডুবিয়া যাতনায় ছট্‌ফট করিবে? একবার কি ভিতরে আসিবে না? একবার কি স্থির হইয়া আত্মস্বরূপে দৃষ্টি

করিবে না? এস এস একবার আপনার ঘরে এস, আপনার ঘরের কোথায় কি আছে দেখি এস, বহির্জগৎ হইতে একবার অন্তর্জগতে এস, একবার সেই সত্য বস্তুর অনুসরণ করিবে এস।

এত করিয়া ডাকি তবু তুমি চঞ্চল হও? একবার চিন্তা কর দেখি এটা বা কি? তুমি যে স্থির হইতে পার না, তুমি কাহার জন্য এত চঞ্চলতা প্রকাশ কর, তুমি চাও কি? এতদিন তো মিথ্যার পিছনে সত্যভ্রমে ছুটিয়াছিলে, তাহাতে কি ফল হইল? ভালতো বাসিয়াছিলে, কিন্তু স্বরূপে দৃষ্টি হারাইয়া ক্ষুদ্র ও অনিত্য দ্রব্যে আসক্ত হইয়াছিলে, তাই না এ হাহাকার! যাহা ফুরাইয়া যায় তাহাতে সুখ কোথায়, যাহা অপূর্ণ তাহাতে পূর্ণতা কোথায়? আপনার ভাবিয়া কত দ্রব্যই গ্রহণ করিয়াছিলে, আপনার কি কেহ হইয়াছে? এখানকার যে সব মিথ্যা, এখানে কেহই আপনার হয় না। তবে আর মরুভূমে মরীচিকা বোধে ছুটিও না। এখনও কি জ্ঞান হয় নাই? তবে এস আর একবার চিন্তা কর। যে তোমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল, যাহার মিলনে কত সুখই উপভোগ করিয়াছিলে, সে কোথায়? সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া দ্বিগুণ দুখের কারণ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল? কাল যাহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কত অতৃপ্ত কামনার ছায়া স্মরণপথে উদয় হইত, আজ সে কোথায়? ঐ দেখ যে তোমার অতি আদরের ছিল, অতি আপনার ছিল, অতি প্রিয় ছিল, তাহারই এ সুন্দর ললিত অঙ্গ শ্মশানাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি করিতে পারিতেছ? এখনও কি নশ্বর দ্রব্যে বৈরাগ্য হয় নাই? একবার প্রিয়জনের অন্তিমশয্যায় মৃত্যুযন্ত্রণা মনে কর দেখি? একবার তাহার কাতর দৃষ্টি চিন্তা কর দেখি, যখন সে তোমারই দিকে তাকাইয়া যাতনা জানাইতেছিল, তুমি তখন সেই সত্যস্বরূপ পরমপিতার স্মরণ ভিন্ন কি করিতে পারিয়াছ? যখন তাহার সুন্দর দেহটির ভস্মাবশেষ পরিলক্ষিত হইল, তখন মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, সেই ক্ষণিকের শ্মশান-বৈরাগ্যকে হৃদয়ে

জাগ্রত করিয়া, এ সমস্ত পদার্থ নশ্বর জানিয়া, সেই অবিনশ্বর পরম পদার্থ অনুসন্ধান কর, নতুবা শান্তির আর গত্যন্তর নাই। তাই বলি, এখানকার সম্বন্ধ দুদিনের, এ পরিচয় দুদিনের, এ মিলন দুদিনের, এ দেখা দুদিনের, ইহাতে সুখ কোথায়? আর আপাতমনোরমে মুগ্ধ হইও না। যেখানে চির অবিচ্ছিন্ন মিলন, যে প্রেমের বিচ্ছেদ নাই, যে ভালবাসার অন্ত নাই, যেখানে রূপরসের সম্বন্ধ নাই, যেখানে কিছুই ফুরাইয়া যায় না, যেখানে পাওয়া শেষ হয় না, যেখানে কখন অতৃপ্তি নাই, চল সেই অনন্ত সুখের রাজ্যে চল। চঞ্চলতা ত্যাগ কর, একটু'তে সুখ হয় না। এখানকার এ সুখ দুঃখ হাঁসি কান্নায় লিপ্ত হইও না। একবার আপন স্বরূপ চিন্তা কর, দেখ তুমি জড় নহ তুমি চৈতন্য, তুমি মাত্র সাক্ষিস্বরূপ, তুমি দ্রষ্টা। তোমার যাহা হয় বা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা, অবস্তুকে বস্তুজ্ঞানে দ্রষ্টাতে দৃশ্য আরোপ করিয়া অহং কর্ত্তা অভিমানে, স্বরূপ হারাইয়াছ। এস এস একবার স্থির সুখাসনে বসিয়া, চৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করি। তাহা ভিন্ন ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে আনন্দ নাই। কিসের দুঃখ? কেন দুঃখ পাও? এ দুঃখও মিথ্যা, যদি এই ঘোর নৈরাশ্যপূর্ণ অন্ধকারে গুরুকৃপা লাভ করিয়া অনন্তের পথ পাইয়াছ, বিনা সাধনে যেন আর পথহারা হইও না। এস নাম কর। নামে প্রাণ ভরিয়া ফেল, হৃদয়বীণায় অহরহঃ নামের ঝঙ্কার হউক; দেখ দেখি আনন্দ পাও কি না? দেখ দেখি নামে রস পাও কি না? যেই নাম সেই নামী, স্বরূপে লক্ষ্য হইলেই ভেদাভেদ থাকিবে না, গুরুমন্ত্র ইষ্ট সব মিশে যায়, তাই বলি দৃঢ় পুরুষার্থ ধরিয়া, বল, মরিতে হয় মরিব, নাম করিয়া মরিব। দেখ দেখি সংসার আবার হাঁসিয়া উঠে কি না? নাম করিতে করিতে সব সহ্য হইয়া কি এক আনন্দঘন রসে আপনাকে ডুবাইয়া দিবে। তখন কোথায় সুখ দুঃখ হাঁসি কান্না জ্বালা যন্ত্রণা? এ রাজ্য শুধুই আনন্দের। একবার এস ভাই! স্থির সুখাসনে বসিয়া, সহস্রারে শ্রীগুরুপাদুকা লইয়া, দ্বিদল মাঝে এবং অষ্টদল পদ্মোপরি, ত্রিকোণে কমলের ভিতরে

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বিরাজিত গৃহের মাঝে মণিমণ্ডপোপরি, চৈতন্যময়ী জননীকে দেখিবে এস। এখানকার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। চন্দ্রকোটি সুশীতল কিরণে ঘর উদ্ভাসিত হইয়াছে, কতই রাগ রাগিণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারিত, কুসুমিত উপবনের সৌরভে এ ঘর আমোদিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অন্যান্য দেবতাগণ এ ঘরের প্রহরীরূপে দ্বারে দণ্ডায়মান। স্নিগ্ধ নয়নমনমুগ্ধকর জ্যোতি অপরূপ শোভাধারণ করিয়াছে। এক-বার চল সেই ঘরের রাজাকে দেখিবে চল, এখানে আসিলে, তোমার ক্ষুদ্র 'আমি' হারাইবে, এখানে জাগতিক ময়লা প্রবেশ করিতে পারে না, এখানে কোন অভাবজনিত দুঃখ নাই, এখানে অপূর্ণতা নাই, এই তোর নিজের ঘর, এই ঘরেই তোমার পরশমণি আছে। হায়! হায়! এমন সুন্দর গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় পরের ঘরে আপনার স্বরূপ ভুলে, দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া এলি ?

প্রিয়জনের মৃত্যুকালীন বৈরাগ্য ও দৃঢ় পুরুষকার এই দুইটি পাথেয় করিয়া ঘরের রাজার নিকটে এস, তাহার পর যখন যাহা আবশ্যক হইবে তিনিই সে অভাব দূর করিবেন। একবার কাতর হইয়া প্রার্থনা কর। আমার আর কেহ নাই, তোমার আদেশ পালন করা, তোমার সেবা করা ভিন্ন আমার আর কোন কর্ম্ম নাই, আমি আর কিছু জানি না, আর কিছু জানিতে চাই না, আমি কায়মনো-বাক্যে তোমার শরণ লইলাম, তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও। আমি নিজ দুষ্কৃতিরাশির কত ময়লা মাখিয়াছি, আমি কেমন করিয়া অপবিত্র হইয়া ঘরে যাইব ? যেখানে পবিত্রমূর্ত্তি তুমি আছ, যেখানে ব্যাস বশিষ্ঠাদি মহাত্মাগণ বেদ পাঠ করিতেছেন, যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিরাজমান, সেখানে যাইতে হইলে কত পবিত্র হইয়া যাইতে হইবে তাহা ধারণার অতীত, তুমি আমায় দয়া কর তুমি আমায় পবিত্র করিয়া লও। আমি ভক্তিভরে তোমারই দুটি রাঙ্গাচরণে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্না হইয়া গ্রহণ কর। এস মন যা হয় হউক, একবার দৃঢ়ভাবে বল এ জীবনে সাধনা ব্যতীত আমার কিছুরই প্রয়োজন

নাই, একটি শ্বাস নাম বিনা ব্যয় হইবে না, প্রতিশ্বাসে তাঁহাকে স্মরণ করিব। নাম ধ্যান, মানসপূজা ও আত্মবিচার এই লইয়া জীবন কাটাইব। একবার মনে প্রাণে বল আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। ওই রাঙ্গাচরণ হৃদয়ে ধরিয়া ঘরে বসে নাম করি এস। যাহা দরকার তিনিই দিয়া দিবেন। একবার চরণে লুটাইয়া পড়ি এস। ক্রমেই সময় চলিয়া যাইতেছে। ২৭।২

কেন হইতেছে না?

লোভে লোভে, আশায় আশায় বহুদিন অতিবাহিত হইল তবুও ত লালসার ধন মিলিল না, তবুও ত আশা পূর্ণ হইল না! বিশ্বজননীর চরণ-কোকনদে মধুলেহীসম মকরন্দ পানে নিলীন হইব সাধ করিয়াছিলাম; দিনে দিনে মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কত কাল চলিয়া গেল,—আজিও ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে চিরস্থির হইতে পারিলাম না! কায়মনোবাক্যে আমি তাঁহারই হইতে অভিলাষ করিলাম, কিন্তু আমার দেহ, চিত্ত, বাণী ত তাঁহার হইল না। মায়ের পতিতপাবন নাম মধুময় তানে গাহিব বলিয়া আমার এই সাধের বীণা বাঁধিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, কত বর্ষ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া গেল আজিও ত বীণা বড়ই বেসুরা বাজিতেছে!

কেন এমন হইল? কেন হইতেছে না? শ্রীশ্রীমা ত করুণাময়ী, সন্তানবৎসলা জননী, তবে তাঁহার সন্তানের আশা অপূর্ণ রহিতেছে কেন? এই কায়া তাঁহারই রচনা, এই মন তাঁহারই লীলা-প্রসূত, এই বাক্‌শক্তি তাঁহারই অসীম শক্তির সামান্য অভিব্যক্তি মাত্র, তবে যাহা তাঁহার নিজস্ব তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিতেছি না কেন? মায়ের বস্তু মাকে ফিরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না কেন? পরদ্রব্যে এই দারুণ আসক্তি কেন?

সত্যশূন্যাড়ম্বরপরিপূর্ণ নগর হইতে বহু দূরে, ভূ দেবমি পর্ব্বত-

রাজ হিমাচলের অনতিদূরে, শ্যামশস্প পরিশোভিত প্রান্তরপার্শ্বে, সত্য-প্রচারক শ্মশান সমীপে উপবেশন করিয়া দ্বিপ্রহরের নীরবতার মাঝে ব্যর্থ প্রয়াসের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতেছি। নিদাঘের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের খরকর পীড়িত হইয়াই হউক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক একটি বিহঙ্গম অবিরলধারে, কুক্, কুক্, কুক্ শব্দ করিতেছে। প্রতি কুক্-ধ্বনি আমার স্থির মনের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া আমার প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় বাহির করিয়া আমার নয়নসমীপে ধরিতেছে। মলিন চরিত্রের কি মর্ম্মন্তুদ চিত্রই দেখিতেছি! বিহঙ্গম, তোমার প্রসাদে আজি আত্মচরিত্রের যে স্বরূপ দেখিতেছি তাহা অক্ষর সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিব; পুনরায় যখন লোকালয়ে প্রবেশ করিব, পুনরায় যখন স্থানমাহাত্ম্যে স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে অতুলনীয় মনে করিব তখন এই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও হয় ত ক্ষণিকের জন্যও অহঙ্কার শান্তভাব ধারণ করিবে। বিহঙ্গম, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। বন্ধু, তোমার এই উপকার যাবৎ এ দেহে প্রাণ রহিবে তাবৎ বিস্মৃত হইব না।

চিত্তফলকে বিশ্বজননীর চরণ-ছায়া মুদ্রিত করিতে হইলে ফলক নির্ম্মল, শুভ্র হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। আমি ত মনে করিয়া আসিতে-ছিলাম যে আমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। কিন্তু আজি চরিত্রের যে চিত্র দেখিতেছি তাহাতে বিশেষ ভাবনা হইতেছে। দেখিতেছি, বিষ-য়ানুরাগ চিত্তকে ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। এই বিষয়ানুরাগ যে সদা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারি না তাহার কারণ সে এক জটিল ছদ্মবেশ পরিধান পূর্ব্বক সুন্দররূপে স্বরূপ গোপন করিয়া চলিতেছে। আজি এই শান্তক্ষণে যশোরূপ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। লোকহিতৈষণার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যশোলাভলিপ্সা আমাকে বিড়-ম্বিত করিতেছে। এই যশোলিপ্সা যে প্রকারে আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে ভগবদ্ভক্তি উপজিত হইবে, তাঁহার রাতুল চরণে মন মজিবে—এই আশায় সৎগ্রন্থ

পাঠ করি। কোন কোন দিন এমন ঘটে যে অধ্যয়নকালে সৎগ্রন্থ বর্ণিত ভগবদ্বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে চিত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার চরণারবিন্দে সুস্থির হইয়া যায়; তখন কোন প্রকার জ্বালা থাকে না, যাতনা থাকে না, দেহে এক অভিনব শক্তিসঞ্চার হয়, ধরণী এক রমণীয় ছবি ধারণ করে। কোন কোন দিন আবার সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে পাঠ পরিত্যাগ করিয়া আবেগভরে স্বয়ং সৎকথা লিখিতে বসি। অনুসন্ধান করিয়া করিয়া সুন্দর সুন্দর শব্দ সংগ্রহ করি। শব্দে শব্দে বিনাইয়া বিনাইয়া ভাব প্রকাশ করি। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীশ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া সে এই শব্দসাগরে প্রবেশ করিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলে মন উত্তর করে যে সৎকথা প্রচার করিয়া, জনসাধারণকে সাধনপথের সংবাদ প্রদান করিয়া সে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে, ইহাও সাধনার অঙ্গবিশেষ। মোহের প্রিয় বিলাসভূমি হইতে দূরে, স্নেহময়ী প্রকৃতিজননীর স্নেহক্রোড়ে উপবেশন করিয়া স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে বিহগস্বরে এই সময়ে প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। এই শুভমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি যে রচনায় যে অভিনিবেশ তাহা নিঃস্বার্থ পরোপকারেচ্ছাসম্ভূত নহে, তাহা যশোলাভলিপ্সাসঞ্জাত সৎগ্রন্থের ভাষার সৌন্দর্য্যে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় যে দিন লুপ্ত বাসনা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে সেই দিন শব্দে শব্দে সৌন্দর্য্য রচনা করিবার জন্য তালমানলয়ে সঙ্গীতলহরী তুলিবার জন্য লোকচিত্ত বিনোদিত করিয়া যশোলাভ করিবার জন্য মুগ্ধ প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সংযমের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উন্মত্ত প্রাণ কাগজ কলম গ্রহণ করে! এই শুভমুহূর্ত্তে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে বলিতেছে "ভ্রান্ত হইও না। যশের কুহকে ভুলিও না। কাগজ কলম পরিত্যাগ কর। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীশ্রীচরণ বক্ষে ধারণ কর। তুমি শ্রীশ্রীমাতার দর্শন লাভ করিতে পার নাই, তদেকচিত্ত হইয়া এক্ষণে অভীষ্টলাভে যত্নবান্ হও। যে ব্যক্তি বিশ্বজননীর চরণতলে উপবেশন করিয়া সত্যশিক্ষা করিতে পারে নাই সে যাহা ভাবিবে, সে যাহা বলিবে, সে

যাহা লিখিবে তাহা যে সত্য তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ? তাহার তথা-কথিত জ্ঞান যে অজ্ঞানান্ধকার ঘনীভূত করিবে না তাহার স্থিরতা কোথায় ? বিষয়ানুরাগবিমূঢ় জন নানা ভাবে বিষয়ের সেবা করিয়া নিত্যই ইহলোকে প্রতারিত হইতেছে, তুমি সাবধান হও, নতুবা যাহা চাহিতেছ তাহা পাইবে না”।

কেবল মাত্র বিষয়ানুরাগই যে চিত্তফলক মলিন করিয়া রাখিয়াছে এমত নহে। নিদাঘ দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায় নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছি যে, আত্মাদর চিত্তের অন্যতম কলঙ্ক রচনা করিতেছে। যশোলাভ-লিপ্সার ন্যায় আত্মাদরও ছদ্মবেশে স্বরূপ লুক্কায়িত রাখিয়াছে। আজি এই শুভদিনে আত্মাদরের ছদ্মবেশ অপসারিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ প্রকটিত হইতেছে। সৎসঙ্গ ভগবদ্ভক্তিলাভের অন্যতম উপায় বলিয়া, ভক্তজনের ভক্তিরাগরঞ্জিত, শান্ত, মধুর চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, ভক্তের আত্মহারা, উন্মত্তভাব অবলোকন করিয়া, তাঁহার পূতমুখে পবিত্র ভগবদ্ কথা শ্রবণ করিয়া মলিন জীবন নির্ম্মল করিবার লালসায় দেশ দেশান্তরে পরিভ্রম করিলাম, গহন কাননে প্রবেশ করিলাম, বিজন শ্মশানভূমিতে বিচরণ করিলাম, দু'রারোহ গিরিশিখরে আরোহণ করিলাম, বহু সাধু সন্ন্যাসী তপস্বীর চরণপ্রান্তে উপবেশন করিলাম, কিন্তু যে রমণীয় ছবি দর্শন করিবার জন্য এতাদৃশ প্রয়াস করিলাম সে দৃশ্য ভাগ্যে ত ঘটিল না। প্রকৃত ভক্ত ভগবানের সমীপবাসী ; তাঁহার দর্শনলাভ ভগবদ্দর্শন লাভের পূর্ব্বাভাষ ; বিশেষ পুণ্য না থাকিলে ভক্তদর্শনরূপ বিশেষ সৌভাগ্য ঘটিবে না ;—এই সত্য মনে করিয়া ভক্তদর্শনাশায় বঞ্চিত হওয়ায় তাদৃশ দুঃখিত নহি। তবে মনে এক দুঃখ বড়ই বাজিতেছে। যাঁহাদের চরণ দর্শন ভাগ্যে ঘটিল তাঁহাদের সকলেরই প্রতি অনাদর জন্মিল। সত্য বটে তাঁহারা কেহই আমার উচ্চ আদর্শের সমুজ্জ্বল ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; সত্য বটে তাঁহাদের সকলকেই কোন না কোন প্রকার বিষয়ে অনুরক্ত দেখিলাম ; কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এই দুর্দ্দশা কেন হইল, কিন্তু

তাহা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি আমার এই অননুরাগ কেন? সাধুগণের ভণ্ডামিই আমার এই অশ্রদ্ধার হেতু,—ইহা বলিয়া প্রতারক মন আমাকে এতদিন ভুলাইয়া আসিতেছে। আজি যখন মোহের রাজ্য হইতে ক্ষণিকের জন্যও বাহিরে আসিয়াছি তখন বুঝিতেছি যে,এই সজ্জনানাদর আমার হীন আত্মাদর হইতেই সম্ভূত, আমি আমাকে এতই ভালবাসি যে অন্য কাহাকেও ভালবাসিবার ক্ষমতা আমার নাই, আমার গুণরাশিতে আমার হৃদয় এতই পূর্ণ যে সে হৃদয়ে অন্যজনের গুণের একান্ত স্থানাভাব। এক্ষণে দেখিতেছি আমার অহঙ্কারই আমার শত্রু হইয়াছে।

ঈশ্বরনির্ভরতা ঈশ্বরলাভের অপরিহার্য্য অবলম্বন। শরণাপন্নকে আশ্রিতবৎসলা জগজ্জননী কখনও পরিত্যাগ করেন না। যে সাধক সত্যসত্যই তাঁহাতে নির্ভর করে—তিনি সত্যই তাহার সকল ভার গ্রহণ করেন, তাহাকে সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করেন, তাহা দ্বারা সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় সাধন ভজন সম্পাদন করাইয়া শরণাগতকে চরণপ্রান্তে আনয়ন করেন। সাধু তারস্বরে এই সত্য ঘোষণা করিতেছেন; শাস্ত্র মেঘমন্দ্রে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। নির্ভরশীলের প্রতি ঈশ্বর-করুণার উপাখ্যান শ্রবণ করিতে করিতে প্রাণ বিগলিত হইতেছে। কত লোকের নিকট অভূতপূর্ব্ব ঈশ্বরমহিমা কীর্ত্তন করিতেছি। আপনাকে জনৈক ঈশ্বরনির্ভরশীল ব্যক্তি মনে করিয়া কতই আনন্দ লাভ করি-তেছি। কিন্তু নির্ভর কি করিতে পারিয়াছি? সেদিন অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলিলেন—"বাবু, সংসারের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, ঈশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হউন নতুবা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না।" শরীর নিতান্ত অপটু, নিত্যই ব্যাধি লাগিয়া রহিয়াছে, সতত কবিরাজের সাহায্য আবশ্যক,"—আপত্তি করিলাম। হাসিয়া কহিলেন, "যদি ঈশ্বরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেও রোগ হয় এবং কবিরাজের আবশ্যক হয় তাহা হইলে হিমালয়ের গুহার নিভৃতপ্রদেশে কবিরাজ অনাহূত হইয়াই উপস্থিত হইবেন।" বলিলাম, "শীতকালে শীতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, হিমালয়ের দারুণ শীতে শীত নিবারণ হইবে কি প্রকারে?" মধুর

অধরে মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বাবু, পরের দাসত্ব করিয়া দিবানিশি পরিশ্রম করেন তাহাতে ত দেহে সামান্য বস্ত্রই উঠিয়াছে, দেখিতেছি। ঈশ্বরকে গ্রহণ করুন, যদি শীতে কষ্ট হয় তাহা হইলে অনায়াসে জামিয়ার মিলিবে। ঈশ্বরকে একবার পরীক্ষই করিয়া দেখুন না!" শরণাগতকে ঈশ্বর যে সতত রক্ষা করেন স্বীয় জীবনে তাহার কত পরিচয় পাইয়াছেন সহাস্যে সাধু তাহা শুনাইলেন, শুনাইয়া বলিলেন, "আপনার মঙ্গল হইবে বলিয়া সকল কথা বলিলাম। এক্ষণে গৃহে গমন করুন। প্রভাতেই যাত্রা করিবেন।" বলিলাম, প্রভো, আমার বহু ঋণ, ঋণ পরিশোধ না করিয়া কেমন করিয়া যাইব।" উত্তরে হাসিয়া "কালু সাহার" গল্প বলিলেন এবং আদেশ করিলেন, "উত্তমর্ণগণকে লিখিয়া দিউন যে আপনি ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা আপনার নূতন প্রভুর নিকট হইতে তাঁহাদের অর্থ সুদে আসলে পাইবেন। সন্ধ্যার ছায়া পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে শান্তস্বরে পুনরায় কহিলেন, "ঐ দেখুন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দিবাবসান অবলোকন করিয়া পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায়ে গমন করিতেছে। যাউন, গৃহে যাইয়া আপনার বিশ্বজননীর ধ্যানে নিযুক্ত হউন।" চরণে প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তাহার পর কতদিন অতিবাহিত হইয়াছে, ঈশ্বরের দ্বারে দাঁড়াইতে পারিয়াছি কি? "ঈশ্বর হস্ত পদ দিয়াছেন, চক্ষু কর্ণ দিয়াছেন, জ্ঞান বুদ্ধি দিয়াছেন, আহার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি স্ব স্ব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ না করি তাহা হইলে তিনি আমাদের অশন-বসনের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার চিরপ্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিবেন কেন?"—এই বিচার বলে মন আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আজি যখন বিচারের রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বাসের ভূমিতে মুহূর্ত্তের জন্যও উপস্থিত হইয়াছি তখন কুহকী মনের কুহক ছুটিয়া গিয়াছে, তখন শুনিতে পাইতেছি "যে আইন করিয়াছে সে আইন রদ্ করিতে পারে"। এখন বুঝিতেছি আমার ক্ষুদ্র শক্তির উপর আমার নির্ভর

আছে, কিন্তু যাঁহার শক্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সঙ্ঘটিত হইতেছে সেই সর্ব্বশক্তিময়ীর অনন্ত শক্তিতে আমার নির্ভর নাই!

এই পুণ্যমুহূর্ত্তে বুঝিতেছি, কেন হইতেছে না। বিষয়ানুরাগ, অহঙ্কার, অবিশ্বাস হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং সেই অন্যাধিকৃত প্রদেশে প্রেম প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। প্রকৃত পক্ষে আমি বিষয়ের সেবা করিতেছি, শুধু মুখেই বলিতেছি যে আমি সাধনা করিতেছি। এতাদৃশ আত্মপ্রতারণায় কি জননীর চরণতলে উপস্থিত হওয়া যায়! কায়মনোবাক্যে জগজ্জননীর সেবায় নিযুক্ত না হইলে কি সেই দুর্ল্লভ বস্তু লাভ করা যায়? বিশ্বাস করিব না, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিব না, বিষয় সেবা করিব অথচ শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে চিরাস্থির হইব, ইহা কি কখনও সম্ভব? বিনয়, বিশ্বাস ও বৈরাগ্য এই তিনটি ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি রচনা না করিলে শুধু মুখের বচনে কি ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায়! সাধক সত্যই গাহিয়াছেন—

"তোমাতে আমাতে শুধু মুখের কথাতে
হরি, হবে কি গো পরিচয়?
আমি ডাক্‌তে হয় ডাকি, আবার বিষয় নিয়ে থাকি,
ফাঁকি দিলে কি জানা যায়?

—০—

সম্পাদকের মন্তব্য।

যদি মনে হয় যশের জন্য লিখি তাহা হইলে সে ব্যভিচার তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আর যদি যাহাকে ভালবাসি তাহার মধ্যে ঐ দোষ আছে ভাবিয়া ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখান কিছু থাকে সেখানে সরল ভাবে বলাই উচিত, ওগো তোমার এই এই দোষ আছে ত্যাগ কর। প্রবন্ধে অনেক আত্মপ্রতারণা ধরিবার কথা আছে। কিন্তু প্রতিকারটি ঠিক ধরা হয় নাই বলিয়াই এই মন্তব্য।

শাস্ত্রকে নিজেদের মত গড়া, গুরুকে নিজের মত গড়া;

অধ্যাপককে নিজের মত গড়া সমাজকে নিজের মত গড়া আজ কাল-কার সাংঘাতিক রোগ। এমন কি শ্রীভগবান্‌কেও নিজের মত গড়া ইহা এই কালের এক প্রবল বাতিক দাঁড়াইতেছে।

আগে নিজেকে কাহারও মতন করিয়া গড়িয়া তুল। এই কাহারা হইতেছেন ভারতের ঋষি।

ভারতের ঋষি বলেন না তুমি কোন কালে অনাশ্রমী থাকিতে পার। ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস এই তোমার আশ্রম। যদি সংসার ত্যাগই করিতে হয় সন্ন্যাসের উপযোগী আপনাকে করিয়া বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বাহির হও। ইহা না কর তোমার হৃদয় ব্যভিচারী হইবে।

—০—

গড়িয়া লওয়া।

আজকালকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ দাঁড়াইয়াছে সকল জিনিষকে নিজের মতন করিয়া গড়িয়া লওয়া। এ রোগ এত বাড়িয়াছে যে যিনি ভাল হইতে সত্য সত্য চেষ্টা করেন এমন ভক্ত জনও শাস্ত্রকে, গুরুকে নিজের মতন করিয়া গড়িয়া লইতে চাহেন।

দেখিয়াছি সৎশিষ্যের অনেক লক্ষণ যাঁহাতে আছে তিনিও গুরুকে আপনার মতন করিয়া গড়িতে চাহেন। প্রায়ই শুনা যায় ভাল ভাল শিষ্যও গুরুকে উপদেশ দেন দেখুন গুরুদেব! আপনার এই কার্য্যটি করা উচিত নয়। আপনি এইরূপ ভাবে কার্য্য করিবেন অর্থাৎ শিষ্য যাহা বুঝেন গুরু যেন তাহা বুঝেন না। গুরু যেন অবিচারেই বহু কর্ম্ম করেন। অবশ্য বলিবার প্রণালী এমন আছে যাহাতে হয়ত কোন লোকনিন্দা যাহা গুরুর কর্ণে আইসে নাই তাহা শিষ্য ব্যথিত হইয়া গুরুদেবের নিকটে বলিতেও পারে। কিন্তু সেরূপ কথা বলার প্রণালী স্বতন্ত্র। পুত্র ও পিতাকে আপনার মনের ভাব জানাইতে পারে কিন্তু এমন ভাবে তাহা বলিতে হয় যাহাতে গুরু যেন

সকল বিষয় বুঝিতে পারেন না ইহা শিষ্যের মনে না থাকে। নতুবা গুরুকে ঠিক গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা হয় নাই। ইহাতে অনিষ্টই হয়। অবশ্য গুরুর পক্ষ হইতে ইহা বলিতে হইবে যে গুরু যদি মুখের উপদেশ মাত্র না দেন, যদি তিনি যাহা উপদেশ দেন সেইমত নিজেও আচরণ করেন আর নিজের মধ্যে গুরুত্ব অভিমান না রাখেন তবে তিনি শিষ্যের কোন দোষ ধরেন না; তিনি অন্য সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শিষ্যের যাহাতে ভাল হইবে তাহাই মাত্র বলিয়া যান। তিনি শিষ্যের নিকটে কোন্ কার্য্য কোন্ কারণে করেন তাহা সকল সময়ে ব্যাখ্যাও করেন না। সাধারণতঃ গুরু শিষ্য এই ভাবের থাকিতে পারে। অবশ্য সিদ্ধগুরুর কথা স্বতন্ত্র। আর গুরু সিদ্ধ অথবা সিদ্ধ নহেন্ এ বিচার শিষ্যের করা উচিত নহে। যদি একটা মাটির ঢিলের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারা যায় তবে সেই মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্য হইতেও শ্রীভগবান্ উদিত হয়েন আর দেহধারী গুরুকে যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস করা যায় তবে সে শিষ্যের কখন কোন অকল্যাণ হইতে পারে না এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গুরু এবং শিষ্য যখন সেই একটি মাত্র বস্তুকে ধর্ম্মজগতে এবং ব্যবহারজগতে সর্ব্বদা দেখিবার অভ্যাস লইয়া থাকেন তখন আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

শিষ্যের কর্ত্তব্য গুরুকে মানুষ ভাবে ভাবনা না করা—গুরুই ইষ্ট-দেবতা এবং গুরুই মন্ত্ররূপী ইহা সর্ব্বদা বিশ্বাস করা। কাজেই গুরুর ধ্যান যখন শিষ্য করেন তখন শ্রীগুরুর চৈতন্যকে ইষ্টদেবতার চৈতন্য ভাবনা করিয়া হইতেছে শ্রীগুরুকে ইষ্টদেবতার বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া শ্রীগুরুকে ইষ্টদেবতার সাজে সাজাইয়াই চিন্তা করা। ইহাকেই বলে গুরু ও ইষ্টদেবতাকে এক করিয়া লইয়া মন্ত্র জপ করা। আর মন্ত্রের অর্থেও যে চৈতন্যরূপা শ্রীগুরুকে পাওয়া যায় তাহাও মিলাইয়া লইতে হয়।

আবার গুরুর কর্ত্তব্য হইতেছে আপনার মধ্যে যাহাতে গুরুভাবের অহঙ্কার না আসিয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া। গুরু

আপনার চৈতন্যে সর্ব্বদা যেমন অভিমান রাখেন সেইরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যেও লক্ষ্য রাখিবেন।

গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্য ঠিক ঠিক যেখানে পালিত হয় সেখানে কাহারও পতনের আশঙ্কা থাকে না। ইহা না হইলেই শিষ্য নিশ্চয়ই গুরুকে গড়িতে চেষ্টা করেন অর্থাৎ শিষ্য গুরুকে আপনার মত করিয়া লইতে চাহেন।

গুরুতত্ত্ব ও শিষ্যতত্ত্ব যত সহজ ভাবা যায় তত সহজ ইহা নহে। আমাদের দ্বিতীয় কথা হইতেছে শাস্ত্রকে এমন কি ঈশ্বরকেও নিজের মত গড়িয়া লওয়া। আপনাকে শাস্ত্রের মত গড়িয়া লইতে হইবে এবং ঈশ্বরের মত গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা না করিয়া যখন শাস্ত্রকে এবং ঈশ্বরকে নিজের অভিপ্রায় মত গঠন করা যায় তখনই সমাজে বহু প্রকারের দলাদলি সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। "আমি তোমার" না হইয়া যখন একবারে "তুমি আমার" করিতে চেষ্টা করা যায় তখন সাধনার ভারি একটা বিপর্য্যয় অবস্থা আইসে। সাধনার ক্রমের বিপর্য্যয়ে যে ক্ষতি হয় তাহাতে কোনকালে ধর্ম্ম-জীবন লাভ হইতে পারে না। বরং সমাজে এবং আপন আপন চরিত্রে নানাপ্রকার ব্যভিচারকে সমর্থিত হইতে দেখা যায়। আজকালকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রায়ই ব্যভিচার লক্ষ্য করা যায়। ইহা হইতেই আপাপন্থী পথের সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ কি ইহা ছাড়িবে?

কর্ম্মের পরে।

হাসি পায় গো হাসি পায়। তোমার ধরণ দেখিয়া আমার বড় হাসি পায়। তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়ার দ্বারা জীবসমূহ মুগ্ধ। তুমি যে মায়ায় জগত সৃজন ও লয় করিতেছ, তোমার সেই মায়া বা প্রকৃতি তোমার কি করিতে পারে? সহজানন্দ পুরুষ তুমি, এত ব্যস্ত কেন? তোমার আবার লজ্জা ভয় কোথায়? আত্মারূপী তুমি, না হয়

তোমায় আমি এই আকারে সাজাইয়াছি। তোমার নিরাকার ভাব আমি ধরিতে পারি না বলিয়াই, তোমাতে এই প্রাণমোহন রূপ দিলাম। বেশ তো লাগে, তোমার এই সদানন্দ সৌম্য মূর্ত্তিখানি। তুমি যেন আপন ভাবে আপনি ভোর। তাই তোমার ভাবে ভাবিত হইতে জীবকে উপদেশ দাও। কিন্তু ঠাকুর! জিজ্ঞাসা করি, যদি এরূপে আসিয়াছ, তবে আসিয়াই এত যাই যাই কর কেন? কার জন্য পলাইতে চাও, তোমার জন্য, না আমার জন্য? অথবা কি এই দুর্গন্ধ রুধির-বহা অস্থি মেদ তরঙ্গাকুল দেহে বদ্ধ থাকিতে তোমার বড় কষ্ট হয়? ঐতেই ত আমার হাসি পায়। চিরমুক্ত মহাকাশের ছবি, ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে পড়িল। মহাকাশ আপন স্বরূপ ভুলিয়া ক্ষুদ্র ঘটে বদ্ধ হইবার মত যে ভান তুলিল, সেই ক্ষণিক ভানে কত যুগ যুগান্তর গত হইল। মাটির ঘট কতকটা মৃত্তিকা জল ও অগ্নি সহযোগে গড়া হইয়াছিল। গড়িয়াছিল কে? কুম্ভকার। সে জানে আমি ঘট নহি, ঘটের রচয়িতা, দ্রষ্টা, জ্ঞাতা। তুমিও এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্বষ্টিকর্ত্তা। তোমায় বদ্ধ করিতে কে পারে? তোমার প্রকৃতি? এই প্রকৃতির ভয়ে তুমি যেন শশঙ্কিত। সরল শান্ত তুমি—প্রকৃতির হাবভাবে একদিন ভুলিয়া, আপন স্বভাব ত্যজিয়া প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান করিয়া বড় ক্লেশ পাইয়াছ। তাই বুঝি এত ভয়? হরি হরি! এই প্রকৃতি তোমার কে? প্র শব্দে সত্ত্বগুণ, কৃ শব্দে রজগুণ, তি শব্দে তমোগুণ, এই না তুমি বল? তাহা হইলে যিনি ত্রিগুণাত্মিকা, এবং স্বষ্টি ব্যাপারে প্রধানা তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। স্বষ্টির আদিভূতা যিনি, তিনিই না প্রকৃতি। দেখনা, আমি ঠিক বুঝিলাম কি না? কিন্তু তুমি ত ত্রিগুণাতীত, তবে প্রকৃতিকে তোমার ভয়ের কারণ কি আছে? আবার তুমিই বল প্রকৃতি জড়। অচেতন লৌহাদি যেমন চুম্বক সান্নিধ্যে চৈতন্য লাভ করে। সেইরূপ জড় প্রকৃতি, চৈতন্যময় তুমি তোমার সান্নিধ্য বশতঃ তোমারই ইঙ্গিতে তোমার জগত রচনা করে। এই প্রকৃতি তোমার ইচ্ছা বা ক্রিয়াশক্তি। তুমি যখন আপন ভাবে আপনি থাক, তখন তোমার

ইচ্ছাশক্তি তোমারই মধ্যে লয় হয়। আবার যখন জগৎ খেলারূপ খেলা খেলিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তখন তোমারই ইচ্ছাশক্তি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড গড়ে ভাঙ্গে, তুমি দ্রষ্টা স্বরূপ শুধু দেখ। তবে দেখ ঠাকুর এই প্রকৃতিকে তুমি শতমুখে প্রবাহিত করিতে পার, আবার তুমিই তাহাকে শ্রীচরণে চিরতরে নিষ্পেষিত করিয়া আবার স্ব স্বরূপে স্থিতি লাভ কর। কিন্তু এই প্রকৃতি না হইলে তোমার লীলা হয় না। চুপচাপ বুঝি চিরদিন থাকা যায় না। গভীর অতলস্পর্শী সমুদ্রে বুঝি তরঙ্গ না না খেলিলে তাঁহার নয়নাভিরামরূপ উজ্জ্বল আভা দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে না? তাই না সাগর হইয়া কঠিন কর্ত্তব্য শিক্ষা দাও। আবার তরঙ্গ তুলিয়া প্রাণে প্রাণে ব্যাকুলতা ছড়াও। তোমার সবই তো বেশ লাগে। তুমি কখন তোমার প্রকৃতিকে আদরে গলাইয়া দাও। তোমার এত আদরই বা কে জানে বল, আবার তোমার মত এত কাঁদাইতেই বা কে মজবুত? তোমার কি সকলি অদ্ভুত? তোমার আদরেও সুখ, তোমার জন্য কান্নাও সুখ। তোমার বর্জ্জনেও সুখ, তোমার প্রতিষ্ঠায়ও সুখ। আবার তুমি যখন আমার জন্য নদ নদী গিরি গুহা বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে, তখন আমার বড় সুখ। আবার যখন আমার জন্য অপার বারিধি বন্ধনে শক্রপুরী আক্রমণ করিয়া রক্ষশরে সুকোমল নবদুর্ব্বাদল শ্যামল তনু জর্জ্জরীভূত হইত, তখনও আমার সুখ। আবার তুমি যখন আমায় বর্জ্জন করিয়া লোকরঞ্জন কর, তখন আমার ভারি আনন্দ। এ আনন্দ আমার তুমিই বোঝ। আমি না হইলে যেন তোমার চলে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রতপূজা সমস্তই অসম্পূর্ণ থাকে, তাই আমার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া, যজ্ঞেশ্বর তুমি, তোমার যজ্ঞ তুমি সম্পূর্ণ কর। তবে দেখ আমি তোমারি শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ এক। তবে তোমাতে তুমিই ভোল। আমার সাধ্য কি যে তোমায় ভুলাইয়া রাখি। ২৭

ব্যথার ব্যথী।

আহা!

ব্যথায় ভরা পরাণখানি
লুকান ছিলগো অন্তঃপুরে
পরাণ দরদী! রইতে নারি
ডাক্‌লে তারে হাজার সুরে।
নীল আকাশে আঁখর লিখে,
শ্যামলবনে, জলদ বুকে,
তপন তাপে, চাঁদিমা ভাতে,
অনলে, জলে, শতেক মুখে;
সকাল সাঁঝে পাখীর ডাকে
শুনালে কত প্রেমের বাণী,
মলয় মন্দ বুলালো স্নিগ্ধ
কোমল তব পরশ খানি।
বইতে নারি আপন বোঝা,
লুটালো যবে পথের পরে;
আসিলে ছুটি বহিতে বাধা
তুলিয়া নিলে আপন শিরে।
আকাশভরা বপুর বাঁধে
জুড়ায়ে দিলে পরাণ মন,
তোমার হাতে স্নেহের দানে
সফল তার জন্ম মরণ।

ছিল,

ব্যথায় ভরা পরাণখানি
তুলিয়া দিনু তোমার হাতে
আপন বলি রাখিও ধরি
আশিস্ কর বুলায়ে মাথে॥

—০—

২৫।৫

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

* অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, আশ্বিন—কার্ত্তিক। { ৬।৭ সংখ্যা।

ভারতের নিন্দা।

পৃথিবীর সকল লোক কি আজ ভারতের লোককে নিন্দা করে? বুঝি করে।

কিন্তু ভারতের জড় প্রকৃতিকে কেহ ত নিন্দা করিতে পারে না। ভারতের হিমালয়, ভারতের গঙ্গা, ভারতের গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত যথাসময়ে এই ঋতু পরিবর্ত্তন, ভারতের সুনীল আকাশ, ভারতের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি, ভারতের ঋতুতে ঋতুতে ফলফুল লতাবৃক্ষ পশুপক্ষী, ভারতের বিচিত্র সৃষ্টি কেহই ত আজ পর্য্যন্ত ইহার নিন্দা করে না। বরং জগতের লোকে ইহাও বলে যে, সমস্ত জগতে যাহা আছে ভারতে তাহারই সার সার বস্তুগুলি রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকারের ফুল ফল ভারত ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না; সকল প্রকারের ভ্রমর প্রজাপতি, সকল প্রকারের পশুপক্ষী এক ভারত ভিন্ন জগতের কোন দেশে নাই।

ভারতের বাহ্যপ্রকৃতি তবে জগতের বাহ্যপ্রকৃতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে ভারতের কোন্ বস্তুকে আজ জগৎ নিন্দা করে?

ভারতের নরনারী আজ জগতের সকল নরনারীর কাছে ঘৃণিত। কিন্তু চিরদিনই কি ভারতের নরনারী জগতের কাছে নিন্দনীয় ছিল?

এ কথা ত কেহ বলিতে পারে না! ভারতের রাম যুধিষ্ঠিরের মত রাজা, ভারতের ব্যাস বশিষ্ঠের মত ঋষি, ভারতের নারদের মত ভক্তযোগী, ভারতের ভীষ্মের মত সংযমী, ভারতের ভীমার্জ্জুনের মত দয়াশীল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাবীর—বল আর কোন্ দেশে পাইয়াছ? ভারতে ভরত লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা, মহাবীরের মত ভক্ত—বল কোথায় দেখিয়াছ? ভারতে সীতার মত স্ত্রী, সাবিত্রীর মত চরিত্র, মদালসার মত জননী—বল কোথায় পাইলে? বল এসব আদর্শ আর কোথায় পাও? বল কোন্ দেশে প্রহ্লাদ ধ্রুব দেখিয়াছ? তবে বল দেখি কোন্ আদর্শে কাহার দৃষ্টান্তে পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবে?

ভারতের মানুষ কি চিরদিন নিন্দনীয় ছিল? এখন না হয় ভারতের নরনারী হীন হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে যে গড়িয়া তুলিবে তাহা বল দেখি কাহার মতন করিয়া গড়িবে? ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী না গড়িয়া বিলাসী বিলাসিনী গড়িলে কি সুখ হইবে? তাঁহারা ত সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—তোমরা কি তাহা রক্ষা করিতে জান, না নিজের জীবনে সামঞ্জস্যের কোন কিছু দেখাইয়াছ? তবে বল দেখি তোমার এই খামখেয়ালী উপদেশে কাহার কি হইবে? তুমি তোমার হৃদয়ে এত ঘৃণা পুষিয়া রাখিয়াছ, তুমি তোমার দেশবাসীকে তোমার দেশের অমূল্যরত্ন সমূহকে কত ঘৃণার চক্ষে দেখ, তুমি ভালবাসিয়া উপদেশ দিতে পার না—তুমি কি প্রেমিক, না তুমি কামুক?

আজ জগতের লোক একদিকে চলিতেছে; তোমার ভারতের শিক্ষাদাতা যাঁহারা, তাঁহারা অন্য প্রকার শিক্ষা দিতেছেন। কোন্‌টি প্রকৃত শিক্ষা তাহা তুমি যদি না দেখ, যদি অনেক লোক যে পথে চলে

সেই পথে তুমি ভারতকে চালাইতে চাও—তবে কি তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলা যাইবে ? জগতের লোক আজ ভারতের শাস্ত্রকে নিন্দা করে ; তুমি এই ভারতের জল বাতাসে মানুষ হইয়া যদি ভারতকেই ঘৃণা করিতে শিক্ষা কর তবে তুমি কি তুমিই বুঝিও।

পারিবে না। ভারতের এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, ভারতের এই ত্যাগধর্ম্ম, ভারতের এই ব্রহ্মচর্য্য, ভারতের এই জাতিভেদ, ভারতের এই আশ্রমের ভেদ, ভারতের এই বিধবা—ইহার কোনটিই অসত্যে স্থাপিত হয় নাই। তুমি শত চেষ্টা করিয়াও ইহা তুলিতে পারিবে না। রামবিনাশে রাবণের চেষ্টার মত তোমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। স্মরণ রাখ, রাবণ মরিবার কালে এই বলিয়া মরিয়াছিল—"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী"। কতবার কলিযুগ আসিয়াছে, কিন্তু সত্যের নাশ কি হইয়াছে ? যে জাতিভেদ ভাঙ্গিতে তুমি এত প্রয়াস করিয়াছ, সে জাতিভেদ আজকালকার সভ্যতাও আদর করিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে বলিতেছে। যে ইয়ুরোপকে তুমি গুরুস্থানে বরণ করিয়াছ সেই ইয়ুরোপই জাতিভেদকেই শ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। ১৩২৪ সালের বৈশাখের উৎসবে কলির উপদ্রবে আমাদের লক্ষ্য প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিও।

শান্ত হও। হইয়া ঋষিগণের পদানুসরণেই চেষ্টা কর, শুভ হইবে ; নতুবা তোমার নিজেরও ভাল হইবে না, দেশের কল্যাণও তুমি সাধিতে পারিবে না। মরিবার সময় এই বলিয়া মরিতে হইবে "My Life is a failure."

কথা-রামায়ণ আরম্ভে সদা স্মরণের কথা।

জীবন্ত ভাবে শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে হইবে। একক্ষণও তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পাইবে না। ঋষিগণ এই শিক্ষার উপর সমাজ গঠন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। নিজ

নিজ কর্ম্মফলে যে যেমন ক্ষেত্রে আসিয়া জন্মিয়াছে, সে আপন অধিকার মত সর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে অভ্যাস করুক ; তাহাতেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

কথা-রামারণ লিখিলেই কি জীবন্তভাবে শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকা যাইবে ? না কথা-রামায়ণ পড়িলে তাহা হইবে ?

লিখিলে বা পড়িলে যে হইবে এ কথা বলে কে ? কোটিকল্প বই লিখিলেও কিছু হইবে না, বই পড়িলেও হইবে না,—যদি শ্রীভগবানের কথা যাহা লেখা গেল বা পড়া গেল তাহা কার্য্যে অভ্যাস না করা যায়।

কি অভ্যাস করাইতে চাও ?

কথা-রামায়ণ ধরিয়া "কথা কওয়া" অভ্যাস করিতে বলি।

কেন বল ?

যাহা মানুষ করে তাহা ধরিয়াই মানুষকে উপরে উঠিবার পথটি শাস্ত্র দেখাইতেছেন। ইহারই জন্য অধিকারী বিচার, ইহারই জন্য লঘূপায়।

মানুষ কথা কহিতে বড় ভালভাসে। যখন লোকের কাছে থাকে তখন কত কথা কয়, কত অসম্বন্ধ প্রলাপও বকে। আবার যখন একা থাকে কেহই কাছে থাকে না—তখন মনে মনে কত লোককে জাগায়, জাগাইয়া তাদের সঙ্গে কথা কয়। এমন কি, রাস্তাতেও যখন একা চলে তখন কত কথা কয়, কত অঙ্গভঙ্গী করে। যতক্ষণ জাগিয়া থাকে ততক্ষণ যেন কথা কহিতে ছাড়ে না। প্রায় লোকের এই স্বভাব। শাস্ত্রকারগণ মানুষের এই সাধারণ স্বভাব অবলম্বন করিয়া কিরূপে ইহাদিগকে ভাল করা যায় তাহার উপায় বলিয়াছেন।

মানুষ যে যা তা কথা কয়—নানা অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে, ইহার মাত্রা বেশী হইলেই মানুষ পাগল হয়। অসম্বন্ধ প্রলাপে মানুষের বড় অনিষ্ট হয়। এত অনিষ্ট হয় যে, জপ পূজা করিবার সময়েও মানুষ এক করিতে আর করিয়া বসে ; শ্রীভগবানের নাম করিতে গিয়া কত ছাই রাই অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিয়া উঠিয়া আসে আর মনে ভাবে জপ পূজা

করিয়া আসিলাম। ফলে ইহা জপ পূজাও নহে, ধ্যান ধারণাও নহে। ইহাকে সাধন ভজন বলে না।

ঋষিগণ সেই জন্য লঘূপায়ে বলেন শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা কহিতে অভ্যাস কর—কিছুদিন তাঁহাদের কথা মত চলিয়া দেখ, দেখিবে শ্রীভগবান্ জীবন্তভাবে তোমার হৃদয়ে তোমার নিয়ন্তা হইয়া তোমায় রক্ষা করিবেন। কিছুদিন অভ্যাস কর তুমি আপনিই বুঝিবে তিনি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র; তুমি চলিতেছ, তিনি কিন্তু চালাইবার মালিক। আহা! বড় সুখের অবস্থা ইহা।

শ্রীভগবান্ আমার প্রভু, আমার গতি, আমার ভর্ত্তা, আমার সুহৃৎ ইহা অনুভব করায় কত সুখ।

সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকায় কত সুখ। মানুষ যদি সর্ব্বদা জীবন্ত শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকিতে পায়, তবে আর কি চায়? আর কি অভিলাষ করে? আর ত কোন অভিলাষ তখন থাকে না—মানুষের ত তখন সব হইয়া যায়।

ঋষিগণের লঘূপায় মত কার্য্য করিলে ইহা হয়। করিয়া দেখ নিশ্চয়ই হইবে।

বল কি করিতে হইবে?

সাকার মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া নিরাকারে পৌঁছান যায় ইহা ঋষি-গণের মীমাংসা। "সাকারেণ মহাদেবি! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ" এই কথা বড় সত্য। একাগ্রতার পর নিরোধ এ কথার প্রতিবাদ হয় না।

তোমার উপাস্যের একখানি ছবি সম্মুখে রাখ। প্রথমেই ভাবনা কর পটের ছবি যেটি, সেটি কিন্তু কাগজ মাত্র। সেই ছবি যাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তিনিই জীবন্ত ভগবান্। সকল জীবের দেহই তুমি—চৈতন্যপুরুষ, তোমার দেহ এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্তু। সকল জীবের চক্ষু কর্ণ লইয়া তুমিই দেখ, তুমিই শুন। আমার চক্ষু কর্ণ লইয়া তুমিই দেখিতেছ, তুমিই শুনিতেছ। তুমি চৈতন্য, তুমি জড় নহ। জগতের সকল বস্তুতে তুমি চৈতন্যরূপা হইয়া

বিরাজ করিতেছ। সর্ব্বদা ইহা যদি স্মরণ করা যায়, তবেই ত সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে লইয়া সুখে থাকা যায়। রাগদ্বেষের আর স্থান কোথাও থাকে না। চিত্তশুদ্ধি সহজেই হয়। এইটিতে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যই না শাস্ত্র, পটের ছবিটি যাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কহিতে বলিতেছেন? প্রথমে পটের ছবির সঙ্গে কথা কহিতে অভ্যাস কর—আর পটের ছবি যাঁকে স্মরণ করাইয়া দেয় তিনি যে সর্ব্বব্যাপা তাঁহার ভাবনা কর—দেখিবে আকাশ মেঘ বায়ু বৃক্ষলতা পশুপাখী নরনারী সকলকে দেখিয়া সেই একেরই সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছ। একটু পাকা করিয়া অভ্যাস করিয়া ফেল—দেখিবে সেই একই সবার মধ্যে থাকিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছে। পাখীর শব্দে, পশুর চিৎকারে, বায়ুর গর্জ্জনে, সাগরের তরঙ্গে, মেঘের আস্ফালনে—সেই একই এক করিয়া আর করিতেছে বুঝিবে। সকলের মধ্যে থাকিয়া সেই তোমায় কত আদর করে অনুভব করিতে তখন ক্লেশ হইবে না।

আহা! ইহা ত বড় সুন্দর! ভাল করিয়া বল কিরূপে আরম্ভ করিব? বলিতেছি ত পটের ছবির সঙ্গে কথা কও। পটের ছবি পটের ছবিই নহে তোমার সর্ব্বব্যাপী অথচ মূর্ত্তিধারী ইষ্টদেবের প্রতিমা ইহা। এ কথাও সত্য যে যখন তুমি কথা কহিতে আরম্ভ কর তখন তুমি বেশী কথা পাওনা। দুই চারিটি কথা কহিলেই তোমার কথা ফুরাইয়া যায়। সেই জন্য ঋষিরা যে ভাবে কথা কহিয়াছেন সেই ভাবে কথা কহিতে অভ্যাস কর। মনে কর রামায়ণ তুমি অবলম্বন করিয়াছ। ভগবান্ বাল্মীকি যে ভাবে শ্রীভগবান্ রামের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন তাহা পড়িয়া পড়িয়া রামের সঙ্গে তুমি কথা কহিতে অভ্যাস কর।

বড় সুখ পাইবে তখন যখন ভগবান্ বাল্মাকির কথা লইয়া সেই চৈতন্য পুরুষের সঙ্গে তুমি কথা কহিতে পারিবে। ক্রমে দেখিবে পটের ছবি জীবন্ত। দেখিবে পটের ছবি যেমন পটে জীবন্তভাবে আসিয়াছে সেইরূপ হৃদয়পটেও ইনি সজীব হইয়া তোমায় চালাইতে-

ছেন আবার সারা বিশ্বে তিনিই সকলকে লইয়া কত অভিনয় করিতে-ছেন। তোমার সুখের তখন শেষ থাকিবে না। লোকে যাহাকে সুখ দুঃখ বলে, হর্ষ বিষাদ বলে, জয় পরাজয় বলে, লাভ অলাভ বলে, শীত গ্রীষ্ম বলে তুমি সেই সকল ভাবে একজনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা এক আনন্দের অবস্থাতেই থাকিবে—মাতা পিতা গুরু আচার্য্য ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলের মধ্যে এক জনকে দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে, না আর কোন অশ্রদ্ধা অভক্তি করা যায় ?

আচ্ছা রামায়ণের সকল কথাই ত রামের সঙ্গে হয় নাই। এখানে অন্য কথাও ত আছে ?

আছে সত্য। কিন্তু কোথাও কথা প্রত্যক্ষে তাঁর সঙ্গে কোথাও কথা পরোক্ষে। প্রথমে সাক্ষাতে তাঁর সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল তাহাই না হয় অভ্যাস করিও। পরে পরোক্ষে কথা অভ্যাস করিবে।

কথা-রামায়ণে এই দুই থাকিবে।

এখন আরম্ভ কর।

ইষ্ট অবলম্বনে।

কবে হবে তব সনে সে সুখ মিলন
তব প্রেমে মাখা হয়ে রব সর্ব্বক্ষণ।
প্রতিবাক্যে প্রতি কর্ম্মে সুধাব তোমারে
সকল ভাবনা মম হবে তোমা তরে।
শোক দুঃখ ব্যথা জ্বালা যখনি আসিবে
স্মরিলে সে হাঁসি মুখ সব দূরে যাবে।
যে দিকে ফিরাব আঁখি হেরিব তোমারে
প্রেমময় শান্তিময় সবার মাঝারে।
ওই রূপে পূর্ণ ধরা আর কিছু নাই

যাবে মুছি দৃশ্য দোষ রবে মাত্র ওই।
জীব মাঝে আত্মারূপে আমাতে চৈতন্য
বিশ্বরূপ এ জগৎ মূর্ত্তি ভক্ত জন্য।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
এই খেলা নিরন্তর করিব দর্শন।
এ সংসার ছায়াবাজী মায়ারূপ তব
যাহা নাই আছে তাই এই অনুভব।
ভুলিয়া অসৎ যাহা সতে হব স্থির
শান্তিপূর্ণ হবে প্রাণ আনন্দে অধীর।
মিছার পশ্চাতে ছুটি কোন সুখ নাই
সর্ব্বানন্দময় তুমি তোমাকেই চাই।
সংসার বাসনা মোর গেছে চিরতরে
তোমারি করুণা স্মরি প্রাণ উঠে ভ'রে।
পূজিতে চরণ মাত্র সাধ জাগে প্রাণে
তুলসী চন্দন মাখি দিই শ্রীচরণে।
যা কিছু আমার ছিল করিয়া তোমার
তুমি আমি এক হ'য়ে রব অনিবার।
স্বরূপে সুন্দর তুমি পূর্ণ প্রেমময়
স্মরণ বন্দন ধ্যান ও পদ আশ্রয়।
আমি গো তোমারি বলি লুঠি পদ পরে
আশ্রিতা বলিয়া সখা লবে চিরতরে।
মিলন আনন্দে ভরি এ মম হৃদয়
তব ও চরণপ্রান্তে হ'য়ে যাবে লয়॥

২৮।৪

ভার দেয় কে ?

১

সে ত ভার লইতে সদাই প্রস্তুত। কিন্তু ভার দাও কৈ ? মুখে বল সব ভার ত তোমায় দিয়াছি কিন্তু কাজে কর কি ? যদি সব ভারই আমায় দিলে তবে আবার ভাব কেন ? আমি যাহা করিতে বলিয়াছি, যাহা করিয়া তুমি শান্তিও পাইয়াছ—তাহাই কেন করিয়া যাও না ? সব দিন সমান পার না কিন্তু চেষ্টা ত কর। সে চেষ্টাই ত আমার কাছে পৌঁছায়। তবে না পারিলে চিত্তকে এরূপ অসন্তুষ্ট কর কেন ? যার সব ভার তার উপর, তার চিত্ত আবার অসন্তুষ্ট থাকিবে কিরূপে ? আর ঐ যে উপদ্রব আসিয়া তোমাকে তোমার মনের মতন, কাজ করিতে দেয় না—ইহাই ত উপদ্রব। এই কালে জন্মিয়াছ যখন, তখন এ উপদ্রব ত থাকিবেই। তাহাতে মন উচাটন করিলে উপদ্রব ত আরও বাড়িয়া যাইবে। যাহা হয় হউক, যা আসে আসুক—তুমি তাহার মুখ স্মরিয়া, তার নাম করিয়া আর যদি এসব কিছু নাও পার তবে তারে প্রণাম করিয়া করিয়া সকল অসুবিধাগুলি তার চরণে নিবেদন কর দেখিবে সে তখনি তোমার মনকে সুস্থ করিয়া দিবে। সে যে সব ভার লইয়াছে। সে কি তোমাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে ? তবে ভাল করিয়া দেখিও তোমার মধ্যে কোন কপটতা যেন না থাকে। কপটতা ধরিবার কৌশল হইতেছে তোমার কোন ভোগেচ্ছা আছে কিনা তাহার বিচার পুনঃ পুনঃ করা। যখন দেখিবে কোন ভোগেচ্ছা তোমার নাই, তখন জানিও তুমি ভার দিয়াছ আর সেও ভার লইয়াছে। একবারে যদি ভোগেচ্ছা না যায় তবে এক কর্ম্ম কর কিছু খাওয়া পরার ইচ্ছা জাগিলে অপরকে নারায়ণ বোধে খাওয়ান বা পরাণর অভ্যাস করিতে থাক ; ভোগেচ্ছা ক্রমে যাইবে ! কিন্তু স্ত্রী পুত্র কন্যাকে অপর মনে করিও না। ইহাদের উপর আমিত্ব মাখা হইয়া গিয়াছে। যেখানে আমি মাখা হয় নাই, সেই অপর।

২

আমি আর বোঝা বহিতে পারি না। এটা চিন্তার বোঝা। যদি যেখানে আছি সেইখানে থাকিয়াই নিজের কাজ করিয়া যাইব ইহা স্থির থাকিত, তবে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ অন্যত্র করিব ভাবিয়া রাখিয়াছি; যাইতে না পারিয়া মন উচাটন করিতেছি। এই সময়ে কিন্তু সব ভার আমার উপর লইয়াছি তাই এই কষ্ট পাই। তাই বলিতেছি আমি ঐ চরণে সব সঁপিয়া স্বাধীন হইতে চাই। যে সময়টুকু আছে তাহাতে হইবে ত?

তোমার অধীন হওয়াই আমার স্বাধীনতা। তোমার অজ্ঞাতে ত কোন কিছুই হয় না বিশ্বাস করি, তবে যাহা আসে আসুক তাতে আমার বিচলিত হইবার বা কি আছে? আমি সদা সজাগ থাকিয়া তোমাকে সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা সবই জানাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তোমায় ডাকিতে চাই। যাহা আসে আসুক, আমি কিন্তু তোমাকে জানাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। এই মুহূর্ত্তেও তাহা অনুভব করিতেছি।

আমি সীতারাম সীতারাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম সদা সজাগ হইয়া জপিতে জপিতে সর্ব্বব্যাপী তুমি, সর্ব্বরূপ তুমি তোমার স্মরণ করিতে চাই। কোন কিছু করিতে হইলে—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে যখন তাহাকে কিছু বলিতে হইবে তখন; যখন স্নান করিতে হইবে তখন; যখন আহার করিতে হইবে তখন; যখন জপ ধ্যান করিতে হইবে তখন; যখন কিছু লিখিতে হইবে তখন; যখন নিদ্রা যাইতে হইবে তখন; যখন কিছু পড়িতে হইবে তখন; যখন কিছু ভাবিতে হইবে তখন; যখন তীর্থাদিতে যাইতে হইবে তখন—সকল সময়ে—এমন কি যখন রাগদ্বেষ হয় তখন; আবার যদি জানিয়া শুনিয়াও রাগদ্বেষ দমন করিতে না পারা যায় তখন; সকল সময়েই তোমাকে হৃদয়কমলে স্মরিয়া স্মরিয়া দেখিয়া দেখিয়া জানাইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে—ইহাই হইল সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া করিয়া জপ অভ্যাস। ইহারই অন্য নাম "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে"। ইহারই অন্য নাম "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা"।

ইহা অভ্যাস করিতে পারিলে—শাস্ত্র বলেন—

"তেষাং মৃত্যুভয়াদিনী ন ভবন্তি কদাচন"।

তারে সকল ভার দিয়া এই অভ্যাস কর না। কর, শমন ভয় এড়াইতে পারিবে। আর ইহাতেই সংসার উপদ্রব কাটিবে। কিন্তু ইহাও জানিও, শুধু বোকার মত অভ্যাস করা অপেক্ষা জানিয়া শুনিয়া অভ্যাস করা শ্রেয়। আবার জানিয়া শুনিয়া অভ্যাস করা অপেক্ষা ধ্যান করা ভাল। আবার ধ্যান পাকা করিয়া ধ্যানে থাকিয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা।

ভার দাও। ভার দিয়া এই সব কর। বুঝিবে সে ভার লইয়াছে।

মহামিলন।

পবিত্র সে গৃহে যবে তোমার কাছেতে যাই,
কিছু নাহি মনে থাকে নূতন জীবন পাই।
জ্যোতির মাঝারে তব জ্যোতির্ম্ময় রূপ হেরি,
নিজেও জ্যোতির হয়ে জ্যোতির্ম্ময় সেবা করি।
শান্ত! সেথা সব শান্ত, শান্তির বাতাস বয়,
পশুপাখী তারা সদা সে প্রিয় নামটি গায়।
বিকশি কুসুম কত রয়েছে আনন্দ ভরে,
তুলিয়া সে ফুলরাশি দিই সে চরণ 'পরে।
সে স্নেহ নয়ন দুটি সতত আমারে চায়,
হৃদয়ের ব্যাকুলতা না বলিতে বুঝে নেয়।
এত দিনে দয়া ক'রে ডেকেচ তোমার ব'লে
সকলি জানিছ দেব ডুবে আছি মোহজালে।
এ মহামিলন আজ তোমার বিজন বাসে,
আমার আমিত্ব নাশি লও নাথ তব পাশে।

২১।২৭

অভ্যাসের গুরুত্ব।

বিনা অভ্যাসে জীব পরমপদে স্থিতিলাভ করিতে কখন সমর্থ হইবে না। কত ভাল কথা শুনিয়াছ, কত ভাল কথা বলিয়াছ, কিন্তু তবুও যে কিছু হয় না, তবুও যে রাগদ্বেষ গেলনা—কেন বল ত শুনি? শুধু অভ্যাস করনা তাই। বৈরাগ্যের কথা কত শুনিলে, কতবার বৈরাগ্যের মূর্ত্তি দেখিলে কিন্তু অভ্যাস ত করিলে না—তবে বৈরাগ্য স্থায়ী হইবে কিরূপে? তমোগুণ আক্রমণ করিলে মৃত্যুচিন্তা করিতে হয়; রজোগুণে নিষ্কাম কর্ম্ম চিন্তা করিতে হয়, কৈ বল ইহার অভ্যাস করিলে? ঈশ্বর প্রণিধান ত অতি সুন্দর সাধনা। প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্য উচ্চারণে এবং প্রতি কর্ম্মকালে অগ্রে হৃদয়ের রাজাকে জানাইয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। জানিলে ত এই কথা। কথাটি বলিয়া দিলেই বল ইহা সহজ। সকলেই করিতে পারে। কিন্তু অভ্যাস করিলে কবে, যে ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিবে? প্রতি কর্ম্মে শ্রীভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিতে হয়; শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী বড় সুন্দর ইহা ত বলিলে কিন্তু অভ্যাস করিলে কবে, যে সিদ্ধিলাভ হইবে? জীব মাত্রই আত্মা। মানুষ দেহ নহে মানুষ মনও নহে, তুমি আত্মা, তুমি চেতন কবে ইহা অভ্যাস করিলে যে হইবে? তাই বলি অভ্যাস সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম কিছু জানিয়া রাখা ভাল। যেমন পিতার ফটোটিই পিতা নহে সেটি শুধু কাগজ ছবিটি যাঁরে স্মরণ করাইয়া দেয় তিনিই পিতা, সেইরূপ শ্রীভগবানের নামটি শুধু অক্ষর মাত্র কিন্তু নামটি যাঁহাকে মনে করিয়া দেয় তিনিই শ্রীভগবান্। তাই তাঁহাকে একটু বুঝিয়া লইয়া তবে নাম করা উচিত। বুঝিয়া নাম করিলে দেখিবে, যিনি পরিপূর্ণ অধিষ্ঠানচৈতন্য, যিনি আবার সর্ব্বদা আপনার আপনি আপনি ভাবরূপ তুরীয়ে থাকিয়াও বিশ্বরূপ সাজেন, সাজিয়া সকল দৃশ্য পদার্থের সাররূপে, সকল দৃশ্য বস্তুর প্রাণরূপে জগৎ-দেহ ধারণ করেন, যিনি জীবে জীবে চৈতন্যরূপে থাকিয়া জগৎ

রক্ষা করেন এবং যিনি জগতের বিপর্য্যয়কালে মায়া-মানুষ বা মায়া-মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন এবং ভূভার হরণ করেন,—সেই সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতার যিনি নামটি তাঁহারই নাম ; নামের সঙ্গে রূপ গুণ কর্ম্ম এবং স্বরূপ সর্ব্বদা জড়িত। বুঝিয়া নাম করিলে সর্ব্বত্র যে নামী চৈতন্য আছেন তাঁহার স্মরণ হয়। তবেই দেখ জগতের সকল বস্তু, জগতের সকল জীব, সুন্দর কুৎসিৎ, শত্রু মিত্র, জল স্থল, আকাশ বায়ু, পর্ব্বত সমুদ্র যাহা কিছু দৃশ্য বস্তু জগতে আছে সকলেই সেই নামকে সেই নামীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

নাম জপের আরও সঙ্কেত এই যে তোমার দেহের ভিতরে হয় হৃৎপদ্মে বসিয়া অথবা কূটস্থে আসিয়া আপনার জ্যোতিমণ্ডিত গৃহে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বীজ মন্ত্রের মধ্যে বা প্রণবের মধ্যে নামটি চক্ষে দেখিতে দেখিতে এবং কর্ণে সেই নামের শব্দটি শুনিতে শুনিতে নাম জপ। জপ সাঙ্গ করিয়া একবার চুপ করিয়া থাক। সেই সময়ে সহস্রারে স্থিতিলাভের প্রয়াস কর।

যতক্ষণ স্থূল দেহের অভিমান রাখ ততক্ষণ প্রণাম প্রদক্ষিণ পূজা সাজান খাওয়ান এই সমস্ত মানস ব্যাপার, তারে হৃদয় কমলে বসাইয়া নিত্য অভ্যাস কর। পরে যখন বুঝিবে নাম যাঁহার তিনি চৈতন্য আর তুমি সেই পূর্ণ চৈতন্যের অংশ মাত্র তুমি ও চেতন, যখন ভাবিতে পারিবে তুমি ভ্রমে খণ্ড চৈতন্য হইয়া যেন আছ কিন্তু তোমার নাম সেই অখণ্ড চৈতন্যের নাম আর তোমার ভ্রম জনিত খণ্ডভাব, তোমার অজ্ঞান জনিত অল্প শক্তিমত্তা, তোমার অবিদ্যা জনিত জন্ম মরণ ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ তুমি নিজের শক্তিতে সরাইতে পার না বলিয়া তুমি খণ্ড হইয়া অখণ্ডের শরণাপন্ন হও—হইয়া নিত্য সন্ধ্যা পূজা কালে নামরূপী মন্ত্রে তাহাকে ডাক আবার ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বদা নাম জপ করিতে করিতে সকলকে দেখিয়া তারেই স্মরণ কর—এক কথায় যখন তুমি বুঝিতে পার তুমি স্থূল দেহ নও তুমি সূক্ষ্ম দেহ নও তুমি চেতন অথচ অজ্ঞান অবিদ্যা ভ্রমে মনে কর তুমি খণ্ড চৈতন্য মাত্র তখন

তুমি আজ্ঞাচক্রে থাকিতে অভ্যাস কর। শেষে যখন ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্থির হইয়া বসিয়া থাক তখন তুমি সহস্রারে থাকিও। সহস্রার হইতেছে নির্ব্বাণ ক্ষেত্র স্থিতির স্থান। এই তিন স্থানে থাকিতে অভ্যাস কর। জপ পূজা ইত্যাদি হৃদয়ে,চৈতন্য ভাবনা কূটস্থে আর স্থিতি অভ্যাস ব্রহ্মরন্ধ্রে। এই ভাবে কর্ম্ম অভ্যাস কর। বুঝিয়া অভ্যাস কর, করিলে কর্ম্মের ঘরে আর আটকাইবে না অথচ গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে সেই জন্য শ্রীগীতা বলিতেছেন

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥

ধ্যান করিয়া বসিয়া থাকা প্রথম অবস্থা। কিন্তু মনকে ধ্যানের বস্তুতে সর্ব্বদা রাখিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া হাতে পায়ে যথা-প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হওয়া ধ্যানে বসিয়া থাকা অপেক্ষা অতি উত্তম।

বলা হইল সব। শুনাও হইল সব। এখন অভ্যাস করা মাত্র বাকী। এই মুহূর্ত্ত হইতে নাম বুঝিয়া সর্ব্বদা নাম অভ্যাসে লাগিয়া পড় বড় শুভ হইবে। নতুবা শুধু শাস্ত্রের বুলি যদি কোটিকল্প আও-ড়াও বিনা অভ্যাসে বিনা নিত্য অভ্যাসে তোমার ধর্ম্ম জীবন লাভ হইবে না; তোমার রাগ দ্বেষও যাইবে না। তুমি মনের শান্তিও পাইবে না। আর নিশ্চয় ইহা জানিও মৃত্যুকালে তুমি ফাঁকিতে পড়িবে। তাই বলি নাম কর আর সর্ব্ব বস্তুতে তোমার নামীকে সর্ব্বদা স্মরণের অভ্যাস লইয়া থাক। আহা! কত সুখ তখন যখন সর্ব্ব জীবে, সর্ব্ব অবস্থায় তুমি তারে স্মরণ করিতে পারিবে? কত সুখ তখন যখন সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা শত্রু মিত্র পুত্র কন্যা মাতা স্ত্রী সকলকে দেখিয়া তুমি তারে স্মরণ করিতে পারিবে? কত সুখ তখন যখন বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, পতঙ্গ পিপীলিকা, নর নারী, আকাশ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, বায়ু জল, সমুদ্র পর্ব্বত—যাহা দেখিবে তাতেই তারে স্মরণ হইবে? কত সুখ তখন যখন পাখীর শব্দে, বাতাসের শব্দে, তরঙ্গভঙ্গের কল্লোলে সে কথা কহিতেছে বুঝিবে? কত সুখ তখন—যখন ইষ্ট দেবতাকে মানস চক্ষে

দেখিতে দেখিতে বাহিরের সকল বস্তু দেখিতে শিখিবে। অভ্যাস কর নতুবা দুঃখ পরিত্রাণের অন্য পথ নাই।

সংক্ষেপে অভ্যাসের বিষয়গুলি আবার বলি।

১। সমস্ত ভাবনা, সমস্ত বাক্য, সমস্ত কর্ম্ম তার স্মরণে তাঁতে অর্পণ। প্রতি দুঃখের সময়ে, প্রতি সুখের সময়ে তাঁরে স্মরণ কর অগ্রে স্মরণ করিয়া সুখও তাঁতে অর্পণ কর দুঃখও তাঁতে অর্পণ কর।

২। ইহার অভ্যাস জন্য প্রতিদিন (১) ত্রিসন্ধ্যায় অসম্বন্ধ প্রলাপ তাঁতে অর্পণ কর, করিয়া (২) অসম্বন্ধ প্রলাপ বন্ধ করিয়া তবে সন্ধ্যা কর সর্ব্বদা জপ অভ্যাসে ব্যবহারিক সবই তাঁরে স্মরণ করিয়া কর।

৩। চরিত্র গঠন জন্য সর্ব্বদা তাঁরে লইয়া থাকিতে অভ্যাস কর সেই জন্য সর্ব্বজীবে যে চৈতন্য আছেন প্রথমেই তাহা নিজের মধ্যে দেখিয়া দেখিয়া দেখিতে অভ্যাস কর এবং বিপরীত দর্শন ত্যাগ জন্য অন্য কতকগুলি বিষয় বুঝিয়া অভ্যাস কর।

(১) নিজে সম্মান চাহিও না—সকলকে সম্মান দিতে অভ্যাস কর আর মানুষ মুখোশ মাত্র এই ভাবিয়া চৈতন্যে লক্ষ্য কর আর কোন মানুষের সমালোচনা করিও না।

(২) সর্ব্বত্র চৈতন্যে লক্ষ্য রাখিয়া বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথা পাতি লয় এই ভাবে সংসারের দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া চল। ইহাই প্রারব্ধ ভোগ জানিও।

(৩) কামের সংসার করিও না প্রেমের সংসার কর। নিজের সুখের জন্য যদি পতি পুত্র বিলাস আড়ম্বর চাও তবে তুমি কামুক বা কামুকী। কিন্তু নিজে দুঃখ নিজের অভাব অগ্রাহ্য করিয়া অন্য সকলের মধ্যে শ্রীভগবান্ আছেন জানিয়া যখন তাঁহার সন্তোষের জন্য সব করিতে অভ্যাস কর তখন জানিও প্রেমের সংসারে ঢুকিয়াছ। এই অভ্যাস কর দেখিবে সর্ব্বপ্রকার মানে অপমানে, সুখে দুঃখে, তিরস্কারে পুরস্কারে, অভাবে অসুবিধায়, এমন কি শেষে শীতে গ্রীষ্মে, বাতা-তপে,—সকল অবস্থায় সকল সময়ে তুমি একজনকে লক্ষ্য করিয়া

করিয়া আর কিছুতেই বিচলিত হইবে না। ধীর স্থির ভাবে তুমি তাঁরে স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারিবে; আর বুঝিবে মঙ্গলময়ের নিকট হইতে যাহা আসিতেছে তাহাতে অমঙ্গল হইতেই পারে না; দুঃখও যে তার স্নেহের দান তখন বুঝিবে।

৪। কুমারী যুবতী বৃদ্ধা দেখিয়া মাকে ভাবিতে অভ্যাস কর। ইহাদের হাঁসি ইহাদের কথাবার্ত্তা ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মায়ের হাঁসি মায়ের চলন বলন মায়ের হাব ভাব মায়ের স্বরূপ যেন স্মরণ করাইয়া দেয়।

৫। সকল পুরুষ সকল স্ত্রী দর্শনে—আদি পুরুষ আদি স্ত্রী রূপী তোমার ইষ্ট দেবইষ্ট দেবীর স্মরণ অভ্যাস কর। এই সমস্ত অভ্যাস কর হইবে। না কর সুখ দুঃখের হাতে স্ত্রী পুত্রের হাতে, পরিবার সমাজের কাছে তুমি ক্রীড়ার পুতুল। না কর তোমার দুঃখ কিছুতেই দূর হবে না। দিন দিন দুঃখ বাড়িয়াই যাইবে। আর কর বড় সুখী হইবে।

—০—

অভ্যাস।

আমি—এতদূরে আসি ফিরিয়া দেখিনু
জীবনে অভ্যাস সকলি বাকি।
আমি—যাহা ভাল জানি অভ্যাস করিনি
এখন ত দেখি পড়েছি ফাঁকি॥
তবু তুমি বল এখনও হইবে
এখনও সময় অনেক আছে।
না হও হতাশ ত্যজ হা হুতাশ
নব বলে চল করিয়া অভ্যাস
গত ভবিষ্যৎ ভাবনা ছাড়িয়া
বর্ত্তমান ধর সে তোমার কাছে॥

নাম—নিতুই বুঝিবে সদা লয়ে রবে
বায়ু যেন শূন্য কভু না ছাড়ে।
তেমনি ভিতরে শ্বাসে শ্বাসে নাম
জ'পে চল বুঝে রস তায় বাড়ে॥
শুধু জপা চেয়ে জেনে জপা ভাল
জ্ঞান চেয়ে ধ্যান আরও মহত্তম
ধ্যান হ'তে ফলাকাঙ্ক্ষা সদা ত্যজ
তারে লয়ে সদা তারি কাজে মজ॥

—০—

ব্যাকুলতা?

মা আমার ষোড়শী। ছেলে কিন্তু পঁচাশী। এ বা কেমন তা যে জানে সে জানে। এই বুড়ো ছেলের জন্য মা কি ব্যাকুল হয়? দেখি ত মা ব্যাকুল হয়। এ কথা যখন সূক্ষ্মভাবে ভাবি তখন কিন্তু মায়ের কাছে যাই। স্থূল দেহটাকে লইয়া যাইতে পারি নাই সত্য—"স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে" এই বিপর্য্যয়কালে নিজের দেহটাও যে নিজের নয়—এই মড়াটা টানিতে সবাই যে ভার বোধ করে—তাই এটাকে লইয়া যাইতে পারি না। পারি না বলিয়া লইয়া যাই না তাহাও ঠিক নহে, লইয়া যাইতে চাইও না। মা আমার ষোড়শী তাই লইয়া যাইতে চাই না। যে মা আমার পদ্মালয়া—যে মা কমলদলবাসিনী, যে মা কদম্ববনচারিণী তাঁর কাছে কি এই দেহ লইয়া যাওয়া যায়? তা যায় না। তাই এই দেহটার উপরে আমার বৈরাগ্য।

দেহটা বৈরাগ্যের বড় সহায়তা করে। দেহ ধারণ যে করিয়াছে তার অন্য বৈরাগ্য শুনিবার প্রয়োজন কি? শ্রুতি বলেন "স্বদেহাশুচি গন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। বিরাগকারণং তস্য কিমন্যৎ উপদিশ্যতে।

শুনি যে বৈরাগ্য না হইলে তার কাছে যাওয়া যায় না। যাইবে

কিরূপে? দেহে অনুরাগ যদি রহিল, মনে অনুরাগ যদি রহিল, বিষয়ে অনুরাগ যদি রহিল তবে কি আবার তার উপরে অনুরাগ থাকে? সেই জন্যই ত অন্য সকল অভিলাষে বৈরাগ্য হওয়া চাই। অন্য অভিলাষ নাই, অন্য কিছুই চাই না, চাই কেবল তোমায়—এই বৈরাগ্য না হইলে কিরূপে হইবে? তাই শ্রুতি বলেন—বৈরাগ্যের জন্য বেশী দূরে যাইতে হইবে না। নিজের দেহটা যে সদা অশুচি আর সর্ব্বদা দুর্গন্ধময়; এটা যদি ফুল হইত তবে ফুলের মত গন্ধ ইহা হইতে উঠিত—তাত উঠে না। উঠে ঘামের গন্ধ। যতই সুন্দরই হও আর যত সুন্দরীই হও নিজের গায়ের ঘাম একটু চাটিয়া দেখিলেই হয়—দেখনা এটা কেমন ফুল। তাই বলিতে হয় যার ভিতরে ঘাম পোরা থাকে, তাহা বা কেমন সুন্দর? সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন নিজের দেহের অশুচিগন্ধে যার বৈরাগ্য হইল না, তার বৈরাগ্য জন্মাইতে আবার অন্য কি উপদেশ দিব? তাই বলিতেছিলাম এ দেহটা আমার ষোড়শী কামাখ্যা মায়ের কাছে লইতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে পঞ্চতন্মাত্রা গঠিত বালক দেহে মায়ের কাছে যাই। মাতৃস্তন্য পান করি। ইহাতেই বলাধান হইবে। মা সকলকেই বলাধান করিতে চান। মা যে সকলকে ভাল দেখিতে চান। পারিবে কি মাতৃস্তন্য পান করিতে? আমরা যে মাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসি তাই মা কাতর হন। মাতৃস্তন্য-সুধাপান ছাড়িয়া কি খাইবার লোভে মানুষ অন্যত্র পলাইয়া যায়?

বলনা কবে নিরন্তর মাকে লইয়া থাকিব? মায়ের এই কাতরতা ভাবিয়া ভাবিয়া ইহা সহ্য না করিতে পারিয়া কবে ছুটিয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িব?

—০—

ব্রজকথা।

কে বলিলি নিদারুণ ব্রজপুরী অন্ধকার ;
ব্রজের সে নীলমণি ব্রজে নাকি নাহি আর ?
বক্ষে স্নেহক্ষীর ঝরে,
আদর-নবনী করে ;
ছুটিতে পথের পরে, 'মা' বোল শুনিনু তার ;
অঞ্চলে ধরিয়া ফিরে আঁখিমণি যশোদার।
চিত্তে ছিল ডাক শুনে ঝাঁপায়ে পড়িল কোলে
প্রাণগলা প্রীতিকণ্ঠে 'মা' ডাকে মধুর বোলে।
সোহাগ জানায় ছলে
কত কথা আঁখি বলে
সর্ব্বস্ব বিলায়ে একি, ভিখারী গো বিশ্বনাথ ?
চাহিয়া মুখের পানে ননী মাগে পাতি হাত।
শিরে শিখিপুচ্ছ দিয়া চূড়া বাঁধি অলকায়
চন্দন তিলক ভালে সাজাইয়া দিনু তায়।
পীতধটী পরাইয়া
বনমালা দোলাইয়া,
চরণে নূপুর দিনু সাজাইনু রাঙ্গা পায়,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন আঁকা দেখ আঙিনায়।
তেমনি নাচিয়া এল, নাচিত যেমন করি,
স্বেদবারি পড়ে ঝরি অঞ্চলে মুছানু ধরি।
কে বলে 'গোপাল' নাই,
ব্রজপুরী শূন্য তাই,
ব্রজে তার প্রেম সাধা, ব্রজ কি ছাড়িতে পারে ?
হৃদয়ে সে ব্রজ করে, অধরে ধরায় তারে॥

অনুষ্ঠানতত্ত্ব।

কার্ত্তবীর্য্য স্মরণ।

আপনার সন্তোষ সাধনই আজকাল আমাদের প্রতি কার্য্যের লক্ষ্য, সন্তোষলাভ করিবার জন্যই আমাদের রাত্রি দিন এ ছুটাছুটী, কিন্তু যার জন্য এত প্রাণপণ, যার জন্য এই দৌড়ঝাঁপ, কয়জন সে সন্তোষলাভ করিতে সমর্থ হন? "অর্থেই সুখ" এ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা সতত অর্থলাভ আশে ব্যাকুল, কিন্তু হায় সেই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থও স্থায়ী নহে, তাহার ব্যয় কিম্বা নাশ হয়। নাশে ব্যয় হইতে দুঃখ অধিক। "দুইটী টাকা যদি হারাইয়া যায় অমনি মনে হয় পাঁজরার দুখানি হাড় খসে গেল" অর্থনাশে মন এত উতলা ও মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হইল যে, তখন করতলগত দ্রব্যও প্রত্যক্ষ করা দুঃসাধ্য, মনের ও মস্তিষ্কের সেই অবস্থাতেই নষ্টদ্রব্য উদ্ধারের জন্য অত্যধিক যত্নবান্ হইলেও যত্ন বিফল ও মনোরথ অপূর্ণ হইল, কারণ যে ব্যক্তি করতলগত দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম, সে নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিবে কিরূপে? নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমে মনস্থির করিতে হয়, মনস্থির হইলে মস্তিষ্কও শীতল হয়, "নষ্ট দ্রব্যের পুনঃ প্রাপ্তি হইবে" এ আশা না হইলে কি মনস্থির হয়, মনস্থির করিতে হইলে শাস্ত্রবিশ্বাসী হওয়া কর্ত্তব্য; শাস্ত্রবিশ্বাসী হইয়া হৈহয়েশ্বর কার্ত্তবীর্য্যের নাম কীর্ত্তন করিলে নষ্টদ্রব্য উদ্ধার হয়, কেবল অকিঞ্চিৎকর অর্থ নহে, মনুষ্যের নষ্ট মনুষ্যত্বের পুনঃ উদ্ধার হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, প্রতি প্রভাতে প্রবুদ্ধ হইয়া স্মরণ কর—

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো রাজা বহুবাহু সহস্রবান্।
যোঽস্য সঙ্কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ।"

সহস্রভুজমণ্ডিত কার্ত্তবীর্য্যের নাম যিনি প্রতি প্রভাতে স্মরণ করেন, তাঁহার বিত্তনাশ হয় না, তিনি নষ্টদ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হন।

প্রথমে প্রয়োজন স্বরূপ সন্ধান—কার্ত্তবীর্য্যের স্বরূপ কি ? কার্ত্তবীর্য্য কে ? কোথায় বা তাঁহার জন্মস্থান ? তাঁহার কার্য্যকলাপই বা কিরূপ ? পুরাণাদিগ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়—হৈহয় দেশে কৃতবীর্য্য নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, তাঁহারই পুত্র কার্ত্তবীর্য্য, কৃতবীর্য্যের পুত্র বলিয়াই ইঁহার নাম কার্ত্তবীর্য্য। কার্ত্তবীর্য্যের ধনুকের মহাধ্বনিতে জগত্রয় কাঁপিয়া উঠিত, কার্ত্তবীর্য্য শত্রুরূপ কাননের দাবাগ্নি ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের কল্পতরু ছিলেন, ইঁহার অঙ্কশায়িনী হইয়া চঞ্চলা বিজয়-লক্ষ্মী স্থিরা হইয়াছিলেন, ভক্তভীতিভঞ্জন, যোগবলদীপ্ত দত্তাত্রেয়-প্রিয়তম শিষ্য, দর্পি-দশানন দর্পহারী, ইন্দ্রিয়গ্রামবিজেতা সহস্রভুজ-মণ্ডিত কার্ত্তবীর্য্যকে সকলে মহাদেবের সাক্ষাৎ অবতার জ্ঞান করিত। ইঁহার রাজ্যশাসন সময়ে গোপনে দুষ্কার্য্য করিয়া দুষ্ট অব্যাহতি লাভ করিতে অক্ষম হইত; কারণ যোগবলে ইনি সকলের মনোগত ভাব অবগত হইতেন, ইঁহার রাজ্যে "শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা" লোকে কাণেই শুনিত তস্কর বলিয়া একটা সংজ্ঞা আছে। গুণময় রামচন্দ্রের বালি-বধের মত জমদগ্নি-ধর্ষণ কার্ত্তবীর্য্যের একটা দোষ সাধারণ চক্ষে লক্ষিত হয় বিশেষভাবে আলোচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় জমদগ্নির প্রারব্ধই তাহার মূলীভূত কারণ মহাকবি কালিদাসের কথাতেও বলা যাইতে পারে

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ"

বহু গুণের মধ্যে একটা দোষ চাপা পড়ে, যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক চাপা পড়িয়াছে।

অনবধানতা বশতঃ যাঁহাদের ঈপ্সিত দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে কিম্বা যাঁহারা সতত চৌরাদি ভয়ে ভীত, প্রতি প্রভাতে কার্ত্তবীর্য্যের নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের ভীতিভঞ্জন হয়। এখনও আমাদের কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে "সেকেলে গিন্নীরা বলে—কার্ত্তবীর্য্যের নাম ক'রে মুন জল দে তাহা হইলে পাবি"। ইহার মূলে সত্য নিহিত আছে। উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রে আছে ভগবতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে প্রভো! বিবিধ আপদে, রাজচৌরাদি পীড়ায়, শস্ত্র, অগ্নি ও বিষভয়ে

ভীত হইলে কিসে মানবের রক্ষা হয় ও নষ্টদ্রব্যের উদ্ধার এবং প্রাপ্ত দ্রব্যের রক্ষা কিরূপে হয় ? তাহার উত্তরে মহাদেব বলেন—সহস্রভুজ-মণ্ডিত কার্ত্তবার্য্যের নাম স্মরণ করিলে মনোরথ সফল ও নষ্টদ্রব্যের উদ্ধায় হয়—

ভগবত্যুবাচ—কেন রক্ষা ভবেন্নৃণাং ভীতানাং বিবিধাপদি,
রাজচৌরাদিপীড়াসু শস্ত্রাগ্নি বিষপাতনে।
অনষ্টদ্রবতা চৈব নষ্টস্য পুনরাগমঃ।
সর্ব্বাকর্ষণসংক্ষোভঃ সর্ব্বসংহননং তথা।
ভবন্ত্যভীষ্টজন্তূনাং কেবল দ্বয়মেব হি।......।

মহাদেব উবাচ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রবান্।
তস্য স্মরণমাত্রেণ কৃতং নষ্টঞ্চ লভতে॥

এখন দেখা যাইতেছে দেবাদিদেব মহাদেবের উক্ত উক্তির সহিত স্মার্ত্ত-ধৃত আমাদের এ প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকের বিশেষ সামঞ্জস্য। দেবতা-শাস্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া এস ভাই প্রতি প্রভাতে নষ্টদ্রব্যের উদ্ধার ও প্রাপ্তদ্রব্যের রক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া প্রতি প্রভাতে স্মরণ করি—

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো রাজা বহুবাহুসহস্রবান্।
যোঽস্য সঙ্কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র পাত্যস্মৃতিতীর্থ,
ভাটপাড়া।

ডাক সখা ডাক পুনঃ মোরে।

ডাক সখা ডাক পুনঃ মোরে
সেই মধুময় স্বরে
সকল আনন্দ হাসি যে ডাকাতে উঠে ভাসি

দুঃখ শোক অশ্রুরাশি দূরে যায় সরে।
ডাক সখা ডাক পুনঃ মোরে
সেই সোহাগের স্বরে
যে ডাকেতে চন্দ্রতারা হইয়া আপনা-হারা
নিশিদিন ঘোরে
যে ডাকে হ'য়ে আকুল বায়ু ফুটাইয়া ফুল
সৌরভ বিস্তারে-
ডাক সখা ডাক পুনঃ মোরে
যে ডাকে অজানা টানে স্রোতস্বিনী কল গানে
ছুটিছে সাগরে ;
অজানা সে পথ তার না শুধি কাহারে
ছুটিছে সাগর পানে মিশিতে সাগরে ॥
ডাক সখা ডাক পুনঃ মোরে
সেই মধুময় স্বরে
যে স্বরে জগৎ হাসে আকাশে চন্দ্রমা ভাসে
সুষমা বিস্তারে
যে স্বরে জগৎ আলো সে স্বরে বাসিছ ভাল
ছোট একটুকু পাখী যে স্বর-ঝঙ্কারে।
ডাক প্রিয় ডাক তুমি মোরে
সেই মধুমাখা স্বরে
যে স্বরে সকল ভুলি গোপিনী আসিত চলি
লাজ মান সব দলি দেখিতে কানুরে।
একবার ডাক সখা সেই মধুময় স্বরে
যে স্বরে কালিন্দী জল নাচিত যে কল কল
প্রেমের ঝঙ্কারে।
যে স্বরে সকল আলো যে স্বরে বাসিছ ভাল
যে স্বরে আলোক আসি মিশিছে আঁধারে।

ডাক প্রিয় ডাক তুমি মোরে
সেই চির সোহাগের স্বরে
সুপ্ত সুখ সুপ্ত আশা যে স্বরে ঝঙ্কারে
যে স্বরেতে ভালবাসা মোহন মূরতি ধরে।
আপনি খুঁজিতে ধায়
ভাল বাসি তারে
ডাক সখা ডাক পুনঃ মোরে
সেই চির-সুধামাখা স্বরে।

২০।৩

—০—

তোমার পূজা।

তোমার পূজা আমার এত কেন ভাল লাগে? একটি তুমি কত হইয়া আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় কোথা দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দাও? একি খেলা দয়াময় তোমার? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকেও তুমি কেমন করিয়া সকল সময় স্মরণ রাখ? তোমায় কেমন করিয়া ডাকিতে হয় কেমন করিয়া তোমার সেবা করিতে হয় কেমন করিয়া তোমার পূজা করিতে হয়—তাহার ত কিছুই আমার জানা নাই, তবু আমি আমার ছোট প্রাণটা দিয়ে তোমায় ডাক্‌তে চাই তোমায় ভাল বাসিতে চাই, তোমার পূজা করিতে চাই, কে জানে কিছুই জানিনা তবু কেন আমার প্রাণে এ আশা জাগিয়া উঠে—কেবল মনে হয় এই ছোট্ট হৃদয়খানা আমার তোমার চরণে লুটাইয়া দিয়া শুধু তোমার পানে নীরবে অনিমেষে চাইয়া চাহিয়া থাকি। এই হইলেই বুঝি আমার সব হইয়া যায়, আর বুঝি কোন কিছুই এ সংসারে নাই সকল তৃপ্তি তোমায় দিয়া কোথায় এক কোনে পড়িয়াছিলাম ফুল হ'য়ে ফুঠতে গিয়েই অমনি শুখাইয়া ঝরিয়া পড়ে ছিলাম্ন কিন্তু তুমি কোথা হতে আসিয়া এই শুষ্ক ঝরা ফুল আবার ফুটাইতে চাইলে? বড় অপূর্ব্ব

দেখিলাম তাই ত আপনা হারা হইয়া গিয়াছি; যে শুষ্ক ফুল ফুটাইল, তাহার চরণে ছাড়া আর কোথায় লুটাইব? তাইতে ত কেবল মনে হয় গুরু তুমি, ইষ্ট তুমি, মন্ত্র তুমি তোমার চরণতলে মিলাইয়া যাই। আমার সব পূজার সাধ পরিপূর্ণ হইয়া যাক্। তোমায় পূজা করিতে আমার বড় ভাল লাগে। কি আসনে বসাইব, কি দিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিব, কিবা ভোগ দিব, আমি ত কিছুই খুঁজিয়া পাইনা, তবু আমার পূজার সাধ হয় একটী শ্বেত শুভ্র পুষ্পমাল্য পরাইয়া, একটু শুভ্র চন্দন ললাটে দিয়া, অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইয়া চরণ দুইখানি ছাইয়া দিই অথবা তাহাতেও যেন আমার হয় না—এই হৃদয়খানি ফুলের মত, শুভ্র ফুলের মত পবিত্র সুবাসযুক্ত করিয়া আমি ঐ চরণে ডালি দি। আর ত কোন বাসনাই প্রাণে জাগে না কেবল এইটুকু হইলেই বুঝি আমি পরিপূর্ণ হইয়া যাই; শুধু পবিত্র নির্ম্মল হইয়া তোমার মত সুন্দর সুবাসযুক্ত হইতে চাই। তুমি আমি এক, কিন্তু এই এক কেমন করিয়া? এই এক ত নামরূপ বাদ দিয়া—আমার রূপ, আমার নাম, তোমার রূপ, তোমার নাম, এ সমস্তই মিথ্যা—স্বরূপে এক চৈতন্যই আমাদের পূর্ণতা। এই চৈতন্যই স্ব-স্বরূপ। এই চৈতন্য ছাড়া হইলে আর কোন কিছুই থাকে না। এই চৈতন্যময় হইয়া আমিও পূর্ণ, তুমিও পূর্ণ। কত সুন্দর তখন আমি! তখন দেখি আমি তোমার রূপ লইয়া, আমি তোমার মত তোমার গুণ পাইয়া, আমি তোমার মত তোমার ভালবাসায় ভরিয়া আমি পরিপূর্ণ; তোমার কথা কহিয়া আমি বাচাল; তোমার সেবায় আমি কর্ম্মী; তোমারই আদর সোহাগে আমি আদরিণী, সোহাগিনী; তখন ত আমার আর কোন অভাব থাকে না তখন আমি পরিপূর্ণ— আমি যে তোমারই। তাই ত আমি তোমার মত হইয়াছি। তোমার হইয়া তোমার মত হওয়ায় যে কত সুখ তাহা অন্যে কি বুঝিবে? আমি তোমার হইয়া তোমার মত হইলে কিরূপ পরিপূর্ণ হইয়া যাই তাহাত তুমিই জান, তুমিই বোঝ, আর কেহ একথা বুঝিবে না; যে প্রাণে প্রাণে তোমায় চাহিয়াছে, প্রাণে প্রাণে তোমার আস্বাদ

সুখ অনুভব করিয়াছে, সেই জানিবে, সেই বুঝিবে কত সুখ তোমার হইয়া যাওয়ায়। এক তুমিই সকল বস্তুর সঙ্গে মিশিয়াছ, তাই ত যাহা কিছু করি, যাহা কিছু দেখি, সে সমস্তই তুমি।

যাঁহা যাহা নেত্র পড়ে
তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে

আহা! এই অবস্থা কতই সুখের, কতই সুন্দর, যাহা কোন কিছু দেখি সব তুমি, তুমিই আমার সব, তুমি ছাড়া আমার আর কোন কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের এই অবস্থা হইয়াছিল প্রতি বৃক্ষ লতা যাহা দেখিয়াছেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোন কিছুই দর্শন করেন নাই। ধ্রুবেরও এই ভাব হইয়াছিল ব্যাঘ্র, সর্প, যাহা দেখিয়াছেন তাহাকেই বলিয়াছেন এই কি পদ্মপলাশলোচন হরি? কি ব্যাকুলতা, কি তন্ময়তা, এমন না হইলে কি তোমায় পাওয়া যায়? সব ভুল হইয়া যাইবে যেমন তোমাতে সব পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে; আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখিব, আমার একটি ছাড়া আর কোন কিছু দেখিব না; কোন কিছুই করিব না,কোন কিছুই ভাবিব না, যাহা দেখিব তাহা তুমি, যাহা ভাবিব তাহা তোমারই চিন্তা, যাহা করিব তাহা তোমারই সেবা। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, ধ্যান, পূজন, পাদসেবন, আত্মনিবেদন, দাস্য এই নবধা ভক্তি লক্ষণ—এইভাবে তোমাতে এক এক হইয়া থাকা। আর স্বরূপে তুমি অখণ্ড চৈতন্য তুরীয় চতুষ্পাদ পরিপূর্ণ নিরাকার জ্ঞানময় আনন্দঘন পুরুষ, তুমি ছাড়া আর কোন কিছুই তখন থাকে না। এই স্বরূপে স্থির থাকিয়া যখন যে ভাবে ইচ্ছা থাকা যায়, খেলা হয়; স্বরূপে থাকিলেই তুমি আমি এক তখন আপনার স্বভাবে থাকিয়াও খেলা হয়; যেমন বৃদ্ধ ছেলে সাজিয়া ছেলের সঙ্গে খেলা করিতে পারেন, আপনাকেও ঠিক স্মরণ রাখিয়া সকলই করা যায় এ অবস্থা কিন্তু বড় সুখের অবস্থা; আপনাকে না হারাইয়া এই দুরন্ত সংসারে মিশিয়া না গিয়া ঠিক ঠিক কাজ করিয়া যাওয়া। ইহার নাম আপনাতে আপনি থাকা। বলিবার কথা ত কতই আছে,

কিন্তু ফুটাইতে ত পারি না। তুমি অন্তর্যামী তোমার অগোচর ত আমার কোন কিছুই নাই, তবু তুমি কহাইতে চাও তাই আমি বলি। বুঝি একটু না বলিলেও তৃপ্তি পাই না, পূর্ণতা পাই না। তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি যখন ভরিয়া যাই আর তুমিও আমার দিকে এক এক বার চাও—বল দেখি তখন কি হয়? আমি ত কিন্তু সে কথা বলিতে পারি না। এত ভালবাসা তুমি কোথায় পাইলে? ইহার কোথাও একটু অপূর্ণতা, কোথাও একটুখানি অভাব নাই। কি অদ্ভুত খেলা, তোমার আমি যে বড় অযোগ্য,কত গুণ তোমার,তোমার ভক্তেরা কত সুন্দর-- আমি ত অতি অধম কীটাণু কীট, তবু তুমি তোমার গুণে আমায় চেয়েছ, তোমার গুণ দিয়ে আমায় সাজিয়েছ, কি দয়া তোমার দয়াময়! তাই ত জগৎ জীবে তোমায় দয়াময়, করুণাময়, কৃপাময় কতই বলে। তোমার নাম নাই কিন্তু আবার তোমার অনন্ত নাম, তোমার ধাম নাই অথচ তোমার অনন্তধাম, তোমার গুণ নাই তুমি ত্রিগুণাতীত কিন্তু আবার তুমি সর্ব্বগুণময়! কি করিয়া তোমায় ভাবিব, কি বলিয়া তোমায় ডাকিব আমি যে কিছুই জানি না! কেবল তোমার কথা শুনিয়া শুনিয়া তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া আমি আপনাতে আপনি ভরিয়া যাই। আমার আর কোন কিছু আমি রাখিতে পারি না। তোমার আমি, আমার সব তোমাতেই লয় করিয়া দিই। আমার রজস্তমোযুক্ত মনটাও দেখি 'তুমিময়' হইয়া গিয়াছে। কখন কখন ঐ মনটা যখন আমায় তোমা ছাড়া করিয়া আনিতে চায়, তখনই ত আমার স্বরূপবিস্মৃতি হয়, তখনই ত কত গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন মনটাকে বলি কেন গোলমাল করিতেছ? ও সব পাগলামী ছাড়, দেখ চাহিয়া কে! কেমন সুন্দর করিয়া তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! তখন মনটা ভিতরে চায় আর সুন্দর মনোহর রূপ দেখিতে পায়, তখনই মনটা হারাইয়া গিয়া 'তুমিময়' হইয়া যায়। তখন দ্বৈত ঘুচিয়া যায়, তখন আমি তুমির গোলমাল, আমি তুমি ব্যবধান চলিয়া যায়, এক পরিপূর্ণ আনন্দঘন রূপ ফুটিয়া উঠিয়া আমার এই 'ছোট্ট'

হৃদয়খানা ভরিয়া দেয়। তোমার ভক্তেরা কতই সুন্দর করিয়া কত ভালবাসিয়া তোমার পূজা করে তোমার সেবা করে—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অতি অধম, তবু আমার যাহা বাসনা, তাহা তোমার চরণে নিবেদন করিলাম। তুমি ত বাঞ্ছাসিদ্ধিকারী যে যাহা কামনা করে, তুমি ত তাহার সেই কামনাই পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া তাহার সকল সাধ মিটাইয়া দাও। আমার ত আর কোন বাসনাই নাই, কেবল আমি তোমার যোগ্য হইতে চাই, তুমি আমার সকল কলুষতা ঘুচাইয়া তোমার ওই চরণের উপযুক্ত করিয়া লইবে, আমি যেন আমার এই 'ছোট্ট' প্রাণটা তোমাতে মিশাইয়া দিতে পারি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি প্রসন্ন হইয়াছ, শুনিলেই আমি পরিপূর্ণ হইয়া যাইব, ওই চরণের তলে লুটাইয়া থাকিব। ইতি

২৮।৪

—০—

তোমার খেলা।

তুমি একলা এসে একলা চ'লে যাও।
অরূপেতে রূপ ফুটিয়ে কেমন ক'রে দাও।
মাতিয়ে এসে কাছে বস কত সোহাগ ভরে
অজানা কি মধুর সুরে যায় হৃদয় ভ'রে।
না থাকে সে শোকসিন্ধু না থাকে নৈরাশ
তোমার স্পর্শ মধুমাখা—না থাকে বিষাদ।
সাথে নাও, কাছে রাখ, কত স্নেহ ক'রে
অজানা সে পথের কথা শুনাও বরে বারে।
তখন—কি এক রাগে প্রাণটি জাগাও কি এক তালে মনটি নাচাও
আবার সব ছাড়িয়ে প্রাণমন তোমাতে ডুবাও।
একলা এসে একলা চ'লে যাও॥

শ্রীজয়দেবে—"স্মরতি মনোমম কৃত-পরিহাসম্"।

শ্রীরাধা ত প্রেম। কিন্তু শুধু প্রেম লইয়া খেলা হয় না। নির্ম্মল প্রেমে চলন থাকে না। সেখানে হস্ত গলদেশে জড়িত, কিন্তু কোন চঞ্চলতা থাকে না। নয়ন নয়নে আবদ্ধ, কিন্তু এতই প্রেমভরা যে, "থির নয়নজনু ভৃঙ্গ আকার। মধু-মাতল কিয়ে উড়ই না পার"। বিশুদ্ধ প্রেমে মান অভিমান থাকে না। তার কিছুই মন্দ লাগে না। তিরস্কার পুরস্কার নাই, নিন্দা স্তুতি সমান। সকল অবস্থায় সন্তোষ। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" এখানে হইয়া যায়। আদর উপেক্ষার বোধ এখানে থাকে না।

তাই প্রেমের সহিত একটু মানুষ ভাব মিশাইতে হয়। নতুবা খেলা হয় না। একটু মানুষ ভাব থাকে, তাই হয় মান অভিমান। সে চলিয়া গেলে তাই বিরহ আইসে। তখন দুঃখ করিয়া বলিতে হয়—

"আঁধল প্রেম পহিলে নাহি বুঝনু
সো বহুবল্লভ কান"
আদর সাধে বাদ করি তা সহ অহর্নিশ জ্বলত পরাণ"

প্রেমে আঁধার থাকে না। একটু মানুষভাব মিশ্রিত যে প্রেম, তাহাই আঁধল প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করিয়া শ্রীমতী বড়ই কাতর হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মান ভাঙ্গিবার জন্য কতই করিলেন—শ্রীমতী ফিরেও চাইলেন না। সখীরা কতই বলিল—ঐ দেখ চূড়া একঠাঁই আর বাঁশী একঠাঁই তবুও তোর হইল না? শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। আর শ্রীমতী? শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে একবারে উতল হইলেন। সখীদিগের হাতে ধরিলেন। আমায় আনিয়া দে। আমি প্রাণ রাখিতে পারিতেছি না। সখীরা তখন পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

হাতকা লছমী চরণ পর ডারসি
কৈছে মিলায়ব আনি।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলি এখন মিলাই কিরূপে বল? শ্রীমতীর তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। শ্রীমতী সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতেছেন, সব সাজসজ্জা দূর করিতেছেন। "অবসব বিষসম লাগই" সবই বিষের মত লাগিতেছে। শ্রীমতী বলিতেছেন—

শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হাররে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডাররে॥

এই অবস্থাতে তাঁহার মনে বড় আক্ষেপ আসিল তাই বলিতেছেন আমার আঁধল প্রেম আমাকে বুঝিতে দেয় নাই যে কানু বহুবল্লভ। সে যে জগতের ইহা প্রথমেই যদি বুঝিতাম তবে সেই সাধা, সেই আদর ইহা উপেক্ষা করিয়া তাহার সহিত বাদ কি সাধিতাম? তবে কি আজ এই অহর্নিশি প্রাণের জ্বালায় জ্বলিতাম?

বলিতেছিলাম, সখী ত অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইল। আর শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের এই উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিলেন না। দেখনা অঙ্গুলি সঙ্কেতে হৃদয়কমলে তার অন্যের সঙ্গে বিহারে তোমার কিছু হয় কি না?

বিহরতি বনে রাধা সাধারণ-প্রণয়ে হরৌ
বিগলিত-নিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ।

শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিত সমান ভাবে বিহার করিতেছেন। শ্রীমতীকে তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন না? শ্রীমতীর নিজের উৎকর্ষ বিগলিত হওয়ায় তিনি আর দেখিতে পারিলেন না। তখন

ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রত মণ্ডলী
মুখর শিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্॥

শ্রীমতীর ঈর্ষ্যা আসিয়াছে। আমিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রিয়তমা প্রেয়সী এই অভিমানে আঘাত লাগিয়াছে। তাই শ্রীমতী দূরে আসিয়াছেন। আসিলেন এক নিভৃত লতাকুঞ্জে। সেই লতাকুঞ্জের

শিখরদেশকে ভ্রমরনিকর গুন্‌গুন্ শব্দে মুখরিত করিতেছে। শ্রীমতী সেই নিভৃত নিকুঞ্জে আসিয়া মনের অতি নিগূঢ় কথা প্রিয়সখীকে বলিতে লাগিলেন—

সখি! আমার একি হইল!

গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলস্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্॥

ভ্রামং = বিস্মরণং। বামং = প্রতিকূলম্; অবাধ্যং।

আর দেখিব না বলিয়াত এই নির্জ্জনে আসিলাম। কিন্তু আমার অবাধ্য মন একি করিতেছে? যাহাকে ভুলিবার জন্য আসিলাম, এখানে আসিয়া আমার মন তাহারই গুণগ্রাম চিন্তা করিতেছে; ভ্রমেও তাহাকে ভুলিতে চাহিতেছে না। তার স্মরণে বড়ই তৃপ্তি পাইতেছে, তাহার দোষ ত একবারেই দেখিতেছে না। কৃষ্ণ আমায় ছাড়িয়া সাতিশয় অনুরাগে অন্য যুবতী লইয়া বিহার করিতেছেন। আজি জানিতেছি তাহার উপর আমার অনুরাগ বৃথা। আমার অবাধ্য মন পুনঃ পুনঃ তাহাকেই কামনা করিতেছে। একি ইহার আসক্তি! বল্ সখি! আমি এখন কি করি?

কখন কি ভগবানের উপরে অভিমান করিয়াছ? শ্রীভগবানের উপরে অভিমান কিরূপ, তাহা কি কখন ভাবিয়াছ? এই সংসারের মান অভিমান তাঁহার উপর আরোপ করিয়া ইহা বুঝা যায় সত্য কিন্তু সাধারণ প্রণয়ের অভিমানের আরোপ তাঁহার উপর না করিয়াও সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণে অভিমান হয়।

তুমি যেই হওনা কেন—নারী হও বা পুরুষ হও; পাপী হও বা পুণ্যবান্ হও, তুমি যাই হও, তুমি তোমার শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতিতে অভিমান করিতে পার। তুমি সাধনা-সাহায্যে নিরন্তর ভাবিতে পার—তুমি শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতি। এই ভাবনাটিও মিথ্যা ভাবনা নহে। সত্যসত্যই তোমার মধ্যে রজস্তমোরূপিণী প্রবৃত্তি-প্রকৃতিও যেমন আছে, আবার শুদ্ধসত্ত্ব-

স্বরূপিণী নিবৃত্তি-প্রকৃতিও তেমনি আছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই আপনাকে সত্ত্ব-প্রকৃতি ভাবিতে পার। যদি ইহা ভাবনা করিতে পার, তবে তুমি ভক্তিমার্গে বড় সুন্দর অবস্থা লাভ করিতে পারিবে। কিরূপে পারিবে দেখ।

শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদা ভগবান্‌কেই চায়। সত্ত্বগুণটি প্রকাশময়। শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং প্রকাশ। কাজেই প্রকাশ প্রকাশেই মিলিতে চায়, মিশিতে চায়। কিন্তু সত্ত্বগুণটি রজস্তমের সহিত জড়িত। রজস্তম সর্ব্বদা ক্লীব আয়ান-সংসারের ক্রোড়েই লুন্ঠিত হইতে চায়। যখন রজস্তম প্রকৃতি সংসার লইয়া মত্ত হয়, তখন সত্ত্ব প্রকৃতি কি ভাবে থাকে? সত্ত্বপ্রকৃতি তখন কি শ্রীভগবানের উপরে অভিমান করে না? বলেনা কি হে প্রিয়! তুমি যখন যার কাছে থাক তখন তার। আমি যে তোমায় ছাড়িয়া একক্ষণও থাকিতে পারি না, তুমি আমায় উপেক্ষা করিয়া কিরূপে রজস্তম লইয়া থাক? আমার প্রাণেশ্বর, যাহা করিতে চান করুন তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু তিনি আমার এই অনুরাগ যে একবারে অগ্রাহ্য করেন, ইহা ত আমি সহিতে পারি না। আমি সর্ব্বদা হরি হরি করি; আর তিনি? তাঁহাকে যখন যে ডাকে, তিনি আর সব ভুলিয়া তারই হইয়া যান। হায়! আমার জীবনে সুখ কি? হরি ভিন্ন এ দেহ ধারণ কি?

শ্রীমতী অভিমান করিয়া নির্জ্জনে আসিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার উপর অভিমান তাঁহাকে ত ভুলিতে পারিতেছেন না। সখীকে বলিতেছেন—সখি! আমি এখন কি করি? রাগ করিয়া ত আসিলাম। কিন্তু বল্ সখি! আমি বাদ সাধিব কার সঙ্গে? আমি রাগ করিব কার উপর? সেই হাঁসি, সেই বাঁশী, সেই ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠাম, সেই চেয়ে চেয়ে ডাকা—আহা! আমি ভুলিব কি? সেই রূপ, সেই গুণ কোন্‌টি ভুলিব। সেই যে সেই মাধবীতলে 'আমার লাগিয়া পিয়া যোগী যেন সতত ধেয়ায়', সেই যে সেই 'আমারে লইয়া সঙ্গে কেলীকৌতুক রঙ্গে ফুল তুলি বিহরই বনে', সেই যে সেই নব কিশলয়

তুলি শেজ বিছায়ই রস পরিপাটীর কারণে—তার রূপ, তার গুণ, তার কর্ম্ম কি ভুলিব বল! আহা!

সঞ্চরদধর-সুধা-মধুর-ধ্বনি-মুখরিত-মোহনবংশং
বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল মৌলি-কপোল-বিলোল-বতংসং।
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্।

[বলিতেন ইতস্ততঃ প্রচলতা দৃগঞ্চলেন দৃশোঃ দৃষ্টেঃ অঞ্চলং চক্ষুঃ প্রান্তভাগঃ তেন কটাক্ষেণ। বতংসৌ মণিকুণ্ডলে।]

আহা সখি! করস্থিত মোহন মুরলী সঞ্চরমাণ মুখামৃত সহকৃত ফুৎকারে কেমন মধুর ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে; আর ইতস্ততঃ প্রচলনে সেই কুটিল কটাক্ষ, মৌলিস্থ শিখিপুচ্ছকে কম্পিত করিতেছে, তাহাতে সেই চঞ্চল মণিকুণ্ডল সেই গণ্ডদেশের কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। শ্রীমতীর উপস্থিত কিছুই মনে নাই। সব ভুলিয়া ভাবনারাজ্যে গিয়াছেন আর বলিতেছেন সখি! সেই রাসোৎসবে আমার মন হাবভাবজড়িত পরিহাসচপল শ্রীহরিকেই স্মরিতেছে।

চন্দ্রক-চারু-ময়ুর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত-কেশং
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত-মেদুর-মুদির-সুবেশম্॥
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্ ॥২॥

[চন্দ্রকেণ-অর্দ্ধচন্দ্রাকারেণ চারুণা ময়ুরশিখণ্ডকানাং ময়ুরপুচ্ছানাং মণ্ডলেন বলয়িতঃ বেষ্টিতঃ কেশো যস্য। বৃহতেন্দ্রধনুষা অনুরঞ্জিতঃ বিভূষিতঃ মেদুরঃ স্নিগ্ধঃ যঃ মুদিরঃ নবজলধরঃ তদ্বৎ সুশোভনঃ বেশঃ যস্য তাদৃশং]

আহা সখি! কি অপরূপ এইরূপ! অর্দ্ধচন্দ্রাকার সুন্দর ময়ুর পুচ্ছ। দেখনা তাহাই কেশপাশে বিনিবেশিত করিয়া কেমন শোভা ধরিয়াছে! যেন সুপ্রসারিত সুন্দর ইন্দ্রধনুতে পরিশোভিত নূতন জলধর! রাসের

সময়ে পরিহাসচতুর হাবভাবপরায়ণ এই মধুর শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন কতই না স্মরণ করিতেছে।

গোপ-কদম্ব-নিতম্ববতী-মুখ-চুম্বন-লম্ভিত-লোভং
বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত-স্মিত-শোভম্ ॥
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্ ॥৩॥

[লম্ভিতঃ প্রাপিতঃ লোভঃ যস্য তং। মধুরঃ মনোহরঃ। উল্লসিতা পরিবর্দ্ধিতা স্মিতেন মধুরহাসেন শোভা যস্য তং।]

গোপকুলনিতম্বিনীগণের মুখচুম্বনে লুব্ধ বন্ধুক কুসুমের ন্যায় লোহিত মধুর অধরপল্লব কত সুন্দর! আর এই মুখ! এই মুখে এই মৃদু মধুর হাস্য! আহা! কতই শোভা পাইতেছে। রাসে পরিহার-চতুর এই শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন স্মরণ কবিতেছে। স্মরণ একটু করনা দেখনা হরিস্মরণে রস আসে কি না?

বিপুল-পুলক-ভুজ-পল্লব-বলয়িত-বল্লব-যুবতি-সহস্রং
কর-চরণোরসি মণিগণ-ভূষণ-কিরণ-বিভিন্ন-তমিস্রম্।
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্ ॥৪॥

বিস্তীর্ণাঃ পুলকাঃ রোমাঞ্চাঃ যয়োস্তাভ্যাং পল্লববৎ কোমলাভ্যাং ভুজাভ্যাং বলয়িতং পরিবেষ্টিতম্ বল্লবযুবতীনাং গোপতরুণীনাং সহস্রং যেন। একদা অনেকালিঙ্গনাৎ নৈকনিষ্ট প্রেমাণমিত্যর্থঃ। তথা কর-চরণোরসি হস্তপদবক্ষসিস্থিতানি মণিগণভূষণানাং মণিময়ালঙ্কারাণাং কিরণেন বিভিন্নং নাশিতং তমিস্রং অন্ধকারো যেন তাদৃশং]

দেখ সখি! বিপুল পুলকে পুলকিত হইয়া পল্লববৎ কোমল বাহুযুগলদ্বারা সে কেমন অনেক গোপযুবতীকে আলিঙ্গন করিয়াছে আর সেই কর, চরণ ও হৃদয়দেশে সুশোভিত মণিময় ভূষণের কিরণ দ্বারা চারিদিকের অন্ধকার দূরীকৃত হইয়াছে। রাস সময়ে বিহিতবিলাস পরিহাসচতুর এই হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

জলদ-পটল-বলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটং
পীন-পয়োধর-পরিসরমর্দ্দন-নির্দ্দয়-হৃদয়-কবাটম্।
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥৫

[জলদপটলেন মেঘসমূহেন বলন্ পরিস্ফুরন্ যঃ ইন্দুঃ তস্য বিনিন্দকঃ তিরস্কারকঃ চন্দনতিলকঃ ললাটে যস্য তং। পীনপয়োধরয়োঃ পর্য্যন্তভাগস্য মর্দ্দনায় নির্দ্দয়ং হৃদয়কবাটং যস্য তং।]

নবীন জলদমণ্ডলে বিরাজমান চন্দ্রমার যে মহতী শোভা তাহার উচ্চগৌরব খর্ব্ব করিতেছে এই ললাটদেশে মনোহর চন্দন তিলকের অনির্ব্বচনীয় সুষমা। আর দেখ সখি! যুবতিগণের পীনপয়োধরের পর্য্যন্ত ভাগ মর্দ্দনে নির্দ্দয় হৃদয় এই শ্রীহরি—আমার তখনকার সেই মধুর ভাব মনে পড়িতেছে।

মণিময়-মকর-মনোহর কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডমুদারং
পীতবসনমনুগত-মুনি-মনুজ-সুরাসুরবর-পরিবারম্।
রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ৬

[মণিপ্রচুরাভ্যাং মকরাকারাভ্যাং মনোহরাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতৌ-গণ্ডৌ যস্য তং উদারং মহান্তং পীতবসনং পীতাম্বরং, অনুগতঃ সৌন্দর্য্যেণা-কৃষ্টঃ মুন্যাদীনাং বরপরিবারঃ পরিগ্রহো যেন স্তং]

মণিময় মনোহর মকারাকৃতি কুণ্ডলপরিশোভিত এই গণ্ডযুগল কত সুন্দর! কামিনীগণের মনোভাব পূর্ণ করিতে ইনি উদার। আর অনুপম মোহনরূপ মাধুরী বিস্তার করিয়া এই পীতবসন—কি দেবকন্যা, কি মুনিকন্যা, কি মানব-কন্যা, কি অসুরকন্যা সকলকেই আদৃষ্ট করিতেছেন এই শ্রীহরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

বিশদ-কদম্ব-তলে মিলিতং কলি-কলুষ-ভয়ং শময়ন্তং
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্।

রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ৭

[বিশদ কদম্বতলে পুষ্পিত কদম্বতরুতলে মিলিতং সঙ্গতং তথা কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং যথাস্যাৎ তথা তরঙ্গন্তী বিস্ফুরন্তী অনঙ্গদৃক্ কামদৃষ্টিঃ যস্মিন্ তাদৃশেন মনসা মামপি রময়ন্তং কলিজনিত পাপতাপ ভয়ং নিবারয়ন্তং]

কুসুমিত কদম্বতরুতলে দাঁড়াইয়া কি এক অপূর্ব্ব অনঙ্গসঞ্চারী কটাক্ষ দ্বারা মনে মনে আমার সহিত রমণ করিতেছেন—আহা সখি। কলিকলুষভয়হারী এই শ্রীহরি আমি মানসনয়নে দেখিতেছি আর আমার হৃদয় তারে সাক্ষাতে পাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীজয়দেব-ভণিতমতি সুন্দর-মোহন-মধুরিপু-রূপং
হরিচরণ স্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্।
রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম ॥ ৮

শ্রীজয়দেববর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের এই অতি সুন্দর মোহনরূপ অধুনা পুণ্যবান্ ভক্তগণের হরিচরণ স্মরণ জন্য কেমন উপযোগী।

—০—

আগমনে মায়ের রূপ।

(আমার) এমন মাকে কে সংসাজালে বল্ তা শুনি।
ও যে শম্ভু রমণী; সংসার-সংশয়-সংহারকারিণী
মা মোর—সঙ্গতি-সম্প্রদায়িনী
সব সঙ্কটহরা সঙ্কোচ দূর করা
আবার—স্বয়ং শঙ্করী শঙ্কর-মরম-সঙ্গিনী ॥
স্বয়ং স্বয়ম্ভু যাঁর স্বরূপ গড়িতে নারে
সে শম্ভু দারারে গড়া কুম্ভকারে কি পারে

ঐ ভুবনমোহিনী বামাটিকে
অঙ্গে—দিল বা মাটি কে
হায়রে তুলিতে স্বরূপ উহার তুলিতে কার সাধ না জানি॥
রঙ্গের পুতলী ওরা কি দিবে আর রঙ্গ বই
রং বীজে রূপ যাঁর রং কি তাহার ঐ
মা আমার রংকাররঙ্গিণী :—
তাইতে জগৎ-রূপা মা মোর জগৎ জোড়া মায়ের গা
জগতেরই গায়ে আমার জগন্ময়ী ঢালে গা
জগতেরই কাণে কাণ জগতেরই প্রাণে প্রাণ
তদ্বিষ্ণু পরমং পদং মন্ত্র তাই ঘোষে অবনী॥
চাঁদে না মিলিবে ওরূপ না মিলিবে তপনে
না মিলিবে তারা তড়িৎ তরল হুতাশনে
মা যে আমার পূর্ণ জ্যোতির খনি—
পেয়ে সেই রূপের আভাস আকাশপথে প্রকাশ রবি
ওরই আভাস লয়ে আবার খেলায় শীতল চাঁদের ছবি
তারি কণা কে না জানি কীট পতঙ্গ তুমি আমি
তারি কণায় তরু ফলে, সাগরে চলে তটিনী॥
বিবেক হাঁপর সাধন-অগ্নি হৃদয় রূপ কোটরায়
হ্রীঁকার হেমের কাঁতি গাল প্রেমের সোহাগায়
মা গঠনের এই উপাদান জানি—
ভক্তি স্নেহ দ্রব্য মাখি জ্ঞানময় ধ্যানের ছাঁচে
শ্রদ্ধা অনুরাগে ঢাল হৃদয়ে যে প্রেম আছে
হবে তখন প্রেমানন্দে মাখা ঐ মায়ের মূর্ত্তি দেখা
গোবিন্দের বাসনা কেবল ঐ রূপের ভিখারিণী॥

আগমনে।

(১)

তুমি আসিবে বরষা অন্তে শরৎ পরশে
এ কথা স্মরিলে হৃদি শিহরে হরষে।
দ্বিপ্রহরে কি প্রভাতে, অপরাহ্ন গোধূলিতে,
সায়ং সন্ধ্যা জ্যোৎস্না ফুল্ল সোনালি রজনী,
তিমিরা নীরবা রাত্রে আসিবে জননী ?
তব আশা পথ পানে, উৎকণ্ঠা কাতর প্রাণে,
গেল কত শীত গ্রীষ্ম শরৎ হেমন্ত
বার তিথি পক্ষ বর্ষ বরষা বসন্ত।
বুঝিনু আমারি দোষে, থাক তুমি দূর দেশে,
পবিত্র কি অপবিত্র কর না বিচার,
সর্ব্বদ্রষ্টা অজানিত কি আছে তোমার ?
কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়,
অশান্ত সন্তানে করে জননী শাসন,
তা ব'লে কি পারে কভু করিতে বর্জ্জন ?
বেদ স্মৃতি নীতি ধর্ম্ম, সিদ্ধান্ত বচন মর্ম্ম,
কাব্য অলঙ্কার আদি পুরাণে জড়িত,
ত্রিতাপনাশিনী শ্যামা তোমারি রচিত।
শ্রীপদে চন্দন গন্ধ, পরশিবে ব্রহ্মরন্ধ্র,
বিকসিতা পঙ্কজিনী চরণ রেখায়,
সিন্দুর কুঙ্কুম কত বরণে খেলায়।
কনক নূপুর ময়, রাঙ্গা জবা মালা চয়,
এরূপে কি নিয়ে যাবে চিদাকাশে তুমি,
মধুর অব্যক্ত শব্দে মিশাইব আমি।
বিশ্বরূপ প্রিয়দারা, রাসেশ্বরী সদা কারা,

আসিবে মা কোন্ বেশে বল কি বাহনে
ঐরাবত বৃষ শিখী পুষ্পক স্যন্দনে।
উচ্চৈশ্রবা খগরাজ, সিংহ পৃষ্ঠে কিংবা আজ,
মকরে কি কপিধ্বজে মহিষে মরালে,
বল মা চিনিব তোরে কিরূপে করালে ?
শ্বেতরূপা শশধরা, জনময়ি চিত হরা,
ধূম্রবর্ণা কৃষ্ণবর্ণা তড়িত বরণী,
দশভুজা চতুর্ভুজা দ্বিভুজ ধারিণী।
সদ্য ছিন্ন নরশিরে, দেখ মা রুধির ক্ষরে
বালার্ক চুম্বিত তোর যাবক শোভিত,
শ্রীপদে লুটায়ে বলে আমি গো আশ্রিত।
দ্রবময়ী দ্রবীভূতা, আর্ত্তজন কল্প লতা,
লজ্জারাগে সুরঞ্জিতা কমলবদনা
দাঁড়াইলে কুন্দদন্তে টিপিয়া রসনা।
চিন্ময়ী দানব হন্তা, প্রচণ্ডে অলক্ত দন্তা
তুমি কি মা সেই উমা শৈলেন্দ্রদুহিতা
বিষ্ণুমায়া মহাগৌরী স্বয়ম্ভূ বনিতা ?
ক্ষয় অপচয় হীনা, স্নেহময়ী দীনপ্রাণা,
অরুণ লোচনা ঘোরা পাপাত্মা দলনী,
দেবশক্তি প্রাদুর্ভূতা প্রফুল্লা পদ্মিনী।
অনন্ত প্রতাপান্বিতা, শচীপতি আরাধিতা,
সর্ব্বগতা নবদুর্গা মৃণ্ময়ী রূপিণী,
পূর্ণকামা আশাপ্রদা আশ্বাসদায়িনী।
গর্ব্বিত কামনাসুরে ; পদাঙ্গুষ্টে বিদ্ধ করে,
এস মা মানসাকাশে শরতে শারদা
নমো নমো নারায়ণি বরদা সুখদা।

২৭।২

(২)

বহুদিন পরে যথা আঁধার কুটীর মাঝে,
দেউটী জ্বলিয়া উঠে অমার নীরব সাঁঝে।
উঠে হাস্য কোলাহল আনন্দের কলধ্বনি
সঙ্গীত ঝঙ্কারি উঠে নীরব সে গৃহখানি।
কিম্বা হিমানীর শেষে বসন্তের দূতবেশে
কোয়েল পাপিয়া আসি গাহে তার আগমনি
আজি এই বঙ্গ মাঝে আঁধার আমার সাঁঝে
চির বিষাদের পরে সুমঙ্গল বার্ত্তা আনি।
মুছাইয়ে লয় যথা দুঃখান্তে সুখের কথা
চির বিরহীর কাছে মিলনের গীতি বাণি
তেমতি এ বঙ্গমাঝে আনন্দময়ীর সাজে
আবার আসিছ তুমি আসিছ জননি।
নব পত্র ফুল ফলে সাজায়ে তোরণ দ্বার
দেয় যথা গৃহ স্বামী আনন্দ উৎসবে তার
তেমনি সে ঋতুরাজ মা তুমি আসিছ বলে
ধুয়ে গেছে চারিদিক্ পূত বরষার জলে;
শ্যামল সুন্দর রূপে প্রকৃতি মোহন বেশে
জননি! আসিছ ব'লে আবার উঠেচে হেসে।
আবার সে কূলে কূলে ঢেউগুলি লয়ে তায়
দুকুল উছলি নদী তেমনি বহিয়া যায়;
তেমনি হরিৎক্ষেত্র মাঠে মাঠে ভরা ধান
মাগো তোর আগমনে ফুল্ল সবাকার প্রাণ।
মা তোরে স্মরিয়া বুঝি বঙ্গের সে সামগান
মনে পড়ে গেছে আজ তাই সব একপ্রাণ।
ভাই ভাই বলি আজ পরস্পরে দেয় কোল
মা তোরে স্মরিয়া আজ ভুলে গেছে গণ্ডগোল।

বরষ বরষ ধরি এমনি করিয়া আয়
ভক্তি-পূত অর্ঘ্য মোরা দিব তোর রাঙ্গাপায়।
বহুদিন গেছে চলি বাঙ্গলার সব সুখ
মাগো তোর আগমন আছে শুধু ওইটুক্‌॥

২০।৩

—০—

বিশ্বরূপিণী।

জীবনের অপূর্ব্ব এ নাট্যশালা মাঝে
নট রঙ্গময়ী তুমি আছ নানা সাজে।
অরূপের রূপ দাও, তুমি নিরাকার,
মহিমা বুঝিতে বল, আছে সাধ্য কার।
গিরি নভঃ উর্দ্ধে অধে ফুলের হাসিতে
শশী সূর্য্য নক্ষত্রাদি সাঁঝের মেঘেতে।
সব মাঝে সব হয়ে বিরাজিছ তুমি
ফুটিছে সবের মাঝে তব মুখখানি।
ধায় একটানা নদী বহে কুল কুল
প্রচারিছে তোমার সে মহিমা অতুল।
বিজন বিপিন, ঐ নীরব ভাষায়,
সে যে গো, তোমার (ই) কথা সতত জাগায়।
বিহগ তুলিয়া তান, গাহে গুণগান
প্রভাতে প্রকৃতি ওই করে তব ধ্যান।
ক্ষুদ্র আমি অতি ক্ষুদ্র অযোগ্য তোমার
তাই মাগো এ যাতনা এত হাহাকার।
পরকে আপন ভাবি, আপনারে পর
কতই যতনে সদা বাঁধি খেলা ঘর।
আকর্ষণ বিকর্ষণে উঠি আর পড়ি
কল্পনাতে কাঁদি হাঁসি কত ভাঙ্গি গড়ি।

ভব আশা মৃগতৃষা ছুটে যায় যবে
আপনার য'ারে ভাবি ফেলে যায় সবে।
তখনই কাতরে চাহি তব মুখ পানে,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, অজ্ঞান সন্তানে।

বুঝাইয়া দাও মোরে আত্মতত্ত্বজ্ঞান
আমি যে অধম অতি দুর্ব্বল অজ্ঞান!
অমনি দাওগো মাতা সুমধুর স্বরে
আমি যে ভরিয়া উঠি তোমার আদরে।

তোমার অভয় বাণী, শুনি গো শ্রবণে
কতই সোহাগভরে, ডাক দীনজনে।
আর কেন কর এবে চক্ষুরুন্মীলন
তপস্যাতে হয়ে দৃঢ় কররে সাধন।

স্বাধীনতা রত্ন তোরে দিয়াছিনু আমি
অপব্যবহারে নষ্ট করিয়াছ তুমি।
পলাইতে পথ নাহি, ঘিরিয়াছে কাল
গুরু মন্ত্র ইষ্ট চিন্ত ঘুচিবে জঞ্জাল।

শিয়রে দাঁড়ায়ে কাল, করিছে গর্জ্জন
শৃগাল কুক্কুর প্রায়, মরিবি রে কেন।
দুর্লভ মানব জন্ম, ভুলেছ হা ধিক্
পাথেয় সম্বল কিছু কররে পথিক।

করে'ছ আমারে ভুলে কুকার্য্য সাধনা
বিনা তপস্যাতে সিদ্ধি হবে না হবে না।
মিথ্যা প্রহেলিকা সব, মিথ্যা এ ভাবনা
মায়ার খেলায় আর, কেঁদনা হেসনা।

তুমি বা কি? কোথা ছিলে? কোথা যাবে চ'লে?
কে তব প্রণেতা কেবা আছে তব মূলে?

এক সূত্রে গাঁথি মালা, জীবকুল সবে,
সূত্র ধরে খেলিতেছে, একজন ভবে।
বৃথা অভিমানে তুমি, কর আমি আমি
ভাব দেখি একবার, কে তুমি কে আমি ?

নিত্য মুক্ত নিত্যানন্দ জন্মমৃত্যুহীন
তুমি কি হইতে পার মায়ার অধীন ?
জগৎ প্রপঞ্চ এই ভোজ বাজী প্রায়
স্বপ্ন দৃষ্টে ওরে অন্ধ কর হায় হায়।

কর ছিন্ন মায়াপাশ জ্ঞানের কুঠারে
প্রকাশ অনাদি নিত্য সত্য আপনারে।
রূপহীন নামহীন অশব্দ অব্যয়
তাহার কি সুখ দুঃখ হয় কভু ক্ষয় ?

পরিপূর্ণ চতুষ্পাদ কারণ সলিলে,
অহং বহুস্যাম বলি, জগৎ সৃজিলে।
মণির ঝলক প্রায় উঠে এক দেশে,
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাহাতেই ভাসে।

তুমি যে গো শান্ত স্থির অনাদি নিশ্চল
তোমার সে মায়ারাণী খেলিছে কেবল।
তোমার হৃদয়ে তব প্রকৃতি খেলায়
দ্রষ্টা তুমি পদ্ম পত্রে থাক জলপ্রায়।

শব্দতত্ত্ব ওঁকারে ধ্বনিল যে নাদ
সত্ত্ব-রজঃ-তম সেতো তোমারই প্রসাদ।
তুমি কিন্তু নিত্য মুক্ত হও গুণাতীত
তুমি সে পরম পদ চিন্তার অতীত।

ওঁকারে জড়িত আছে সত্ত্ব, রজঃ, তম
ত্রিগুণ আশ্রয় করি খেলিছে বিষম।

জাগ্রত হইতে স্বপ্ন, স্বপ্নতে সুষুপ্তি
পরে কলা বিন্দুনাদে হয় যবে স্থিতি
থাকে না তখন তার মায়ার ঝঙ্কার
আপনা হারায়ে শুধু আনন্দ অপার।
জীব শিবে মিশে যায়, যে তুমি, সে তুমি
মিথ্যা ভাব আরোপিয়া, দুঃখ পায় 'আমি'।
মিথ্যা হাসি মিথ্যা কান্না মিথ্যা যাওয়া আসা
মিথ্যা সুখ, মিথ্যা দুঃখ, মিছা ভালবাসা।
মিথ্যা এই ছায়াবাজী, আমির বিকার।
মিথ্যাতে ভুলিয়া কর আমার আমার।
এক দ্রষ্টা নাহি তাহে বহুত্বের ভাব
দ্রষ্টাতে আরোপে দৃশ্য, মায়ার স্বভাব।
অখণ্ডকে খণ্ডজ্ঞানে ধরি ঘটাকাশে,
ঘট ভগ্নে মিশে যায় অনন্ত আকাশে।
স্বপ্ন দৃষ্ট নর যথা হাসে কাঁদে গায়
ভবরঙ্গ নাট্যশালা তেমনি রে হায়।
এস মাগো বুঝাইয়া দাও পর ভাব
ঘুচাও আমার যত অবিদ্যা অভাব।
মিথ্যার পাছেতে ছুটি করিগো ক্রন্দন
দীর্ঘ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া, দে দুখানি চরণ।
নিজ কৃপা গুণে, দীনে করগো তোমার
এস গো চৈতন্যময়ী সর্ব্বসারাৎসার।

—০— ২৫।২

সত্যবতী।

১

চণ্ডীমণ্ডপ, পুষ্করিণী, সবৎসা ধেনু, চতুষ্পাঠী শালগ্রামশিলা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সংসারে যাহা যাহা থাকা উচিত—শ্যামপুরের হরিনাথবিদ্যারত্ন

মহাশয়ের প্রায় সকলই ছিল, তথাপি গ্রামের লোকে বলিত—"বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সব থাকিতেও কিছুই নাই, যেহেতু পুত্রসন্তান নাই; যুক্তি দৃঢ় করিবার জন্য লোকে "অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং" এই নীতিশ্লোক আবৃত্তি করিত।

বিদ্যারত্ন মহাশয় কিন্তু এমন স্বভাবসুন্দর যে তাঁহাকে দেখিলে বোঝাই দায় হইত যে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কোনরূপ অভাব বোধ আছে; প্রকৃত কোনও অভাব বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুভব করিতেন না, স্নেহ-পুত্তলিকা কন্যা সত্যবতীর মুখ দেখিয়া বিদ্যারত্নমহাশয় এতই আনন্দিত ছিলেন যে অন্য কোন দুঃখ তাঁহাকে কাতর করিতে অক্ষম হইয়া পাড়ার দুর্ব্বলব্যক্তির কাছে অতিথি হইত। স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক সময়েই বলিতেন—দেখ গৃহিণি! শাস্ত্রে আছে "দশপুত্র সমা কন্যা যদিস্যাচ্ছীলবর্জ্জিতা" এক কন্যাই দশপুত্রসমা হয় যদি তাহাকে সৎপাত্রে দান করা যায়। আমি এ আশা রাখি, মা আমাদের সকল দুঃখ ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে। আমার হৃদয়ে সন্তানস্নেহের সীমা আছে কি না এই পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন মায়া, শরীরধারিণী হইয়া আমার গৃহে উপস্থিত। পরীক্ষা দিতে দিতে আমি আত্মহারা হইয়া যাই। মা যখন দূর হইতে আমাকে বাবা বলিয়া ডাকে, আমার মনে হয় স্বর্গের মুরজাদির ধ্বনিকে পরাস্ত করিয়া আমার মার মুখের বাবা ধ্বনি আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করে। আহা! সন্তানস্নেহ কি অসাধারণ শক্তিশালী! ভগবৎ কৃপায় মাকে যদি সৎপাত্রে দান করিতে পারি, না জানি এ সংসার আমার পক্ষে কি সুখাগারই হইবে! মনের আবেগে বিদ্যারত্নমহাশয় যখন যখন এই কথাগুলি বলিতেন, তখন তখনই গৃহিণী উত্তর দিতেন—সুখাগার কি কারাগার হইবে তা ভগবানই জানেন, তাঁহার যাহা মনে আছে তাহাই পূর্ণ হইবে। বলাই বাহুল্য গৃহিণীর এরূপ মর্ম্মস্পৃক্ উত্তরে বিদ্যারত্নমহাশয় কিছুমাত্রই সুখী হইতেন না, কিন্তু তথাপি এরূপ উত্তর শুনিতে হইত। বিধাতা যেন তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দিতেন সুখের কল্পনা

কেবল করিও না, ইহা ভাবিও তুমি সাদরে আহ্বান কর অথবা ভয়ে ভীতই হও তোমার আদর অনাদরের প্রতি না চাহিয়া দুঃখের দিন তোমার আসিবে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, ইহাই জাগতিক নিয়ম। জগতের নিয়ম ইহা বুঝিয়া যে প্রস্তুত থাকে, সে বিপদে মুহ্যমান হয় না, আর যে একেবারেই প্রস্তুত না থাকে, আকস্মিক্ বিপদের আঘাতে সে আত্মহারা হইয়া দুঃখসাগরে হাবুডুবু খায়। নদীতে ডুবিবার আগে সাঁতার শেখার যেরূপ প্রয়োজন, সুখের সময়েও দুঃখ সহ্য করিবার জন্য হৃদয়কে গঠিত করা সেইরূপ আবশ্যক।

(২)

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মায়ার সহিত দিন দিন সত্যবতীর ধর্ম্মবুদ্ধি, রূপ ও বয়ঃক্রম বাড়িতে লাগিল। সত্যবতী অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিল। অষ্টমবর্ষীয়া-বালিকা পিতার শিক্ষানুসারে পার্থিব শিব প্রত্যহ পূজা করে ও বৈকালে প্রতিদিন রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে, এবং সায়াহ্নে পিতৃমুখে ধর্ম্মোপদেশ সীতা, সাবিত্রী, পতিব্রতা প্রভৃতির উপাখ্যান শ্রবণ করে; পাতিব্রত্য উপাখ্যান বলিবার সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় ভাগবতের ভগবানের উক্তিটী পুনঃ পুনঃ বলেন—

"দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্য ধনোঽপি বা।
পতিঃস্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥

পতি দুঃশীল, দুর্ভাগা, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা দরিদ্র যাহাই হউন না কেন, স্ত্রীর কাছে তিনি জগৎপতি অপেক্ষা পূজ্য। এই আসল কথাটা এখন অনেকেই বিস্মৃত, তাই দেশে এত ব্যভিচারিণীর প্রাদুর্ভাব। বালিকা বেদবাক্যজ্ঞানে পিতৃবাক্য শুনিত ও মনে মনে ভগবানে কাছে প্রার্থনা করিত আমার যখন পীরক্ষার সময় আসিবে হে ভগবন্ আমি যেন এই পিতৃদত্ত উপদেশ তখন না বিস্মৃত হই। পূর্ব্বাহ্নে শিবপূজা সমাপন করিয়া গালবাদ্য করিতে করিতে যখন সত্যবতী "বম্ বম্" ধ্বনি করিত, তখন দূর হইতে ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহা দেখাইতেন ও বলিতেন— তোমরা কুমারসম্ভবে সতীর শিবপূজার বর্ণনা পড়িয়াছ,

আর আজ প্রত্যক্ষ কর আমার সত্যবতী মায়ের পূজা করা। দেখ মাকে শিবপূজায় মগ্ন দেখিয়া মনে মনে আমি ভাবি—এই ঘোর কলিকালে ধর্ম্মসংমূঢ় ব্যক্তিগণের রক্ষার জন্যই দয়াময়ী সতী যেন শিবপূজার মহিমা প্রচার করিতে এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! মার পূজায় আশুতোষ সন্তোষ লাভ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ করেন। মনোমত পাত্রে মাকে সম্প্রদান করিয়া আমার এ জীবন যেন সার্থক করিতে পারি। সকল পিতারইত অভিপ্রায় সুপণ্ডিত পাত্রের হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করিতে; কিন্তু কয়জনের এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? অনেকেই শীতল জল প্রার্থনা করেন ও শীতল জলের পরিবর্ত্তে "কঠোর বজ্রাঘাত" পান।

(৩)

সত্যবতী অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলে গৌরীদান আশায় ব্যস্ত হইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় দেশ বিদেশে সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু মনোমত পাত্র কোথায়ও পাইলেন না। পাত্রের একটা না একটা দোষ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চ'খে পড়িতে লাগিল। হয় পাত্র উৎকট পাশ্চাত্যভাবাপন্ন না হয় বিদ্যাবর্জ্জিত, মনোমত পাত্রের সন্ধান হইল না। কিন্তু ১লা জ্যৈষ্ঠ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে গৌরীদান আশায় নিরাশ করিয়া সত্যবতীর অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম চলিয়া গেল। বিদ্যারত্ন মহাশয় বুঝিলেন "কাল" কাহারও মুখপানে চায় না; আত্মাভিমানী আপন মনে চলিয়া যাইতেছে তুমি প্রস্তুত কি অপ্রস্তুত সে তাহা লক্ষ্য করে না, কালই এ সংসারে বলবান্। কিন্তু তথাপি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়েই হউক আমি নবম বর্ষ বয়স্কা সত্যবতীকে পাত্রসাৎ করিয়া রোহিণী-দান ফললাভ করিবই। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় সুপাত্র ও বিবাহোপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিবার জন্য দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—বিবাহোপযোগী সকল দ্রব্যই সংগ্রহ হইয়াছে, কেবল এক অভাব মনোমত পাত্রের। গৃহিণী বলিতেন "অত খুটি-নাটি করিও না, বাছ্‌তে বাছ্‌তে শেষে কি ময়লায় হাত

পড়িবে”। বিদ্যারত্ন মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, সৎ-পাত্রের সন্ধান রীতিমত চলিতে লাগিল। মনে মনে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা আছে নবমবর্ষে কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবেনই,। বৈশাখ মাসে বিদ্যারত্ন-ঘরণী বলিলেন ওগো এই বৈশাখ মাস অতীত হইলেই “সত্যবতী” আমার দশমবর্ষে পদার্পণ করিবে। বিদ্যারত্ন মহাশয় বুঝিলেন, এই বৈশাখ মাসে যদি বিবাহ না দিতে পারি—তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইবে। মনে অনুশোচনা আসিল—কেন এ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ? একে একে বৈশাখ মাসের এক একটা দিন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বুকে দারুণ হইতে দারুণতর এক একটা আঘাত করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আর যেন উপহাসচ্ছলে বলিয়া যাইতে লাগিল—কি ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা কি স্মরণ নাই, বড় যে বুক্ঠুকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ? এখন বুফ ঠুকে প্রতিজ্ঞা পালন কর। ক্ষতের উপর ক্ষার অর্পিত হইলে সকলে যেমন অধীর হয়, বিদ্যারত্ন মহাশয়ও সেইরূপ অধীর।

(৪)

চলিত্ কথা আছে “জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে” ক্ষুদ্র মানব ত কোন্ ছার, স্বয়ং বিধাতাও বিধিলিপি খণ্ডন করিতে অক্ষম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সকল সাধে বাদ সাধিয়া ২৮শে বৈশাখ সত্যবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ছাত্রগণ “কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ” এই শ্লোক আবৃত্তি ও পাত্রী বরের রূপ, পাত্রীর মাতা ধনসম্পত্তি, পিতা শাস্ত্রজ্ঞান, মাতুলাদি সৎ কুল ও পাড়াপড়্শী মিষ্টান্ন প্রার্থনা করে এই-রূপ ব্যাখ্যা করিয়া মিলাইতে গিয়া বুঝিল হাড়ে হাড়ে বুঝিল, সত্যবতীর যিনি স্বামী হইয়াছেন, কাহারও প্রার্থনা নিষ্ফল লইলে কেহ পাছে দুঃখিত ও কেহ সুখী হইলে পাছে তাঁর পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে এই আশঙ্কায়ই যেন সকলকেই একদম নিরাশ করিয়াছেন।

নিজের সাধ্যাতীত চেষ্টা নিষ্ফল হইলে প্রতিজ্ঞাস্খলনভয়ে ভীত

হইয়া সরল হৃদয় বিদ্যারত্ন মহাশয় গ্রামস্থ হরিশর্ঘটকের উপর পাত্রানু-সন্ধানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। চতুর ঘটক মহাশয় রূপে গবারাম, বিত্তে-ভিখারীর সহোদর, শাস্ত্রজ্ঞানে গোবরগণেশ, সৎকুলে এখন কুলীন (অর্থাৎ কুকার্য্যে লীন) দুলাল গোপালকে কোনও গো-পাল হইতে আনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীর বরাসনে বসাইয়া দিল। শর্ম্মা-রামকে দেখিয়াইত সকলের চক্ষুস্থির। সত্যবতী হঠাৎ জলমগ্ন হইয়াছে এ সংবাদে আত্মীয়বর্গ যেরূপ মর্ম্মাহত হইতেন, বরাসনে পাত্রকে দেখিয়া তাহা হইতে অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন। লগ্নভ্রষ্ট হইলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, তাই ধর্ম্মভীরু বিদ্যারত্ন মহাশয় মর্ম্মের বেদনা মর্ম্মে চাপিয়া, সেই পোড়া বিধাতার ও চতুর চূড়ামণি ঘটকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সকলেই ভাবিল দেবভোগ্য নৈবেদ্য আজ অসুরের করে অর্পিত হইল।

(৫)

বলা বাহুল্য 'বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার গৃহিণী বা বিদ্যারত্ন মহা-শয়ের আত্মীয়বর্গ, সকলেই বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু যার জন্য তাঁহাদের এত দুঃখ, সেই সত্যবতী কিছুমাত্র দুঃখিতা নহে। অনেকে মনে করিতেন বালিকা তাহার বিপদ্ বুঝিতে পারে না, তাই সে দুঃখিতা নহে। আবার কেহ কেহ ভাবিতেন, সত্যবতী বয়সে বালিকা কিন্তু কার্য্যে সে বালিকা নহে। কারণ পূর্ব্ব হইতেই তাহার জ্ঞান, তাহার আচরণ,দেখিয়া অনেকে অনেক সময় বিস্মিতা হইতেন, ও বলিতেন আহা সত্যবতি! এত অল্প বয়সে তোর এত জ্ঞান হ'ল কেমন ক'রে। লোকে মুখে বলে "গতস্য শোচনা নাস্তি" কিন্তু এখন প্রায় সকলেই গত কার্য্যের সমা-লোচনায় এত ব্যস্ত যে, বর্ত্তমানের ভবিষ্যতের ভাবনাও ভাবিতে পায় না, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীর মজলিসেও গত কার্য্যের খুব অনুশোচনা চলিতে লাগিল। আত্মীয়েরা একত্র হইলেই গোপালের মুণ্ডপাত করিতে ছাড়িতেন না, তাঁহারা গোপালের নিন্দা করিতে আরম্ভ করি-লেই, সত্যবতী কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইত ও

মনে মনে ভাবিত, আমি উহাদের নিকট এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে উঁহারা আমার কাছে আমার স্বামীর নিন্দা করেন। যাঁহারা স্বামিনিন্দা করেন তাঁহাদের সংসর্গ বিষবৎ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, সতী স্বামীনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বাবাও উপদেশ দিতে দিতে আমার কাছে কত সময় বলিয়াছেন—স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের পৃথক্ উপাস্য নাই। স্বামী মনের মত নয় বলিয়া যাহারা পূজা জপ করিয়া সময় ক্ষেপ করিতে চায়, তাহারা রূপান্তরেও নামান্তরে ব্যভিচারিণী। যে নিজের সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া—স্বামী মনের মত নয় ব'লে সাক্ষাৎ দেবতা ত্যাগ করিয়া মাটীর বা পটের দেবতা পূজা করে, তাহাদের ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়। "হেলে ধর্‌তে না পেরে কেউটে" ধর্‌তে যাইলে যে দুর্গতি, স্বামীকে তুষ্ট করিতে না পেরে "জগৎস্বামীকে তুষ্ট করিতে যাইলেও সেই দুর্গতি।" বাবা ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিতেন—স্বামীর অপ্রণয় দেবতার ছলনা ভাবিতে ভাবিতে যে কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবা করিয়া থাকে, তাহার সৌভাগ্যের উদয় হইবেই। যে স্ত্রী হাস্যমুখে পতিনিন্দা শুনিতে পারে তাহার অসাধ্য জগতে কার্য্য নাই, আর যে নিজ মুখে পতির নিন্দা করে তার জন্য যে কোন্ রৌরব নরক সৃষ্ট হয় তাহা কে বলিবে?

একদিন গ্রামস্থ কোনও বর্ষীয়সী আত্মীয়া সত্যবতীর দুঃখে দুঃখী হইয়া বলিলেন "ভাই এত ক'রে শিব-পূজা কর্‌লি তোর কপালে শেষে এই হ'ল, তাই এক একবার মনে হয় আজকাল আর পূজা আচ্ছা না করাই ভাল।" মনের বেগ রোধ করিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে সত্যবতী বলিল—আপনারা স্নেহেতে অন্ধ হইয়া কেন আমার সর্ব্বনাশ করেন? এতদিন মাটীর শিবপূজা করিয়াছি এবার খাঁটী দেবতার পূজার দিন আসিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করুন এবার যেন দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি আর আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা দেবতার নিন্দা আমার কাছে করিয়া, আমার হৃদয়ে ব্যথা দিবেন না; সত্য কথা

বলিতে কি আপনারা পাছে দেবনিন্দা করিয়া আমার মনে ব্যথা দেন, এই ভয়ে আপনাদের সঙ্গে এখন আমার কথা কহিতেও ভয় হয়। দশম বর্ষীয়া বালিকার মুখে এই কথা শুনিয়া বর্ষীয়সী বিস্মিতা, লজ্জিতা ও আনন্দিতা হইলেন ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সত্যবতীর স্বামীর নিন্দা করিয়া আর তাহার মনে আমরা ব্যথা দিব না। বুঝিলাম আমরা যাহা যাহা দোষ দেখি, সত্যবতী সেগুলি দেবতার ছলনা ভাবিয়া সুখে আছে। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন গোপালের সব না থাকিলেও কিছুরই অভাব নাই। এমন যার স্ত্রী সে ত্রৈলোক্যপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; হায়! কবে সত্যবতীর তপস্যা সফল হইবে?

(৬)

পাড়ার চ্যাঙ্‌ড়া ছেলেরা বলিত, শিবপূজা ক'রে সত্যবতী শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বামী পাইয়াছে। পঞ্চানন পাঁচ মুখে যে নেশা করিতে পারেন কি না সন্দেহ, গোপাল একমুখে তাহার শ্রাদ্ধ করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার কেহ কেহ বলিত গোপালের কোন কোন কার্য্য শিবের মত, শিব বিবাহের পর হিমালয়ে আড্ডা গড়িয়াছে, আর গোপালও বিদ্যারত্নভবনে মৌরশীপাট্টা লইয়াছে; এস্থান ত্যাগ করে কোথাও আর এক দিনও যায় না, যাবেই বা কোথায়? আর কোন চুলোয় কি যায়গা আছে? উহাদের মধ্যে একজন বলিল ভাই পরের সমালোচনা এত করিতে নাই, কার কখন কি পরিবর্ত্তন হয় বলা যায় না। শুনেছি গোপাল একজন বড় নৈয়ায়িকের ছেলে, বাল্যকালে পাঁচজনে ওর কত সুখ্যাতিও কর্‌তো; কিন্তু কপাল-দোষে আজ ওর এই অবস্থান্তর। আমাদের মধ্যেও কখন কার কি হয় তাও তো বলা যায় না। বিদ্যারত্ন মহাশয় আশা করিয়াছিলেন সৎ-পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবেন, একবারও ভাবেন নাই এমন বিপদে পড়িতে পারেন তাই তিনি বিপদের জন্য কিছু মাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। অনেকে থাকেনও না। কিন্তু সম্পদ বিপদ স্বকীয় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে আসে, তাই সম্পদকে কাতরে

মিনতি করিলেও সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় থাকিতে পারে না ও বিপদের নাম হইতে না হইতেই ভয়ে ভীত হইয়া "স্বাট্ স্বাট্" শতসহস্র বার করিলেও সে যথাসময়ে আসেই। নেশার ঘোরে সত্যবতীকে গোপাল গালি দেয়, কখন কখনও প্রহার পর্য্যন্ত করে; বিদ্যারত্ন এসব প্রত্যক্ষ করেন ও মনে মনে ভাবেন হায় হত বিধাতঃ! তোমার মনে আর কত আছে, আর যে সহ্য করিতে পারি না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কষ্টের অবধি নাই, এরূপ জামাতা যাঁর ঘরে আছে তিনিই জানেন কুপাত্রে কন্যা দান করিলে তাহার কি বিষময় পরিণাম!

(৭)

লোকে ভয় করে "দাঁতাল, নেশেল, শিঙেলকে"; গোপাল সকলেরই ভয়ের ও ঘৃণার পাত্র। গোপালকে দূর হইতে দেখিয়াই বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঘৃণায় ও ভয়ে পথ ছাড়িয়া দেয়। এমন কি গোপালের শ্বশুর শাশুড়ী পর্য্যন্তও অনেক সময় ঘৃণায় গোপালের সঙ্গে কথা কন না। গোপাল বুঝিয়াছে তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা করাই জগতের লোকের একটা মহত্ত্ব। জগতের লোকে যত তারে ঘৃণা করে, ততই জগৎছাড়া এক জনের কথা গোপালের মনে জাগে। গোপাল ভাবে আমাকে ঘৃণা না করিয়া সত্যবতী ভক্তি করে কেন? আমাকে বেরো দূরহ না বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কেন? আমি ওর কে? আমার যেমন নেশায় মন ব্যস্ত, সত্যবতীওতো সেরূপ পূজা জপ তপ নিয়ে ব্যস্ত থাকিলেই পারতো; তাত করে না। আমি নেশাখোর যদিও তবুও লক্ষ্য করি আমাকে দেখিলে সে পূজার সকল আয়োজন মৃত্তিকানির্ম্মিত শিব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে বাতাস দেয়, আমার পায়ে হাত বুলোয়, আমার পায়ের কাছে এসে টিপ্ করে একটা প্রণাম করে। আবার ভাবে না অত সত্যবতীর ভাবনা ভাবা হবে না, ওটাও একটা নেশা। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি সত্যবতার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেও আমি কোন কোন দিন এত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি যে, আমার সাধের গাঁজার কল্কের আগুণ নিভে

যায়, আর সে সময় নেশা ক'রেও আনন্দ পাই না। নেশাখোরের একটা নূতন নেশা আসিলে সেইটাই প্রবল হয়, তাই গোপাল আবার ভাবে, না গাঁজা খাওয়ার চেয়েও সত্যবতীর ভাবনা করায় সুখ। তার কাছে যেতে আর সাহস হয় না, কারণ আমি যে নেশাখোর। আবার ভাবে সত্যবতীর সঙ্গে যত দিন না দেখা হ'য়েছিল, ততদিন ছিলাম ভাল। তত দিন নেশা ক'রে কেমন সমস্ত দিন মস্গুল হ'য়ে থাক্তুম, এক সত্যবতীর ভাবনা ঢুকে আমার নেশায় আর তত সুখ হয় না। দুদিনের দেখা শুনোয় চিরদিনের নেশাত্যাগ করা নিতান্ত বেরসিকের কাজ; যাক্ সত্যবতীকে না দেখিলে ত আর তার ভাবনা আসিবে না—আজ থেকে স্থির করিলাম আর সত্যবতীর সঙ্গে দেখা করিব না। গোপাল সত্যবতীকে ভুলিবে ভেবে নেশা করিতে লাগিল, দু-তিন দিন আর শ্বশুর বাড়ীর দিকেই যাওয়া বন্ধ করিল, কোন রকম ক'রে নেশার পয়সা জোগাড় ও নেশা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু হায় যাহাকে ভুলিতে তার এত চেষ্টা, তার ভাবনা আর একপলও গোপাল ত্যাগ করিতে পারিল না। কেবল মনে হ'তে লাগিল হায় আমাকে না দেখে, সে কত কষ্টই না পাচ্ছে, চুম্বুকের আকর্ষণে লৌহ কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? অনিচ্ছা সত্বেও কলের পুতুলের ন্যায় গিয়া গোপাল সত্যবতীর নিকট দাঁড়াইল। দু-তিন দিন স্বামীর সাক্ষাৎ না পাইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সত্যবতী কেবল ক্রন্দন করিতেছিল। স্নেহান্ধ মাতা পিতাকেহই 'বকাটে' জামায়ের সন্ধান করেন নাই। সত্যবতী চাতকিনীর ন্যায় আশা পথ চেয়ে ব'সেছিল, আজ স্বামীর সন্দর্শন পাইয়া ও স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া অপরাধিনীর ন্যায় কাতর ভাবে বলিল, দেব! আপনার শ্রীচরণে দাসী যদি কোন অপরাধই করিয়া থাকে তাহা আপনার মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য, কারণ আমি জ্ঞানহীনা বালিকা। গোপাল বলিল সত্যবতি! তোমার অপরাধ অতি গুরুতর, তুমি মরুভূমির নিকট জল, বজ্রের নিকট কোমলতা পাইলেও পাইতে পার কিন্তু এ পাষাণ প্রাণের কাছে স্নেহ,

ভালবাসা কিছুই পাইতে পার না, তুমি কিন্তু তথাপি পাইতে চেষ্টা করিতেছ পাষাণ প্রাণে তোমাকে কত গালি দিয়াছি, কত প্রহার করিয়াছি কৈ সত্যবতি! একদিনও তুমি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ কর নাই। দেখ সত্যবতি! বানরের গলায় মতির মালার যে অবস্থা হয় আমার হাতে পড়িয়া তোমারও সেই অবস্থা। কাতরে চরণে ধরিয়া সত্যবতী বলিল—দাসীকে কেন অপরাধিনী করিতেছেন, ক্ষমা করুন ও সকল কথা বলিবেন না, উহাতে আমি বড় ক্লেশ পাই। প্রথম প্রথম আসুরী শক্তি কিছু প্রবল হয় বটে কিন্তু শেষে চিরদিনই উহা দৈবীশক্তির কাছে পরাস্ত হয়। আজ সত্যবতীর কথার উত্তর দিতে গোপাল অক্ষম। যার হৃদয়ে কণামাত্র করুণা আছে কি না লোকে বুঝিতে পারিত না,—সেই পাষাণ গোপাল আজ করুণাময় হইয়া সত্যবতীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিল—অয়স্কান্তমণির স্পর্শে লৌহের লৌহত্ব দূর হইয়া স্বুবর্ণত্ব হয়। তোমাকে হৃদয়ে লইয়া আমি পবিত্র হইলাম। আমারও প্রতিজ্ঞা এ পবিত্রতা রক্ষা করিতে আমি প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিব। সত্যবতী ভাবিল এতদিনে দেবতা বুঝি ছলনা ত্যাগ করিয়া স্বরূপে দেখা দিলেন।

(৮)

"স্ত্রীর মত স্ত্রী হইলে স্বামী যতই দুষ্কার্য্যশীল হউক না কেন, একদিন না একদিন ভাল হইতেই হইবেই। সত্যবতীর মত স্ত্রী পাইয়াছিল বলিয়া গোপাল আর সে গোপাল নাই।" এই কথাই হরিপুর গ্রামের অনেকের মুখে। সত্যই গোপাল আর সেই গাঁজা, গুলি, চণ্ডুখোর নাই। সে সর্ব্বদাই এখন সেই চিন্তাই ব্যস্ত, কিসে সত্যবতীকে শ্বশুর শাশুড়ীকে ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে সুখী করিবে ও সকলের প্রিয়পাত্র হইবে? সত্যবতী ভালবাসে বলিয়া গোপাল বহুকষ্টে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে লাগিল। শ্বশুরের ব্যবস্থা মত সংস্কৃত হইয়া গায়ত্রী পুরশ্চরণ করিয়া নিত্য সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিতে লাগিল ও শ্বশুরের নিকট দশকর্ম্ম শিখিতে লাগিল। মেঘ কেটে

গেলে, বারি বর্ষণ বন্ধ হইলে, আকাশ যেমন নির্ম্মল হয় ও তাহাতে চন্দ্র উঠিলে যেমন সকল লোকের সুখের অবধি থাকে না,—সেইরূপ নেশামুক্ত গোপালের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত। হৃদয়ে পাপ থাকিলেই রূপ বিকৃত হয়। নলের হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল তাই সর্পদংশনে বিরূপ হইয়াছিলেন। যার হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করে, সেই বেশ্যা, সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের দ্বারা ক্রমশঃ বিকৃত হয়। পাপ কাটিলে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কলি দেহ হইতে নির্গত হইলে স্বীয় রূপ নলও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আসল কথা গোপাল নেশাগুলি ত্যাগ করিয়া প্রকৃতই সৌম্যদর্শন হইয়াছে। এখন সত্যবতী মনে মনে ভাবে,—আশুতোষ অল্প আরাধনাতেই সন্তোষলাভ করিয়াছেন। দেবতা আমার ছলনা ত্যাগ করিয়া দাসীকে কৃতার্থা করিতে স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। গ্রামের প্রাচীনারা বলেন—সাবিত্রী মৃতস্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিল ও সত্যবতী, পশুকে দেবতা করিয়াছে। সাবিত্রী অপেক্ষা সত্যবতী কম কিসে? বিদ্যারত্ন মহাশয় ভাবেন, কালের আবর্ত্তে পড়িয়া আজ কাল অনেকেরই স্বামী কর্ত্তব্যভ্রষ্ট। এ সময় যদি শক্তি-স্বরূপিণী কন্যারা নিজেদের নিজত্ব স্মরণ করিয়া নিজেদের সুপ্তশক্তি প্রবুদ্ধ করিয়া পাপপথ হইতে পুরুষদের না ফিরাইয়া আনেন, তাহা হইলে পাপপঙ্কে এ জগৎ ডুবিয়া যাইবে। পুণ্যবতী নারীর অভাব এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। এখন সেই অভাব, তাই আমাদের দেশে আমাদের ঘরে ঘরে এত হাহুতাশ। কবে এ দেশে আবার সেই শুভদিন আসিবে যবে ঘরে বেশভূষা বেশ্যার ও ধর্ম্মভাব গৃহলক্ষ্মীদের অলঙ্কার হইবে। কবে প্রত্যেক গৃহলক্ষ্মী বুঝিবেন—ধর্ম্মের ন্যায় শোভাবর্দ্ধন করিতে অন্য কাহারও সাধ্য নাই; স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি।

শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ,
ভাটপাড়া।

মধুরে 'মা'।

আহা ! স্বরগের সুধা রেখেছি গোপনে কত
ওগো পরিয়া সঙ্কোচ বাস,
তোমারে নিরখি এযে রাখা দায় বঁধু, একে
গুরুজন মাঝে করি বাস।
কাজ কি এ পীতবাসে খুলে পর রাঙ্গাবাসে
বাসে করি উপহাস।
বনমালা লব খুলে জবা আর বিল্বদলে
অর্ঘ্য দিব হয়ে দাস।
পড়ে রব পদতলে দাঁড়া হৃদি-পদ্ম দলে
ডাক্‌বো সদা 'মা মা মা' ব'লে ;
স্বরূপে কে রূপ খোঁজে মা বোঝে, সন্তানে বোঝে
খেলা ভঙ্গে নিবি কোলে তুলে !

—০— ২৫।৭

ভালবাসা।

সখা ! ভুল ক'রে যেন মোরে ভালবেস না !
ভুলে ভালবাসা, এ ভুলে যাওয়া আসা ;
জলধি থাকিতে শিশিরবিন্দুতে ম'জনা।
আমি জলধির জলে মিশাব এ তনু,
জনম মরণ আর ত হে মোর রবে না।
জনম জনম এ উপাসি হৃদয়ে ল'য়ে
তোমারি বেদনা বহি, আছি মুখ চেয়ে ;
ওগো ! শুধু "আমি" ভুল ক'রে যেন চেয়োনা।
এত আকুলতা এ তরুণ প্রাণের আশা
প্রাণে প্রাণে গাঁথা এ চির-চাওয়া ভালবাসা
যেন এ ভুলে ভুল ক'রে বঁধু হারায়োনা॥

—•— ২৫।৭

ব্রহ্মের স্বরূপ কি ?

তিনি অবাঙ্মনসগোচর, তিনি মন বুদ্ধির অতীত, তিনি বাক্যের অতীত, তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, তিনি অজ্ঞেয়, যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যেখানে চক্ষু দ্বারা দর্শন হয় না যেখানে মনও সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে, যিনি অলব্ধ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, যিনি আত্মজ্ঞ, আত্মতৃপ্ত, আত্মানন্দ, এক কথায় বোধ হয় বলা যায়, যেখানে আর কোন বস্তুর দর্শন হয় না, শ্রবণ হয় না, মনন হয় না, যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় সবই এক, তাহা বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও হইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্ম এক সেখানে দুই নাই, তিনি সাক্ষী স্বরূপ ত্রিগুণাতীত, সৎ-চিৎ-আনন্দ। সৎ অর্থে যাহা আছে, চিৎ অর্থে জ্ঞান, তাহার পর আনন্দ, অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানানন্দময় নিত্য পদার্থ। তাহাও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মাত্র, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সেই একই ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন।

তবে আপন, পর এটা কি ?

ওটা পূর্ণ অজ্ঞান মাত্র। এই বিশ্বমাঝে সবার ভিতরে সেই এক-জনই আছেন, তবে আপন, পর কথাটা ভুল, আমি, তুমি কথাও ভুল, যদি একজনেরই সকল খেলা, তবে কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কিন্তু কথাটা যদি না বুঝিয়া বলা হয় অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' আমার পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই, তাহা হইলে, ব্রহ্মের দোহাই দিয়া জীব যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অতিজ্ঞান আসিয়া পড়ে। প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাও সাধন সাপেক্ষ।

আহা এমন সুন্দর ! পূর্ব্বে আমিই একদিন জ্ঞানের কথা শুনলে লাফিয়ে উঠ্‌তাম, এখনও ত কিছুই বুঝি না, তবে আজ এত ভাল লাগছে কেন ? শুন্‌তে ২ কি এক অপূর্ব্ব ভাবরাজ্যে ডুবিয়া গেলাম, বল কোন্ সাধনা দ্বারা আমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে আমি তাহাই করিব।

প্রথমতঃ গুরু বাক্য বিশ্বাস করিয়া বিবেক বৈরাগ্য, মনঃসংযম, ভক্তি শ্রদ্ধাদি লাভ করিতে হয়, পরে প্রণব সাহায্যে (তাহা গুরু জানা-ইয়া দেন) আপনাকে ব্রহ্ম সাগরে ডুবাইতে হয়। লবণ-পুত্তলিকা

সমুদ্র মাপিতে গিয়া তাহাতে গলিয়া যায় অথবা সমুদ্রেই লয় হয়, সেই-রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা বলা যায়না তাহাতে ডুবিয়াই যাইতে হয়। এই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে হইলে যে সাধনার আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ বিনা সাধনে কোন কার্য্যই ফল প্রসব করে না। এই দেখনা কেন, সামান্য লেখাপড়া শিখিতে জীবনে কত সাধনার প্রয়োজন হয়? এই প্রাণপণ পরিশ্রমের বা সাধনার ফলে মানুষ কি পায়? ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য অস্থায়ি সুখ। ব্রহ্মবিদ্যা না শিখিলে, বিদ্যা, অবিদ্যা মাত্র। এই অনিত্য সুখের জন্য কত সাধনা করিতে হয়। আর চির নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে হইলে, কতটা সাধনার আব শ্যক হইবে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আজ কাল কেহ ২ কোন সাধনা না করিয়াই আমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে ইত্যাদি মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেন, সেই জন্যই আমার বলা যে, বিনা সাধনে ব্রহ্মজ্ঞান দুষ্প্রাপ্য মাত্র। এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার সাধনাটি বলুন আমি তাহাই করিব।

আমাদের আর্য্য ঋষি মহাত্মাগণ যে পথে গিয়াছেন সেই পথেই আমাদিগকে চলিতে হইবে। অর্থাৎ মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা' স্মরণ রাখিয়া দৃঢ় পুরুষকার দ্বারা অবিচলিত চিত্তে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক সময়ে অনেকানেক বাধা বিঘ্ন আসিবে কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না, মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ অর্থাৎ 'যায় যাবে প্রাণ আমার যাবে হরিনাম ত ছাড়িব না' এই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। দেখ, এ জীবন ত একদিন যাবেই, তবে শৃগাল কুকুরের মত যায় কেন? জীবন থাকিতে ২ যতটুকু পারি, সাধনপথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিয়া যাইলে, শীঘ্রই বাসনা, কামনার নিবৃত্তি হইয়া যাওয়া আসারূপ ভীষণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, শ্রীগুরুর বাক্যমতে সাধনা করিয়া সত্যের অনুসরণ করিলে ত্রিগুণময়ী মায়াকেও অতিক্রম করা যায়, ও পরে হৃদয়মধ্যে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়

পুরুষকে উপলব্ধি করিয়া, ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারা যায়, আর জীব যখন হৃদয় মধ্যে চৈতন্যরূপী ঈশ্বরকে, নিজ স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত বাসনা কামনা নিবৃত্ত হইয়া মাত্রাতীত পরম পুরুষকে লাভ করিয়া বিগত শোক হয়। গুরুবাক্য বিশ্বাসের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনা করিলে, ক্রমেই শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মদর্শন জন্য প্রবল ব্যাকুলতা জাগ্রত হয়, ও পরে এ জগৎ-প্রপঞ্চ, সেই ব্রহ্মরূপ সমুদ্রের মায়ার তরঙ্গ অথবা স্বপ্ন এবং একমাত্র ব্রহ্ম সত্য ইহা জানিয়া আত্মাতে স্থির হয়। নির্গুণ ব্রহ্মে সাধক আপন অস্তিত্ব লয় করিয়া স্থির হইয়া যান, এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সাধক কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহা শ্রীমদ্ভবদ্গীতা স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণে বিশেষরূপে বলিয়াছেন।

আচ্ছা ব্রহ্ম যদি নির্গুণ, তবে সগুণের উপাসনা করা কেন, এবং তিনি যদি নিষ্ক্রিয়, অচল, তবে এ অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লইয়া কে খেলা করে?

ব্রহ্ম কিরূপে খেলা করেন বলিতেছি শ্রবণ কর। যখন কিছুই ছিল না, অথবা যা ছিল, তা ছিল, সেই চতুষ্পাদ ব্রহ্মের, একটি কোণে একটু ঝলক উঠে, এই ঝলক উঠার 'কেন' নাই; যেমন মণির ঝলক উঠা, তাহার স্বভাব, এও তাঁর স্বভাব বলা যাইতে পারে, সেই একটু ঝলক ব্রহ্মের মায়া বা শক্তি, সেই ঝলকরূপ মায়াতেই এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, এই মায়া আবার সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণময়ী। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু তাঁহার শক্তি সক্রিয় ও সগুণ বহুনামরূপী। ব্রহ্মের তবে দুইটী ভাব হইল, শিবভাবে তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় স্পন্দন রহিত, শক্তিভাবে তিনি সগুণ ও তিনি নানারূপে নানা ভাবে খেলা করেন। তাই তিনি, সবরূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি হয়েন নিরাকার। শিবভাবে তিনি স্থির শান্ত, শক্তিরূপ তরঙ্গে তাঁহার খেলা, এই শিবশক্তি দুই ভিন্ন খেলা হয় না, শক্তি ভিন্ন শক্তিমান্ অচল-স্পন্দন রহিত। যেমন সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ, একই জল, সেইমত ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে মায়ারূপ তরঙ্গ দ্বারা জগৎ ভাসিয়াছে, অতএব নির্গুণও তিনি

সগুণও তিনি, মহাত্মা সাধক তুলসী বলিয়াছেন—

নির্গুণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ মাহতারী
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো দু'য়ো পাল্লা ভারি।

এই সগুণ উপাসনা ভিন্ন নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা হয় না, এই ত্রিগুণাশ্রিত শক্তির উপাসনা ভিন্ন ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব। তুমি মহাকালের হৃদয়ে নৃত্যকালীর বরাভয়করা রণমূর্ত্তি দেখিয়াছ, ইহাতে সৃষ্টি-তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে; ধ্যান স্তিমিত নেত্রে মৃতবৎ যে মহাযোগী নিস্পন্দ হইয়া শক্তির চরণ যুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন ইনিই ব্রহ্ম বা শিব, আর ওই ব্রহ্মময়ীর মূর্ত্তি, ইহাই শক্তি মায়া বা প্রকৃতি নামে ব্যক্ত, ইনি মূর্ত্তিমতী ও চঞ্চলা। জীব নিজ কৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম-রাশির ঘোর অজ্ঞান তিমিরে ডুবিয়া থাকে, সে বুঝিতে পারে না, কুম্ভ যেমন মৃত্তিকাতে লয় হয়, অলঙ্কার যেমন একই সুবর্ণে লয় হয়, সেইরূপ এই সৃষ্টি ব্রহ্মেতেই লয় হয় যেমন জলের বুদ্বুদ জলে উদয়, জল হয়ে মিশায় জলে। এই যে সুখ দুঃখ, ভয় বন্ধন, ক্ষুধা তৃষ্ণা, পাপ পুণ্য ইহা কেবল মনের কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম অথবা চৈতন্য যে বস্তু তাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা বন্ধনাদি কিছুই নাই তিনি নিরুপাধি নির্ম্মূল ও মুক্ত।

জীব সগুণ উপাসনা দ্বারা আপন আপন দেবতাকে হৃদয় পদ্মে বসাইয়া, তুমি ও আমি পৃথক্ ভাবে পূজা করিয়া থাকে, ইহাও বড় মধুর, এইরূপে, সাধক আহার নিদ্রা ভ্রমণ দান ধ্যান দেহ মন প্রাণ, সমস্তই তাঁর প্রাণের দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া অহঙ্কার জয় করিয়া লন, সর্ব্বদা মানস পূজা লইয়া ও সকল কর্ম্ম তাঁহার প্রসন্নতার জন্য করেন, ও সকল কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করেন, এই অবস্থায় ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন।

'মন আমার ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
নগর ফিরে মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে,

যাহা শুনি কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশত বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে
আহার কর মনে কর আহুতি দি শ্যামা মারে।

এ খেলা অতি সুন্দর অতি মধুর, এবং ইহাকেই কর্ম্ম কৌশল বা কর্ম্মযোগ বলে।

আচ্ছা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বুঝিলাম, এখন নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনা কেমন করিয়া জানিব? নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিবার প্রণবই মহাস্ত্র, এই অ × উ × ম যুক্ত করিয়া ওঁকার হয় এই তিন অক্ষর ত্রিগুণাশ্রিত, ইহাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয় ইহাই আবার জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি। সৃষ্টি স্থিতিতে লয় হয়, তাহার পর বিন্দু থাকে, এই বিন্দুই ব্রহ্ম দর্শনের দ্বার স্বরূপ, এই ওঁকার ত্রিগুণাশ্রিত ও ত্রিগুণ অতীত।

এই জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির খেলা প্রতি দিন প্রতি জীব হৃদয়েই হয়, আমরা ঘোর অজ্ঞানে ঘুমাই বলিয়া ইহা অনুভবে আইসে না। আমরা এই জগত লইয়া জাগ্রত রহিয়াছি, সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেই এই জাগ্রত্ স্বপ্নে লয় হয় ও পরে স্বপ্ন সুষুপ্তিতে লয় হয় ও তাহার পর স্থিতি বা তুরীয় অবস্থা লাভ হয়, তখন কিছুই থাকে না। সেই ব্রহ্মানন্দে সমাধি হয়, সমাধি ভঙ্গে সাধক উপলব্ধি মাত্র করেন যে 'বেশ ছিলাম' সকলেই সাধনা দ্বারা এ অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। অনেক সময় আমাদের এমন অবস্থা হয়, যে কত কথা হইয়া গেল শুনি নাই, কত কি চলিয়া গেল দেখি নাই, ইহা অন্য মনস্কতার জন্যই হয়; এইরূপ চিত্ত তাঁহাতে তত্ত্ব চিন্তা দ্বারা একাগ্র হইয়া বিষয়ে অনমনস্ক হইলে, সাধক তখন ইচ্ছামত যথা-প্রাপ্ত কার্য্যে জাগ্রত হয়, তারপর তাঁহাকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন রাজ্যে চলিয়া যান ইহা পরমানন্দ অবস্থা। যখন শিবশক্তি আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন তখন তাঁহারা দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া যান তখন খেলা থাকে না তখন নিদ্রাভঙ্গে উপলব্ধি করার মত বেশ

ছিলাম বলা যায় মাত্র, পরে তাঁহারা হৃদয় হইতে কণ্ঠে আসিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে বহু ভাবের খেলা করিতে থাকেন, তখন পরস্পর পরস্পরকে বলিতে থাকেন, 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। তাহার পর স্বপ্ন রাজ্য হইতে চোখে আসিলেই পৃথক হইয়া যান, দক্ষিণ চক্ষুতে পুরুষ সত্ত্ব গুণাশ্রয় করিয়া পৃথক হয়েন, আর বাম চক্ষুতে প্রকৃতি রজস্তম গুণাশ্রয় করিয়া বিষয় লইয়া খেলা করেন। পুরুষ কিন্তু সত্ত্বগুণাশ্রয় করিয়া ভিতরেই থাকেন, প্রকৃতি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরের বস্তু লইয়া সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত খেলাই খেলেন, কিন্তু সত্ত্বগুণ রূপী পুরুষ প্রকৃতির ব্যবহারে সর্ব্বদাই কষ্ট করিতে থাকেন ও কত দুঃখ করেন। পরে খেলিতে খেলিতে রজঃস্তম ক্ষীণ হইয়া আসিলে সত্ত্বগুণাশ্রয় লইতে হয়। সত্ত্বগুণ জাগ্রত হইবা মাত্রই জীব হৃদয় ভগবৎ চরণে আপনা হ'তে লুণ্ঠিত হইবে। জীব তখন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া পরম ব্রহ্মের অনুসন্ধানে যত্নবান হয়, ও সাধনাদি দ্বারা চৈতন্য স্বরূপ পরম ব্রহ্মে ডুবিয়া যায়। তখন আর প্রকৃতির খেলায় মুগ্ধ হয় না, সুখ দুঃখ জ্বালা তখন তাঁহার স্বপ্নবৎ মনে হয়, স্থির শান্ত চৈতন্যে দৃষ্টি করিয়া আপনিও স্থির শান্ত হইয়া যায়। আর দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যে নিজের কর্ত্তৃত্ব মিশাইতে পারে না, তখন তাঁহার যাহা দর্শন হয় সমস্তই চৈতন্য। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন, নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ নাকারয়ন্ ঘটাকাশকে মহাকাশে মিশাইয়া, খণ্ড জীব চৈতন্যকে অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্যে মিশাইয়া জীব স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করেন, এই জরা মৃত্যু রোগ শোক সংসার এ সকলের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া, পরমানন্দরূপ ব্রহ্মপদ তখন তিনি প্রাপ্ত হয়েন, এবং তখনই শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই বলা হইতেছে ব্রহ্ম সাগরে ডুবিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্ম কি কেহ বাক্যের দ্বারা বা কোন কিছুর দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারেন না।

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।

এবং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধি সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।

তাই বলি এস ভাই তাঁহাকে লইয়া একবার ঘুমাইয়া পড়ি এস, জাগ্রত্ স্বপ্নে ও স্বপ্ন সুষুপ্তিতে লয় হইয়া যাইবে, তারপর তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর কিছুই থাক্‌বে না বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া যাইবে। এস এস যতটুকু পারি সাধনা দ্বারা তাঁহাকে জানি এস। নতুবা হাঁসি কান্না এ বিষম দ্বন্দ্বের মাঝে শান্তি পাইবার আর উপায় নাই।

—০—

২৫।২

ব্রজবাণী।

নয়নের কুম্ভ ভরিয়া আনিনু
আনিতে যমুনা বারি,
সজনে রহিয়া বিজন বাসিনী
মরম কহিতে নারি।

রমণী হৃদয় চির সংগোপন
সরমে লুকায় লাজে,
মরম কাড়িলে মরমে মরয়ে
সে ব্যাথা পরাণে বাজে।

বয়সে কিশোর সে নবনী চোর
ফিরয়ে যমুনা তীরে,
কি জানি কি বাসি হাঁসে মধু হাসি
নিরখি নয়ন নীরে।

আহেরী কুমারী না জানে চাতুরী
কি বুঝে অবলা বালা ?
কালিন্দীর জলে গভীর অতলে
গাহনে না গেল জ্বালা।

মুছালে না মুছে হৃদয়ের ক্ষত
দহয়ে অন্তর লোকে,
বহিরঙ্গ-বাসে ঢাকা থাকে বাসে
ঠেকয়ে মরমী চোখে॥ ২৫।৭

বঙ্গে "মা"

অঞ্চলে দুলে মলয় মন্দ
কণ্ঠে শেফালি জানায় গন্ধ
চরণে অশোক রাঙা ফুটে থরে থরে,
শারদ রাতি উজলে ভাতি বাহিরে ঘরে।
স্নেহের পীযুষে বক্ষ ভরা,
চরণে লুটে অবাক ধরা,
কুন্দ-শুভ্র-হাসিখানি অরুণ অধরা,
বিকশিত স্নেহদল বারিজ নয়না।
এযে সার্থক শিশু 'মা' বলা ?
এল, কল্যাণী চির মঙ্গলা,
ফুল্ল-দ্রুমদল-শোভী—কানন-কুন্তলা ;
শিশির মুকুতাজালে কুসুমিত ভূষণা।
সাধক জননী এল বাণী,
কমলা, বরদা ভবরাণী ;
লয়ে সিদ্ধি আনে পৌরুষ বিপুল জয়।
মনমহিষমর্দ্দিনী আর কারে ভয় ?
ওরে কে আছিস দুঃখী দীন,
আহা ! মার বাছা শান্তিহীন ;
কেন রবি, চির দিন বিষাদ মলিন ?
ছিন্নবাস দূরে ফেলি সাজিয়ে নবীন,
ওরে আয়রে 'উৎসব' বাসে,
যদি জুড়াবি ভবের ত্রাসে !
মা বলা জেনেছে শিশু মার কোল চায়,
মা এয়েছে ধরাতলে আয় ছুটে আয়॥

২৫।৭

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৮ সংখ্যা।

তোমার কাছে থাকা।

ঘন নীল আকাশের মধ্য স্থানে যেমন মধ্যাহ্ন সূর্য্য, সেইরূপ পরম-পদ পরমাকাশের একদেশে জ্যোতি র্ম্মণ্ডিত তোমার স্থান। সীমাশূন্য আকাশের তুলনায় যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে বিন্দু বলা যায় সেইরূপ সীমাশূন্য মহাব্যোমের কাছে তোমার স্থান বিন্দুই বটে। মহাব্যোমের প্রবেশ দ্বার এই বিন্দুই বটে। সূর্য্যকে যেমন অতিক্ষুদ্র দেখায় সূর্য্যদেব কিন্তু যেমন তত ক্ষুদ্রই নহেন সেইরূপ এই পরমপদের প্রবেশদ্বার বিন্দুমত ভাবিত হইলেও এইটি বিন্দুই নহে। এই বিন্দুর ভিতরে মহাসিন্ধু-অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। বিন্দুর নীচে নিখিল শব্দরাশির মূর্ত্তি। আরও নীচে সর্ব্বশক্তির ব্যক্তাবস্থা-লয়শক্তি স্থিতিশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি।

তেজোমণ্ডিত বিন্দুর ভিতরে তুমি। বিন্দুতে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আহ্নিকাদি নিত্য কর্ম্ম কিছুদিন অভ্যাস কর অথবা যাঁহারা এইরূপ করিতে অভ্যস্ত তাঁহারাই জানেন তোমার কাছে থাকা কি?

তোমার কাছে থাকা—এমন আর ত কিছুই নাই। দেখিতে দেখিতে ভরিয়া যাওয়া এমন আর কোথায় হয়? তুমি কি—যে তোমায় দেখিতে দেখিতে ভরিয়া যাই—কি হইয়া যাই তাহাত বলিবার ভাষা পাই না। তুমি কি আদরভরা যে তোমায় দেখিতে দেখিতে সেই ভরিত আদরে যথায় তথায় তোমাকেই দেখা হইয়া যায়? তুমি কি যে তোমায় দেখিয়া দেখিয়া এত স্থির হইয়া যাইতে হয়? শেষে আবার আর কিছুই দেখা থাকেনা? এ কেমন অনুরাগ যে তোমার কোন কিছুই পুরাতন হয় না? যত দেখি ততই দেখি—যত শুনি ততই তোমার কথা শুনিবার পিপাসা বাড়িয়া যায়? যত মনন করি ততই মনন করিতে ইচ্ছা যায়? কিছুতেই যে পরিতৃপ্তি নাই! শ্রবণ মনন সবই যেন অতৃপ্ত। আবার সেই অতৃপ্তের ভিতরে স্থির অনন্ত তুমি। যখন তোমায় দেখিতে দেখিতে, তোমার কথা শুনিতে শুনিতে, তোমার কথা মনন করিতে করিতে স্থির হইয়া যাই তখন কি হয় তাত বলা যায় না! সব বলা, সব দেখা, সব শোনা—কিছুই আর থাকে না—দেহ ভুল হয়, মন ভুল হয়। তাই বুঝি কবির ভাষায় বলা হয়—

থির নয়ন জনু ভৃঙ্গ আকার
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।

আবার যখন স্থিরত্ব ছুটিয়া যায়—তখন দেখিবার জন্য প্রাণ কতই ব্যাকুল হয়। যেন আর থাকিতে পারি না। তখন মনকে বলি চলনা—দেখিতে ত চাও—দেখনা কেন! এ দেখা—দেখিতে দেয়না কে? তোমায় দেখা—এ দেখা রোধ করিতে ত কেহই পারে না। চলনা—যাহা দেখ তাহাতেই সেই বিন্দু ধরিয়া স্থির হও—দেখিবে তারেই ত দেখিতেছ। সাকার সাকার বিন্দুতে নিরাকার তুমি ছাইয়া আছ সেই ত আমার স্থিরত্বের স্থান।

মনকে সর্ব্বদাই ত তোমায় দেখাইতে পারি। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্থূল দেহকে লইয়া যাইতে ক্লেশ আছে, কিন্তু মনে মনে বিশ্বেশ্বরের

মস্তকে গঙ্গাজল আর বিল্বদল সর্ব্বদা দেওয়ার বাধা ত কেহই দিতে পারে না।

তাই ত বলি তোমার কাছে সর্ব্বদাই থাকা যায়। তখন কি আর কারও সঙ্গ হয়? তখনই ত তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন যেন চিৎ। ইহাই ঠিক। ইতি।

—০—

অতৃপ্তি।

হৃদয়ে হৃদয়ে ভাষা
হৃদয়ে হৃদয়ে মাখি,
আঁখিতে সে যায় ধরা
তুলিতে কেমনে আঁকি?
একিগো প্রেমের দীক্ষা,
এত কি রেখেছ ভিক্ষা?
সমগ্র হৃদয় লয়ে
চরণে রাখিনু থুয়ে।
আমিত দেখিনু বুঝে—
আশা যাবে সাধ মিছে;
পলকে পলকে দেখি
তৃপত না হ'ল আঁখি।
প্রাণে প্রাণে ভালবাসা,
প্রাণের গভীর আশা;
মিটাতে প্রাণের ক্ষুধা,
প্রাণে শুধু যায় সাধা।
চিরদিন অপেখিয়া
তৃষিত রহিল হিয়া;
জানিনা সাধিনু কিবা,
দেখি যে সকলি বাকি। ২৫।৭

বর্ত্তমাস সমস্যা ও হিন্দু শাস্ত্র।

সমগ্র দেশব্যাপী প্রচণ্ড বন্যার জলস্রোতের মত আধুনিক সভ্যতা চারিদিকে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। প্রতি গৃহেই, কোথাও ভিতরে, কোথাও বাহিরে, এই জলকল্লোল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে।

মনে করা হউক, প্রাচীন যাহা তাহা বড় বেশী কেহ গ্রহণ করিতেছেনা বলিয়া ইহা ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়া আছে আর নূতন যাহা তাহা বড় আস্ফালন করিয়া সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। মনে করা হউক সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। অধিকাংশ নরনারীর রুচি নবীন সভ্যতার দিকে। এই সমাজ কি নূতনের দিকে একেবারে গা ঢালিয়া দিবে—সমস্ত নূতন গ্রহণ করিবে আর সমস্ত প্রাচীন ত্যাগ করিবে অথবা গ্রহণ ও ত্যাগ সম্বন্ধে ইহার কোন বিচার থাকিবে?

সমস্যাটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা যাউক।

আমরা দেখিতেছি দেশের মধ্যে যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যাঁহারা কৃতবিদ্য, যাঁহারা সভ্যজগতের সভ্যদেশ সমস্ত পরিদর্শন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগকে নূতন সভ্যতা গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন সভ্য জগৎ যাহা বলিতেছে, যাহা করিতেছে, তোমরা সেইরূপ চল নতুবা তোমরা বাঁচিতে পারিবে না। যাহাকে তোমরা তোমাদের নিজের নিজস্ব বলিতেছিলে তাহা একেবারে বিসর্জ্জন দিতে না পার এমনভাবে ইহার পরিবর্ত্তন কর যাহাতে সভ্যদেশের সকল লোকের সঙ্গে তোমরা মিশিতে পার।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা সভ্য তাঁহারা আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য অল্পাধিক পরিমাণে যাহা যাহা বলিতেছেন তাহা এই। কেহ বলিতেছেন প্রাচীন যাহা তাহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন কর, কেহ বলিতেছেন সুবিধার অসুবিধার জন্য কতক রাখ কতক ছাড় ইত্যাদি। বিষয়গুলি এই:—

১। আহারে বিচার ত্যাগ কর। পরিষ্কার হইলেই হইল শুচি অশুচি মানিও না।

২। বিবাহের বিচার ত্যাগ কর। যে জাতি হউক না কেন ক্ষতি নাই, সুবিধা হইলেই হইল।

৩। রজঃস্বলা না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দিওনা বিবাহও করিওনা। বাল্য বিবাহ প্রথা চালাইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিও না।

৪। বিধবার বিবাহ দেওয়া প্রচলিত কর।

৫। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বংশগত জাতিভেদ তুলিয়া দাও। দিয়া যে যাহা হইতে চায় তাহাকে তাহাই হইতে দাও।

৬। এক ঈশ্বর অবলম্বন কর। দেব, দেবী, প্রতিমা, মূর্ত্তি এই সব পূজা ত্যাগ কর।

৭। প্রাণায়াম, মন্ত্র আওড়াইয়া পূজা, জপ, ব্রত, উপবাস ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ভোগ ত্যাগাদি, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি এই সবের জন্য কায়-ক্লেশ ত্যাগ কর।

এই সমস্ত অল্লাধিক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া সভ্য হও। সভ্যজাতির সঙ্গে মিলিত হও। ইহাতে তোমার নিজত্ব না থাকে নাই থাকিল। বিশেষ তুমি যে সব আদর্শের কথা বল তাহা ভুল আদর্শ।

সভ্য জগৎ আমাদিগকে ইহাই করিতে বলিতেছেন। ইহা না করিলে আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া গালাগালিও দিতেছেন।

এই সমস্ত করিতেই সভ্যেরা বলিতেছেন। তবে ইহাদের মধ্যে কেহ একটু মোলায়েম করিয়া বলিতেছেন কেহবা অজ্ঞানীর উপর দয়া প্রদর্শন করা অনুচিত ভাবিয়া অতি উগ্রভাবেই এইরূপ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এমন কি নিজে নিজে সম্প্রদায় গঠন করিয়া নিজের স্ত্রী-পুত্রকে দিয়া এইরূপ করিতেছেন এবং সমাজে যাহাতে লোকে এই সকল করে তজ্জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতেছেন।

ইহাও শুনিতে পাইতেছি যে যদি লোকে ইহা না শুনে তবে তাঁহারা এরূপ আইন চালাইবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিবেন যাহাতে তাঁহাদের প্রচারিত সভ্যতার প্রতিকূল হইলে লোকে আইন মত দণ্ড পায়।

যাঁহারা আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন তাঁহারা আমাদের এই দেশেরই লোক। ইঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে কে? ইহারা বর্ত্তমান কালে ধনে, মানে, বর্ত্তমান বিদ্যায়, পৌরুষে, বলীয়ান এবং ইঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে এবং ইহাদের সংখ্যাই বাড়িয়া যাইতেছে। উপস্থিত সময়ে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্রাহ্মণেতর হিন্দু-জাতির মধ্যে যে পূর্ব্বোক্ত প্রথার কতক কতক নাই তাহাও বলা যায় না। ইঁহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া আর জগতের বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া একই কথা।

কিন্তু প্রতিকূলে দাঁড়াইতে ভরসাই বা করে কে?

ইহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিলেন ভারতের ঋষিকুল। প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আছেন ভারতের শাস্ত্র। আর এখনও দাঁড়াইতে ভরসা করিতেছেন ভারতের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণসমাজ এই মুষ্টিমেয় ব্রহ্মণ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণসমাজ এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বাড়াইতে চান, ব্রাহ্মণসমাজ অন্য অন্য জাতিকে ঘৃণা করিতে চান না কিন্তু ঋষিদিগের বিচার শুদ্ধ মীমাংসা জগতের চক্ষে ধরিয়া জগতের লোককে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে চান। তবেই হইল মুষ্টিমেয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতেছে আধুনিক সভ্যতার কতটুকু সত্য তাহাই জগতসমক্ষে দেখান। ঋষিগণ একদিন ভারতের লোকের গুরু ছিলেন। আর এই মুষ্টিমেয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া যাহা সত্য তাহা জগতকে দেখাইতে চান এবং সেই সত্য মত সমাজ গঠন করিতে চান।

ইঁহারা এখনও বর্ত্তমান জগতকে দেখাইতে চাহেন ঋষিগণ চিরদিনই জগতের গুরু আর চিরদিনই জগতের গুরু থাকিবেন।

বর্ত্তমান সমস্যার কথা বলা হইল এবং ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তব্যের কথাও বলা হইল।

এই কর্ত্তব্য পথে চলিবার জন্য ভারতের মুষ্টিমেয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিতেছেন ঋষি প্রণীত হিন্দুশাস্ত্র ইহাও বলা হইতেছে।

এখন দেখা যাক্ হিন্দুশাস্ত্র বা ঋষিকুল কি জন্য আজ জগতের সভ্য জাতির মীমাংসাকে নির্ভুল বলিতে চান না।

উপরে সভ্যজাতির যে সমস্ত চেষ্টার কথা বলা হইয়াছে তাহার সকলগুলির বিচার করা সময় সাপেক্ষ। সেই জন্য শাস্ত্র, জগতের হিতের জন্য মনুষ্য জাতিকে যেরূপ হইতে দেখিতে চান তাহার কথাই কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

বর্ত্ত সময়ে আমাদের দেশে দুইটি প্রধান দল দাঁড়াইয়াছে। একদল জগতের সভ্য জাতির সঙ্গে এক হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। বলিতেছেন ইহা না হইলে আমাদের কল্যাণ হইবে না। আর একদল বলিতেছেন জগতের যেটি বর্ত্তমান সভ্যতা তুমি দেখাইতেছ তাহাতে জগতের কল্যাণ হইতেছে না—আধুনিক জগৎ এখন তাহা বুঝিতেছেন, ভবিষ্যতে আরও বুঝিবেন। বর্ত্তমান সভ্য জগতের দুঃখ দূর করিবার যে চেষ্টা এটা উন্মত্ত চেষ্টা। এ চেষ্টা তোমরা করিও না। জগৎকে সভ্য করিতে হইলে ঋষিদিগের পথ ভিন্ন অন্য পথই নাই।

উভয় দলের লক্ষ্য একই। জগতের লোককে সুখী করা উভয়েরই লক্ষ্য। কিন্তু যে উপায়ে লক্ষ্য পথে চলা যাইতে পারে সে উপায়টি পৃথক্।

এই বিবাদের মীমাংসা কবে হইবে,. কে করিবে, তাহা আমরা জানিনা। আমরা উভয় পক্ষের উপায়গুলি আলোচনা করিয়া দেখিতেছি আধুনিক সভ্য জগৎ ও ভারতের ঋষিকুল প্রচলিত শাস্ত্র যাহা যাহা বলিতেছেন তাহার মধ্যে প্রধান্ প্রধান্ কোন্ কোন্ বিষয়ে মতের সামঞ্জস্য আছে। কতক বিষয়ে যদি মতের মিল হয় তবে ইহা অবলম্বন করিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়। সকল বিষয়ে সকল মানুষ একমত হইবে ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু গন্তব্য পথ ঠিক রাখিয়া যে যে বিষয়ে আমরা প্রাণে প্রাণে একমত হইতে পারি তাহা প্রদর্শন করাই অমাদের উদ্দেশ্য।

সভ্য জগৎ যাহা চান যদি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণও তাহাই চান তবে বর্ত্তমান সমস্যার সহজেই একটা নিষ্পত্তি হইতে পারে।

জগতের লোককে সুখী করাই যদি লক্ষ্য হয় তবে জগতের নর-নারীকে সুখী করিবার জন্য যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত বাসনা তাহাই আমরা অগ্রে দেখাইতেছি।

(১) পুরুষের নির্ম্মল চরিত্র আমরা সকলেই দেখিতে পাই।

(২) স্ত্রীলোকের সতীত্ব জগতের সকলেই চান।

(৩) মনের একাগ্রতা না জন্মিলে কোন মানুষের প্রকৃত শান্তি হইবে না।

(৪) মনের নিরোধ অবস্থা না পাইলে পূর্ণশান্তিতে চিরস্থিতি অসম্ভব।

(৫) নির্ম্মল চরিত্র, সতীত্ব, মনের একাগ্রতা এবং মনের নিরোধে স্বরূপ বিশ্রান্তি ইহার কোনটিতেই মানুষ কখন পৌঁছিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বরকে জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইতে পারে।

জগতের কোন জাতি পুরুষের নির্ম্মল চরিত্র এবং স্ত্রীলোকের সতীত্বে অনাদর করে না। একাগ্রতা, নিরোধ, ঈশ্বরকে জানিয়া ঈশ্বরে নির্ভর করা এ সমস্ত বিষয়ে সভ্যজাতি ও হিন্দু শাস্ত্র এখন একমত হইতে পারেন নাই।

তবেই আমরা ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তব্য পাইলাম। কিরূপ কার্য্য করিলে ও করাইলে পুরুষ নির্ম্মল চরিত্র হয় ইহাই প্রথম কার্য্য।

কিরূপ কার্য্য করিলে স্ত্রীজাতি সতীত্বকে অতি সমাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে ইহাই দ্বিতীয় কার্য্য।

ব্রাহ্মণ সভার তৃতীয় কার্য্য হইতেছে মনের একাগ্রতা কোন্ বস্তু এবং মনের সম্মুখে একটি বস্তু—কেবলমাত্র একটি বস্তুর স্ফুরণ করিতে না পারিলে কোনও পুরুষ বা কোনও স্ত্রীলোককে যে চরিত্রবান বা চরিত্রবতী করা যায়না; বাহিরের যতকিছু সুখের বস্তুর আয়োজন

তুমি না কর, সুন্দর বাড়ী, সুন্দর বাগান, সুন্দর জুড়ী, সুন্দর গাড়ী, সুন্দর চসমা, সুন্দর ছড়ি, ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট, ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান, মোটর গাড়ী, সুন্দর সহর, সুন্দর রাস্তা ঘাট, সুন্দর জাহাজ, সুন্দর বিমান পোত যাহাই তুমি করনা কেন তোমার মন কিছুতেই সুস্থ হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা একটি মাত্র বস্তুতে একাগ্র হইতে না পারে এই বিষয়টি বেশ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া। মনকে কোন একটি সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় বস্তুতে ডুবাইতে না পারিলে মনের শান্তি আর কিছুতেই হইতে পারে না।

ব্রাহ্মণ সভার চতুর্থ কার্য্য হইবে জগতকে দেখান যে মনের একাগ্রতাতেও মানুষের আংশিক সুখ মাত্র লাভ হয়। মন যতক্ষণ একাগ্র থাকিবে, যতক্ষণ সেই রমণীয় বস্তুতে ডুবিয়া থাকিবে ততক্ষণ ইহা নর-নারীকে সুখী করিবে কিন্তু একগ্রতা ভঙ্গ হইলেই ইহার দুঃখ আবার আসিবে। সেই জন্য মনকে চিরতরে সেই সুখের সাগরে ডুবাইয়া রাখিতে হইলে মনের নিরোধ অবস্থা লাভ করা চাই। নিরোধ অবস্থা এমন করিয়া আয়ত্ব করা চাই এতদূর অভ্যাস হওয়া চাই যাহাতে মনকে ধ্যানস্থ রাখিয়াও ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া অবুদ্ধি পূর্ব্বক শুভ কর্ম্মই হইতে থাকে। অর্থাৎ ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হইয়াও "যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্ত মবৈতি নিত্যং" ইহা আয়ত্ব হওয়াই চিরতরে সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দে স্থিতি।

উপরে যে চারিটি সর্ব্ববাদী সম্মত উপায়ের কথা বলা হইল তাহার কোনটিই ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিয়া, ঈশ্বরের সম্বন্ধে অন্ততঃ কতক কতক না জানিয়া ঈশ্বরে নির্ভর করিতে না পারিলে, হইবে না। এই জন্য ব্রাহ্মণ সভার পঞ্চম কর্ম্ম হইবে ঈশ্বর কি, জগতের নিকটে প্রচার করা এবং ঈশ্বরে নির্ভর করিতে হইলে কি সাধনা করা চাই কোন্ অভ্যাস লইয়া নিরন্তর থাকিতে পারিলে ঈশ্বরে নির্ভর করা যায়—আর সকল প্রকার মানুষের পক্ষে ঈশ্বরে নির্ভর করার কোন লঘূপায় আছে কি না তাহাই জগতকে দেখান।

যে পাঁচটি উপায়ের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল সেই উপায় মত সমাজকে চালাইতে হইলে কি করিতে হইবে তাহার আলোচনা করা এখন কর্ত্তব্য।

পুরুষকে নির্ম্মল চরিত্র লাভ করিতে হইলে কতকগুলি কার্য্য প্রথম হইতেই ইহাকে অভ্যাস করাইতে হইবে। সমস্ত অভ্যাসের লক্ষ্য হইবে একটি বস্তু। সে বস্তুটি শ্রীভগবান্। বালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে সন্ধ্যা বন্দনা যাহার জন্য করি, পিতা মাতা আচার্য্য ভাই ভগ্নীর সেবাও তাহারই সন্তোষ জন্য করি। অতিথি সেবা সেই জন্যই করি। সমাজের লোকহিতকর কর্ম্ম যাহা করি তাহা সেই শ্রীভগবানের অর্চ্চনার জন্য করি। আজকাল 'কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর' এই কথা জগতের সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্র এবং হিন্দুও কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন কিন্তু সেই কর্ম্মের সঙ্গে আরও কিছু করিতে বলিতেছেন। বলিতেছেন তোমার সকল কর্ম্মই তোমার বন্ধনের কারণ হইবে, তোমার সুখ দুঃখের কারণ হইবে যদি তুমি মনে রাখিতে না পার যে তোমার সর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা তোমায় করিতে হইবে। গীতা এই জন্য সার শিক্ষা দিতেছেন—বলিতেছেন "স্বকর্ম্মনা তমর্ভ্যর্চ্চ"। কর্ম্ম দ্বারা, স্বকর্ম্ম দ্বারা, স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতেছি ইহা ভুলিয়া কর্ম্ম করিও না। শাস্ত্র বলিতেছেন কর্ম্ম করাটি গৌণ কিন্তু ঈশ্বরের অর্চ্চনার ভাবটি মুখ্য। ব্রাহ্মণ সমাজ আপনি আচরণ করিয়া জগতকে এই শিক্ষা প্রদান করেন।

ঈশ্বরের অর্চ্চনার জন্য কর্ম্ম করি এই ভাবনা করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলে পাপ কর্ম্ম করা যাইবেনা, লোকের অনিষ্টকর কর্ম্ম করা যাইবে না। কাজেই তোমাকে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে হইবে।

এখন ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হইলে কি করিতে হইবে? না মনকে ঈশ্বরে একাগ্র করিবার অভ্যাসটি করিতে হইবে। মনকে ঈশ্বরে একাগ্র করিতে হইলে মনের রজস্তম অংশকে অধীন করিয়া ইহাতে সত্ত্বগুণ জাগাইতে হইবে। সত্ত্বগুণ জাগান না গেলে পুরুষ

কখন চরিত্রবান্ হইবে না। আবার সত্বগুণ জাগাইতে হইলে সাত্বিক আহার করা চাই। আহারের সহিত ঈশ্বর অর্চ্চনার অতি নিকট সম্বন্ধ। কাজেই আমরা দেখিতেছি প্রকৃত চরিত্রবান্ হইতে হইলে আহারের বিচার চাই। কাজেই সভ্য জগৎ যদি ইহা বলেন যে আহারে বিচার না করিলে কোন দোষ হয় না, হিন্দু শাস্ত্র সেখানে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন—আহার শুদ্ধি না করিলে 'স্বকর্ম্মণা তমর্ভ্যচ্চ' আদৌ করা যায় না। শ্রুতি এই জন্য বলেন 'আহার শুদ্ধৌ সত্ব শুদ্ধিঃ সত্ব শুদ্ধৌ ধ্রবা স্মৃতিঃ'।

আহার শুদ্ধি না হইলে সত্ব গুণের উদয়ে মনের শুদ্ধি হইবে না। মন রাগদ্বেষ কলুষিত থাকিবেই। সত্ব শুদ্ধি হইলে তবে ঈশ্বরকে মনে রাখা যাইবে। সর্ব্বকর্ম্মে শ্রীভগবানকে অর্চ্চনা করিতে হইবে ইহার স্মৃতি তখন সজাগ থাকিবে যখন আহার শুদ্ধি হইবে।

এইরূপে দেখা যায় স্ত্রীলোককে সতী হইতে হইলে পতিকে ঈশ্বর ভাবে দেখিতে হইবে। কাজেই সর্ব্ব ভাবনা সর্ব্ব বাক্য সর্ব্ব কর্ম্ম ইহার কোন কিছু স্বামীকে গোপন করিয়া করিলে চলিবে না। কারণ স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করা ব্যভিচার, সতীত্ব নহে। সতীত্ব বস্তুটি রক্ষা করিতে হইলে যাহা সতীত্বের বিঘ্ন তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। যাহাতে কামের প্রশ্রয় হয় তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে আর যাহাতে পতির সেবায় ও পতির স্বজন সেবায় ঈশ্বর সেবা হয় তাহাই করিতে হইবে। সভ্য সমাজে এই বিঘ্ন কিরূপে দূর হইতেছে ইহার উল্লেখ এখানে আর করিলাম না।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দু রমণীর সতীত্বের আদর্শ নিবেদিতা প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে বলেন তখন সভ্য দেশের স্ত্রীলোকেরা তাঁহার আদর্শ বুঝিতে পারে নাই। নিবেদিতা আচার্য্য বিবেকানন্দ নামক পুস্তকে তাহাই নিজ মুখে বলিয়াছেন।

১১ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ভাদ্র মাসের উদ্বোধনে লেখা আছে—

"প্রাচ্যদিগের ন্যায় তিনি (বিবেকানন্দ) মনে করিতেন আদর্শ

পত্নী হইতে হইলে এক মাত্র স্বামীর প্রতি জ্বলন্ত হ্রাস বৃদ্ধি হীন নিষ্ঠা থাকা চাই।" নিবেদিতা বলিতেছেন—"পাশ্চাত্য প্রথা সকলকে তিনি সম্ভবতঃ বহু পতিক (Polyandrous) পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকিবেন ইত্যাদি। বিবেকানন্দ যদি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন যিনি আদর্শ পত্নী তিনি স্বামীকে নারায়ণ বোধ করেন—স্বামীকে নারায়ণ বোধ না করিতে পারিলে এক নিষ্ঠা হয় না, বহু পতিকতা দোষ দূর করিয়া স্ত্রীলোককে স্বামীর অনুরাগে ভরিয়া রাখিতেও পারে না—তবে বুঝি ভাল হইত। ফলে হিন্দু রমণীর পতিনারায়ণ ব্রতই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত।

সভ্য জগৎ হিন্দুগণ বাল্য বিবাহ দিতেছেন বলিয়া হিন্দুদিগকে নিন্দা করেন।

বালকের সহিত বালিকার বিবাহই বাল্য বিবাহ। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র বালিকার সহিত বালকের বিবাহ দিতে ত কখনও বলেন না। পুরুষ ২৫ বৎসরের কমে বিবাহ করিবে না কারণ ঐ বয়সের কমে তাহার ব্রহ্মচর্য্যই হইতে পারে না। ২৫ বৎসরের যুবা যদি ১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করেন তবে তাহাকে বাল্য বিবাহ বলা যায় না। সংযমী স্বামী ১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিলেও স্ত্রীলোকের ১৬ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সহিত পুরুষের একত্র অবস্থান নিষিদ্ধ ইহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন এবং এই প্রথা এখনও বহু সমাজে আছে। বাল্য বিবাহ বলিয়া চিৎকার না করিয়া যাহা শাস্ত্র সম্মত তাহা করিলেই ত প্রকৃত সত্য পথ অবলম্বন করা হয়। মানুষকে সংযমী করিতে হইলে যাহা করা উচিত তাহা শিক্ষা না দিয়া যুবক যুবতীর বিবাহ দিলেই কি সমাজ উন্নত হইবে?

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও বিধবার পুনঃবিবাহ এ ক্ষেত্রে শাস্ত্র বিধিমত চলিতে পারিলেই সমাজ সংস্কার করা যায়। নতুবা ঐ বিধি উলঙ্ঘন করিলে সমাজ সংস্কৃত না হইয়া সমাজ ধ্বংস পথেই চলে।

আমি অনেক সময় লইয়াছি এ সমস্ত বিষয় এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ

করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এক কথায় এইমাত্র বলি সমাজের অভ্যুদয় ও ব্যক্তির নিঃশ্রেয়স্ সমকালে এই দুইটিতে লক্ষ্য রাখিয়াই ঋষিগণ সমাজ গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ঋষিগণ ঈশ্বর কৃত জাতি ও বর্ণ বিচার অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। জাতিভেদ হিন্দু ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। জাতিভেদ ঈশ্বর কৃত। ইহা না হইলে পবিত্র চরিত্র ও সতীত্ব সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার বিষয় হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় অনেকে জাতিভেদের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পাবেন না। আবার কেহ কেহ জাতিভেদ ভাল বলিলেও বলেন যাহা তাহা আহার করায় জাতিভেদের কোন ক্ষতি হয় না। এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। এই সিদ্ধান্তে শাস্ত্রকে এবং ঋষিদিগকে নিজের কদর্য্য স্বভাবের মতন করিয়া গড়া হইয়া যায়। আপনাদিগকে ও সমাজকে ঋষিদিগের মত বা শাস্ত্রের মত গড়িয়া তোলা হয় না। তুমি পারনা বলিয়া সত্য আদর্শকে তোমার মতন করিয়া গড়িয়া লইয়া একটা সুবিধা করিয়া সমাজে থাকিবে এ অবস্থা ঋষিগণ করেন নাই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া করিয়া আদর্শেরদিকে চল ইহাই উন্নতির একমাত্র উপায়। দুর্ব্বল অধিকারীও পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা সবল হইয়া আদর্শ পথে চলিতে থাকুক ইহাই করণীয়। আর সেই জন্যই অধিকারী বিচার, সেই জন্য এক গঙ্গাতে স্নানের বহু ঘাটের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সভা জাতিভেদের কথা সমাজকে বেশ করিয়া বুঝাইবার আয়োজন করুন। জাতিভেদের আধুনিক দোষ বর্জ্জন করিয়া যাহাতে মানুষ আদর করিয়া জাতিভেদ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়েন ব্রাহ্মণ সমাজকে আজ তাহাই দেখাইয়া দিতে হইবে।

সভ্য জাতির সকলেই যে জাতিভেদ মানিতে চান না তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য ইয়ুরেপীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য তাঁহারাও বলেন জগতে জাতিভেদ প্রথা চালাইতে হইবে। ইহা

আইন কর্ত্তাগণ করেন নাই, ঈশ্বর স্বয়ং ইহা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিতেছেন :—

"The author was a profound believer in the value of tradition, in the value of general discipline lasting over long periods. He knew that all that is great and lasting and is intensely moving has been the result of the law of caste or of the laws governing the individual members of a caste throughout many generations."

"This building up of the rare man, of the great man (of a cultivated type in a Darwinian sense) as every scientist is aware, is utterly frustrated by anything in the way of injudicious and careless cross-breeding."

"The author could not help but advocate the rearing of a select and aristocratic caste, and in none of his axhortations is he more sincere that when he appeals to higher men to sow the seeds of a nobility for the future."

"Verily, ye shall not become a nobility one might buy, like shopkeepers with shopkeepers' gold. For all that hath its fixed price is of little value."

"It is ridiculous to pretend to treat every one without regard to those natural distinctions which are manifested by superior intellectuality, or exceptional muscular strength, or mediocrity of spiritual and bodily powers or inferiority of both. The biographer says that the author tells us it is not the legislator but nature herself who establishes these broad classes, and to ignore them when forming a society would be just as foolish as to ignore the order of rank among

materials and structural principles when building a monument."

"Thus he would have the intellectually superior, those who can bear responsibility and endure hardships, at the head. Beneath them are the warriors, the physically strong, who are "The guardians of right, the keepers of order and security, the king above all as the highest formula of warrior, Judge, and keeper of the law. The second in rank are the executive of the most intellectual." And below this castle are the mediocre. "Handicraft, trades, agriculture, science, the greater part of art, in a word the whole compass of business activity, is exclusively compatible with an average amount of ability and pretension." At the very base of the social edifice, the author sees the class of man who thrives best when he is well looked after and closely observed, the man who is happy to serve, not because he must, but because he is what he is,—the man uncorrupted by political and religious lies concerning equality, liberty and fraternity,—who is half conscious of the abyss which separates him from his superiors, and who is the happiest when performing those acts which are not beyond his limitations.

১৩২৪ সালে বৈশাখ মাসের উৎসবে আরও স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে।

এখন আমরা উপসংহার করিতেছি।

দুঃখ প্রতীকারের জন্য প্রাণপণ করাই পুরুষোচিত কার্য্য। দুঃখ করাটা হৃদয় দৌর্ব্বল্য, যে যত অজ্ঞান তার তত দুঃখ। দুঃখটা অজ্ঞান প্রসূত। মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিলেও শ্রীভগবান্ বলেন—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং।"

ভারতের ব্রাহ্মণ এখনও আছে। কিন্তু জাতি-ব্রাহ্মণই অধিকাংশ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ আজ মুষ্টিমেয়। অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকিতে যাঁহারা প্রাণপণ করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

তাহাতেও হতাশ হইবার কিছুই নাই। বহুবার এরূপ হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মণ কখন মরে নাই। এখনও মরিবে না।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি কতবার আসিল কতবার গেল কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই একথা ভারতের ইতিহাসে --কল্পের ইতিহাসে পাওয়া গেল না।

এখন ব্রাহ্মণের বিপদ আসিয়াছে। আরও বিপদ আসিতেছে। ভারতের আধুনিক জাতি সকলে ব্রাহ্মণ হইতে চায় অথচ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী।

ব্রাহ্মণের বিপদ কি এবং সেই বিপদের প্রতীকার কিরূপ হইবে তাহাই কতক আলোচনা করা হইল। আরও বলিলাম বিপদের প্রতীকার জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজের জন্ম।

লোকে যখন বলে দলাদলী বাড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজ করা হইয়াছে তখন লোকে ঠিক কথা বলে না।

এরূপ নিন্দা চির দিনই আছে। মানুষ যতই সাবধান হইয়া চলুক না কেন মানুষের তিন পক্ষ থাকিবেই। এক স্বপক্ষ, দ্বিতীয় পরপক্ষ এবং তৃতীয় উদাসীন পক্ষ। ব্রাহ্মণ সমাজেরও তাহাই হইয়াছে। কেহ বলেন ভাল, কেহ বলেন সমাজটাকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজ একটা দলাদলির যন্ত্র বিশেষ আর কতকগুলি লোক ভালও বলেন না নিন্দাও করেন না থাকেন উদাসীন।

যিনি যাহা বলেন বলুন কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজ আপন গন্তব্য পথে চলিবেন। কোন দিকে তাকাইবেন না।

আজ সমস্ত সভ্য জাতি এক কথা বলিতেছে আর ভারতের ব্রাহ্মণ তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে।

পৃথিবীর সমস্ত জাতি বলিতেছে আমাদের সমান হও নতুবা মরিবে আর ভারতের ব্রাহ্মণ বলিতেছে তোমরা ঠিক বলিতেছ না তোমরা

ভুল করিতেছ। তোমাদের ভ্রান্ত কথায় আমরা আমাদের সত্য নিজত্ব ছাড়িয়া তোমাদের মত ডুবিয়া মরিতে প্রস্তুত নহি।

ভারতের মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য দাঁড়াইতেছে গুরুতর। ব্রাহ্মণ আজ জগতের সকল লোকের মত হইবে না জগতের সকলকে করিবেন আপনার মত।

ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তব্য এই। ব্রাহ্মণ সমাজ যদি একটি মাত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণ, একটি মাত্র যথার্থ ক্ষত্রিয়, একটি মাত্র শুদ্ধ বৈশ্য আর একটি মাত্র সৎ শূদ্র আজ জগতকে দেখাইতে পারেন তবে বলিব ব্রাহ্মণ সমাজ যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভগবান শ্রীবশিষ্ঠ দেবের মত একটি ব্রাহ্মণ আমরা চাই, শ্রীঅর্জ্জুনের মত একটি ক্ষত্রিয় আমরা চাই, শ্রীসমাধির মত একটি বৈশ্য আমরা চাই আর শ্রীবিদুরের মত একটি সৎ শূদ্র আমরা চাই।

ইহারই জন্য ব্রাহ্মণ সমাজের আয়োজন করিতে হইবে। সৎগ্রন্থ লিখিয়া ঋষিদিগের মত প্রচার করিতে হইবে। ধর্ম্ম পুস্তক লিখিয়া গ্রামে গ্রামে বালক ও বালিকাদিগকে অনুষ্ঠান শিক্ষা দিতে হইবে, পুরোহিত প্রস্তুত করিতে হইবে; প্রচারক প্রস্তুত করিতে হইবে।

শুধু সভা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। ইহার জন্য গ্রামে গ্রামে লোক প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জাগ্রত সাধক চাই, জাগ্রত বাক্য চাই, জাগ্রত পুস্তক চাই।

এই সমস্ত কার্য্যের জন্য অর্থ আবশ্যক। এক জনের অর্থ সাহায্যে ইহা কুলাইবে না, এই কার্য্যে বহু অর্থ আবশ্যক। ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তব্য এই অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করা। ইহাতে চক্ষুলজ্জা করিলে চলিবেনা। বহু-স্থানে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সভা হইবে তাহাদিগকে মূল সভা সাহায্য করিতে পারেন এরূপ অর্থ মূল সমাজের সংগ্রহ করা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণ সমাজের এই সাধু কার্য্যের সহায় হউন আর ব্রাহ্মণ সমাজের এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—o—

ক্রতং স্মর।

মরণ কাল যখন উপস্থিত হইবে, যখন হস্তপদাদি আর স্ববশে থাকিবে না, যখন প্রাণবায়ু আর দৈহিক সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিবেন না, যখন অন্য কোন পরিচর্য্যা আর করা যাইবে না তখন শ্রুতি বলিতেছেন—হে ক্রতো! হে সদা সঙ্কল্প, চঞ্চল মন! তুমি জপ তপ পূজা, তীর্থাদিতে সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি যাহা করিয়াছ তাহা স্মরণ কর।

বড় সুন্দর উপদেশ ইহা। মনে কর তুমি ধনুষ্কোটীতে কখন গিয়াছিলে। কৃত তীর্থই ত ভ্রমণ করিয়াছ। সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ হইতে ধনুষ্কোটীতে যাইতে হয়। পরম রমণীয় তীর্থ ইহা। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রাম ইত্যাদি পূর্ণব্রহ্মের অবতারগণ, কত মুনি ঋষি এই তীর্থকে পবিত্র করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র এইখান হইতেই সমুদ্রে সেতুবন্ধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে প্রায়শ্চিত্ত, অনন্তর সমুদ্র স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হয়।

দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থল কত সুন্দর। একদিকে মহোদধি অন্য দিকে রত্নাকর। একদিকে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত তরঙ্গমালা। যেখানে এই দুই সমুদ্র মিলিয়াছে সেইখানে স্নান করিতে হয়। উপরে নির্ম্মল সুনীল আকাশে সূর্য্যদেব ঝলমল করিতেছেন। সমুদ্র সঙ্গমে দাঁড়াইয়া ত সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া আসিয়াছ। সেই নির্ম্মল আকাশের তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য দেখিতে দেখিতে সূর্য্যার্ঘ্য দিতে দিতে, কত কথা কি মনে উঠে না? শ্রুতির কথা একবার মনে করনা! বলনা—

> पूषन्नेकर्षे यम सूर्य्य प्राजापत्य
> व्यूह रश्मीन् समूह तेजो।
> यत् ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि
> योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि।

জগতকে পোষণ করেন কে? একাকী বিচরণ করেন কে? সর্ব্ব সংহারকারী সর্ব্ব সংযমকারী কে? সকল বস্তুর রসগ্রাহী কে? তুমিই ত।

হে জগৎ পোষণ কারিন্—পূষণ্! হে একাকী বিচরণশীল একর্ষে! হে সর্ব্ব সংহার কারিন্ যম—হে প্রজাপতি সম্ভূত! তুমি তোমার রশ্মি সমূহকে সরাইয়া দাও—[ব্যূহ-বিগময়] তোমার সন্তাপকর জ্যোতি সমূহকে [সমূহ একীকুরু উপসংহর] সঙ্কোচিত কর! তোমার যাহা অত্যন্ত শোভন—কল্যাণময়—সুন্দর রূপ তাহা আমায় একবার দেখিতে দাও। আমি ভৃত্যের মত প্রার্থনা করিতেছি না। কারণ আমি জানিয়াছি এই আদিত্য মণ্ডল মধ্যগত যে পুরুষ—এই সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী যে পুরুষ—সেই পুরুষই আমি।

হে মন! সুস্থ অবস্থায় এই সমস্ত ত করিয়াছিলে যখন শেষ সময় উপস্থিত হইবে তখন এই সমস্ত স্মরণ করিবে। আরও স্মরণ করিবে—সেই স্বচ্ছন্দ অবস্থার সেই সরস কথা।

সেই যে প্রতিদিনের সাধনার সেই কথা। যদি ভাল করিয়া ইহা না করিয়া থাক তবে—এখনওত সময় আছে—এখনও ত শেষ সময় আসিতে বিলম্ব আছে। এখনই ইহা করিয়া রাখ তবে শেষ সময়ে মনকে বলিতে পারিবে—মন! তুমি কৃতং স্মর।

যদি এতদিন নাও করিয়া থাক তবে কি করিতে বলিতেছি জান? সেই যে সেই সূর্য্য দেবকে বলিলে, সেই যে অসঙ্গ অথচ একাকী—বিচরণশীল পুরুষকে বলিলে যত্ তে **রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি**—তিনি যেন তোমার প্রার্থনা শুনিলেন; শুনিয়া স্বীয় রশ্মিসমূহকে সরাইয়া লইলেন—স্বীয় সন্তাপকর জ্যোতি সমূহকে উপসংহার করিলেন। আহা! তখন তুমি কি দেখিলে? সেই রমণীয় দর্শনের সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃভরা মনোরম গৃহ। সেই গৃহে আসিবার জন্য যে পদ্মময় ছয়টি প্রকোষ্ঠ—সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃভরা ছয়টি চক্রগৃহও দেখিলে। আর দেখিলে যিনি তোমার হাতে ধরিয়া বড় আদর

করিয়া এই সমস্ত গৃহ পার করিয়া কতকি দেখাইতে দেখাইতে সেই রমণীয় দর্শনের সুন্দর গৃহে আনয়ন করেন—আনয়ন করিয়া আপনাকে সেই রমণীয় দর্শনের সঙ্গে একীভূত করিয়া স্মিতমুখে বিকশিত চক্ষে তোমার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া—তোমাকে যেন কেমন করিয়া দাঁড়ান—দেখিলে তাঁহাকে। মন! সেই অসময়ে ইহা স্মরণ করিও।

বল দেখি কে তিনি, যিনি তোমাকে সেই রমণীয় দর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া থাকেন? ঐ দেখ সবার নীচে, সৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্টি-শক্তির অধিষ্ঠাতা; ইনি জাগ্রৎকালে স্থূল বিষয় ভোগ করেন। ইঁহার উপরে স্থিতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির অধিষ্ঠাতা; ইনি স্বপ্নকালে সূক্ষ্ম সংস্কার লইয়া খেলা করেন—ভোগ করেন। ইঁহারও উপরে লয়শক্তি ও লয়শক্তির অধিষ্ঠাতা—ইনি কোন ভোগেচ্ছা করেন না কোন স্বপ্নও দেখেন না—ইনি আনন্দভুক্, ইনি আনন্দময়। যিনি রমণীয় দর্শনের সঙ্গে তোমাকে মিলাইয়া দেন তিনি অ উ ম রূপিণী প্রণব শক্তি ও ওঁকার। ইনিই আবার সৃষ্টি-স্থিতি লয় করিয়া থাকেন নাদরূপে। নাদ আবার লয় হইয়া বিন্দুরূপে অবস্থান করেন। তবেই দেখ গায়ত্রী তোমাকে তোমার রমণীয় দর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া দেন। প্রণবই তোমাকে পদ্মে পদ্মে বহুভাবে নাচিয়া নাচিয়া—সুন্দর অলক্ত রঞ্জিত চরণ-নূপুরের ধ্বনি শোনাইয়া তোমার ঈপ্সিতের সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির গৃহে লইয়া যান।

আর এই বিন্দু? এই বিন্দুই তোমাদের প্রথম মিলনের স্থান। নাদের উপরে বিন্দু! ইহা কি কোথাও দেখিয়াছ? ঐ যে দেবীপক্ষে তৃতীয়ার চন্দ্র সুন্দর নির্ম্মল সুনীল আকাশে বড় উজ্জ্বল হইয়া নাদরূপে ভাসিয়া ছিল আর তেমনি উজ্জ্বল বিন্দুমত তারাটি একটু দূরে সরিয়া জ্বলিতেছিল—ঐ তারকাকে তৃতীয়ার চন্দ্রকলার কোলে আনিয়া দেখ, দেখিবে নাদবিন্দু বড় সুন্দর হইয়া ভাসিল। প্রণবটির উপরে এই নাদ বিন্দু দিয়া সে যখন চক্রে চক্রে পদ্মে পদ্মে কি যেন কি মধুর মধুর ধ্বনি

তুলিয়া চলিতে থাকে তখন বলনা কেমন হয়? তার পরে যখন সব চলা সাঙ্গ করিয়া বিন্দু স্থানে তোমাকে আলিঙ্গন করে, করিয়া তোমার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া নয়নে নয়নে যেন কত কথা কয় তখন কি হইয়া যাও—রে মন! একবার স্মরণ কর।

আরও স্মরণ কর যখন সুপ্তমত তার কোলে ঘুমাইয়া পড় তারপরে সে যখন তোমায় জাগাইয়া দেয়—যখন তোমার বিদায় লইবার সময় আসে—তখন তুমি প্রেমভরে তারে কত কি বল।

বলনা কি? তারে ছাড়িয়া আসা—সে যে বড় কষ্ট। তুমি তখন কত ব্যাকুল হও। ব্যাকুল হইয়া বল—আমার বেশ রচনা করিয়া দাও। সে তখন কি করে?

নীলগিরি বেড়ি কনকের মাল।
গোরি মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল।

তার আদরে তুমি ফুটিয়া উঠ। তুমি যখন বল—

তুরিতঁহি বেশ বনাহ যতন করি
যামিনী ভেল অবসান।

যখন বল—

শারী শুক পিক কপোত ঘন কুহুরত
ময়ুর ময়ূরী করু নাদ
নগরক লোক যব জাগি বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ।

সবাই ঘুমাইলে তার সঙ্গ হয়। সবারই হয়। কাজেই সবাই জাগিয়া বসিলে বড় প্রমাদই হয়। তাই সবাই না জাগিতে জাগিতে তার আদর অঙ্গে মাখিয়া, তার বানান বেশে ভূষিত হইয়া তার মন্দির ছাড়িয়া আসিতে হয়।

দেখিতে দেখিতে নগরের লোক সব জাগে কিন্তু তুমি কি কর? তার বিরহ ত সুধামৃতের মত বোধ হয়, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মত হয়। সব

ইন্দ্রিয়, সব লোক, জাগিলেও তখন মনকে ভজন করাইতে হয়। হয় না কি? সেই আনন্দ, বাসনাতে ভোগ করিবার জন্য—মনকে প্রভাতেই গাওয়াইতে হয়—

ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলভ মানুখ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব সিন্ধুরে॥
শীত আতপ বাত বরিখ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখ লব লাগিরে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল জীবন টল মল
ভজহুঁ হরিপদ নীত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥

মনকে প্রত্যূষে ইহা গাওয়াই দেখ কেমন হয়! তার মিলন সুখ বাসনানন্দে ভোগ হয় কি না বেশ বুঝিবে। সুষুপ্তি হইতে উঠিয়াই গাওনা—

হো সীতারামকে ভজো
ভগবানকে ভজো
রঘুনাথকে ভজো
অব চরণ কমল বলিহারি॥

বিদায়কালে—বিন্দুস্থান হইতে তারে ছাড়িয়া আসিবার কালে তুমি যাহা

কর আর সেও যাহা করে—রে মন! এই অন্তিমে তাহাই স্মরণ কর। শুধু স্মরণেই সৎ গতি লাগিয়া যাইবে। তখন যে আর কোন সামর্থ্য নাই তাই—পূর্ব্বে যাহা করা থাকে তার স্মরণ মাত্রেই এই সময়ে কাজ হয়।

সেই জন্যই তিন বেলা তারে ডাকিতে হয়, তীর্থে গিয়া তীর্থের কার্য্য করিতে হয়, তীর্থে গিয়া সন্ধ্যা পূজা বিশেষ করিয়া করিতে হয়—নতুবা অন্তিমে স্মরণ করিবে কি? মাতেব হিতকারিণী শ্রুতির "কৃতং স্মর"—যাঁহারা শুভকর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদেরই জন্য। যাহারা সন্ধ্যা পূজা করে না, তীর্থকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, তীর্থ যাত্রা নূতন স্থান দেখার জন্য মনে করে—তাহারা কি অন্তিমে বলিতে পারে—

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং
ওম্ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

রামেশ্বরমের কথা বলা হইল। এইরূপ কামাখ্যা তীর্থের কথা স্মরণ কর, চণ্ডীর পাহাড়ের কথা স্মরণ কর, পুষ্কর তীর্থের কথা মনে কর। তীর্থে যাও। সেখানে গিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া আইস। তবে ত 'কৃতং স্মর' হইবে।

—০—

নামের ভরসা।

দুরন্ত সংসার শ্যামা নিরখি ডরাই
প্রতি পদে পদে মাগো আপনা হারাই।
যে পথে চলিতে যাই বুঝি না সে পথ
পড়িয়া করম ফেরে হই আশা-হত।
ভাবি আমি তোমা ভুলি কিছু না করিব
ভাব ভাষা কর্ম্ম সাথে তোমারে সেবিব।
সাধন, ভজন, ভক্তি প্রেম-ভরা প্রাণ
নাহিক কিছুই দিতে শ্রীচরণে দান।

ভরসা কেবল মাত্র নাম সুধাময়
নাম স্মরি নামী পদে পাইব আশ্রয়।
মধুর নামের সুরে শ্রবণ ভরিবে—
মন্ত্র-সাথে মন ক্রমে লয় হয়ে যাবে।

কূটস্থে হইয়া স্থিরমূর্ত্তি ঘন হলে
নাম নামী এক হয়ে নয়নে ভাসিবে।
চরণ তরণী তব পাতকীর তরে—
আছে সত্য চিরদিন দুরন্ত সংসারে।

রাখিতে আমারে মাগো, সংসার মাঝারে
চাহিয়া খুঁজিয়া শিবে! পাইনি কাহারে।
লয়েছি শরণ তাই চরণ কমলে
তোমারি বলিয়া মোরে লও কোলে তুলে।

(অঞ্জলি)

—•—

ভোগেচ্ছা।

মৃত্যু? আসে আসুক তাতে কি? সে যে বলিয়াছে ভোগেচ্ছা ত্যাগ কর। ত্যাগ করিতেই হইবে। সাধকের এই অধ্যবসায় থাকা চাই। তার আজ্ঞা পালনের কাছে কি কোন ভোগেচ্ছা দাঁড়াইতে পারে?

স্থূল রূপ দেখা চক্ষুর ভোগেচ্ছা—স্থূল শব্দ শোনা শ্রোত্রের ভোগেচ্ছা স্থূল স্পর্শ করা ত্বগিন্দ্রিয়ের ভোগেচ্ছা, স্থূল গন্ধ লওয়া নাসিকার ভোগেচ্ছা, রস লোলুপতা জিহ্বার ভোগেচ্ছা—এই সব ত্যাগ করিতে হইবে। সে যে বলে "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ-যোনয় এব তে" স্পর্শ জনিত যে কিছু ভোগ তাহাই দুঃখের হেতু—তবে এ সব ছাড়িব না কেন?

প্রথম স্থূল ভোগ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ভোগের আশা রাখিতে হয়। ভিতরে তারে সূক্ষ্মে ভোগ করা—ইহা হইতেছে সূক্ষ্ম ভোগ। একবারে ভোগেচ্ছা ছাড়িতে পারে না বলিয়া, সেই কৃপা করিয়া বলে যদি ভোগ একবারে ছাড়িতে না পার ভিতরে শুধু আমাকেই ভোগ কর। ভিতরের জন্য সদাই তোমার হইতে থাকুক—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।

ভোগেচ্ছা রাখিতে হয় তারে লইয়া ভোগেচ্ছা প্রথম প্রথম থাকুক। শ্রুতিও বলেন "অকামো বিষ্ণুকামো বা"।

তারে ভোগ করার গুণ এই যে—সে যখন তারে ভোগ করায় তখন সব ভোগেচ্ছার শান্তি হইয়া যায়। ভোগেচ্ছা একবারে শান্ত হইলে কি থাকে? তোমায় অঙ্গে মাখিয়া সেই থাকে। ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণের গোপাঙ্গনা সঙ্গ যেমন, দুর্ব্বাসার সব আহার করিয়াও কিছু

না খাওয়া যেমন এ ভোগও তেমনি। তার মতন সে যখন করে তখন স্বপ্ন জাগরে স্থূল সূক্ষ্ম ভোগে থাকিয়াও নিত্য নির্লিপ্ত থাকা হইয়া যায়। বড় সুখের অবস্থা এটি। স্থূল ভোগ পামরে করে, সূক্ষ্ম ভাবে তারে ভোগ করে ভক্ত, আর তার মত ভোগ করিয়াও নিঃসঙ্গ থাকে জ্ঞানী। তাই সে বলে "তেষাং জ্ঞানী নিত্য যুক্ত এক-ভক্তি বিশিষ্যতে।"

পামরের উঠিবার উপায় হইতেছে পূজাতে বিষয়োপভোগ রচনা—বা স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য।

যাক্ এসব কথা স্থূল ভোগেচ্ছা ত্যাগ কর। জীবন ধারণের জন্য যেটুকু চাই তাহাও তাকে নিবেদন করিয়া তারে ডাকিতে ডাকিতে গ্রহণ কর কিন্তু গ্রহণে লালসা রাখিও না।

ভোগেচ্ছা একবারে ত্যাগ কর মুক্ত হইবে। "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে"।

—০—

সাধনে অধ্যাবসায়।

তোমার আশার আশায় আর কত দিন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব ? ক্ষনেক মাত্র আসিয়া তুমি কত দিন কত কি দিয়া নির্ম্মল আনন্দ সুখ প্রদান করিলে, ক্ষণতরে ত কত কি অনুভব করাইলে, কিন্তু হায়! এই মহাক্ষণ ত আমার ক্ষণমাত্রই রহিয়া গেল! এই শুভ মুহূর্ত্তকে ত আমি চিরতরে মহাক্ষণে পরিণত করিতে পারিলাম না। তুমি অনাদি চিন্ময়! তুমি অচিন্ত্য বাক্য-মনাতীত, তুমি সর্ব্বময় প্রেমময় সুখ স্বরূপ, তুমি আনন্দময় আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ চলন শূন্য স্থির শান্ত চৈতন্যময় পুরুষ, এই অনন্তকোটী বিশ্ব সাজিয়া আবার তুমিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছ—প্রতি জীব মধ্যে খণ্ড চৈতন্যরূপে থাকিয়া তুমিই জীব সাজিয়া নিরন্তর খেলিতেছ—যখন দুষ্টের দমন

এবং ভক্তকে রক্ষা করিবার আবশ্যক হয় তখন তুমি তোমাতে মায়া-ময় মূর্ত্তির বিকাশ কর। এই বিশ্ব তোমার অন্তরে অবস্থিত, দর্পণের মধ্যে যেমন মূর্ত্তি প্রতিভাসিত হয় তদ্রূপ অনন্তকোটী জীব জগৎ তোমারই অন্তরে অবস্থিতি করিয়া আছে। আমার মধ্যে তুমি জীবত্মা-রূপে কিন্তু তুমিই অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ—তুমি অখণ্ড আমিত তোমাতেই বাস করিতেছি। ঘটাকাশই মহাকাশ, নামরূপ যাহা তাহা মিথ্যা, নামরূপ ভেদে কখন আকাশ বিভিন্ন হইতে পারে না। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ে মিশিয়া মায়া রূপিণী প্রকৃতি নিরন্তর খেলা করিতেছে। প্রকৃতি হইতেই মিথ্যাময় জগৎ, ত্রিগুণময়ী মায়াই সৃষ্টি প্রধানা ইচ্ছা বা কর্ম্ম যাহা কিছু তাহা এই প্রকৃতির কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্য ভিন্ন প্রকৃতি জড়, কারণ প্রকৃতিই সব করে কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যে। স্থির শান্ত ত্রিগুণাতীতে গুণের কর্ম্ম অসম্ভব, তবে শক্তিমান ছাড়া শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই তাই পুরুষকে অন্তরে রাখিয়া তবে প্রকৃতি খেলা করে, ব্রহ্মের অব্যক্ত অবস্থা যাহা তাহাই তুরীয় পরিপূর্ণ চতুষ্পাদ আপনি আপনি অবস্থা, ব্যাক্ত অবস্থায় এই বিশ্ব সংসার জীব জগৎ, ইহাই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া। পূর্ণ চতুষ্পাদের কোন এক পাদে চলন উঠিয়াই এই মায়ার বিকাশ হয়, আপনাতে আপনি ঝলক তুলিয়া খণ্ড ভাণ আমি বহু হইব এই কল্পনা করিয়া মিথ্যাতে বহু সাজিয়া খেলা? নিরাকার সাকার আত্মা অবতার তুমি ত সমকালে সব, একও তুমি বহুও তুমি। যাহা আছে যাহা সত্য তাহা তুমি, যাহা মিথ্যা যাহা নাই তাহা কেবল মায়ায় ভ্রম দর্শন। মরুভূমিতে জল ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি মূলক কিন্তু হায়! নিরন্তর তোমাতে বাস করিয়াও তোমায় অনুভব করিতে পারিনা, ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে বিভিন্ন মনে ভাবি। তুমি ত কত করিয়াই এস, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে কতভাব লইয়া আসিয়া আমায় পরিপূর্ণ করিয়া দিতে চাও, তোমার খণ্ডকে তোমাতে মিশাইয়া লও কিন্তু আমি যে ক্ষণকে মহা ক্ষণে পরিণত করিলাম না, আমি তোমা হইতে খণ্ড হইয়া রহিলাম, ত্রিগুণের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া

আমি আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে কৈ পারিলাম ? কত দিন তোমার ঐ প্রেমভরা বিশাল চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষু তোমার চক্ষু হইয়া গিয়াছে, আমার দেখা তোমার দেখা হইয়া গিয়াছে, আমার কর্ম্ম আমার বাক্য তোমার কর্ম্ম তোমার বাক্য হইয়া গিয়াছে, আমার মন তোমার মন হইয়া গিয়াছে, আমার দেহটাও যেন তোমাতে মাখা হইয়া তোমারই দেহ হইয়া গিয়াছে, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটাকে হারাইয়া তুমি ময় হইয়া গিয়াছি, তোমার আদরে তোমাতে ভরিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছি, সে সব কথা বুঝি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, যাহা আশার অতীত তাহাও আস্বাদন করাইয়াছ! কিন্তু হায়! আমি ত সেই মহা মুহূর্ত্ত, সেই শুভক্ষণ ক্ষণ ভিন্ন মহাক্ষণে পরিণত করিতে পারিলাম না। ওগো! আমি তাই ত বলি তুমি ত সব দিলে কিন্তু আমি ত ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। আবার আমি তোমার আশার আশায় বসিয়া আছি। সেই ক্ষণেকের মধুর স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই। আবার যে আমি আমার সব তোমার করিয়া তোমাময় হইয়া যাইতে চাই। এই দৃশ্য দর্শন সমস্ত মুছিয়া ঘটাকাশকে মহাকাশে মিশাইয়া দিয়া তোমার আমি তোমাতেই ভরিত হইয়া থাকিতে চাই। তোমার ওই সদা প্রফুল্ল হাসি ভরা মুখ খানি হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া তোমার আজ্ঞা পালনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিব—সেই চেষ্টা দেখিয়া তুমি প্রসন্ন হইবে। তুমি বল চেষ্টা মাত্রই সূক্ষ্মভাবে তোমার নিকট পৌঁছায়। আমি আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণপণ করিতেছি ইহাতে তুমি আনন্দ পাও ইহা স্মরণে আমার সকল কষ্ট চলিয়া যাইবে—সকল কর্ম্মে তোমার মুখ চাহিয়া তোমার অপেক্ষা করিব, ভিতরে পূর্ণ শান্ত হইয়া যাইব, এই ক্ষুদ্র প্রাণটা তোমার সেবায় অর্পণ করিয়া আমি সকল সময় তোমাতেই লাগিয়া থাকিব, তোমার জীব সেবায় তোমারই সেবা সুখ অনুভব করিব—এই সুখের নিকট তুচ্ছ বাহিরের ভোগ সুখ, আমার সকলই তোমার শ্রীচরণে মিশাইয়া দিয়া আমি তোমাতে তন্ময় হইয়া

যাইব একমাত্র এই সাধ আমার। হায়! এ বিন্দু প্রাণে সে বিশাল সিন্ধু পিপাসা কেন জাগাইলে—সে সুখ সে মধুময় আনন্দ কেন ভোগ করাইলে? ওগো! তাই ত আমি আপনা হারা হইয়া ওই চরণে বিকাইয়াছি যখন তুমি এই ক্ষুদ্র শিশির কণাকে তোমার হৃদয় কমলে তুলিয়া তোমাতে মিশাইয়া লও তখন যে আমি কি হইয়া যাই! আমায় ত আর খুজিয়া পাই না কি এক অপূর্ব্ব মিলন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাই। ওগো! একবার এস, আমার বাঞ্ছিত আমার চির ঈপ্সিত, আমার সকল সাধের সমষ্টি। সাধনার ধন চির আরাধ্য দেবতা! তুমি কি এস না? তুমি ত নিত্যই এস, কতভাবে কতরূপে ক্ষণে ক্ষণেই এস, কিন্তু ইহাতেও আমার হয় না একবার তেমনি করিয়া এস তোমার স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে এস। আমার সকল ভুল ভ্রান্তি ঘুচাইয়া আমায় চির দিনের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যাও। আর লুকোচুরী নয় - একবার এস—আমি আর যেন না হারাই—আর যেন না ভুলি—আমার মহাক্ষণ—সেই শুভ মুহূর্ত্ত চির মহাক্ষণ হইয়া যাক এই মিলনে আমার মহা মিলন হউক। আমি সেই সাধে তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছি—আমার এ আশা কি মিটিবে না? সেই শুভ মুহূর্ত্ত সেই ক্ষণমাত্র কি আমার মহাক্ষণে পরিণত হইবে না? তোমার আশার আশায় প্রাণে বড় আশা লইয়া অনুদিন আমি বসিয়া আছি, এ আশা কি মিটাইবে না? আর কি বলিব অন্তর্যামী প্রাণের প্রাণ তুমি! এ সাধ না পূর্ণ করিয়া তুমি কি থাকিতে পারিবে? দয়ামম নামে—বাঞ্ছাসিদ্ধিকারী নামে যে কলঙ্ক হইবে। প্রসন্ন হও ওই রাতুল চরণে মস্তক লুন্ঠিত করি। ইতি

অঞ্জলি

—•—

কৃতজ্ঞতা।

ধন্য লীলা লীলাময় তব লীলা স্মরি
নিরখি তোমার ভাব আপনা পাসরি।
বৃন্তভাঙ্গা এ কলিকা বালিকা পরাণ
কেমনে জুড়ালে নাথ! করি ছায়া দান।
মিটে নাই কোন দিন তব সেবা সাধ
মর্ম্মভেদী দীর্ঘ শ্বাসে প্রকাশে বিষাদ!
জগতের তৃপ্তি সুখ পায়'নি কখন
জীবনের সব সাধ রেখেছে গোপন।
গোপনে গোপনে ওগো? কত দিবানিশি
ধরিতে চেয়েছে ফুল চরণ পরশি!
বিন্দু বারি সিন্ধু হ'য়ে স্থান দিলে বুকে
হেরি দয়া কণ্ঠ রোধি অশ্রুভরে চ'খে।
কি ভাবে কখন জানি? গোপনে আসিয়া
স্নিগ্ধ কোমল ক'রে যাও পরশিয়া।
চাহিলে আঁখির পানে জানিনা কি দিয়া
নয়ন ভঙ্গিতে তু'লো আকুল করিয়া,
দিঠিমাঝে থাকে আঁকা রূপ অনুপম
(ঝরে) হৃদয় কুসুম রাশি অঞ্জলির সম।
নিত্য আসি সংগোপনে মাধুরী বিলাও
তোমারি তুমিরে না কি মিশাইয়া লও?
হাসিয়া ফুটিয়া নিজে হাঁসাও সবারে
কাঁদিয়ে কাঁদাও হেরি আবার তাহারে,
জীব পালি জীব লয়ে খেল নিরন্তর
লীলাময় হেরি তব সকলি সুন্দর!

অঞ্জলি।

—০—

আপনি আপনি সোহাগের অশ্রু।

"দেখ স্থিতির সাধনা করিয়াও যে বাহিরে ছুটিতে হয় এটা কি বল দেখি" ?

"যত দিন না স্বরূপে স্থিতি হইতেছে ততদিন এই চঞ্চলতা ; আনন্দ-স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে গিয়াও যে বাহিরে তাহাকে দেখিতে আসা এটাকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না। যে আনন্দে থাকিতে চেষ্টা করা যায় সেই আনন্দে গড়া মূর্ত্তি বাহিরে দেখিতে যে সাধ এটী যদিও স্বাভাবিকই কিন্তু তবু একটু সাবধান করিয়া দিতে চাই।"

"যদি ইহা স্বাভাবিক তবে ইহাতে কিন্তু বল কেন ? অগ্নির উষ্ণতা, জলের তরলতা এগুলিকে ত দোষ বলিয়া ধর না, তবে ইহাতে দোষের কি পাইলে বল শুনি ?"

"তুমি বল ত তুমি চাও কি ? চাও, আমাকে পাইতে আমার আনন্দ ধামে আমার সহিত স্বরূপাবস্থান। এটা কি এত সহজ ভাবিলে ? আমি তোমাকে হাতে ধরিয়া আমার সেই চন্দ্র সূর্য্য বিনা আপন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দিব্য সুন্দর ধামে বিনা আয়াসে লইয়া যাইব সেখানে আমার হইয়া আমাতেই থাকিয়া আমার স্বরূপে অবস্থান করিবে। কোন ক্লেশ থাকিবে না, কোন দায় আর থাকিবে না। এইটী ত তুমি চাও ? দেখ, আমার স্বরূপে থাকিতে হইলে আমার মতন হওয়া চাই, আমি যেমন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তাদির খেলা খেলিয়াও মহা মৎস্যের নদীর উভয়কুলে বিচরণের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকি, নিজ স্বরূপ হইতে একবারও বিচ্যুত হইনা, তোমাকেও তেমনি হইতে হইবে। তাই বার বার তোমাকে সতর্কতা করিয়া দিতে চাই, তুমি যাহাতে নামরূপে না আট্‌কাইয়া যাও, এখানকার কিছুতে আট্‌কাইলে যে আমার সহিত তোমার যাওয়া কঠিন হইবে।

"আচ্ছা ! তুমি আমাকে কি হইতে বল ? আমাকে কি নির্ম্মম পাষাণ হইতে বল ! আপন আত্মার মূর্ত্তি অনন্ত প্রীতির নিদর্শন,

বাহিরে এ প্রকাশ ঘনীভূত দেখিয়া কেহকি না ছুটিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারে ? আপন আত্মাকে কে না ভালবাসে ? কে না দেখিতে ব্যাগ্র হয় ? এমন নির্ম্মম হইব কিরূপে ?”

“তাই কি আমি বলিতেছি ? ভালবাস—ভালবাসিয়া তাহাতে ভরিত হইয়া থাক। এ অভাব বোধ, এ ক্ষুন্নতা থাকিবে কেন ? যে ভালবাসে ও যাহাকে ভালবাসে সে যদি পূর্ণ হয় তবে এ ছুটাছুটি এই আপনাতে আপনি অভাব বোধ এ দুর্ব্বলতা থাকিবে কেন ? সর্ব্বদা তাহাকে লইয়া থাক, সর্ব্বত্র তাহাকে দেখ, এক মুহূর্ত্ত ও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিও না, দেখ দেখি পূর্ণতা পাও কি না ?”

“এ তুমি কি বলিতেছ ! আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। দেখগো, তুমি ত সবই জান, আমার অন্তরের কিইবা দেখিতে বাকি আছে। এক মুহূর্ত্তও যে তাহাকে ছাড়িয়া থাকা যায় না, অথচ এই যে তাহার দর্শনের প্রতীক্ষায় ছুটাছুটি কোথায় না যাইতে হয়, কষ্টকে কৃষ্ট জ্ঞান করিয়া একদণ্ডও ত বসিয়া থাকা যায় না, ইহার জন্য সব লাঞ্ছনা গঞ্জনা চন্দন চূয়া গায়ের আভরণ হইয়া যায়। অথচ সব সময়ে আর দেখা পাওয়া যায় না। প্রতি নিমিষে বৎসর কাটিতে থাকে। প্রাণের মধ্যে এই যে ঢেঁকির পাট পড়া এযে কি যাতনা এত বলিয়া প্রকাশ করা যায় না, কেবল ভুক্তভোগীই জানে। বল ত এ ব্যাকুলতা পূর্ণ হইবে কিসে ? কেমন করিয়া তাহাকে সর্ব্বদা পাইব ? এক নিমিষও ছাড়িয়া থাকা হয় না এইটীত চাই। কিন্তু তেমন করিয়া পাই কিরূপে ?”

ক্রমশঃ—

উৎসব।

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, পৌষ। { ৯ সংখ্যা।

সব তুমি—ব্যবহারিক জগতে।

স্বরূপে ঈশ্বর এক আর নামরূপে সেই একই বহু। পুরুষ বা স্ত্রী শ্রীভগবানের স্বরূপে নাই। চৈতন্যকে পুরুষও বলা যায় না, প্রকৃতিও বলা যায় না। তাই যিনি স্ত্রী, তিনি ইচ্ছা করিলেই পুরুষ। তাঁর স্ত্রী হওয়া—বা পুরুষ হওয়া এটা হয় তাঁহার সন্তান সন্ততির—তাঁহার ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে। শাস্ত্রও সেই জন্য বলেন "ভক্ত-চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ"।

এইরূপে মা হওয়া বা কন্যা হওয়া, পুত্র হওয়া বা সখা হওয়া, স্ত্রী হওয়া বা প্রাণেশ্বর হওয়া এসব সম্বন্ধ স্বরূপে নাই। তারে যা বলিবে সে তাই। তাই তিনি আপনি বলেন গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। তিনিই গতি, তিনিই ভরণকর্ত্তা, তিনিই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা প্রভু, তিনিই সাক্ষী, তিনিই নিবাসস্থান, তিনিই আশ্রয়, তিনিই সখা সুহৃৎ।

তাঁর এই চেতনস্বরূপে যদি দৃষ্টি না পড়ে, শুধু নামরূপ জড়ে যদি আটকাইয়া যাও তবে ঐরূপ একটা জড়সম্বন্ধে মাত্র আটকাইয়া থাকিতে হয়। শুধু নামে, শুধু রূপে আটকাইয়া থাকিও না তবে দলাদলি সম্প্রদায়ে পড়িয়া যাইবে। নামরূপ অবলম্বন কর কিন্তু চৈতন্যে—স্বরূপে লক্ষ্য রাখ।

অসঙ্গ সে। যদি তার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে হয়, তবে তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ পাতাও। মাও সে, স্ত্রীও সে, প্রাণেশ্বরও সে, প্রাণেশ্বরীও সে, পুত্রও সে, ভর্ত্তাও সে। সবই সে। সে কিছু না হইয়াও সব সে। তবে কলির দুর্ব্বল জীবের মুখ্য অবলম্বন করা উচিত মাতৃভাবে। মাতৃভাবটি মুখ্য রাখিয়া অন্য সকল ভাবেই তারে ভজিতে পার, তাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। একখানা পুস্তকের নায়িকা বলিয়াছে—মাই আমার প্রাণেশ্বর।

আহা! এই তুমি! স্ত্রীবাচক যাহা কিছু তাও তুমি, পুরুষ-বাচক যাহা কিছু তাহাও তুমি। তথাপি যাহা ধরিয়া তুমি প্রথমে ফুটিয়া উঠ, সেই প্রথমকার আধারটি কিন্তু "মম সর্ব্বস্বঃ"।

শুধুই কি পুরুষ, স্ত্রী আর স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক যাহা কিছু তাহাই তুমি? আর কিছু তুমি নও? না না তা কেন—বৃক্ষবাচক, লতা-বাচক, আকাশবাচক, বায়ুবাচক, জলবাচক, স্থলবাচক, বাক্যবাচক, প্রাণবাচক, দেহবাচক, ইন্দ্রিয়বাচক সব বাচক তুমি।

বলিতে যাইতে ছিলাম ব্যবহারিক জগতে কেহ তোমায় ভালবাসে, কেহ মন্দবাসে; কেহ প্রশংসা করে, কেহ নিন্দা করে; এ ক্ষেত্রে সবই সে বলিব কিরূপে?

প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম আরম্ভে বেশ করিয়া ভাবিয়া লও—প্রথমেই ভাবিয়া লও যে তোমায় ভালবাসে সেও যেমন সে সেইরূপ—যে তোমায় উৎপীড়ন করে সেও কিন্তু সে। যে সর্ব্বদা তোমায় বিরক্ত করে তারেও যেমন তুমি সেই ইহা ভাবনা করিতে হয়—যে সদা তোমায় চায় তারেও তেমনি সেই এ এই ভাবনা করিতে

হয়। যে সদা তোমায় চায় তার আদর অপেক্ষা যে সদা তোমার নিন্দা করে তার কটু কাটব্যে তোমার লাভ বেশী। একটু বিচার করিলেই এ কথা বেশ বুঝিবে। খুব উচ্চ ভাব যদি ধরিতে না পার তবে এইটি দেখ যে, যে যাতনা দেয় সে কত উপকার করে। কারণ দুঃখেই তারদিকে নজর পড়ে বেশী। সুখে মানুষ যত সহজে তারে হারাইয়া ফেলে, দুঃখে তত শীঘ্র হারায় না। তাই কবীর বলেন —

"দুখ্ মে সব হরি ভজে সুখমে না ভজে কোই।
সুখমে যব হরি ভজে দুখ কাঁহাসে হোই॥

তাই বলি দুঃখ যাতনায় তারে স্মরণ করা যায় বেশী। বর্ষার বারিধারা সহ্য করিয়া বৃক্ষ যে ঠিক থাকিবে সে কেবল তোমাকে লইয়া থাকিতে অভ্যাস করিলে তবে হয়। যাঁরা অনুরাগে ভজন ধরিয়াছেন, তাঁরাই বলেন—

স্মরিলে সে মুখ দূরে যায় দুখ
এই গুণ শ্যামা মার রে॥

অনুরাগের মুখটি একবার স্মরিয়া দেখনা দুখ দূরে যায় কি না? যদি দেখ যায় না, তবে জানিও অনুরাগ এখনও ঠিক হয় নাই।

আর একটু সূক্ষ্মে চল। যে নিত্য তোমায় চায় তার উপরে ত গায়ত্রী জপিবেই—জপিয়া তার স্বরূপ দেখিবেই; কিন্তু যে নিত্য তোমায় কঠোর কথা কহিয়া যাতনা দেয় তার উপরেও—যখন যখন ব্যথা পাও তখন তখনই গায়ত্রী জপিয়া দাও—দিয়া দেখ সে স্বরূপে কে? তবেই ব্যবহারিক জগতে সব সহ্য করিয়া সর্ব্বত্র তারে লইয়া থাকিতে পারিবে। সদা গায়ত্রী জপিয়া জপিয়া যখন শত্রুকেও দেখিবে, তখন দেখিবে শত্রু কেহ নাই। উৎপীড়ক কি যে বলিল তাও তুমি শুনিতে পাইবে না—স্বরূপ লইয়া থাকিতে পারিতেছ বলিয়া। বল কতখানি অভ্যাস করিলে ইহা হয়। করনা এই অভ্যাস। দেখনা হয় কি না?

আরও সূক্ষ্মে চল আরও সূক্ষ্ম সাধনা মিলিবে। ব্যবহারিক জগতে তুমি যাহা দেখ, যাহা শুন—বেশ করিয়া বিচার করিয়া দেখ

তাহা মনেরই সাজা। বাহিরে যাহা কিছু দেখ তাহা মনেরই সঙ্কল্প। মনই বাহিরে আসিয়া সব সাজিয়া আছে। চিত্তস্পন্দন-কল্পনাই এই জগৎ। কাজেই সুখ দুঃখ, মান অপমান, জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখ ভাবনা ছট্‌ফটানি যাহা কিছু তোমায় চঞ্চল করে তাহা মনেরই ব্যাপার।

তবে মনে যখন কোন ছট্‌ফটানি আসিবে, তখনই মনের উপর গায়ত্রী জপিয়া দাও। যাহার উপর গায়ত্রী জপিবে তাহারই স্বরূপ দেখিতে পাইবে। আর দেখিবে গায়ত্রী—বরণীয় ভর্গ ই—সর্ব্ববস্তু-নিহিত খণ্ডমত বরণীয় ভর্গকে তোমার সর্ব্বস্বের কাছে পৌঁছিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। একটু তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি কর, ইহা বুঝিবে।

যাহা দেখ যাহা শুন তাহাতে গায়ত্রী জপা স্থূল কথা। কিন্তু কোন কিছু হইলে তাহার যে মূল মন সেই মনে গায়ত্রী জপিয়া জপিয়া অবরণীয় মনকে লয় করিয়া বরণীয় মন লইয়া তাহার সুশীতল চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়া কি যেন কি হইয়া যাওয়া বড় ভাল সাধনা। রোজ একবার করিয়া ইহার অভ্যাস কর, ত্রিসন্ধ্যায় সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে ইহার বিনিয়োগ কর, আর কতক্ষণ অন্ততঃ সব ভুলিয়া তাহাকে লইয়া তাহা হইয়া স্থিতিলাভ কর—ইহা অপেক্ষা সুখ আর নাই। নিত্যক্রিয়ার পূর্ব্বে ইহা কর, ক্রিয়ার পরেও ইহা কর, নতুবা সব হারাণার ভয়ও আছে। ইতি

—•—

অভয় আশ্বাস।

তব—প্রেমের পবিত্র মধুর বাঁধনে
কে তুমি আমায় বেঁধেছ ?
আমার সুখে দুঃখে দৈন্যে, রোগে শোকে পুণ্যে
করুণা নয়নে চেয়েছ।

ওগো সোহাগের ভরে আয় আয় ক'রে
কি মধুর স্বরে ডাকিছ।
আমার—হৃদয়-নিকুঞ্জে নিভৃতে পশিয়া
মাধুরী ছড়ায়ে দিতেছ ॥
যবে—গরজিল ঘোর আঁধার-সিন্ধু
হৃদয়-গহ্বর বিদারি।
কে তুমি বলগো ছুটিয়া আসিলে
স্নেহের দু'বাহু পশারি ॥
দেখি—তোমার আলোকে ভূলোকে দ্যুলোকে
তোমারে করিছে আরতি।
আকুল পুলকে বিশ্ব ভুবন
করিছে চরণে প্রণতি ॥
জলে স্থলে শূন্যে দাঁড়ায়েছ তুমি আকাশ ভুবন ছাইয়া
কি মধুর তান আছে গিরি নভ সব ভরিয়া।
আমি তোমারই দয়ায় চিনেছি তোমায় আর যেন স'রে যেওনা
মম উপবাসী হিয়া মিলন মাগিছে—হৃদয় সরোজে এসনা।
তোমার স্বরূপে ডুবায়ে আমারে তোমার আনন্দ লভিতে
রূপরস আদি দূরেতে রাখিয়ে—ও রাঙ্গা চরণে লুটাতে—
দাওহে শকতি হে বিশ্বের রাজা! জাগিছে পরাণে বাসনা।
আবেশ-বিহ্বল পরাণে আমার শুধু ও শ্রীপদ-কামনা।
অদমিত মম প্রলুব্ধ অন্তরে এসহে জীবন-বল্লভ
তৃষিত ব্যাকুল হৃদয়ে আমার দাও ও চরণ পল্লব।
সাধের আবরণ খুলে ফেল সখা এবার তোমায় চিনেছি,
তোমার কৃপায় ওহে কৃপাময় আমি যে তোমারি জেনেছি ॥

২৫।২

—০—

মন্ত্রে প্রণাম অভ্যাস।

অনুরাগের দস্তুর এই যে এক ক্ষণকালও অনুরাগের বস্তু ছাড়িয়া থাকা যায় না। ইহা যেখানে না হয় সেখানে যে অনুরাগের কথা কওয়া যায়, সেটা আর কোন কিছুর সুবিধার জন্য অনুরাগের প্রলেপ মাত্র। যখন দেখা যায় মানুষ দিনের মধ্যে দুই এক সময়ে শ্রীভগবান্‌কে ডাকে কিন্তু অন্য সময়ে তাঁহাকে বেশ ভুলিয়া রঙ্গরসও করে, তখন বলা যায় যে, ভগবান্‌কে ডাকাটা সংসারের সুবিধার জন্য। তাই বলি সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকাটাই অথবা থাকিতে চেষ্টা করাটাই শ্রীভগবান্‌কে সত্য সত্য ডাকা।

যে কর্ম্মই করিনা কেন সকল কর্ম্মেই তোমাকে স্মরণ করা চাই। যে কর্ম্মে তোমার স্মরণ হইতে পারে না সে কর্ম্ম বর্জ্জনীয়। কলিযুগে মানুষের পাপ বড় বেশী হইয়াছে তাই মানুষকে এমন কর্ম্ম লইয়া অনেক সময় থাকিতে হয়, যে কর্ম্মে তোমাকে স্মরণ রাখা বড় কঠিন। সেই জন্যই ত পূর্ব্বে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মটাও এমন হইত যাহাতে তোমাকে স্মরণ রাখা যাইত। মনে করা হউক নিজে শ্রীভগবান্‌কে ডাকা এবং অন্যকে তাহা শিক্ষা দেওয়া; নিজে শ্রীভগবানের লীলা পাঠ করা, তাঁহার স্বরূপ বিচার করা এবং অন্যকেও তাহাই অধ্যাপন করান, নিজে দান করা এবং অন্যের দান গ্রহণ করা এই সমস্ত যদি তোমার কার্য্য হয়, তবে সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকিবার ত কোন বিঘ্ন হয় না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন যেন ঠিক হইল কিন্তু দান প্রতিগ্রহেও কি ঈশ্বর লইয়া থাকায় বিঘ্ন হয় না?

না তাহা হইবে কেন? স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা করাতে শ্রীভগবানের স্মরণের বিঘ্ন কেন হইবে? তোমার কোন এক মূর্ত্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিলাম আবার তোমাকেই অন্যমূর্ত্তিতে দান করিলাম। আহা তোমার দেওয়া কত সুখ! তোমার দেওয়া

ধন তোমায় দিয়া দাসী হইয়া থাকায় কত সুখ যে দিয়াছে সেই জানে। আর দান প্রতিগ্রহের কথা কি বলিতেছ স্নান, আহার, গৃহস্থালী করা সকল কর্ম্মে তোমায় স্মরণ রাখা যায়।

এই সর্ব্বদা স্মরণেরই একটা সঙ্কেত বলা হইতেছে।

প্রণাম অভ্যাস করা—সর্ব্বদা করা বড় সহজ। মনে করিলেই সবাই পারে। মন্ত্ররূপী তুমি—যে তুমি সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত বিরাট পুরুষ; যে তুমি স্থাবর জঙ্গম দেহ ধারণ করিয়া অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছ; যে তুমি বাক্যের মধ্যে, ভাবনার মধ্যে, দেহের সকল বস্তুর মধ্যে চৈতন্যরূপে ফুটিতেছ, যে তুমি আমার ইষ্টমূর্ত্তি ধরিয়া এই সম্মুখে, যে তুমি আমার গুরুমূর্ত্তিতে কত কথা কও, কত সুন্দর চাও—সেই তুমি কিন্তু মন্ত্রমূর্ত্তি। মন্ত্রের অক্ষরগুলি মনঃশ্চক্রেই হউক বা আজ্ঞাচক্রেই হউক বা ললাট চক্রেই হউক বা হৃদয়কমলের অভ্যন্তরে ষট্‌কোণের ভিতরে ত্রিকোণেই হউক বা নাভিচক্রেই হউক—সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে মন্ত্র লিখিয়া লিখিয়া তাঁহাকে প্রণাম অভ্যাস করনা আর মনে রাখনা নির্গুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার যে তুমি সমকালে সেই তোমাকেই প্রণাম করিতেছি। মন্ত্রজপে প্রণাম অভ্যাসটা মাখাইয়া ফেল। আর সাধনায় বসিবার আরম্ভেই পিতা, মাতা, আচার্য্য, স্ত্রী, পুত্র, বালক, বালিকা, বৃক্ষ, লতা, আকাশ, বায়ু, পর্ব্বত, সমুদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, বায়ু, পৃথ্বী, অগ্নি যাহা কিছু আছে, বাক্, প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মন, ভাবনা, সঙ্কল্প, বিকল্প সবই তোমার মূর্ত্তি মনে করিয়া মন্ত্রজপে সকলকে একবার প্রণাম করিয়া লও; এমন কি জপের মালা, পটের ছবি প্রভৃতি অচেতনকেও চেতন ভাবিয়া লইয়া একবার প্রণাম করিয়া লও; পরে কূটস্থে গিয়া বা হৃদয়কমলে ঢুকিয়া মন্ত্রজপে সেই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অক্ষররূপীই হউক বা মূর্ত্তিমান্ মূর্ত্তিময়ীকেই হউক প্রণাম করিতে থাক। তোমার সন্ধ্যা-আহ্নিকই বল বা প্রাণায়ামাদিই বল সমস্তই প্রণাম হইয়া যাউক। এইভাবে সমস্ত বৈদিক কর্ম্মগুলি প্রণামসহ

হউক। কর্ম্ম অন্তে যখন ব্যবহারিক জগতে আসিবে তখন যাহা চক্ষে পড়িবে তাহাকেই সেই ভাবিয়া অগ্রে মনে মনে প্রণাম কর, করিয়া লৌকিক আচার উল্লঙ্ঘন না করিয়া কার্য্য করিয়া যাও; এমন কি স্বাধ্যায়কালেও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শুনাইতেছি অথবা লিখিবার-কালেও জপে প্রণাম করিতে করিতে লিখিতেছি ইহা ভুলিও না।

একদিন করিলে ইহা হইবে না। নিত্য কর। যতদিন না সমাধি লাগে ততদিন কর। নিত্য কর—দেখনা কেন সর্ব্বদা মন্ত্রে প্রণাম অভ্যাসে তারে লইয়া সর্ব্বদা থাকা যায় কি না? যাইবেই, অভ্যাস কর। ইতি

—০—

তোমারি।

তোমারি পূজার ফুলে সাজি ভ'রে রাখি তুলে
হাঁসিভরা সে নয়ন হেরিব মানসে;
স্মৃতিতে উঠিবে ভাসি, পুনঃ যে দাঁড়াবে আসি
সে বিজনে খেলাঘরে আমারি লালসে।
একান্তে তোমারে পেয়ে সাধে ভরি রব চেয়ে,
মালা গাঁথি দিব পদে মিলন সরসে;
তোমারি সে সাধে ভরা তোমারি ত পদে ঝরা
সে মালা তোমার কণ্ঠে দুলিবে হরষে।
হাঁসিতে ফুটিবে হাসি সে আনন্দে আত্মহারা
ভাবে ভরা দুটী আঁখি জানাবে তাহারি।
বক্ষঃ ছাপি পড়ে ঝরি তোমারি প্রীতির বারি,
তোমারি ত নামে নামী কবি ত তোমারি॥

২৫।৭

—০—

অনুষ্ঠান-তত্ত্ব।

(প্রাতঃস্মরণ)

এ কালসমুদ্রে প্রতিক্ষণে কত জীববিম্ব উঠিতেছে ও নিভিতেছে তাহার কি ইয়ত্তা আছে? আমঘটস্থ জলের মত জীবন প্রতিক্ষণেই ক্ষয় পাইতেছে। যে জীবন লাভ করিয়া আমরা এত 'হাঁকা ডুকা' করি, দম্ভভরে কর্ত্তব্যকে পদদলিত করি, ঈর্ষায় অন্ধ হইয়া স্বজনকে সর্ব্বস্বান্ত করি, গুরু লঘু জ্ঞানশূন্য হইয়া দেহপোষণের জন্য নরদেহে পশুর মত আচরণ করি—আমাদের সর্ব্বস্বের মূলীভূত সে জীবন, উত্তপ্ত পাষাণে পতিত জলবিন্দুর মত নিমেষে লয় পায়। তাই শঙ্কর অবতার শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন—

"নলিনী দলগত জলমতি তরলং তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং"

পদ্মপত্রস্থ জলের মত জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। যে জীবন এত ক্ষণভঙ্গুর, সেই জীবন পাইয়া মোহেতে আচ্ছন্ন না হইয়া যিনি কর্ত্তব্য পথে অটল থাকেন, শত শত প্রলোভন যাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে না পারে, তিনিই এসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন। সেই কর্ত্তব্যপরায়ণের কীর্ত্তি, কাল-সাগর হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখে; তাই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। এসংসারে এমন অনেক মহাত্মা জন্মিয়াছেন যাঁহাদের স্মৃতি স্মরণপথে আসিলে মানুষকে বুঝাইয়া দেয়—আহার, নিদ্রা, ভয় ও পশুবৃত্তিচরিতার্থই বিবেকবান্ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নহে। কতশত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও সুমেরু যেরূপ অটল আছে, শত শত বিপৎ বরিষণেও কর্ত্তব্যপথে সেরূপ অটল থাকাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। তাঁহাদের স্মৃতি বিপরীত দিক্ দিয়া ইহাও বুঝাইয়া দেয়—এসংসারে অনেকে অনেককে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অনেকে বিলাসমদিরাপানে এত উন্মত্ত হইয়াছিল যে, পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দেবীকে আমিষ-শয্যাশায়িনী করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব লোপ

হইয়াছে, তাঁহাদের নাম চিরকলঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের দম্ভ অভিমান কাল-সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলে মগ্ন হইয়াছে। বিলাস মদে-উন্মত্ত হইয়া নর হইয়া পশুর মত কার্য্য করিও না, অভিমান ভরে কর্ত্তব্যকে পদদলিত করিতে যাইও না—উপহাস্যাস্পদ হইবে, জগতে শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষা হেয় হইবে। এ সংসারে সেই সংযমী শ্রেষ্ঠ পুণ্যশ্লোক নল জন্মিয়াছেন যাঁহার সংযম দেখিয়া দেবগণ বিস্মিত হইয়াছেন; পাপ কলি প্রাণপণ করিয়াও সে সাধককে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, পুণ্যাত্মার কাছে পাপ পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অগ্নিদ, গরদ, শস্ত্রপাণি, ক্ষেত্রধনাপহারী শত্রু—যে শত্রুকে নীতি শাস্ত্র কলে কৌশলে হত্যা করিতে বলেন এমত শত্রুকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়া গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া যিনি আপনার মনুষ্যত্বের ও কৌরব কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি যক্ষ সকাশে অগ্রে ভবিষ্যৎ আশা-স্থল ভীমার্জ্জুনের প্রাণভিক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে বৈমাত্রেয় নকুলের প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন; যিনি আশ্রিত অস্পৃশ্য কুক্কুরের জন্য দেবদুর্ল্লভ স্বর্গবাস ত্যাগ করিতেও উদযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরও এ সংসারে জন্মিয়াছেন। আর যিনি ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের বিষ্ণুপ্রিয়া, জগতের আধারভূতা—লোকশিক্ষার জন্য, জগতের হিতের জন্য সাধুর পরিত্রাণ ও অসাধুর বিনাশের জন্য, ত্রিলোকজননী সেই সীতাও এসংসারে জন্মিয়া সুরেপ্সিত রাজ্যসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পতিরসহ গহন বনে গমন করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—প্রাণপতিকে নেত্রান্তরালে রাখিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিতে নাই; সে পুণ্যশ্লোকার স্মৃতি আর আমাদের স্মরণপথের অতিথি হয় না—তাই আমরা ১৫।২০ টাকা মাহিনার চাকুরীকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া নিজের প্রাণনাথকে হৃদয় হইতে মুছিয়া সংসার ও হাহাকার করি, সংসারে আমাদের সং সাজাই সার হয়। সেই পুণ্যশ্লোকা বৈদেহী রাবণরাজ কর্ত্তৃক হৃতা ও বহু লাঞ্ছিতা হইয়াও রামনাম জপ ত্যাগ করেন নাই, তিনি মনে মনে প্রাণনাথের নাম জপ করিতে করিতে রাক্ষসের

ও চেটীগণের শত সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া মনে মনে প্রাণনাথকে রাক্ষসরাজের অত্যাচার প্রতীকারের প্রার্থনা জানাইয়া সুখী হইতেন। পরে আর্ত্তত্রাণপরায়ণ তাঁর প্রাণনাথই রাক্ষসরাজকে ধ্বংস করেন, সেই পুণ্যশ্লোকা বৈদেহীর স্মৃতি, স্মরণপথে আসিলে মনুষ্য বুঝিতে পারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ রাক্ষসগণ দেহের উপর অত্যাচার করিলে, যে ব্যক্তি প্রাণনাথকে এ অত্যাচারের কথা জানাইতে পারে, যে ব্যক্তি প্রাণনাথের দিকে চাহিয়া এ অত্যাচার, তাঁহার নাম জপ করিতে করিতে সহ্য করিতে পারে, প্রাণনাথ তার প্রতি সদয় হন, তার সব শোকের শান্তি হয়। যিনি বিলাসোন্মত্ত ত্রৈলোক্যপতি রাবণকে ঘৃণিত কুক্কুরের মত জ্ঞান করিয়া সতীত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন, যিনি সম্পৎ বিপৎ সকল সময়ে প্রাণনাথের নাম জপ করিয়াছেন, সে সীতার গুণ, কীটানুকীট আমি কি বর্ণনা করিব? মহাকবি বাল্মিকীও যাঁহার গুণগান করিয়া তৃপ্তি পান নাই, পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রও যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁর স্মৃতি স্মরণপথে আসিলে, এক এক বার মাকে হৃদয়পদ্মে বসাইলে, শোক আকাঙ্ক্ষা কিছুই থাকে না। ভক্ত ও ভগবান এক, তাই নল ও যুধিষ্ঠিরের সহিত বৈদেহী ও আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ জনার্দ্দনের নাম গ্রথিত। আপাতমধুর বিষয়মদিরার এমন মোহিনী শক্তি আছে যে, সে শক্তি মানুষকে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া পশ্বধম করিতে পারে। তাই বলি ভাই সকল! এস বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মনুষ্যত্ব খোয়াইবার আগে প্রতি প্রভাতে সেই পুণ্যশ্লোক ও পুণ্যশ্লোকার নাম এক একবার স্মরণ করিয়া সংসারকার্য্যে ব্রতী হই। দুঃখনিবৃত্তিই ত কার্য্যের উদ্দেশ্য, এ স্মরণ-কার্য্যে দুঃখনিবৃত্তি হইবেই, এস প্রতি প্রভাতে স্মরণ করি—

পুণ্যশ্লোকো নলরাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্য স্মৃতিতীর্থ,
ভাটপাড়া।

আপনি আপনি সোহাগের অশ্রু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"আচ্ছা? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এত দিন ত দেখিলে, চক্ষুর তৃষ্ণা কি মিটিল? একদিনও কি ভাল করিয়া দেখা হয়নি? কত কথা শুনিলে, তবু কেন বল, তাহার কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই আকুল হইয়া প্রতীক্ষা কর! এ যে নিত্য নূতন, এ দেখা শুনার শেষ নাই, এ যে 'অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল'। বহু ভাগ্যফলে এ তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণের স্বাদ, যদি পাইয়াছ তবে ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়া ফেল। ইহার ভিতর আর কিছু রাখিও না, সমস্তটাই দিয়া ফেল। চোখের দেখায় সাধ মিটে নাই, মনের দেখা দেখিতে শিখ; তাহা হইলে আর হারাইবে না, তাহাকে লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে। মনকে এ প্রেমানলে পূর্ণাহুতি দাও। কিছু ভিক্ষা রাখিও না, এতদিন যাহা করিয়াছ তাহা আত্ম সুখের জন্য, আত্ম তৃপ্তির হেতু। এইবার যাহা কিছু করিবে, সমস্ত সেই প্রেমাস্পদের জন্য হউক। তোমার নিজের বলিয়া আর কিছুই রাখিও না।"

"বল বল, আমি কেমন করিয়া তাহাকে তৃপ্তি দিব—আমায় কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় শিখাইয়া দাও। দেখিতেছি এত দিন আমি কিছুই ভালবাসি নাই, যে ভালবাসায় সে তৃপ্তি পাইল না এমন ভালবাসা নাই বাসিলাম। যে ভালবাসা আত্মতৃপ্তির জন্য, সেটা ত প্রচ্ছন্ন ভাবে কামের উপাসনা—এত প্রেম নয়? তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও কেমন করিয়া আমি তাহার সুখের জন্য আমার সর্ব্বস্ব দান করিব? আমি হাসিমুখে আত্মবলিদান দিব? কিন্তু একটা কথা বলিব কি?"

"বলনা কি বলিতে চাও?"

"দেখ, আমার এ ভালবাসায় তাকে কি একটুও তৃপ্তি দেয় না, সে কি এর কিছুই চায় না? আমার প্রাণ যে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার জন্য পিঞ্জরাবদ্ধ শুকের ন্যায় এই সর্ব্বদা ছট্‌ফট্‌ করে, আর তার কি একটুও দেখিতে ইচ্ছা হয় না?"

"দেখ, সত্য কথা বলিতেছি, তুমি ভুল বুঝিও না, তুমি কতটুকু দেখিতে চাও? সে তোমার হইতে তোমাকে শতগুণে পাইতে চায়, তুমি কতটুকু চাহিতে জান, তোমার ও ক্ষণিকের নেশায় সে সন্তুষ্ট হইতে চায় না। সে চায় তুমি যাহাতে তাহাকে লইয়া চিরদিন থাকিতে চাও—তাই সে তোমার দুদণ্ডের ভ্রম ভাঙ্গাইতে চায়। জানিও যে যত বড় তার তৃষ্ণাও তত অধিক। সমুদ্রের আছাড় কাছাড় দেখিয়াও ত ইহা কতক বুঝিতে পার। দেখ, বিশাল দৃষ্টি সে বড় ভালবাসে, প্রণয়পাত্রকে সে ছোট করিয়া রাখিতে চায় না; আপনার মত করিয়া লইতে চায়। এ যে অনন্তের ভালবাসা ভূমার প্রেম, অল্পে তৃপ্তি পাইবে কিরূপে? এ ভালবাসায় সকল দিয়া তৃপ্তি—আপনাকে সে আপনি বিলাইয়া দিতে চায়, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত রাখেনা। আমি তুমি এ পৃথকত্ব রাখিতে দেয় না। তার কাছে শত তুচ্ছ দেহ ও মনের ভালবাসা যাহা মিলিতে গিয়া মিলনে আরও বাধা আনিয়া দেয়। এ অহৈতুক প্রেমসিন্ধুর কি সীমা আছে! সে চায় অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া শাশ্বত মিলন, সে মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই। যাহাতে আপনাতেই আপনি ভরিত হইয়া যাইবে, সর্ব্বদা ভরিত হইয়া থাকিবে। তুমি কাঁদিতেছ? কাঁদিও না, সরলভাবে সকল কথা খুলিয়া বলিবে ইহাতে দোষ কি? আমি তোমাকে সকল উপায় দেখাইয়া দিব যাহাতে তুমি—

"দেখগো, কত কথাত বলিতে চাই, মর্ম্ম খুলিয়া দেখাইতে চাই, কিন্তু বলিতে গিয়াও কিছুই বলিতে পারি না। তুমি অন্তর্যামী! তুমি আমার অন্তরের ভাষা সবই জান, আমি আর খুলিয়া কি বলিব, ছি ছি এভাবে অন্তর খুলিয়া কেহ কি দেখাইয়াছে? কত আর

বলিব বল ? আমার ব্যাকুলতা তোমার চরণস্পর্শ করিয়াছে, তুমি উপায় জানাইতে ব্যগ্র হইয়াছ, আমি আর কি বলিব তোমায়, শত শতবার তোমার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করি. তুমি কি বলিবে—বল আমি চিত্তে ধারণা করিতে চেষ্টা করিব। তুমি আমাকে তাহার করিয়া দাও, আমি আর এ যাতনা সহ্য করিতে পারিতেছি না"।

"তুমি ইহাতেই এত ব্যাকুল হইলে ? শ্রীমতীর ব্যাকুলতা, শ্রীসীতার, শ্রীভগবতীর অনন্ত পিপাসার কথা শোন ত কি হইয়া যাইবে। ইহাঁরাত স্বয়ংই, তবু ইহাঁরা কত'না সহ্য করিয়াছেন, আত্মদান মুখের কথায় হয় না ? ভার তো আমি লইয়াছি, তুমি এখন নিশ্চিন্তমনে আমার উপর সকল দায় ফেলিয়া দিয়া ভজনা করিয়া যাও। নিশ্চয়ই তাহার হইতে পারিবে বা তাহাকে পাইবে। কাঁদিওনা স্থির হও, অত বিচলিত হইলে কর্ম্ম করিবে কিরূপে ? সাধনা ভিন্ন সে পরমপুরুষকে স্পর্শ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অগ্রে পরশ-মণি স্পর্শ করিয়া সোনা হও। হৃদয়ে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধারণা করিতে চেষ্টা কর, তার পরে সাধনার দ্বারা দগ্ধ হইয়া স্বর্ণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর, একবার পার্ব্বতীর তপস্যা ভাব দেখি। বিশুদ্ধ হইলে তখন আপনাকে তাহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ দেখিবে। হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই "তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" তার এ কথা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পার, নিশ্চয় যেমন চাও তেমনি পাইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভিতরে ব্যাকুলতা অনন্ত টান রাখিয়া বাহিরে ধৈর্য্য ধরিয়া অভ্যাস করিয়া যাও। যে সাধনা পাইয়াছ, যাহা ধরিয়াছ—ইহাতেই পাইবে।

শক্তি অবরুদ্ধ কর, তবেই ইহা অদম্য তেজে প্রবাহিত হইতে চাহিবে। তেজ ঘনীভূত হইয়াই আকার ধারণ করে। ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া আত্মাতে প্রবাহিত কর। ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়ের দেবতা হৃষীকেশের সেবা কর। চক্ষু ইষ্টদেবতার রূপ দর্শনে এত নিযুক্ত থাকুক যে, অন্য বিষয়ে অন্ধ করিয়া ফেল, কর্ণ

অন্য শ্রবণে বধির হউক, জিহ্বা নাম আস্বাদনে এতদূর অভ্যস্ত হউক যে অন্য আস্বাদন ভুলিয়া যাক্। দেখ দেখি ইন্দ্রিয়জয় হয় কি না, তোমার অভীষ্ট বস্তু পাও কি না! আচ্ছা! তাহার আদর এই যে কত রকম করিয়া অনুভব করিতে চাও বলত, এত শিখিলে কোথা হইতে?"

„আহাহা! তুমিত কিছু জান না! যত কিছু আমারই বটে, নিজের গুণ ত দেখিতে পাও না! আপনাতে আপনি পূর্ণ, নিজে ফুটিয়া ফুটিয়া রাখিয়াছ আবার বলা হয়—তোমাকে শিখাইল কে?"

"কেন এইত কতকি বলিতেছিলে, আমি নির্ম্মম পাষাণ আমার মতন হইতে বলিতেছি?"

দেখ, কি আর বলিব, তুমি আমার অপরাধ লইও না, আমি হৃদয়াবেগে কতকি বলিয়া ফেলি। তুমি কি জাননা কি তুমি? তোমার কথা বলিতে গেলে আমার ত একমুখে ফুরাইবে না। ও যে অনন্ত সুন্দর! নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ, কতটুকু বলিয়া শেষ করিব? আমার মুখে আবার এ শুনিতে সাধ গেল কেন? ত্রিভুবন, সপ্তলোক জয়গাথা শুনাইতেছে তবু বুঝি সাধ মিটে না? কাঙ্গালকে এ মহাপ্রসাদ, দীনাতুরকে এ স্বর্গের সিঁড়ি দেখান কেন? এ আবার কেমন শুনাইবে গো! কাঙ্গালত্ব ঘুচাইবে না কি? তুমি কি কম দুষ্ট!"

"এ আবার কি হইল! না থাক্ আর বলিয়া কাজ নাই। এখন যা বলিলাম বুঝিলে ত? আপনাকে আপনি দেখ, তোমার সে আপনিই আমি। তোমার আপনার বা আমার মধ্যে সব পাইবে, অতৃপ্ত আকাঙ্খা মিটিবে। শুধু ধীর হইয়া অভ্যাস করিয়া যাও। অভ্যাসের গুরুত্ব বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিয়া যাও। সর্ব্বদা ফুটিয়া থাক, তাহার সৌগন্ধ জগতে বিলাও, তোমার চাহিবার যেন কিছুই থাকে না, শুধু দিয়া যাও। এদানে কত সুখ 'আমি তোমারি,' চিরদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তোমার জন্যই ত আসিয়াছি, আমার এ রূপ

ধারণ কেন তাহাত জান! কিছু ভাবিও না, আমি তোমায় পূর্ণ করিয়া দিব, 'আমার' করিয়া লইব। বল, আমার মুখে এ আদর কেমন লাগিল, বল, তৃপ্তি পাইলে ?"

"এ জিজ্ঞাসা কেন! তোমার মুখে এ 'আমার' কথা কত মিষ্ট, বুঝি শত জন্ম ধরিয়া অভ্যাস করিলেও সাধ মিটিতে চায় না। আমি তোমারি ত, অগ্রে তোমার করিয়া লও। যে দিন তোমায় তৃপ্তি দিতে পারিব, সে দিন তোমার এ আমির জন্ম সার্থক জানিব, অধিক কি! তোমার আশীর্ব্বাদ জয়যুক্ত হউক, কি আর বলিব আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ কর ইতি।

—০—

শান্তিকুঞ্জে অপেক্ষায়।

আজও ত ফুটেছে ফুল দিশাহারা বিয়াকুল
সে প্রেম যমুনা আজও বহে করি কুল কুল
তৃষিত আকুল হিয়া
আছে পথ নিরখিয়া
তেমনি জোছনা হাঁসি চাঁদিমা বিতরি যায়
ঘন বাসে পরিমলে শিহরে মলয় বায়॥
আজও সে রজনীগন্ধা
তেমনি পুলকানন্দা
সে প্রিয় চরণতলে জীবন ডারিতে চায়
নয়ন নিমেষ হারা আকুল দিঠিতে চায়॥
তেমনি প্রণাম ছলে
চরণে বিকাব বলে
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া যেগো বিরাম লভিবে তায়
সে মরণে কত প্রীতি ব'লে কি বুঝান যায় ?

শুধু সে মাধব নাই
কুঞ্জভবন শূন্য তাই
ধিকি ধিকি মনাগুণে হিয়া পুড়ে হয় ছাই
সে স্মৃতি অমূল্য তবু বিসঁরিতে নাহি চাই।
বলনা রজনীগন্ধা সত্য কি মাধব নাই ?
না লো না, মাধব আছে সেই প্রাণ রাখিয়াছে
নতুবা মরিয়া তুই আবার বাঁচিস্ কিসে
সে যে লো সবার তরে শান্তিকুঞ্জে সদা আসে

শ্রীরাধিকা।

ব্রজগোপিনীগণ, শরণাপত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। গোপিনীরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সমস্ত সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জটিলা কুটিলার শত ভ্রূকুটি গঞ্জনা তুচ্ছ করিয়া, সকল মমতা শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিয়া কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত আপনাদের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, এই বাক্যের সার্থকতা করিয়াছিল। ব্রজগোপিনীদের প্রেমে কোন আত্মসুখ কামনা ছিল না। তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, তাহাদের জীবন সর্ব্বস্বের চরণকমলে সমর্পণ করিয়া, জগতের আদর্শনীয়া হইয়াছেন। ব্রজগোপিনীদিগের অহেতুকী প্রেমের বলে জাতি, কুল, লজ্জা, ধর্ম্ম, বিসর্জ্জন দিয়া, মানাপমান ধনজন প্রতিষ্ঠা পদদলিত করিয়া, হৃদয়ের আবেগময়ী তরঙ্গের প্রেমমন্দাকিনী, অনন্তদেবের চরণোদ্দেশে ছুটিয়াছিল। তাহাদের হৃদ্গত সকল কামনারাশি সেই কামাতীতের চরণে মিশাইয়া, নিষ্কাম প্রেমসাধনে, কৃষ্ণসঙ্গ সুখ লাভে, জীবন ধন্য করিয়াছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র 'আমির' অভিমান, গোপীজন-বল্লভের চরণে ভাসাইয়া দিয়াছিল। সে প্রেম আপনাহারা, জগৎ-ভোলা, সে প্রেমে দিবসে রজনী জ্ঞান, স্মৃতিতে

বিস্মৃতি, সে প্রেম চির-পরিতৃপ্ত, বা চির-অতৃপ্ত। সে অনন্তদেবের সীমাহীন প্রেমে, দুই অঙ্গ এক হয়। 'রাধাকৃষ্ণের দুঁহু তনু এক হয়ে যায়'। নতুবা যাহা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, তাহা ইন্দ্রিয়-মোহকর কাম মাত্র। সকল ভুলে ভগবান্‌কে ভালবাসা, তাহাই প্রেম। গোপীদিগের সকল চাওয়া, সকল পাওয়া, সকল সুখ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিল, তাহারা প্রেমময়কে স্মরণ করিতে করিতে এমনই আত্মবিস্মৃত হইত, নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইত, তাই বলিতেছেন—'আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে, পরাণ হরিল রাঙা নয়ন নাচনে'। যে দিকে তাকায়, সকল বস্তুতে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিরা আপনারাও কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল, যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'।

প্রেমে বিরহ না হইলে বুঝি প্রেমের স্ফুরণ হয় না, অথবা প্রেমের মধুরতা বিকশিত হয় না। বিরহের পর যে মিলন, তাহা যে কত সুন্দর, তাহা যে জানে, সে জানে। যখন প্রতি পদবিক্ষেপে, পশু পক্ষীর ডাকে, বায়ুর স্পর্শে প্রতি শব্দে, বৃক্ষলতাদির শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দে মনে হয়, "ওই বুঝি আমার প্রিয় আসিতেছে," যখন পততি পতত্রে বিচলিত পত্রের অবস্থা লইয়া, যখন কুসুমিত কোমল শয্যা রচনা করিয়া সচকিত নয়নে প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষায় কত দিবস যামিনী জাগিয়া পোহায়। তাহার পর যখন সে আসে, যখন সে আসিয়া ডাকে, যখন সে আসিয়া কত আদর করে, চোখের জল মুছাইয়া দেয়, যখন সে আসিয়া তাহার প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করে, যখন সে তাহার মধ্যে আশ্রিতকে একেবারে মিশাইয়া লয়, যখন সে আসিয়া এই জাগ্রৎ স্বপ্নের পরে তাহার সুষুপ্তি রাজ্যে লইয়া যায়—বল দেখি তখন সে বিরহিণীর কত সুখ, কত আনন্দ ও কি অবস্থা হয়, তাহা কি কেহ কখনও ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে? যখন সে আসিয়া তাহার আদরে হৃদয় ভাসাইয়া, তাহার আনন্দে পূর্ণ করাইয়া দুটি হাত ধরিয়া, এই জড়ত্ব স্বপ্নের পরপারে সুষুপ্তি রাজ্যে লইয়া যায়, তখন যে আর কিছুই থাকে না। জলের তরঙ্গ জলে উঠিয়া জলেই লয় হয়,

নানাবিধ অলঙ্কারাদি একই সুবর্ণে লয় হয়। সমস্ত নামরূপ স্বরূপে মিশাইয়া, তুমি 'আমি' এক হয়, এ প্রেমে দুই থাকে 'না। তাই বুঝি প্রেমিকপ্রবর শ্রীচৈতন্যদেব, আপন প্রণয়িণীর অঙ্গ নিজ অঙ্গে মিশাইয়া, শ্যামাঙ্গে গৌরাঙ্গ ধারণ করিয়াছিলেন। যেমন সঙ্গীতের সুর সকল ঘনভাবে আসিয়া, রাগ রাগিণীতে লয় হইয়া যায় তেমনই হৃদ্গত সকল বাসনা কামনা, সমস্ত ভোগলিপ্সা, বাহিরের সকল দেখা শুনা, সকল ছট্‌ফটানি, সেই পরমপুরুষের দর্শন মাত্রেই, তাহাতেই সমস্ত বিলীন হইয়া যায়। সে প্রেমের ভাব অনন্ত. লীলা অনন্ত, শক্তি অনন্ত, সে প্রেম অনন্তকালে অনন্ত, সে প্রেম পূর্ণ মাধুর্য্যে ভরা।

সেই প্রেমের কথঞ্চিৎ আভাস জগৎকে জানাইবার জন্য, সেই প্রেমে জগৎ তরাইবার জন্যই বোধ হয় প্রেমময়ী শ্রীরাধা. ভগবান্‌-বিরহে কাতরা হইয়া, বিরহাগ্নির তপ্ত অশ্রুজলের বন্যায় এ ধরা ভাসাইয়াছিলেন। তাহা স্মরণপথে উদিত হইবা মাত্রই কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রাণোন্মাদকারী ভাব প্রবাহে ভক্তহৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়। তাই আজ ব্রজ গোপীদিগের এক ফোঁটা চোখের জল লইয়া, শ্রীরাধার বিরহের বিন্দুমাত্র ভাবের আভাস লইয়া, এ জগতে পাপী তাপী, দীন দুঃখী তরিয়া যাইতেছে। এ কান্না যে ভক্তের চিরদিনের সাধনার বস্তু। এ প্রেমের মিলন বিরহ সব সুন্দর, হাঁসি কান্না সব মধুর। ইহার "দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতে-রখিলং মধুরম্। চিত্তের সমস্ত বর্হির্ম্মুখী বৃত্তিগুলি এক করিয়া, যে সেই চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে মিশাইতে পারিয়াছে, যাহার হৃদয়ে প্রেমময় ভিন্ন, অপর কোন বাসনা বা কামনা স্থান পায় না, সেই জানে এ বিশুদ্ধ প্রেম কত মধুর! কত সুন্দর!

শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী। শতবর্ষ কেমন করিয়া, এ বিষম বিরহাগ্নির ভীষণ অনলের মাঝে থাকিব, এই কথা ভাবিবা মাত্র, ছিন্নমূল লতাবৎ অচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন; ক্ষণকাল পরে চেতন পাইয়া, বৃন্দাসখীর হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন।

(আমার) কৃষ্ণ গুণমণি বল কোথা শুনি
বৃন্দেগো কি হৈল মোরে।
কোথা বা যাইব কেমনে পাইব
কে দিবে সে মনোচোরে।
কেমন নিদয় কঠিন হৃদয়
এলনা সে জন সই
গেঁথেছি যতনে, অশ্রুফুলে মালা
কই প্রাণবঁধু কই ?
জারিল গরলে দেহ প্রাণ মন
কি ছার মিছার জ্বালা,
কি কাজ চন্দনে, বিপাক বন্ধন
ফেলে দেরে ফুলমালা।
মুখে হাহা কৃষ্ণবাণী কাঁদে ওই রাধারাণী
লুটায়ে পড়িল ভূমিতলে
স্থির বিজলী যেন ভূতলে পড়েছে খসি,
কৃষ্ণমেঘ বিনা কোথা খেলে ?
যতনে সখীরা ধরি কহে উহু প্রাণে মরি
কোথা প্রাণ বঁধু বলি কাঁদে
অবলা হে ব্রজবালা কত আর সবে জ্বালা,
পড়িয়া তোমার প্রেমফাঁদে।

শ্রীমতীর সর্ব্বাঙ্গ স্থির, প্রাণবায়ু বহিতেছে কি না বহিতেছে। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া সখীরা শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন, ও ক্ষণপরে রাইকে চেতন হইতে দেখিয়া বহু বহু প্রবোধ দিতে লাগিলেন কিন্তু হায়! তপ্ত মরুমাঝে ক্ষুদ্র নীহারকণা বল কতক্ষণ রয়? রাধা-হৃদয়ের সে প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে কোন কথা, কোন উপদেশ কিছুতেই বাধা মানিতেছে না। শ্রবণে, স্মরণে, মননে, শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, কৃষ্ণভামিনী কৃষ্ণময়ী

হইয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ভরিয়া পূর্ণভাবে পাইয়াও এ অতৃপ্তি কেন? এ প্রেম যে চিরদিন অতৃপ্ত, এ প্রেমে নিত্য নূতন ভাবে পাইয়া, নিত্য নূতন ভাবে পূজা করিয়া, নিত্য নূতন ভাবে সাজাইয়া অন্তরে বাহিরে অহরহঃ দেখিয়া, অহরহঃ সে চরণ সেবা করিয়া, ইহার পূজার সাধ, দেখার সাধ, সেবার সাধ, সাজাইবার সাধ, পাওয়ার সাধ কোনটাই মেটে না, "যত দেখি তত দেখিতে বাসনা নিতি নিতি ভালবাসি" যুগ যুগান্তর হৃদয়ে রাখিয়াও হৃদয় জুড়ায় না। অতৃপ্তি বাড়িয়াই যায়। আবার এ প্রেম রসসিন্ধুর ভিতর হইতে নিত্য নব রসোদ্গার হইয়া, প্রাণমন মোহিত করাইয়া দেয়, কি এক আলোক-আঁধার-মিশ্রিত সুশীতল রসে হৃদয় ভরিয়া উঠে। এই বিষম বিরহাগ্নির মাঝেও কি এক প্রাণজুড়ান অনির্ব্বচনীয় সুশীতল রসের অনুভূতি হয়। এই বিরহে বা এই কান্নায় কত সুখ—যে ভগবান্-বিরহে কাঁদিতে পারে, সেই জানিতে পারে।

যাহা হউক সখীগণের সকল উপদেশ বাক্য, স্রোতের মধ্যে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। শ্রীরাধা বলিলেন—

সখিরে আর কি করবি উপদেশ
কানু অনুরাগে তনু মন মাতল, না শুনে ধরমলেশ।
রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ
মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন্ পরসঙ্গ।
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আর নাম,
নব নব গুণ সনে, বাঁধিল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম
গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে
কো জানে, উপজয়ে হাস

তহি এক মনোরথ, হয় যদি অনরথ
পুছত গোবিন্দ দাস।

রাধা বলিলেন—সখিরে, আমি কি করিব বল। দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন সব পরাধীন। আমার আর কেহই নাই, সুতরাং আমার কথা তাহারা কেহই শুনে না। আমি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য চিন্তা করিতে গেলে মন মানে না। অন্যরূপ নয়নে দর্শন করিতে গিয়া দেখি, সকলই আমার কৃষ্ণময় হইয়া বিরাজ করিতেছে, আমি যে দিকে তাকাই, সেই ভুবনআলোকরা কালরূপ ভিন্ন আর কোনরূপ দেখিতে পাই না। বল সখি, আমার নয়নের কি ভ্রম হইয়াছে? অথবা সেই একই কৃষ্ণ সকলের, আমার কৃষ্ণ জগতের কৃষ্ণ, আমার এক কৃষ্ণ সকলের ভিতর বাহিরে বিরাজ করে, সেতো সখি শুধুই রাধানাথ নয়, সে যে জগন্নাথ। দিনমণির আছে শত কমলিনী, কমলিনীর একা দিনমণি ওই। অথবা সে সর্ব্বশক্তিমান্ তাই সকল রূপে, আপন রূপ ছড়াইয়া আমার দুর্জ্জয় মানের প্রতিশোধ লইতেছে। বল সখি! কৃষ্ণতো মথুরা পুরে, তবে এখন কোথা হ'তে কালার বাঁশী বাজে? আমি চাহিলে দেখি সকল কৃষ্ণময়। নয়ন মুদিলে শুনি, শ্যামের বাঁশীর ধ্বনি। অন্তরের অতি অন্তঃস্থলে সেই রাধানামের সাধা বাঁশী বাজিতেছে, সে যে রাধা রাধা ব'লে কত আদর ক'রে ডাকিতেছে, আমার গমনে বিলম্ব দেখিয়া কাতর স্বরে বাঁশীতে আমায় ডাকিতেছে। বল্ সখি, আমি কোন্ পথে কেমন ক'রে যাব? আমি না গেলে সে যে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে ফিরে যাবে। সে মধুর মুরলীর স্বর শুনিয়া আমি কেমন ক'রে ঘরে থাকি বল, আমার ঘরসংসার সমস্ত বিষময় হইয়া উঠিল।

সে বংশীনিনাদ শ্রবণে নিবিড় তমসাময়ী নিশীথে গোপিনীগণ আপন আপন পতিপুত্র গৃহসংসার ভুলিয়া ঘোর কণ্টকাকৃত গহনবনে কৃষ্ণান্বেষণে চলিল।

"সে আমায় ডাকিতেছে" এই কথা স্মরণপথে উদয় হইবামাত্র,

তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, সমস্ত ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়া, আত্মহারা হইয়া বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণমিলন আশা জাগিতে লাগিল। কোথায় বা তাহাদের জাতি কুল মান, কোথায় তাহাদের ক্লীব-সংসারের কঠোর অত্যাচার আর কোথায় বা তাহাদের দুরন্ত ননদিনীর কর্কশ বাক্য? তাহারা প্রিয়মুখস্মরণে সমস্ত ভুলিয়াছে। সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের দান বা তাঁরই লীলা ভাবিয়া, শত তিরস্কারাদি পুরস্কারস্বরূপে আদরে বরণ করিয়া লইত। ইহা কত সুখের বল দেখি—যখন একটি বস্তু স্মরণে সকল জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হয়? ভক্ত বুঝিয়াছেন।

স্মরিলে তাঁহার মুখ, দূরে যায় সব দুখ
এই গুণ শ্যামা মায়ের রে।

ভক্তের এ প্রেম অবর্ণনীয়। এ প্রেমে, প্রেমময়কে স্মরণ করিয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, লজ্জা কোন কিছুই থাকে না। থাকে কি এক অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ। এ প্রেমে ব্যাকুলতা আছে মোহ নাই, তৃষ্ণা আছে কাম গন্ধ নাই, চাওয়া আছে স্পন্দন নাই, "সো পীরিত অনুয়াস বাখানিতে অনুখন নূতন হোয়"। ভোজনে ভ্রমণে শয়নে স্বপনে নিশিদিন সেই প্রেমময়ের প্রেমামৃত পানে, সকল ভুল হইয়া যায়। কি এক অভিনব প্রেম রসাস্বাদনে প্রতি মুহূর্ত্তে, ধমনী ভিতরে শোণিত আলোড়িয়া উঠে, প্রাণের মাঝে প্রতিক্ষণে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইতে থাকে। গোপীগণ সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সকল সংকল্প, তাহাদের মন বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়া এই প্রেমের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রেমাস্বাদনে চির অমরতা লাভ করিয়া, "সর্ব্বধর্ম্মান্ স পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" কথার সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। যে হিমাদ্রি-বক্ষ বিদারি ভাগীরথী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া শত মত্ত মাতঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগে আপনার নামরূপ হারাইবার জন্য, অনন্ত সাগর-মিশ্রণ আশায় ছুটিয়াছে, বল কে তাহার গতি রোধ করে?

যখন কানের ভিতর দিয়া প্রিয় নাম মরমে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ

আকুল করিয়া তোলে, যখন কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া যায়, যখন সে নয়নে নয়ন রাখিয়া স্থির হইয়া যায়, যখন জগতের সবের মাঝে প্রেমময়ের মূর্ত্তি দেখিতে পারে, যখন সমস্ত বহুভাব বিলোপ হইয়া এক চিদানন্দঘন মূর্ত্তিতে পর্য্যবেসিত হয়, সর্ব্বরস যখন এক হইয়া সর্ব্বরসাধারে পূর্ণ হয়, সর্ব্বস্বরূপে সবের মাঝে তাহাকে মাত্র দেখিয়া হৃদয় ভরিয়া উঠে, তখনই এই প্রেমরসাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারে। নামরূপ বাদ দিয়া স্বরূপ অনুসন্ধানে দেখিতে পাইবে, শ্যামরাগে জগৎ ভরিয়া আছে। এখানে দুই নাই। আহা! এই অরূপের রূপ কত সুন্দর কে বলিতে পারে? একাই শ্রীকৃষ্ণ জল স্থল শূন্যে বহুরূপা হইয়া নিত্য নিত্য নব নব অভিনয় করিতেছে। আপনার মাঝে আপনি প্রকাশ, আপনার মাঝে আপনার লয়। রাধাকৃষ্ণের মিলন, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন, জ্ঞান ও ভক্তির মিলন, জীবহৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয়। গভীর মোহাচ্ছন্নে নয়ন মুদ্রিত বলিয়া দেখিতে পাই না। শ্রীগুরু যখন জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন, তখনই জীব ইহা বুঝিতে পারে। এ মিলনে অতৃপ্তি নাই, মলিনতা নাই, ইহা বিজলীর মত ক্ষণস্থায়ী নয়, ইহা শুধুই নয়ন মন ঝলসাইয়া চলিয়া যায় না, ইহা আপাতমনোরম নয়, এ প্রেম চিরমনোরম। প্রাণে প্রাণে কি অদ্ভুত টান, অপূর্ব্ব আকর্ষণ, এ মিলন সমুদ্রের অতলতলে অফুরন্ত রত্ন—অনন্ত সৌন্দর্য্য। এই প্রাণমনহরা হৃদয়-ধ্বংসী শ্যামের বংশীনিনাদে স্বর্গের সুধা উছলিয়া পড়ে, প্রাণ ভরিয়া যায়। তখন সত্যই আপনহারা, জগৎ ভুলিয়া যায়। এই জড় জগতের সুখ দুঃখাদি সকল মোহ টুটিয়া যায়। সেই নটবর চিরসুন্দর প্রেমময়ের প্রেমে গড়া অমূর্ত্তের মূর্ত্তি বা অরূপের রূপ যিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, যিনি নিজহৃদয়ে শ্যামের বাঁশী শুনিয়া সমস্ত ভোগ বিলাস, সমস্ত বাসনা কামনা, 'কৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' করিতে পারিয়াছেন, যিনি প্রেমময় স্বরূপে সকল রূপ মিশাইয়া, একই

শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়াছেন, যিনি তন্মনা তচ্চিত্ত তাঁহাকে নমস্কার ভজন ছাড়া অপর সকল বাঞ্ছা বিনাশ করিয়াছেন—সেই প্রেমবিগলিত হৃদয়েই প্রেমময় ভগবান্ আসিয়া তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া চিরদিনের মত তাঁহার অনন্ত প্রেমসাগরে ডুবাইয়া রাখেন। হৃদয়-মাঝে এই শ্যামের বাঁশী দিবারাতি 'এস এস' বলিয়া বাজিতেছে; চল মন! একবার সেই নন্দদুলাল বংশীধারী দর্শন করিয়া জীবন মন ধন্য করিবে। সেই কমলাসেবিত রাতুল চরণতলে লুটাইয়া ক্ষুদ্র 'আমিকে' হারাইয়া আসিবে।

আর কি বলিব, ঠাকুর? তোমার ও দুটি চরণে কোটী কোটী বার প্রণাম করি, সাধনে শক্তি দাও। ব্যাকুলতা দাও। ক্ষুদ্র জলবিন্দু সিন্ধুতে মিশাইয়া সিন্ধুই হয়, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণে সংমিলিত করিয়া, তোমাতে আমাকে মিশাইয়া লও।

২৫।২

—০—

প্রণয়ী।

এক প্রণয়ী তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তিনি তাঁহার পকেট হইতে একটী কবিতা বাহির করিয়া প্রণয়িনীর পূর্ণাঙ্গতা, রূপলাবণ্য ও মোহিনীশক্তি সমূহের প্রশংসা করিয়া তাঁহার ভালবাসার বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি এখন আমার সম্মুখে, প্রণয়ীর বিরহশ্বাস ও সানুনয় প্রার্থনার প্রয়োজন কি? ইহাতে কেবল সময়ই নষ্ট হইতেছে। অকৃত্রিম প্রণয়ী কখন এইরূপে বৃথা সময় নষ্ট করেন না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমি তোমার প্রণয়ের প্রকৃত বস্তু নহি। তুমি তোমার উচ্ছ্বাস ও উল্লাসকেই প্রকৃতরূপে ভালবাস। আমি দেখিতেছি, যে তৃষ্ণার

জলের জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা সম্মুখে থাকিতেও তুমি তাহা পান করিতে দিতেছ না। আমি যেন কলিকাতায়, তোমার প্রণয়পাত্রী যেন বৃন্দাবনে। যে যাহাকে প্রকৃতই ভালবাসে, সেই তাহার একমাত্র প্রণয়পাত্র, সেই তাহার সর্ব্বস্ব, সেই তাহার সকল বাসনার কেন্দ্রস্থল। যে যাহার প্রিয়, সে তাহার পক্ষে কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ! তুমি আমাতে সমাচ্ছন্ন না হইয়া, তোমার হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উচ্ছ্বাসেই সমাচ্ছন্ন।

—০—

বাল্যবিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ নহে—

অনাচারই অকাল-মৃত্যুর কারণ।

ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে একটা ধূয়া উঠিয়াছে যে, বাল্যবিবাহই যত অনিষ্টের মূল। বাল্যবিবাহ-প্রথা স্বাস্থ্যের অত্যন্ত প্রতিকূল। অল্প বয়সে বালিকাদের বিবাহ দিলে সন্তান সন্ততি বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীর হইতে পারে না। এখন যে হিন্দুসমাজে ৮।৯।১০ বৎসর বয়সে বালিকা কন্যা বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্তই স্বাস্থ্যের ও দীর্ঘজীবন লাভের প্রতিকূল। দীর্ঘ জীবন ও নীরোগ শরীর লাভ করিতে হইলে এই কুপ্রথা, সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া একান্তই আবশ্যক। ইত্যাকার ধ্বনি আজকাল বাবু সমাজের চারিদিকেই মুখরিত। এখন দেখিতে হইবে বাল্যবিবাহ-প্রথা সমাজের পক্ষে উপকারক না ক্ষতিকারক? বাল্যবিবাহ-প্রথা ত কিছুতেই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক নহে। বাল্যবিবাহ কিছুতেই স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কিংবা অকাল-মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না। কারণ প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহা ত সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের এই সনাতন হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথা যে প্রচলিত আছে, তাহা ত

আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রাচীনকালে সুস্থ ও নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা ত এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি বাল্যবিবাহ-প্রথাই স্বাস্থ্যনাশের বা অকাল-মৃত্যুর কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপে সুস্থ দেহ ও নীরোগ শরীর ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন? যদি বাল্যবিবাহ অকাল-মৃত্যুর বা দীর্ঘজীবন লাভের প্রতিবন্ধকই হইত, তাহা হইলে ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে কিছুতেই সুস্থ দেহ ও নীরোগ শরীর লাভ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিতেন না। বাল্যবিবাহ যে স্বাস্থ্যনাশের বা অকাল-মৃত্যুর কারণ নহে, তাহা ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই জ্বলন্ত নিদর্শন। কিন্তু বাবু সমাজের বাবু লোকেরা তাহা স্বীকার করিতেছেন না দেখিয়াই যে তাহাতে হিন্দুসমাজের মহতী ক্ষতি অবশ্যম্ভাবিনী, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। বাবুরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধবাদী হইলেও হিন্দু সমাজের বা হিন্দু শাস্ত্রের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। প্রাতঃস্মরণীয় স্বধর্ম্মরক্ষক হিন্দুকুলপ্রদীপ মহাবীর রাণা প্রতাপ, গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষক মহাবীর শিবাজি, মহাবীর বাজিরাও ও মহাবীর হাম্বীর প্রভৃতি সকলেই ত বাল্যবিবাহজাত সন্তান ছিলেন। যদি বাল্যবিবাহই স্বাস্থ্যলাভের বা শারীরিক বলবিক্রম লাভের প্রতিবন্ধক হইত, তাহা হইলে ত এই সব মহাপুরুষেরা কিছুতেই এত স্বাস্থ্যবান্ ও শারীরিক বলবিক্রমযুক্ত হইতে পারিতেন না। আর এই বাল্যবিবাহ-প্রথা কেবল আমাদের এই বঙ্গদেশেই প্রচলিত নয়; সুদূর পঞ্জাব ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে এই বাল্যবিবাহ-প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। আর তত্রত্য প্রদেশের অধিবাসীরা যে অসাধারণ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী পুরুষ—একমাত্র শিখ জাতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-পরিচায়ক। যদি পঞ্জাবের শিখ জাতিরা

বাল্যবিবাহজাত সন্তান হইয়াও শারীরিক বলবিক্রমে অসাধারণ শক্তিশালী হইতে পারেন, তবে আর বাল্যবিবাহ-প্রথা কিরূপে দূষণীয় হয়? এবং কিরূপেই বা ইহা সামাজিক কুপ্রথা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? পঞ্জাবের শিখেরা ও মান্দ্রাজ-অধিবাসীরা যে শারীরিক বলবিক্রমে অসাধারণ গরীয়ান্, তাহা ত ইদানীন্তন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহা হইলে ত আর বাল্যবিবাহ-প্রথা কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভের বা শারীরিক বলবিক্রমলাভের প্রতিবন্ধক হইতেই পারে না। তবে যদি বলা যায় সুদূর পঞ্জাব, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বাল্যবিবাহজাত ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলবিক্রম একমাত্র তত্তৎ প্রদেশের জল বায়ুর গুণেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাহইলে আমাদের এই বঙ্গদেশেরই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মনস্বী সাহিত্য সম্রাট্ পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয় বাল্যবিবাহজাত সন্তান হইয়াও এবং এই বঙ্গদেশেরই জল বায়ু ও আব হাওয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াও কিরূপেই বা এত স্বাস্থ্য ও নীরোগ শরীর লাভ করিয়া সুস্থ ও সবল দেহে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করতঃ দিব্য অমরধামে চলিয়া গেলেন? যৌবন-বিবাহজাত সন্তানের কয়জন ইদানীন্তন তাঁহার মত এত স্বাস্থ্যবান্ ও নীরোগ শরীর হইতে পারিয়াছেন? এ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের আদর্শ ধর্ম্মপথ বঙ্গবাসীতেই জানিতে পারিয়াছি। কোনও সময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধবাদীরা এক সভা করিয়া বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করেন, তখন ভক্তিভাজন স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতৃদেব সেই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারই কৃতীপুত্র (অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে) লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বলিয়াছিলেন—এই সভায় আপনাদের যত জন যৌবন-বিবাহজাত সন্তান উপস্থিত আছেন, তাঁহার একজনও ত আমার এই বাল্যবিবাহজাত সন্তান অক্ষয়চন্দ্রের মত দিব্য সৌষ্ঠব কান্তিপূর্ণ হৃষ্টপুষ্ট নীরোগ শরীর নহেন; আর তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন—আমার এই পুত্র অক্ষয়চন্দ্র বাল্যবিবাহেরই অব্যর্থ ফল। বাস্তবিকই তখন এই বঙ্গ-সাহিত্যের যশোমুকুট

ভক্তিভাজন সরকার মহাশয়ের মত দিব্য লাবণ্যময়, হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, নীরোগ শরীর একজনও ছিলেন না। আজ বঙ্গসাহিত্যের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, এমন সাহিত্যরত্নকে বঙ্গদেশ হারাইয়াছেন। তিনি যে কেবল বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল ভাস্করই ছিলেন তাহা নয়; ইদানীন্তন সাহিত্যের মধ্যে ধর্ম্মের ভাবও তো একমাত্র তিনিই ফুটাইয়াছেন; আর ফুটাইতেছেন বঙ্গবাসীর পরম বিজ্ঞ সম্পাদক-আদর্শ হিন্দু একান্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী পরম ভক্তিভাজন রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় এবং হিন্দুর আদর্শ মাসিক পত্র উৎসবের সম্পাদক মহাপণ্ডিত ভগবদ্ভক্ত হিন্দুরত্ন পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম্ এ মহাশয়। যাহা হউক বাল্যবিবাহ যে কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভের বা শারীরিক বলবিক্রমলাভের প্রতিবন্ধক নহে, একমাত্র এই সব দৃষ্টান্তই ত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এখন ত বাবু সমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথার অনেকটাই হ্রাস হইয়াছে। এখন ত বাবুদের অনেকেই এই সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে বাল্যবিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ষোড়শী যুবতী কন্যার বিবাহই চালাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে এ যাবৎ কোনও সুফল ফলিয়াছে কি? বরং দেখা যায় তাহাতে কেবল কুফলই ফলিতেছে। আর জিজ্ঞাসা করি বাবুরা ত বাবু সমাজে ইদানীন্তন ষোড়শী, সপ্তদশী, অষ্টাদশী প্রভৃতি যুবতী কন্যার বিবাহ চালাইতেছেনই; কিন্তু তবুও যে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিরা দীর্ঘ-জীবী, স্বাস্থ্যবান্ ও নীরোগ শরীর হইতেছেন না ইহারই বা কারণ কি? একদিকে ত দেখা যায় বাল্যবিবাহজাত সন্তানের অধিকাংশই দীর্ঘজীবী, স্বাস্থ্যবান্ ও নীরোগ শরীর; তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সমাজ। কিন্তু অপর দিকে দেখা যায়, যৌবন-বিবাহজাত সন্তানের অধিকাংশই অল্পায়ু রোগপ্রবণ ও স্বাস্থ্যহীন; তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের বাবু সমাজ। সুতরাং ইহাতে ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাল্যবিবাহ কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভের বা শারীরিক বলবিক্রমের প্রতিবন্ধক নহে; প্রত্যুত হিন্দুর ধর্ম্মাচার-বিভ্রাটই স্বাস্থ্যনাশের বা

শারীরিক বলবিক্রমহানির একমাত্র কারণ। বাল্যবিবাহ যাবতীয় অনিষ্টের মূল নহে, বাল্যবিবাহই যাবতীয় ইষ্টের কারণ। অপিচ বাল্যবিবাহ অকাল-মৃত্যুরও কারণ নহে, অনাচারই অকাল-মৃত্যুর একমাত্র মূলীভূত কারণ; কেননা আচারাল্লভতেহ্যায়ু রাচার দীপ্সিতা প্রজাঃ—ইহা ত শাস্ত্রেরই কথা। অনাচারী, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি কিছুতেই দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন না। আর বাল্য-বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া ষোড়শী যুবতী-বিবাহ প্রথার প্রচলন করিলে কি লাভ হইবে? সমাজে যে সব দোষ আছে, সেই সব দোষের উদ্‌ঘাটন করাই ত কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই সব দোষ হিন্দুর ধর্ম্মাচার-বিভ্রাট ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখন ত শিক্ষিত সন্তানের অধিকাংশই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মাচারে জলাঞ্জলি দিয়া, অপিচ আমাদেরই সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া হিন্দুর অখাদ্য অস্পৃশ্য যা তা গলাধঃকরণ করতঃ অকালে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। কিন্তু শিক্ষিত সন্তানের সে দিকে যে দৃষ্টি আদৌ নাই। এখন ত যত দোষ কেবল বাল্যবিবাহ-প্রথার উপরই। রোগ ঠিক না করিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিলে কোন ফল দর্শে কি? অতএব এই শাশ্বত সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহ-প্রথা উঠাইবার চেষ্টা না করিয়া, হিন্দুসন্তান মাত্রকেই হিন্দুর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানে মতি রাখিতে উপদেশ দেওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দুসমাজে ৮।৯।১০ বৎসরে কন্যা-বিবাহ দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা বড়ই সুন্দর অথচ অতীব মঙ্গলপ্রদ। হিন্দুসন্তান সেই সব প্রচলিত রীতি নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুতেই স্বকীয় জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবেন না। কারণ হিন্দুমাত্রেই শাস্ত্রের অধীন, জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানপালনে হিন্দুসন্তান শাস্ত্রতঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য সুতরাং হিন্দুসন্তান স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া শাস্ত্র-বহির্ভূত, বিধিবহির্ভূত কাজ করিয়া কিছুতেই জাতীয় কলঙ্কের আরোপ করিবেন না। কারণ হিন্দু জানে ভগবান্‌ই তাহার যথাসর্ব্বস্ব;

ভগবান্ ছাড়া হিন্দুসন্তানের একতিলও এদিক্ ওদিক্ হইবার যো নাই; অথচ সেই বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥

(ইতি শ্রীগীতা)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না; তাহার ইহলোকে সুখ ও মোক্ষরূপী উত্তমাগতি লাভ হয় না। কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে শাস্ত্রই প্রমাণ, অতএব শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকারানুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিদিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

(পূজ্যপাদ পণ্ডিতরত্ন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন)
মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ।

ইহা ত শ্রীভগবানের নিজ মুখেরই বাণী। অতএব ঈশ্বর-বিশ্বাসী শাস্ত্রপরায়ণ হিন্দুসন্তানগণ ঈশ্বরের আদেশ ও শাস্ত্রাদেশ অমান্য করিয়া কিছুতেই সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দিবেন না। তবে বাবুদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা না পারে এমন কাজ জগতে কিছুই নাই, কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃত হিন্দু-সন্তান যে দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বালিকা কন্যার বিবাহ দিবেন তাহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুমাত্রেই শাস্ত্রের দাস, অপিচ শাস্ত্রই হিন্দুসন্তানের যাবতীয় কার্য্যের পথনির্দ্দেশক। অতএব আবহমান প্রচলিত শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহ-প্রথা কিছুতেই কুসংস্কার নহে, পরন্তু সুসংস্কার;

অপিচ বাল্যবিবাহ কুপ্রথাও নহে, প্রত্যুত সুপ্রথা। অতএব যাঁহারা এই সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ষোড়শা যুবতী কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্য নিতরাং উৎসুক ও সচেষ্ট, তাঁহারা কিছুতেই সমাজহিতৈষী নহেন; পরন্তু তাঁহারাই সমাজ-সংহারক। শাস্ত্রবিশ্বাসী একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ প্রকৃত হিন্দু ছাড়া সমাজ-সংস্কার করার অধিকার কাহারও নাই। ইদানীন্তন জ্ঞানধর্ম্মের কল্পতরু ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষ পণ্ডিতপ্রবর পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এবং ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষ পণ্ডিত-প্রবর পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণই এই বিশাল বিরাট্ হিন্দুসমাজের একমাত্র কর্ণধার ও প্রকৃত নেতা। তাঁহাদের আদেশ ছাড়া হিন্দুসমাজের একতিলও এদিক্ ওদিক্ হওয়ার যো নাই। তাঁহাদেরই পাদপদ্মে এই অকৃতী অকিঞ্চনের ভক্তিপূত কোটি কোটি প্রণাম। ইতি—

শ্রীআনন্দবিহারী সেন গুপ্ত।

—০—

শেষ প্রার্থনা।

যে কৌশলে জাগ্রত অবস্থার পরে ঘুমাইয়া পড়া যায়—আবার স্বপ্নযুক্ত নিদ্রা হইতে স্বপ্নশূন্য সুষুপ্তিতে যাওয়া যায় সেই কৌশল কি? প্রকৃতি কোন্ কৌশলে জীবকে জাগ্রত হইতে নিদ্রা, নিদ্রা হইতে সুষুপ্তিতে লইয়া যাইতেছেন? কোন্ কৌশলে সুষুপ্তি হইতে জাগ্রতে আনিতেছেন?

এই কৌশল যদি আমি জানিতে পারি কেহ যদি কৃপা করিয়া আমায় বলিয়া দেয় তবে আমি যখন ইচ্ছা জাগি, যখন ইচ্ছা স্বপ্ন দেখি, যখন ইচ্ছা ঘুমাইয়া পড়ি। এইটি আয়ত্তাধীন করাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

—০—

ধারণাভ্যাস ও বিচার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার কত, তাহার কথা বলা বৃথা। এই জন্মে যে সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে তাহার সংস্কার কি গিয়াছে? এতদিন ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করা হইল, মানস পূজা লইয়া বহুরূপে ধারণাভ্যাসী হইবার চেষ্টা করা হইল বহু বিচারও হইল, সোঽহং সোঽহংও হইল কিন্তু সে সমস্ত সংস্কার কি গেল? বাল্যকালে পিতাকে রূঢ় কথা কহিয়া যে ক্লেশ দেওয়া হইয়াছিল, বাল্যজীবন হইতে অসৎসঙ্গে পড়িয়া যেরূপ যেরূপ ভাবে আত্মবধ করা হইয়াছিল, বড় হইয়া যেরূপ ভাবে লাম্পট্য করা হইয়াছিল—শত শত প্রকারে ছাঁকিয়া ছানিয়া, যে পাপগুলি করা হইয়াছিল তাহার সংস্কার গেল কি? যদি গিয়াই থাকে তবে স্বপ্নে তাহারা জাগে কেন? মনে করাইয়া দেয় কে? মনে পড়ে কেন?

সে সব ত অজ্ঞানে হইয়াছে—আমি জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞানের কর্ম্মে জ্ঞানের পতন কেন হইবে? এ বিচার দ্বারা তুমি রক্ষা পাইবে না। মুখে তুমি জ্ঞানস্বরূপ, কার্য্যে তুমি অজ্ঞানস্বরূপ। তুমি বোধচক্ষু মাত্র। তোমার পাণ্ডিত্য মূক পাণ্ডিত্য মাত্র। নতুবা সেই সব সংস্কার এখনও মনে আছে কিরূপে? একটু চিন্তা করিলেই প্রধান প্রধান সংস্কার জাগিয়া উঠে।

আর দেখ পাপের সংস্কার সহজে জাগে কিন্তু তোমার ধারণাভ্যাসের সংস্কার জাগাইতে অধিক যত্ন করিতে হয়। এখন দেখ তোমার সদ্গতি কি অসদ্গতি হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি?

প্রতিদিন ত নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখ? কয় দিন ভাল স্বপ্ন দেখ আর কয় দিন মন্দ স্বপ্ন দেখ ভাবনা কর। মৃত্যুকালে কোন্ সংস্কার জাগিবে তাহা জানিলে কিরূপে? স্বপ্ন হয় না যে বল তাহাতেই নিশ্চিন্ত থাক কিরূপে? উহা ত মূঢ় অবস্থা। জ্বরের সময় যখন দিন কতক উপবাসে নিদ্রা আর হয় না তখন কি জাগে? তাই বলিতেছি এখনও সাবধান হও।

কি করিব তাই বল ?

ধারণাভ্যাস লইয়া সর্ব্বদা থাক আর পার ত বিচার অভ্যাস কর। ধারণাভ্যাস আয়ত্ত হইয়া গেলে দেহত্যাগের পরে মুক্তি হইবে কিন্তু বিচার আয়ত্ত হইলে মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণই হইবে না এই জন্মেই পরমানন্দ-প্রাপ্তি ঘটিবে।

ধারণাভ্যাস কিরূপ, বিচারই বা কিরূপ প্রথমে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। পরে যাহার অধিকারী তাহাই গ্রহণ করিব।

প্রথম ধারণাভ্যাস। তুমি ও তোমার শক্তি—এই দুই লইয়া তোমার জগৎ। শক্তিটি ভিতরে প্রকৃতি বা মন এবং বাহিরে মন তৃপ্তির মূর্ত্তি। কেমন ?

ধারণাভ্যাস নানাপ্রকারের হইতে পারে। শক্তিমান্ তুমি ও তোমার শক্তি—ইহারা অতি সুন্দর, অতি সুকুমার। নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম মূর্ত্তিই শক্তিমান্, জানকীলতাই শক্তি। তোমরা দুই জনে এক অতি রমণীয় প্রণবের উপরকার সীমাশূন্য অব্যক্ত বিন্দুস্থান হইতে যেন এই মাত্র নাবিয়া আসিলে। আসিয়া মণিদ্বীপ মধ্যবর্ত্তী এক অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন পঞ্চবটীমধ্যস্থ মণিমণ্ডপে স্থিতিলাভ করিলে। চারিদিকে সৌগন্ধ—কত বিচিত্র পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, পশু-পক্ষী, সরোবর সেই পঞ্চবটীতে। তোমাদের জন্য কল্পবৃক্ষতলে এক রত্নবেদী। তাহার উপরে মণিমরকত জড়িত এক অপূর্ব্ব সিংহাসন। দুই জনে সেই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া আছ। তোমাদের দৃষ্টি কি যে সুন্দর কত ভাব যে উহা হইতে ঝলক দিতেছে—তাহা বলিবে কে ?

কত কত অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া ভৈরবী রাগিণীতে আলাপ করিতে করিতে সুন্দর পঞ্চবটী হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে—মালা গাঁথিয়া তোমাদিগকে সাজাইবে বলিয়া। কোথাও বা দেবকন্যা-সদৃশী তোমার সখীগণ গো-দোহন করিতেছে, তোমাদের জন্য আহার প্রস্তুত করিবে বলিয়া। কোথাও বা তোমাদের জন্য অপূর্ব্ব বিশ্রাম-

স্থান চিহ্নিত হইতেছে—কিরূপে বীণাবাদন করিয়া তোমাদের তৃপ্তি উৎপাদন করা যাইবে—তাহারই সাধনা সেখানে হইতেছে। এই অপূর্ব্ব দেশে তোমার অতিপ্রিয় রমণীয় দর্শনের সহিত তুমি থাকিয়া যাও। সিদ্ধদেহে সর্ব্বদা ভাবনায় থাকিয়া যাও—এখনকার এই দেহটা সদাই ভুলিয়া থাক। এটা পড়িয়া গেলে ঐ দেহে ঐ নিত্য-ধামে বিরাজ করিতে পারিবে।

দুই এক দিন চিন্তা করিয়া একটু আনন্দলাভ করিলে সব হইল মনে করিও না। সর্ব্বদা সেখানে থাকিবে, স্বপ্নকালেও সেখানে থাকিবে—এমন অভ্যাস করা চাই তবে হইবে।

যদি কিছু বিচার করিতে ইচ্ছা যায় সেইখানে করিও, তাহার সহিত ধারণাভ্যাসের সহিত বিচারবান্ হইতে পারিবে। সহজেই হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় ধারণাভ্যাস।

মনে কর তুমি পরম যোগীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে। সেই দক্ষিণামূর্ত্তির মত তুমি সর্ব্বসঙ্গবিরহিত হইয়া স্থির শান্তভাবে অবস্থান করিতেছ। যদি কোন শিষ্য কোন প্রশ্ন করে তুমি মৌনব্যাখ্যা মাত্র করিবে আর "শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ"—শিষ্যের সংশয় ছেদন হইয়া যাইবে।

তৃতীয় ধারণাভ্যাস।

মনে কর তুমি তোমার দেহ গেহকে শ্রীজগন্নাথের মন্দির ভাবনা করিয়া আপনার মধ্যে শ্রীজগন্নাথ শ্রীবলরাম শ্রীসুভদ্রাকে বসাইয়াছ। মন্দিররূপী তুমি তোমার বাহিরে জগতের ভাল মন্দ সমস্তই মূর্ত্তিমান্ হইয়া অঙ্কিত রহিয়াছে আর ভিতরে তোমার রমণীয়-দর্শন বিরাজ করিতেছেন। তোমার মণিকোটায় তোমার জগমোহনে কত ভক্ত কত সাধু কত প্রেমিক তোমাকে গান শুনাইতে নৃত্য করিতেছে কত কথা কহিতেছে এইরূপ।

চতুর্থ ধারণাভ্যাস।

কৈলাসশিখরে অতি সুন্দর রত্নবাটিকায় হরপার্ব্বতী তোমরাই। পার্ব্বতী মহাদেবকে রামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আর দেবাদিদেব পরমানন্দে অশ্রুপূর্ণ লোচনে রামায়ণ বলিতেছেন—আবার যখন একা তখন রামমন্ত্র জপ করিতেছেন।

পঞ্চম ধারণাভ্যাস।

অধিষ্ঠানচৈতন্যের উপরে তাঁহার শক্তি যেরূপ নৃত্য করে, শিববক্ষে শিবানীর নৃত্য যেমন হয় স্থষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী মূর্ত্তিকে আপন বক্ষস্থলে নৃত্যপরায়ণা দেখিতে দেখিতে তুমি শিবের মত সেই স্থষ্টিস্থিতি বিনাশকারিণী কালীমূর্ত্তির অন্তরঙ্গ পরমরমণীয় মূর্ত্তির চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া চাহিয়া থাক ।

এইরূপ অনেক। যাহার যাতে মন লাগে ।

আর যদি এই জীবনেই পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিবার অধিকারী হইয়া থাক বুঝিতে পার, যদি আর কোন ভোগে রুচি না থাকে বুঝিতে পার, কোন কিছু দেখা, কোন কিছু শুনা, কোন কিছু ভাবনা করায় যদি ইচ্ছা না থাকে সত্য সত্যই ইহা বুঝিতে পার তবে তুমি বিচারবান্ হইতে পারিবে।

যিনি বিচারবান্ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য দৃশ্যজগৎ আর না দেখা। প্রথমে নিজের দেহটা অতিক্ষুদ্র বিচার করিয়া অভ্যাস দ্বারা ইহা নাই সাব্যস্থ কর। স্থূল বিচার এইরূপ।

মনে কর তুমি পুরীধামে কোন এক আশ্রম গৃহের একটি স্থানে বসিয়া আছ বা তোমার দেহ বসিয়া আছে। গৃহের সঙ্গে তুলনা করিলে তোমার দেহ কত ছোট। আবার উৎকল দেশের সহিত তুলনায় তোমার গৃহমধ্যস্থ দেহ কতটুকু। আবার সমস্ত ভারতে তোমার দেহ কতটুকু, সমস্ত এসিয়ায় কতটুকু—সমস্ত পৃথিবীর তুলনায় তুমি কত ক্ষুদ্র। আবার এই পৃথিবী সৌরজগতের তুলনায় কতটুকু। এই সৌরজগৎ আর এক বৃহৎ সৌরজগতের কোন বৃত্তমধ্যে।

আবার সেই সৌরজগৎ অন্য এক বৃহৎ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অতি প্রকাণ্ড অন্য এক জগতে মসিবিন্দুবৎ ঘুরিতেছে। তাহা আবার অন্য বৃহৎ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই পরমসূর্য্যের আলোকে ধূলিকণার মত উড়িয়া বেড়াইতেছে। এসরেণুবৎ অনন্ত জগতের কোন এক জগতে এই পৃথিবী, তাহার মধ্যে এই ভারত, তাহার মধ্যে গৃহ, তাহার মধ্যে এই দেহ—বৃহতের ধারণা কর মহতো মহীয়ানের ভাবনা করিয়া তোমার দেহ খুঁজিয়া পাইবে কি? এই মহাসমুদ্র ইহাই যখন ধূলিকণার কোন এক দেশে তখন তোমার দেহ কোথায়?

যখন তুমি এই ভাবনা অভ্যাস করিবে তখন তোমার আত্মা যে সীমাশূন্য ব্রহ্মের মত আর দেহটা যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে তাহার নিশ্চয় কি হইবে?

এক দিনের বিচারে ইহা হইবে না। এই বিষয় নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে সর্ব্বদা দেহ হারাইয়া ফেলিতে হইবে।

—০—

চিত্ত-স্পন্দন।

পরম শান্ত চিন্ময় পরব্রহ্ম সর্ব্ববিধ চলনরহিত। তিনি চৈতন্য। পরমাত্মার যে চেত্যভাব তাহাই স্পন্দধর্ম্মী। এই চেত্যভাবটি কি?

অগ্নির যেমন উষ্ণতা, চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, বায়ুর যেমন স্পন্দন সেইরূপ পরমাত্মারও এই চেত্য ভাব।

চেতনে এই চেত্য ভাবটি আছে কিন্তু চেতনটিই চেত্য নহে। উত্তাপ যেমন অগ্নি নহে, চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্র নহে, স্পন্দন যেমন বায়ু নহে সেইরূপ চেত্যভাবটিই পরমাত্মা অথচ পরমাত্মা ভিন্ন ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু চেত্যভাব না থাকিলেও পরমাত্মা আছেন। পরমাত্মা চলনরহিত, চেত্যভাবটি স্পন্দধর্ম্মী। যখন চেত্যভাব

পরমাত্মায় অদৃশ্য থাকে তখন বলা হয় শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। এই অবস্থায় চেত্যভাবকে আছেও বলা যায় না কারণ ইহার স্পন্দন নাই, ইহার কার্য্য নাই, ইহার অনুভব নাই। যখন ইহার কিছুই থাকেনা তখন ইহা নাই বলনা কেন? না তাহাও' বলা যায় না। কারণ আবার যে ইহা হইতে সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ আইসে। তাই ইহাকে বলা হয় অনির্ব্বচনীয়া। ইহাই মায়া। এই জন্য শক্তির নাম মায়া। শক্তির নাম মায়া—চেত্যভাব, চিতি, অবিদ্যা ইত্যাদি। এই চেত্যভাবটি স্পন্দনাত্মিকা।

এখন প্রশ্ন স্পন্দন কোথা হইতে উঠে?

ব্রহ্মের এই স্পন্দশক্তিটি মনোময়ী। ব্রহ্মের মনোময়ী স্পন্দশক্তিকে তুমি মায়া বলিয়া জানিবে। চিন্ময় ব্রহ্মের নাম শিব। আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দশক্তিই কালী।

মনোময়ী স্পন্দশক্তি পরমব্রহ্ম হইতে অভিন্নও বটেন ভিন্নও বটেন। ঐ মনোময়ী স্পন্দশক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে অনুভব করাইতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। স্পন্দন দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন বহ্নির অনুমান হয় সেইরূপ ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হন। শিব শান্ত চিন্মাত্র পরমাত্মা অবাঙ্ মনসগোচর। স্পন্দশক্তি তাঁহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়া থাকে।

শক্তির তিন ভাগ। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। চেত্যভাবটি তাঁহার মায়া। চেত্যভাবের প্রথম স্পন্দন—স্ফুরণটি জ্ঞানশক্তি। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্য। এখানে কর্ম্ম আছে বলিয়া ইহা প্রকৃতি। ইহার শক্তি জ্ঞানশক্তি ব্রহ্মের অতি নিকট বলিয়া ইহাও প্রকাশস্বরূপিণী। জ্ঞানশক্তিকে সাত্ত্বিক মায়া বলে। ইচ্ছাশক্তি রাজস মায়া। ক্রিয়াশক্তি তামস মায়া। তমোমায়াত্মক যিনি তাঁহার নাম রুদ্র, সাত্ত্বিক মায়াত্মক বিষ্ণু আর রাজস মায়াত্মক ব্রহ্মা। শ্রুতি বলেন—"চতুর্ম্মাত্রাত্মকোঙ্কারো মমপ্রাণাত্মিকা দেবতা। অহমেব

জগত্ত্রয়স্থপতিঃ। মম বশানি সর্ব্বাণি।
গগনো মম ত্রিশক্তি মায়াস্বরূপঃ নান্যোমদস্তি। তমোমায়াত্মকো রুদ্রঃ। সাত্বিকমায়াত্মকো বিষ্ণুঃ রাজসমায়াত্মকো ব্রহ্মা। ইন্দ্রাদয়-স্তামস রাজসাত্মিকা ন সাত্বিকঃ কোঽপি।

এই জগৎ কি? ইহা কর্ম্মের মূর্ত্তি। ইহাই অপরা প্রকৃতি। পঞ্চতন্মাত্রা ও অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব এবং অবিদ্যা—অপরা প্রকৃতির এই আট ভাগ। এতদ্ভিন্ন আরও ষোড়শ ভাগ ইহার আছে। ইহা বিকৃতি। ষোড়শ বিকৃতিগুলি পঞ্চভূত + পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় + পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় + ১ কর্ম্মজ্ঞানাত্মক মন। এই অপরা প্রকৃতিকেই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগত বলে।

পরাপ্রকৃতি দ্বারা এই অপরা প্রকৃতি বিকৃত হইয়াছে। ক্রিয়াশক্তির মূলে ইচ্ছাশক্তি আছে। ইচ্ছাশক্তি পরা এবং ক্রিয়াশক্তি অপরা। ইহা উভয়েই প্রকৃতি—কারণ উভয়েই কার্য্য করেন। ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনানগর নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ঐ নিরাকার শিবের ইচ্ছা বা মায়াশবলিত ব্রহ্মের ইচ্ছা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে।

ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই জীবচৈতন্য। ইনিই পরাপ্রকৃতি। উনিই বহুবিধ বিকার সম্পাদন করিয়া ক্রিয়াপ্রকৃতি নামে অভিহিত হন। ঐ পরিস্পন্দরূপিণী চিতি শক্তিই নিজ ইচ্ছাতে বেদোক্ত ক্রিয়াস্বরূপা হয়েন। ক্রিয়া কখন নিরবয়ব হয় না। এই কারণে আপনার শরীর মধ্যে হস্ত পদাদি অবয়ব ভাবনা দ্বারা অবয়ববিশিষ্ট হন। ঐ সমস্ত অবয়ব আবার স্পন্দিত করিয়া ক্রিয়ারূপে প্রকাশ করেন। ইচ্ছাশক্তিই ভাবনা দ্বারা ক্রিয়া প্রকাশের অবয়ব ধারণ করেন, অবয়ব দ্বারা আবার ক্রিয়া করেন।

এইরূপে পরব্রহ্মে অসংখ্য চিত্ত। অসংখ্য চিত্ত অসংখ্য জগৎ। আবার অসংখ্য জগতে অসংখ্য জীব আবার জীবে চিত্ত, চিত্তে জগৎ। জগতে জীবে—এইরূপে স্বপ্নসংসারও অসংখ্য। জীবের মধ্যে অসংখ্য

সংসার। সংসারে কত মনুষ্য আবার মনুষ্যের মনের মধ্যে সংসার। জগতের ভিতরে মনুষ্য, মনুষ্যের ভিতরে জগৎ। এইরূপে এই জগৎময় ভ্রান্তির ও শেষ নাই।

এই জন্য বলা হয় এই স্পন্দরূপিণী কালী ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গভূত দৃশ্যপ্রপঞ্চও তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন। স্পন্দশক্তি ক্রিয়ারূপে পরিণত হইতে হইলেই শরীরধারণ আবশ্যক। তবেই বলা হয় অপরা প্রকৃতি পরাপ্রকৃতির প্রয়োজনেই সৃষ্ট হইয়াছে।

এখন দেখ এই অপরা প্রকৃতি বা দৃশ্যপ্রপঞ্চ কি? এই দৃশ্য প্রপঞ্চ চিতির ক্রিয়া—ইহা স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তটিই শান্ত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম—তাঁহাতে কিঞ্চিৎমাত্র স্পন্দন নাই। তাঁহার যে ক্রিয়ারূপতা ইহা কেবল অজ্ঞানে। যখন এই অজ্ঞান দূর হয়—যখন প্রকৃত বোধ জন্মে তখন তিনি ক্রিয়া স্বভাব হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া বাস্তব স্বভাবে অবস্থান করেন। ঐ সময়েই তাঁহাকে শিব বলে।

যখন কূটস্থ চৈতন্যের চিতিশক্তিরূপিণা দেবীর প্রতিকূলস্পন্দ জড়ভাবে অবস্থান করে তখন সেই অবস্থাকে কালী বলা হয়। দেখা গেল মায়াই পরমেশ্বরী প্রকৃতি। ইহাকেই লোকে শিবেচ্ছা বলে। ঐ অকৃত্রিমা স্পন্দশক্তিই জগন্ময়। আত্মাই পুরুষ।

—০—

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } ১৩২৫ সাল, মাঘ। { ১০ সংখ্যা।

রোগ ও চিকিৎসা।

জীবের দুঃখ কেন হয় তাহা অগ্রে জান, জানিয়া দুঃখের প্রতিকার কর। রোগ কোথায় অগ্রে নিশ্চয় কর পরে ঔষধের ব্যবস্থা কর। জীবের রোগটি কি অগ্রে তাহাই দেখ।

জগৎকে শিক্ষা দিবার বস্তুটি এই—আত্মা আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ। তাঁহাতে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মরণ নাই। তাঁহাতে আহার নাই, নিদ্রা নাই, ভয় নাই, কোন তৃষ্ণা নাই। এই আত্মা লইয়া সকলেই ঘর করিতেছে। কেবল ইঁহাকে জানেনা বা জানিতে চায় না বলিয়া মানুষ নিরন্তর মুহ্যমান হইতেছে। মানুষ কাজ করে কিন্তু কেন করে, কাজ করিয়া কি পাইবে তাহা চিন্তা করে না এবং যাঁহারা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কথাও শুনিতে চায় না তাই মানুষের এত দুঃখ। পেটে খাওয়া একটা বেশী কথা নহে। উদরে যে অন্ন নাই তাহা কেন নাই তাই দেখ? পৃথিবীতে কি খাদ্য দ্রব্যের অভাব আছে? একজন যদি হাজার হাজার লোকের

খাদ্য আত্মসাৎ করিয়া রাখে তবে অন্যের ক্লেশ ত হইবেই। যে ঐ হতভাগ্যকে দূর করিয়া দিতে চায় সে যদি মূর্খ হয় তবে আরও বিপদ বেশী হয়। মূর্খকে জ্ঞান দাও। যদি প্রচার কিছু করিতে হয় তবে যে ভাবে নিজে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছ তাহাই প্রচার কর। বলবান্ লোককে বুঝাইয়া দাও। নিজে জ্ঞানলাভ করিয়া শক্তি সংগ্রহ কর, অন্যকে সহজেই বশ করিতে পারিবে।

নতুবা রোগ কোথায় আর ব্যবস্থা করিতেছ কি? একজনও যদি আত্মজ্ঞান লাভ করেন তবে জীবের দুঃখ দূর করিতে তিনিই একাই সমর্থ। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য কি একজনও নাই? সমাজের বা জগতের উপকার করিতে চাও, তবে পাত্র দেখিয়া একজন লোককেও কেননা সেই সুবিধা করিয়া দাও?

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব উপায় বলিয়া দিতেছেন। আত্মা আপন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া যখন চিত্ত-সত্তার অনুসরণ করেন তখন তাঁহাতে অবিদ্যার উদয় হয়। চিত্তের অনুসরণ করাই কল্পনারূপ মন। এই কল্পনা হইতেই ভয়সম্পাদনী তৃষ্ণা আসিয়া অজ্ঞান বৃদ্ধি করে।

চিত্তকে অনুসরণ করিলে অনন্ত আত্মাতে অমানিশার ন্যায় মলিনা তৃষ্ণা অনেক প্রকারে স্ফূর্ত্তি পায়। হৃদয়াকাশে ঋত ও সত্যস্বরূপে পরমাত্মার বিবর্ত্ত হইলে যখন ভাবনা-প্রবাহ ছুটিবার পূর্ব্বাবস্থা হয় তাহাকেই 'ততো রাত্র্যজায়ত' বলা হয়। সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি নাই। বৈষম্যেই সৃষ্টি। প্রথমেই তম সৃষ্টি ইহাই রাত্রি। অনন্ত আত্মাতে তৃষ্ণা-প্রবাহ স্ফূর্ত্তি পাইলেই মহামোহের সৃষ্টি হয়। এই জন্য তৃষ্ণা ত্যাগই আত্মস্বরূপে থাকার উপায়।

জীবের মধ্যে তৃষ্ণার উৎপাত লক্ষ্য কর।

চিত্তই সংসারের বীজ, জীব বন্ধনের বাগুরা। আত্মা চিত্তকে অনুসরণ করিলে ব্রহ্মত্ব বিলুপ্ত হয়, মলিন জ্ঞানের উদয় হয়। আত্মা ঐ মলিন জ্ঞানের অধীন হইয়া চিত্তপরিকল্পিত দেহাদিতে অহম্ভাব

স্থাপন করতঃ রাগ দ্বেষাদি মলে মলিন হয়েন। ইহা হইতেই মহামোহ-প্রদায়িনী তৃষ্ণা মানুষকে নিয়ত মূর্চ্ছিত করে।

তৃষ্ণা আরণ্য-কুক্কুরী। মানুষের মনোময় গর্ত্তে থাকিয়া এই তৃষ্ণা-কুক্কুরী অদৃশ্য হইয়াই দেহ হইতে মাংস, অস্থি, রুধির নিয়ত ভক্ষণ করে। দেখনা যাহার তৃষ্ণা প্রবল তাহার আকার কিরূপ? তৃষ্ণা বর্ষাকালীন নদীর ন্যায়। কখন শীতল—সব শান্ত, আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া ভীষণ স্থানে প্রতিঘাত পাইতে পাইতে প্রচণ্ডা নদীর ন্যায় ঘূর্ণমানা হয়। তৃষ্ণানদী অনন্ত সংসার ভাবনাময় তরঙ্গে সমাকুলা ভ্রমরূপ আবর্ত্তে পরিপূর্ণা। তৃষ্ণা পেচিকা জগৎকে নিরন্তর বিদ্রূপ করিতেছে। তুমি সঙ্কল্প ত্যাগ কর, করিয়া তৃষ্ণা ক্ষয় কর। অনহম্ভাব-রূপিণী কর্ত্তরী দ্বারা অহংজ্ঞানরূপিণী তৃষ্ণাকে ছেদন কর।

আত্মাই মন্ত্রময়। একদিকে আত্মার স্মরণরূপ প্রণব, বীজ ও নাম সর্ব্বদা লইয়া থাক, সঙ্গে সঙ্গে "আমি নাই, অন্যেও নাই" এই তত্ত্ব জানিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস কর, হইবেই। আমি চিত্ত নই আমি চৈতন্য, আমি আত্মা—ইহাই সত্য। মিথ্যা চিত্ত ও চিত্তের তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া সত্য আত্মা লইয়া সত্যময় হইয়া যাও—সমস্ত দুঃখ দূর হইবে, সমস্ত শক্তির স্ফুরণ হইবে। ইহাই অভ্যাসের বিষয়, ইহাই অভ্যাস করাইবার বিষয়।

—০—

শান্ত হওয়া।

দেখ দেখি অশান্ত কেন হইতেছ? কিছু ভাল লাগে না একথা কেন বলিতেছ? কখন বেশ থাক, কখন বেশ থাকনা—কেন ইহা হয়? আজ ভাল, কাল মন্দ ইহা কেন বল দেখি? আজ ঠিকমত একটু কাজ হইল বেশ থাকিলে, কাল নিয়ম লঙ্ঘন হইল অশান্ত হইলে—ইহা কি? জীবন ভরিয়া ত এই করিতেছ? বল ইহাতে শান্তি কি পাইলে? ক্ষণিক শান্তিতে ত কিছুই হইতেছে না? পূর্ণ শান্ত কিরূপে হইবে?

দেখ দেখি অশান্ত কে হয়? অশান্ত হয় মন। কেন হয়? বহু তৃষ্ণা করে বলিয়া—বহু বাসনা করে বলিয়া। "বাসনাময় মাকুলম্"। এই তৃষ্ণা, এই বাসনা কেন আসে? অহংকার কর বলিয়া। পরম শান্ত আত্মা—ইহাই স্বরূপ। সর্ব্বদা অস্থির, সর্ব্বদা চঞ্চল বাসনা তরঙ্গ স্থির সাগরের বক্ষে ভাসে। তুমি ইচ্ছা করিলে বাসনা-তরঙ্গ তুলিতেও পার আবার বন্ধ করিতেও পার। এ শক্তি তোমার আছে।

বাসনা প্রথমে যখন তুলিয়াছিলে তখন সাধ করিয়া। তখন না তুলিবার শক্তিও ছিল। না তুলিয়া স্থির থাকিতেও পারিতে। এখন পুনঃ পুনঃ তুলিয়া তুলিয়া উহা স্বভাব হইয়া গিয়াছে। শক্তি আছে কিন্তু দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।

একটি স্থির সুখময় আনন্দময় অবস্থা—একটি অস্থির দুঃখময় বা সুখগন্ধী দুঃখময় অবস্থা। তুমি স্থির হইয়াও থাকিতে পার আবার অস্থিরও হইতে পার। আবার সর্ব্বদা স্থির থাকিয়া অস্থিরের সঙ্গে মিশিয়া অস্থিরের কার্য্য করিয়াও ভিতরে যে স্থির সেই স্থিরই থাকিতে পার— থাকিয়া একটা খেলা করিতে পার।

অহং এইটি আদি ভাব। পরম শান্ত আত্মস্বরূপকে অহং বল, শান্ত ভাবে থাকিলে। পরম অশান্ত মন দেহ প্রকৃতিকে অহং বল,

অশান্ত হইয়া গেলে। আবার পরম শান্ত আত্ম স্বরূপে থাকিয়াও প্রকৃতিকে অহং না বলিয়া অহং বলার মত করিয়া রঙ্গ কর—বেশ খেলা হইবে।

বাসনা সমষ্টি, তৃষ্ণা সমষ্টিই প্রকৃতি। অহং অহং করিয়া তুমি প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়িয়াছ। অহং মম—এই অজ্ঞানে ডুবিয়া গিয়াছ। ইহার হাত হইতে অহংকে উদ্ধার করিয়া শান্তস্বরূপকে অহং বল,—বন্ধনমুক্ত হইয়া শান্ত হইলে।

কিরূপে প্রকৃতিতে অহং ত্যাগ হইবে? কিরূপে দেহ, মন, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত হইতে অহং উঠাইয়া লইবে?

প্রথমেই সন্দেহ হয় দেহাদি হইতে অহংত্যাগ করিলে দেহ থাকেনা। অহং ত্যাগ করিব আবার জীবিতও থাকিব কিরূপে ইহা হইবে? অহং ত্যাগ অর্থে অহংএর অভাব নহে। অহং ত্যাগ হইয়া গেলে জড়ের মত পড়িয়া থাকিতে হইবে ইহা ভাব কেন? অহং এর বিনাশ এভাবে করিতে বলিতেছি না। অজ্ঞান হইতে অহং বিচ্ছিন্ন কর, জ্ঞানের সঙ্গে অহং রাখ। সুষুপ্তিতে অহং থাকে না, তুমিও জড়বৎ থাক—ইহা হইতে বলা হইতেছে না। অহং আয়ত্তাধীন কর। যখন ইচ্ছা অহংকে ব্রহ্মে লইয়া যাও, বল অহংব্রহ্ম, আবার যখন ইচ্ছা অহংকে বিশ্বরূপে মিশাও—বল অহং প্রকৃতি, অহং বিশ্বরূপ—আকাশ পর্ব্বত সমুদ্র, সূর্য্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ, বৃক্ষ লতা, জীব জন্তু সমস্ত লইয়া অহং। অহং সহস্রশীর্ষা পুরুষ। ত্রিলোকস্থ প্রাণিপুঞ্জের পার্থিব দেহ ব্যাপিয়া আমি। আমারই সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ। এই ভাবে অহং এর প্রসার কর। ক্ষুদ্র দেহকে অহং বলিয়া দুঃখী হও কেন?

ঐ যে বলিতেছিলে অহংত্যাগও করিব আবার বাঁচিয়াও থাকিব ইহা কিরূপে হইবে? এখন বুঝিতেছ অহংত্যাগ কি?

সত্য কথা রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে যখন অন্যমনস্ক হও অর্থাৎ দেহ হইতে যখন অহংটা অন্যত্র চলিয়া যায় তখন দেহটা পড়িয়া যায়।

একখানা কাষ্ঠ কি হাঁটিতে পারে? শিকড় যেমন বৃক্ষকে ধরিয়া থাকে অহংও সেইরূপ দেহটাকে ধরিয়া আছে। এই অহং ত্যাগ করাটা অভ্যাস কর—শান্ত হইবে। অহংবাসনা বা অহংতৃষ্ণা ত্যাগ দুই প্রকার। ধ্যেয়বাসনা ত্যাগ ও জ্ঞেয়বাসনা ত্যাগ। ধ্যান ও জ্ঞান—বাসনাত্যাগের পথ।

ধ্যেয়বাসনা ত্যাগ আমি এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির সমষ্টি, এই দেহটি এই সকল যন্ত্রগুলির মিলিত অবস্থাটি আমি—দেহটি আমার, পান ভোজন আমি করি দেহ রক্ষার জন্য, আমি দেহ ও যন্ত্রাদি ব্যতীত কিছুই করিতে পারিনা—যন্ত্রগুলিও হস্ত পদ মন ইত্যাদিও মৎ-ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারে না, অন্তরে এইরূপ যে নিশ্চয় তাহাই এখনকার অহংবাসনা। এই ভাবটি অসত্য—প্রকৃত অহং এই মন্ত্রটি নহে—সংঘাত ভাবটি নহে কিন্তু যে চৈতন্য থাকার জন্য এই চর্ম্মাবৃত যন্ত্রটি চলিতেছে, কথা কহিতেছে, ব্যবহার করিতেছে সেই চিৎরূপটিই আমি। কাজেই আমি দেহ মন হস্ত পদাদি সংঘাতটি নহি এসকলও আমার নহে—এই সত্যটি গ্রহণ করিয়া আমি আমার ভাবটি ত্যাগ করার নাম ধ্যেয় অহংত্যাগ বা ধ্যেয় বাসনাত্যাগ।

জ্ঞেয় বাসনাত্যাগ বা জ্ঞেয় অহংত্যাগ কি শুন।

সমস্তই ব্রহ্ম—অর্থাৎ চেতনটি বস্তু, চেতনটি আছে বলিয়া জড় ভাসিতেছে, এজন্য সমস্তই ব্রহ্ম—এই ভাবনা দ্বারা যখন অহংত্যাগ হয়, যখন অহং মমতার ক্ষয় হয়, তাহাই জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ। জ্ঞানের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয়। এই অহং পরিত্যাগ দেহত্যাগান্তে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক জ্ঞেয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়।

প্রথম অহঙ্কারময়ী বাসনা ত্যাগ করিয়া যিনি মাত্র লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ দেহধারণ করেন, তিনি ধ্যেয়বাসনাত্যাগী জীবন্মুক্ত। মূল অজ্ঞান সহ বাসনা ত্যাগ করিয়া যিনি শান্ত, তিনি জ্ঞেয় বাসনাত্যাগী।

বাসনা ত্যাগের উপায় তবে (১) আমি কিছু নই, আমার কিছুই নহে (২) সমস্তই ব্রহ্ম।

অহংত্যাগের অবস্থা কত সুন্দর একবার দেখ দেখি। অনবরত সুখ আসুক বা দুঃখ আসুক—হর্ষও নাই, গ্লানিও নাই, ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই, হেয়ও নাই, উপাদেয়ও নাই, দেহের প্রতি অহংমমতা নাই—কাহারও দেহের প্রতি নাই, রাগও নাই, দ্বেষও নাই অথচ সকলের উপর ব্যবহারদৃষ্টি সমান—আত্মা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু তাহাতেই অনাস্থা করিয়াও ব্যবহারপরায়ণ হওয়া কেমন শান্ত অবস্থা বল ?

এইরূপ অভ্যাস কর শান্ত হইলে নতুবা নহে।

বাসনাত্যাগ।

মানুষ এত যে দুঃখী, এত যে অশান্ত—কেন এত অশান্তি ? তৃষ্ণাই মানুষের অশান্তি। বাসনাই জীবের অশান্তি। বহুতৃষ্ণা যাঁহার সে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী—সে অধম। এক তৃষ্ণা যার সে মধ্যম, ইহারও দুঃখ আছে। যাহার তৃষ্ণা নাই সেই উত্তম। ইঁহার দুঃখ আদৌ নাই।

তৃষ্ণা নাই, বাসনা নাই—এটা কি এক জড়ের অবস্থা ? এটা কে চায় ?

কিন্তু যাঁহারা জানেন তাঁহারা বাসনাত্যাগের অবস্থা কত সুন্দর বলেন ? অনবরত সুখ আসুক বা দুঃখ আসুক হর্ষও নাই, গ্লানিও নাই। যেমন আকাশের তলে বিবাহের সমারোহও হইতেছে, রাজ্যাভিষেকের উৎসবও চলিতেছে, আবার ঘোরতর মারামারি কাটা-কাটিও চলিতেছে, আকাশ কিন্তু পরম শান্ত ভাবে আছে। মেঘের কড়কড়, বিদ্যুতের ঝলক, বায়ুর হুঙ্কার কতই আকাশগাত্রে হইতেছে, আকাশ কিন্তু যাহা তাহাই আছে। ঠিক সমান ভাবে সকলের ভিতরে বাহিরে থাকিয়া সকলকে অবকাশ দিতেছে—শান্তি দিতেছে। এই অবস্থা বড় সুন্দর! কোন ইচ্ছাও নাই, কোন অনিচ্ছাও নাই। "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ"। যখন বায়ু নড়ায় না তখন স্থির, যখন নড়ায় তখন নড়ে।

যখন কেহ কোন কাজ করিতে বলে না তখন আত্মানন্দে সমাধি, আবার যখন কেহ কার্য্য করিতে বলে তবে অনবরত কার্য্য। আবার কার্য্য বিরামেই পরম শান্তি, পরম সুখ। এইরূপ হেয়ও নাই, উপাদেয়ও নাই, রাগও নাই দ্বেষও নাই, দেহের প্রতি অহংও নাই, সমতাও নাই, নিজের দেহের প্রতি নাই, কাহারও দেহের প্রতি নাই, আত্মা ব্যতিরিক্ত যাহা তাহাতেই এই সব কেবল আত্মা লইয়া থাকা—আত্মানন্দে থাকিয়া ব্যবহারপরায়ণ হওয়া বড় সুখের অবস্থা এই বাসনা বা তৃষ্ণা ক্ষয়।

তৃষ্ণাক্ষয় মানুষে করে না কেন, বাসনা ক্ষয় করে না কেন? মানুষ সর্ব্বদা অহংকার রাখে তাই। অহংকার ত্যাগ করে না তাই তৃষ্ণা যায় না, বাসনা যায় না।

অহংত্যাগ করিলে আর থাকিল কি?

রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে যখন অন্যমনস্ক হওয়া যায় তখন দেহটা পড়িয়া যায়, কারণ তখন দেহে অহংটা ক্ষণকালের জন্য ভুল হইয়াছিল বলিয়া। দেহে অহং না রাখিলে ত দেহই থাকিবে না। একটা কাষ্ঠদণ্ড বা চামড়া-ঢাকা হাড়ের ঘর কি রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে?

অহংও থাকিবে না অথচ জীবন থাকিবে ইহা কি হয়?

বৃন্দাবনের শৃগাল হইয়া থাকাও ভাল তথাপি অহংত্যাগ করিয়া থাকা ভাল নয়।

বৃন্দাবনের শৃগাল হইতে সাধ যায় তাহা হওনা, তাতে আপত্তি নাই, অনন্তকাল কি হয়েচে কি হয়েচে কর, কিন্তু অহংত্যাগ করাটা কি সেটা ত বুঝ।

দেহে অহংত্যাগ করিতে ভক্ত বলেন, আর জ্ঞানীও বলেন। শৃগাল হইবার কোন প্রয়োজন নাই—ক্ষুদ্র অহংটাকে প্রকৃত স্বরূপে লইয়া যাও। ব্যষ্টি অহং হইয়া দুঃখী হইয়াছিলে, সমষ্টি অহং হইয়া সুখী হইয়া যাও। রাজাকে রাজার পদবী দাও, রাজাকে আইয়ে

জমাদার সাহেব বলিয়া খাতির করিয়া মনে ভাবিওনা—রাজা ভারি 'দরওয়াজা' দিয়া দিলে। শ্রীকৃষ্ণের অহংটি যে সহস্র শীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাৎ—সেটি যে সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। তুমি অতি খণ্ড অহংকে সেই প্রায় অখণ্ড অহংএ মিশাও। পরিচ্ছিন্নকে অপরিছিন্নের চিন্তা করাইয়া, অপরিচ্ছিন্নের কাছে থাক না? এ তোমার আপনার, এ তোমার পর, এ বোধ কর কেন? সব আপনার করনা কেন? কেহই আর পর নাই। প্রকৃতি হইয়া পুরুষ ভজনা কেন? অথবা প্রকৃতি পুরুষে মিশিয়া শক্তি শক্তিমানে এক হইয়া যখন ইচ্ছা সমাধিসুখে থাক আবার এক হইয়াও স্বতন্ত্র হইয়া খেলা করনা কেন? ইহাই অহংত্যাগ।

দেহে অহং রাখ দুঃখী হইলে। প্রকৃতিতে অহং রাখ—রাখিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের অঙ্গ ভাব। সর্ব্বত্র আপন সত্তা দেখিয়া, সর্ব্বত্র আপনাকে আপনি আস্বাদন করিয়া সুখী হও, আবার সমস্ত মায়িক ব্যাপার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি বা শক্তিকে শক্তিমানে মিশাইয়া শুধু আনন্দস্বরূপে সমাধিমগ্ন থাকনা কেন? ইহাও অহংত্যাগ বটে। ইহা পূর্ণ সুখের অবস্থা। এক হইয়া ও সকল শক্তি আয়ত্তাধীন রাখিয়া পৃথক্ ভাবে খেলা কর, জ্ঞানী হইয়াও ভক্ত হওয়া আরও সুখ।

এই ভাবে অহংত্যাগ করিয়া সুখী হও। ইহাই তৃষ্ণাত্যাগ বা বাসনা ত্যাগ।

এই বাসনাত্যাগ দুই প্রকার (১) ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ, (২) জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ।

(১) ধ্যেয় বাসনাত্যাগ—

আমি দেহ ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদির সংঘাত বা সমষ্টি; এই সংঘাত বা সমষ্টি আমার, ইহা পান ভোজনাদি দ্বারা নিষ্পন্ন এবং এই সকল পদার্থ আমার জীবন, সেই জন্য আমি. এসকল ব্যতীত কোন কিছুই করিতে পারি না এবং এসকলও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এই বুদ্ধি কত দূর সত্য বা অসত্য বিচার কর। দেখিবে সংঘাত

ভাবটি অসত্য। সংঘাতটি তুমি নও। চিৎস্বরূপটি তুমি—যে চিৎ-স্বরূপ আছে বলিয়া হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ মন বুদ্ধি একত্র আছে—ভিন্ন শক্তি হইয়াও মিলিয়া রহিয়াছে—সেই চিৎরূপটিই তুমি। কাজেই এসকল আমি নহি, এসকল আমারও নহে—এই ধারণা দৃঢ় কর। সংঘাত সমষ্টি দেহটি আমি নই, ইহারাও আমার নহে—এইটির দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা অহংত্যাগ কর। এই অহংত্যাগকে ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ বলে। ইহা চিৎএর ধ্যান দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহা ধ্যেয়।

(২) জ্ঞেয় বাসনাত্যাগ হইবে তখন যখন দেহ আমি নই, মন আমি নই, জড় আমি নই ছাড়িয়া সর্ব্বত্রই চিৎরূপে লক্ষ্য পড়িবে—পড়িয়া সমস্তই চিৎ, সমস্তই ব্রহ্ম। বৃক্ষ বৃক্ষ নহে তুমি, আকাশ আকাশ নহে তুমি, জল জল নহে তুমি, পক্ষী পক্ষী নহে তুমি, তুমি তুমি করিতে করিতে সর্ব্বত্র তুমিই দেখিবে, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বা চিৎ বা চেতন্যসত্তা দেখিয়া দেখিয়া সব তুমিময় হইয়া যাইবে, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম হইয়া যাইবে, শেষে আমি যাহা দেখিতেছিলাম তাহাও তুমি হইয়া যাইবে—তখন জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ হইবে। জ্ঞানের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহা জ্ঞেয়।

অহংকারময়ী বাসনা এইরূপে ত্যাগ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দেহাদি ব্যবহারে অবস্থিতি কর। তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

অধিক আর কি, এখন সাধনাদি নিত্যক্রিয়ার সঙ্গে ইহার অভ্যাসে লাগিয়া যাও, ক্রমে কর্ম্ম আর থাকিবে না। সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ হইয়া পরমানন্দ পাইবে। যিনি চিৎরূপ অধিষ্ঠানচৈতন্য তাঁহারই নাম সর্ব্বদা জপ কর। সর্ব্বদার কার্য্যটি ভুলিও না।

রজ্জু-সর্প।

শাস্ত্র বলেন—যদ্জ্ঞানাজ্জগৎ ভাতি রজ্জু-সর্পস্রগাদিবৎ।

যজ্জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি সুমস্তাং ভুবনেশ্বরীং॥

বলা হইল—যাহার অজ্ঞানে জগৎ ভাসে। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বুঝা গেল না কাহার অজ্ঞানে? কে ইনি? কাহাকে জানা হয় নাই বলিয়া এই জগৎ ভাসিয়াছে? কাহাকে চিনিতে পারিলে, জানিতে পারিলে এই জগৎ থাকে না? উত্তর হইল—সুমস্তাং ভুবনেশ্বরীং। তিনিই শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী। এস তাঁহাকে আমরা স্তব করি। ইহাতেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা গেল না। ভুবনের যতটুকু বুঝি, জন্মাবধি তাহাই বুঝিয়া আসিয়াছি। নামরূপ লইয়াই "আমার" ভুবন। আমি ত নামরূপের সহিতই চিরপরিচিত। ইহারাই আমার বন্ধু বান্ধব, ইহারাই আমার স্ত্রী পুত্র, ইহারাই আমার পিতা মাতা, ইহারাই আমার সংসার পরিজন, ইহারাই আমার নিত্য ব্যবহারের জিনিষ। ইহাদিগকে আমি চিনি—ভাল করিয়া চিনি, কিন্তু ভুবনেশ্বরী কে? তাঁহাকে ত কখনও দেখি নাই, তবে কেমন করিয়া তাঁহার পূজা বা স্তব করিব? যাঁহাকে দেখি নাই, যাঁহার কথা ভাবি নাই, যাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক করি নাই তাঁহাকে কেমন করিয়া ভালবাসিব? স্তুতি তাঁহারই হয়,—যাঁহাকে আমি ভালবাসি, যাঁহার নামরূপে, যাঁহার ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে আমি গলিয়া যাই। তাই যাহাকে দেখিলাম না, যাঁহার কথা ভাবিলাম না, যাঁহার নামরূপে মজিলাম না, কেমন করিয়া তাঁহার স্তব করিব,—তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিব? স্তব করিতে আমার অনিচ্ছা নাই বরং ইচ্ছাই আছে, কিন্তু আগে বুঝাইয়া দেও—তিনি কে? কাহাকে তুমি ভুবনেশ্বরী বলিতেছ? উত্তর হইল—রজ্জু-সর্পস্রগাদিবৎ; রজ্জু পড়িয়া আছে—তুমি সর্প ভাবিয়া দেখিলে, রজ্জু দেখা হইল না, দেখা হইল

সর্প। ফল হইল ভয়। সর্পকল্পনা একাকিনী রহিল না। একে একে আরও কল্পনা আসিয়া জুটিল। দ্বিতীয় কল্পনা দেখাইলেন ফণা, তৃতীয়—ফোঁস ফোঁস, চতুর্থ—দংশন, পঞ্চম—পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কি কুক্ষণেই তুমি সর্পকল্পনা করিয়াছিলে যে, তাহার ফলই হইল তোমার মৃত্যু। জগতে যত মৃত্যু হইতেছে সর্ব্বত্র একই কারণ এই ভ্রান্তিকল্পনা। যাহার যেমন ভাবনা, তাহার তদ্রূপ ফল "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। নচেৎ এক অমৃতস্বরূপ মহাপুরুষ রহিয়াছেন; তাঁহাকে তুমি পঞ্চভূত বলিতেছ। কি কুক্ষণেই তোমার এই সাঙ্ঘাতিক ভূতাবেশ ঘটিল যে ঔষধেও (শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্র) তোমার অরুচি হইল; ফলে বিকার (বিকৃতি) আসিল। এই রোগের বিকারে তুমি রজ্জুতে সর্পকল্পনার মত পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব কত কি কল্পনা করিয়া তাহারই স্বপ্নসুখে রহিলে। অবশেষে এই বিকার তোমাকে মৃত্যু শয্যায় আনিয়া ফেলিল—তোমার মৃত্যু হইল। তোমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল বটে কিন্তু তোমার কল্পনা সমষ্টি, পুঞ্জীভূত সংস্কার তোমার কর্ম্মানুযায়ী আর একটী ভোগায়তন দেহ তোমার জন্য সৃষ্টি করিয়া দিল। এইরূপে তোমার কতবার জন্ম, কতবার যে মৃত্যু হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি স্বেদজ, উদ্ভিজ, অণ্ডজ সব যোনি ভ্রমণ করিয়াছ। চৌরাশি লক্ষ যোনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সেই জন্মে দুঃসহ কষ্টপরম্পরা সহিয়া সহিয়া অবশেষে পুনঃ পুনঃ মরিয়া মরিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মের পর জন্ম লাভ করিতেছ।

বুঝিলাম, কিন্তু আর একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আমি তোমাকে তত্ত্বতঃ চিনিতে পারি নাই। ভাবিতেছিলাম তুমি এই জগৎ মায়াজাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছ; এবং যে রজ্জুতে সর্প দেখে সেও যেমন রজ্জু লইয়া থাকে, তেমনই আমিও এই তোমাকে লইয়াই আছি; কেবল জগৎরূপে এই পার্থক্য, কারণ সর্পের যে অস্তিত্ব সেত রজ্জুর উপরেই।

হাঁ, তাহাই কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল বিপরীত। জ্ঞানী দেখেন

"এক ভুবনেশ্বরী আমিই আছি"। তাই তিনি ভুবনেশ্বরী দর্শনের ফলে আনন্দে গলিয়া যান আর তুমি জগৎ দর্শনের ফলে দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়। তুমি কোন্ ফল চাও—আনন্দ না দুঃখ? আনন্দ—তবে জগদ্ভাবে দেখিও না; এই ভুলজগৎ মুছিয়া ফেলিয়া শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর স্বরূপ আঁক—আর জননমরণ-স্রোতে ভাসিতে হইবে না।

শ্রীগুরুদাস।

রাম-বশিষ্ঠ সংবাদ।

(১)

সমচিত্ততা।

ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি এতক্ষণ এই যে বাক্‌জাল বিস্তার করিলাম, ইহা দ্বারা তুমি তোমার চিত্ত-বিহঙ্গকে ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিয়া দাও। আমার উপদেশ মত চলিও, তবে কুপথে যাইতে পারিবে না। যদি কুপথে যাও, তবে পর্ব্বতগর্ত্ত-পতিত মহাগজের ন্যায় তোমার পতন চিরপতন হইবে। আর উঠিতে পারিবে না।

আমার উপদেশের মর্ম্ম যদি বুঝিয়া থাক, তবে কালনিয়মে লোক-ব্যবহার যেমন যেমন তোমার উপরে পড়িবে তাহা তৎক্ষণাৎ সানন্দ-চিত্তে সম্পাদন করিবে।

আমার উপদেশের সার এই ঃ—

১। সুখ দুঃখ, শুভ বা অশুভ যাহাই আসুক কিছুতেই কণামাত্র আসক্তি রাখিবে না। কাল মরিতে হইবে জানিয়া তাহাতে আসক্তি রাখিবে না। তাহা হইলেই ব্যাকুল হইবে না।

২। আমার উপদেশ যাহা শুনিলে—সমস্ত সময়ে উহার ভাবনা কর। রাত্রিতে স্বপ্নে যদি উপলব্ধি কর তবে অনন্ত ফল লাভ করিবে।

(২)

সংসার-উদ্ধার ও রামতত্ত্ব।

সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আসক্তি ত্যাগ কর। আসক্তি ত্যাগের সহজ উপায় সংসারে যাহা দেখ তাহাতেই সমান আসক্তি করিয়া ফেল। হেয় উপাদেয় নাই, শত্রু মিত্র নাই, সুন্দর কুৎসিত নাই, বিষ্ঠা চন্দন নাই—সবই সমান।

এই যে জগৎ—ভাবিয়া দেখ ইহার আদি অন্ত দুইই দেখা যায় না। ইহা এত বিস্তৃত যে কোন দিকেরই ইয়ত্তা ইহার নাই। অনাদি কাল হইতে এমনি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইটি ধারণা কর তবে সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতে পারিবে। ইহারই নাম ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং।

আবার দেখ এই যে সাংসারিক সম্পদ, এই যে ভোগ্য বস্তু-পরম্পরা, এই যে কালনিয়মে ধারাবাহিক পাঞ্চভৌতিক অবস্থাভেদ, এই যে ইহার ভোগ, এই যে স্মৃতি, এই যে উপভুক্তের দুঃখময় স্মরণ, এই যে বলবতী পাইবার বাসনা—ইহারাও সেই ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত। এই অপার অজ্ঞান বিলসিতকে অতিক্রম করিতে হইলে "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, সকল প্রাণীতে, তৃণসমূহে, এমন কি শূন্যময় আকাশেও সেই এক ব্রহ্মই দাঁড়াইয়া আছেন। সমস্তই ব্রহ্ম দ্বারা আচ্ছাদিত ইহা ভাবনা করিতে হইবে।

ভাবিতে হইবে এই সংসারে, এই বিশাল প্রপঞ্চে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ভাবিতে হইবে এ সংসারে যাহাকে উপেক্ষা করিতেছি, যাহাকে ঘৃণা করিতেছি, যাহাকে উপাদেয় ভাবিতেছি, যাহাকে বন্ধু ভাবিতেছি, যাহাকে সম্পদ বলিতেছি, শরীর বলিতেছি—সে সমস্তই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হে রাম! জীবের অজ্ঞান প্রতিফলিত এই সকল ভ্রান্তিপূর্ণ

কল্পনা! কতক্ষণ ইহা থাকে, না—যতক্ষণ তাহাদের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাবনা না হয়।

জীব যতক্ষণ এই জগৎপ্রপঞ্চকে সুন্দর জগৎপ্রপঞ্চ দেখে আর মোহিত হয়, যতক্ষণ এই পরিদৃশ্যমান শরীরে অহংতা মমতা থাকে, যতক্ষণ এই সংসারে আমার বলিয়া মিথ্যা বোধ থাকে, ততক্ষণই জীবের চিত্তভ্রান্তি। সম্যক্ জ্ঞানোদয় কখন হয়, না—যখন সর্ব্ববস্তুতে সমান দৃষ্টি হইয়া যায়, যখন সমস্তই ব্রহ্মভাবনায় ভাবিত হইয়া যায়। ইহা হইলেই অলীক 'আমি আমার' দূর হয়, অলীক আসক্তি দূর হয়, অলীক রাগ দ্বেষ থাকেনা, অলীক সংসারের অলীক ভাবনা থাকেনা।

ফলকথা—যাহার মন বিষয়ভোগে উদাসীন তাহারই আসক্তি নাই বলা যায়।

চিত্তটাই একটা ভ্রম। ইহার যে কল্পনা—যাহার নাম চিত্তস্পন্দন কল্পনা—যাহার নাম ভিতর বাহিরের সংসার। যাহার মন বিষয় ভোগে উদাসীন সেই ব্যক্তিই চিরবন্ধনকর বাসনাপাশ কাটিতে পারিয়া নির্ম্মল স্নিগ্ধ সুখে সুখী। তাহারই ভ্রান্তিময় চিত্তাদি বিনষ্ট হয়। সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবে সর্ব্ববস্তুকে যিনি আচ্ছাদিত ভাবেন, তাঁহারই ভ্রান্তিময় চিত্তের পরিবর্ত্তে জ্ঞানময় চিত্তের বিকাশ হয়।

ভ্রান্তিময় চিত্ত ও জ্ঞানময় চিত্ত—ইহাদের পার্থক্য বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ। যতক্ষণ আসক্তি থাকে, যতক্ষণ হেয় উপাদেয় থাকে, যতক্ষণ আমি আমার থাকে ততক্ষণ ভ্রান্তিময় চিত্ত থাকে, আর যখন সংসারের সকল বস্তু ব্রহ্মভাবনায় আচ্ছাদিত হইয়া যায়, জ্ঞানে না হউক বিশ্বাসেও জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায় তখনই জ্ঞানময় চিত্তের বিকাশ হয়।

ভ্রমময় চিত্ত নাশ হইলে এমন এক তেজোময়ের উদয় হয় যাহা এই তেজস্বী সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী।

ভ্রমময় চিত্ত যখন দূর হয় তখন জ্ঞানময় চিত্তের প্রকাশ হয়। ইহাই

চিত্তের সত্ত্ব। চিত্তের সত্ত্বটিই ব্রহ্ম তাঁহারই উপরে ভ্রমময় চিত্তের জগৎ-বিলাস।

ভ্রমময় চিত্ত যাঁহাদের গিয়াছে তাঁহারা সংসারে সবই করেন কিন্তু সর্ব্বদাই সেই পরম জ্যোতিঃ দেখিতে থাকেন।

তবেই দেখ সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে চিত্তকে সত্ত্বরূপে পরিণত কর। যে চিত্ত বিবেকোদয়ে নির্ম্মল, সেই চিত্তের নাম সত্ত্ব। অজ্ঞানীর অন্তঃকরণকে বলে চিত্ত। আমার চিত্ত, আমার পুত্র, আমার পরিজন এই সব আসক্তিই এই চিত্তের মূল। সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বরভাবে আচ্ছাদিত দেখিতে অভ্যাস কর, তবেই জ্ঞানময় চিত্তের উদয় হইবে—সংসার হইতে উদ্ধার হইবে।

আর এক কথা। চিত্তের বিনাশে জগতের নাশ কিরূপে হইবে?

যিনি ব্রহ্ম তিনিই জগৎ। এই জগৎ ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নহে। জগৎ ও ব্রহ্ম দুই বস্তু নহে। জ্ঞানময় উজ্জ্বল চিত্ত আর ব্রহ্ম যেমন এক, জগৎ ও ব্রহ্মও সেইরূপ এক। তবে যে জগতের সত্তা দেখি তাহা কি? অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিত্তেই এই ত্রিভুবনের সত্তা।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিত্ত যতক্ষণ জগৎ ততক্ষণ—এই চিত্তের নাশই জগতের নাশ। তুমি যাহাকে হস্তপদাদিবিশিষ্ট শরীরী ভাবিতেছ, সে তুমিও অজ্ঞানাচ্ছন্ন চিত্তের বিকার। দুঃখ করিও না। যদি এই সংসারকে জ্ঞানময় চিৎস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পার, তখন দেখিবে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে।

বিচার কর, করিয়া বুঝ এক অখণ্ড জ্ঞানরাশিই এই পরিদৃশ্যমান ভ্রমময় জগতের মূলে দাঁড়াইয়া আছেন। যাহার অনুভব নাই তাহার অস্তিত্ব নাই। তুমি আমি কতটুকু অনুভব করি? যতটুকু করি ততটুকুর অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে আছে বলি। যাহার অনুভব হয় না, যতক্ষণ হয় না ততক্ষণ তাহা আমার মধ্যে নাই বলিয়া থাকি।

জগতের সমস্ত বস্তু তুমি আমি অনুভব করি না তবুও যে বলি জগৎ আছে—কেমন করিয়া ইহা বলি? না—এই চৈতন্যময় পুরুষের

অনুভবে এই চিত্তস্পন্দন-কল্পনা সর্ব্বদা আছে। তিনি নাশ করিলেই ইহা নাই। কাজেই চিত্তের স্পন্দনটা না দেখিয়া যে চৈতন্য হইতে এই স্পন্দন উঠিতেছে সেই চৈতন্যকে সর্ব্বত্র দেখিতে চেষ্টা কর। যাহা দেখ তাহাতেই খোঁজ তুমি কোথায়? বিচার ঠিক করিয়া দৃঢ় ভাবনা কর সমস্তই "ঈশাবাস্য" তোমার চিত্ত জ্ঞানময় হইয়া যাইবে।

তাই বলিতেছি রাম! তুমি ভিন্ন আর সংসারে কিছুই নাই। যাহা দেখি, যাহা না দেখি সবই তুমি। এই যে বৃক্ষ, লতা, গো, মনুষ্য প্রভৃতি মিথ্যা ব্যবচ্ছিন্ন সাঙ্কেতিক পদার্থ তাহা তুমি নহ, তাহারাও তোমার নহে। ইহাদের মূলের অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থটি তুমি।

হে রাম! ব্রহ্ম অতিরিক্ত তুমি কিছুই নহ। তুমিই সেই ব্রহ্ম। অতএব হে চিদ্‌ঘনস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। আমি বশিষ্ঠ গুরু, তুমি রাম শিষ্য—তথাপি তোমাকে নমস্কার। হে জগন্ময়! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার।

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্তত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া॥

রাম! তুমিই জগৎ সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রক্ষার জন্য দেবতা, মানুষ, তির্য্যগ্ প্রাণীর দেহ ধারণ করিয়াছ। এই সমস্ত দেহ—সহস্রশীর্ষ পুরুষ তুমি—ইহারা তোমারই দেহ। কিন্তু তুমি দেহগুণে লিপ্ত নও। অখিলজনমোহকরী মায়াও তোমার নিকট ভয় পান।

(৩)

চৈতন্য ভাবনায় দুঃখ নাশ।

সমুদ্রে কতই না তরঙ্গ উঠে। তরঙ্গ ত জলময় জলধির জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ জ্ঞানময় নিশ্চল চিত্তসত্বায় ভ্রমময় চঞ্চল কতই না চিত্তস্পন্দন-কল্পনা উঠে—সেই সমস্ত কল্পনা, সেই সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ—জ্ঞানময় চৈতন্য পুরুষ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

কাজেই সর্ব্বত্রই সেই পরমপুরুষ শান্তভাবে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, এ ভাবনা করায় বাধা কি? তবে এই যে চঞ্চল তরঙ্গমালা, এই যে নিত্যপরিবর্ত্তনশীল সংসারাড়ম্বর—ইহা কোন এক মায়িক ব্যাপার, এই ভাবনা করিয়া "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, সমস্ত চিত্তস্পন্দন-কল্পনা, সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ অনাস্থা করায় বাধা কি? সমস্তই মায়িক, একমাত্র তুমিই সত্য, তোমার নামই সত্য; কূটস্থ জ্যোতিতে তোমার নাম লিখিয়া,—সেই জ্যোতিকেই ব্রহ্মজ্যোতি মনে ভাবিয়া শাম্ভবী মুদ্রায় সর্ব্বদা ঐ জ্যোতি ভাবনা করাই ধ্যান অভ্যাস।

পথে চলিতেছ—সম্মুখে চারি হস্ত পরিমিত স্থানে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পথ হাঁটিতে হয়—ইহা বিধি। কেন বিধি? ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখা অভ্যাস ইহাতে হয়, এবং এত সহজে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বাহিরে আর ছুটিতে পারে না। প্রথমে ইন্দ্রিয়জয় অভ্যাস যিনি না করেন, তাঁহার অন্য সাধনা কিরূপে হইবে? চক্ষুকে অন্যরূপ না দেখাইয়া কূটস্থ মধ্যে ধারণা করিতে যিনি অভ্যাস করিলেন, তাঁহার অন্য অন্য ইন্দ্রিয় শ্রোত্রাদি কত শীঘ্র স্ববশে আসিয়া গেল। করিয়া দেখিলে কত সহজেই সকলে ইহা সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে পারেন। মনকে যদি সর্ব্বদা এইরূপ কার্য্য দেওয়া যায় তবে ইহা আর বিষয়চিন্তা করে কিরূপে?

ভিতরে ব্রহ্মজ্যোতিতে ধারণা, ধ্যান যখন অভ্যাস হইয়া গেল, তখন ঐ বিন্দুধ্যান, যাহা কিছু দেখিবে—তাহাতেই ছড়াইয়া পড়িবে। যাহা দেখিবে, তাহাতেই এক অপূর্ব্ব জ্যোতি স্থূল দৃশ্যপ্রপঞ্চের ভিতরে রহিয়াছে ভাবনা হইবে, ক্রমে এই ভাবনা দূর হইলে সর্ব্বত্র সেই চৈতন্য পুরুষ আছেন, ইহার ভাবনা হইতে থাকিবে। এইরূপে ভ্রমময় চিত্ত নষ্ট হইয়া গিয়া চিত্ত জ্ঞানময় হইয়া যাইবে। করিয়া দেখিলে ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া অনুভূত হইবে।

সমস্তই তুমি—তুমি অভ্যস্ত হইয়া গেলে এই দেহও তুমি, এই আমিও তুমি, সবই তুমি, তুমি ভিন্ন কিছুই নাই। এইরূপে "আমি"

আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আরোহণ—একাগ্র হইতে নিরোধ ভাবে আগমন।

বল দেখি চিত্তই যদি জ্ঞানময় হইয়া প্রশান্ত হইয়া যায়, সমুদ্র যদি একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প হয়, তবে আর তরঙ্গ কোথায় থাকে?

সংসারই তরঙ্গ। প্রশান্ত চিত্তে সংসার নাই। প্রশান্ত মহা-সাগরের তরঙ্গ নাই। আহা, তাহা বড়ই সুন্দর! রাম! তুমিই সেই আকাশের মত প্রশান্ত চিৎসমুদ্র।

আমাদের এই যে অনুভবকারিণী শক্তি? এই শক্তি কাহার? ইহা চিত্তেরই। যখন আমি ছাড়া সংসার নাই, তখন চিত্তের অনুভূত বিষয় সমস্তও আমি। অসংখ্য অগণিত জীব—যাহা দেখি, যাহা শুনি—সবই আমি। সংসারে চিত্তই সব। চিত্তের প্রতি লক্ষ্য কর, সবই লক্ষিত হইবে, জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে, চিত্ত জ্ঞানময় দেখিয়া ধন্য হইবে।

(৪)

আমি চেতন এ অনুভব কার?

চিত্তের প্রতি লক্ষ্য কর। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার বস্তু। অনুভব শক্তিটি কি? ইহা চিত্তেরই শক্তি। জ্ঞানময় চিত্তটিই চৈতন্য-সমুদ্র। ভ্রমময় চিত্তটি দুঃখসমুদ্র বা সংসার। আমি চেতন, আমি সংসার নহি, জড় নহি।

যদি বল চেতন হইলেও আমি বিন্দু মাত্র। আমি জীব, ব্রহ্ম শিব। ইহা বল তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। তথাপি আমি দেহ এই অভিমান ত ত্যাগ কর। আমি চেতন এই অভিমান কর, তবে তুমি জড়ের ধর্ম্ম যে সুখ দুঃখাদি তাহা হইতে মুক্ত হইয়া চৈতন্যের ধর্ম্ম যে আনন্দ তাহাতে রহিলে। আমি চেতন ইহা সর্ব্বদা দেখিলে, সর্ব্বত্র চেতনই

দেখিবে। তখন বিন্দু সিন্ধু হইয়া যাইবে। সর্ব্বদা দৃঢ় ভাবনা কর আমি চেতন, জড় নহি। এই চৈতন্যটুকু যদি না থাকে, তবে সংসার কোথায়? তবে আমি ছাড়া সংসার নাই।

আমি বা অহংটি যখন চৈতন্যে আরোপ হয়, যদি অহংচৈতন্য এই ভাবনা সর্ব্বদা হয়, তখন আমি আনন্দপথে – কল্যাণপথে—মুক্তিপথে। আবার "অহং"টি যেই জড়ে আরোপ হয়, তখন আমি পাপপথে—দুঃখ-পথে—নরক-পথে।

এই অহংটি মিথ্যা। কল্পনা বা জড় বা প্রকৃতি বা শক্তি যাহাই কেন হউক না—এটি যখন চৈতন্য হইতে পৃথক্‌হইয়া চৈতন্যের সান্নিধ্য লাভ করে, তখন এই প্রকৃতি জড় হইয়াও কর্ম্ম করে, জড়েরও চলন হয়। যে চলন জড়ের স্বভাব নহে, তাহা পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ চুম্বকের লৌহকে চঞ্চল করার মত হইতে থাকে। ইহা প্রথম আরোপ। আবার প্রকৃতি যে কর্ম্ম করে, সেই সমস্ত কর্ম্ম চৈতন্যে আরোপ হয়। চৈতন্যই যেন বলেন—আমি বলিতেছি, আমি ফিরিতেছি, আমি কথা কহিতেছি ইত্যাদি কর্ম্মগুলি অকর্ত্তা যে চৈতন্য তাহাতে আরোপ হয় মাত্র। জড়েরও চলন নাই কারণ ইহা জড়। চৈতন্যেরও চলন নাই কারণ ইহা পূর্ণ। চৈতন্য কিন্তু চক্ষুষ্মান্, আর জড় অন্ধ। অন্ধ যখন খঞ্জের উপর চড়িয়া বসেন, তখন চলন ব্যাপারটা হয়। ইহাই অন্ধ-খঞ্জ ন্যায়। মিথ্যা অহংতা হইতে জগতের এত দুঃখ।

আমি চৈতন্য এই অভিমান করিলেও চৈতন্য যে অপরিচ্ছিন্ন ইহা বোধ হইবে কিরূপে? আমি যে ব্যাপক, ইহা বুঝিব কিরূপে?

আমি চেতন, যাহা দেখিতেছি সর্ব্বত্রই যখন চেতনই দেখিব, তখন দুইটি খণ্ড আলোক মিশ্রিত হইলে যেমন বড় আলোক হইয়া যায়, সেইরূপ সর্ব্বত্র চেতন অনুভব হইলে শেষে এক অখণ্ড চৈতন্যই অনুভূত হইয়া যাইবে।

আমি চেতন—এই অনুভবটি করে কে?

যে আমি জড়ের সঙ্গে মিশিয়া, দেহে আত্মাভিমান করিয়া দেহের সুখ দুঃখকে আমার সুখ দুঃখ বলিয়া বলিতেছিল, সেই প্রবৃত্তিমার্গের অহংটিই অনুভব করিতে লাগিল অহংচৈতন্য।

আমি চেতন এই অনুভবটি অহংএর। চেতন, চেতনই আছেন, জড়, জড়ই আছেন। অহংটি কখন জড়ে অভিমান করিয়া বলে অহং-দেহ—আবার চৈতন্যে অভিমান করিয়া কখন অনুভব করে আমি চেতন। তবে আমি ও অহং এক বস্তুই হইল। চৈতন্য আপন স্বরূপে যখন থাকেন, তখন অহং নাই। কাজেই আমিও নাই। দুই না থাকিলে অহং বোধও হয় না। জড় ও চেতন অথবা শক্তি ও শক্তিমান্ ইহাদের সান্নিধ্য ঘটিলে দ্বৈত বোধ, তখন অহং উৎপত্তি। কেবল চৈতন্য যখন তখন অহং নাই।

কেবল চৈতন্য অবস্থা লাভ করাই জ্ঞান। কেবল চৈতন্যই জ্ঞানময় চিত্ত।

জ্ঞান হইলে জ্ঞানী কি রূপ দেখেন না? তাঁহার কি মনের ক্রিয়া হয় না? সে সবই করে, তার সবই হয়। কিন্তু জ্ঞান কোন ক্রিয়াকে উপাদেয় বোধ করেন না, আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন না, তাই সে দর্শনাদিতে জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব নাই।

নানা বস্তুময় সংসারে এক দেখিব কিরূপে? যাহাই কেন দেখ না কোথায় দেখিতেছ, কোথায় অনুভব করিতেছ ভাবনা কর। দেখিবে—দেখা, শুনা, সুখ, দুঃখ অনুভব করা সমস্তই চিত্তে হইতেছে। বাহিরের যাহা কিছু তাহার অনুভব হইতেছে তাহাও চিত্তে। তবেই বাহির হইতে ভিতরে সহজেই আসিতে পারে।

চিত্তের মধ্যে রূপাদির অনুভব হয়। চিত্তের মধ্যে কিন্তু ভাবনা ভিন্ন কিছু থাকে না। ভাবনা অনেক বলিয়া বিষয়ও অনেক বোধ হয়। এক ভাবনা করিতে অভ্যাস কর, বহু বিষয় লোপ হইয়া যাইবে। যেমন দৃশ্যমান এই আকাশকে খণ্ড খণ্ড বস্তু মধ্যস্থিত দেখিয়া বহু আকাশ-

খণ্ড বোধ হয়, সেইরূপ ভাবনাকে বহু বিষয়স্থিত দেখিলে বহু আকারে দেখায়, কিন্তু আকাশ যেমন এক, ভাবনাও সেইরূপ এক। এই একই ব্রহ্ম। এক দর্শন হইলেই সম্যক্ দর্শন হয়। আমি চেতন এই অনুভব সর্ব্বত্র হইলেই সম্যক্ দর্শন হইল—ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি।

আত্ম-ভাবনা।

গঙ্গা একটি, ঘাট অনেক। অনেক ঘাট দিয়া এক গঙ্গাতেই স্নান হয়। স্নান করাই উদ্দেশ্য, ঘাট লইয়া বিতণ্ডা কিছু নয়। যাহার যে ঘাটে সুবিধা তাহার সেই ঘাটেই স্নান করা উচিত। নতুবা বৃথা সময় নষ্ট।

প্রধান প্রধান কয়েকটি পন্থা বলা হইতেছে।

(১) অর্হতগণ বলেন আচারবান্ হও—সব পাইবে।

(২) বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন—ইন্দ্রিয় জয় কর, করিয়া বুদ্ধি বা বিচার দ্বারা পরম পুরুষে প্রবেশ কর, সর্ব্ব উপদ্রব শান্তি হইবে।

(৩) বেদান্তবাদিগণ বলেন—জগৎ ব্রহ্মই। শম ও দম সাধনা ভিন্ন দুঃখ দূর হইবে না।

(৪) কপিল মতাবলম্বী বলেন মন দ্বারা আত্মার নির্ম্মলতা সাধন কর। মনের শক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির ক্ষমতা নাই।

(৫) ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন দৃঢ় ভাবনা কর যাহা চাও পাইবে। যে প্রকারে যাহা দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা সেইরূপেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আমরা ভাবনার কথাই বলিতেছি।

যাহারা ভূত নাঁবায়—প্রেত-আত্মা আহ্বান করে তাহারা কোন পরিচিত মৃত ব্যক্তি কিরূপ ভাবে কথা কহিত, খেলা করিত, বেড়াইত, কার্য্য করিত, বসিত, শুইত এইগুলি ভাবিতে থাকে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত

দৃঢ় ভাবনা করিলে প্রেত আত্মার আবির্ভাব তাহারা জানিতে পারে। বহুলোকে আজকাল ইহা প্রত্যক্ষ করেন।

যাঁহারা ভগবান্‌কে চান তাঁহারা যাঁহার ভক্ত সেই ঠাকুরের লীলা চিন্তা করেন। তিনি বাল্যকালে পিতামাতার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেন, এইরূপে তিনি রাক্ষস দৈত্য বিনাশ করিয়াছেন—এইরূপে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল-বিবাহ হইবার পরে তিনি এই এই কার্য্য করিয়াছেন—নিত্য এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে ভগবানের দর্শন মিলে।

যাঁহারা নিত্যরাজ্যে সর্ব্বদা বিহার করিতে চাহেন, তাঁহারা কল্পদ্রুমমূলে মণিমণ্ডপে ইষ্ট দেবতাকে সমস্ত আবরণ দেবতার সহিত ভাবনা করেন—সেখানে সমস্ত প্রিয় ব্যক্তি আছেন, সমস্ত সাধু আছেন, সমস্ত পূজনীয় গুরুস্থানীয়েরা আছেন, যাঁহাদের উপরে ভক্তি প্রীতি ভালবাসা ছিল সকলেই আছেন—সেই রমণীয় স্থানে সমস্ত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, সমস্ত সৌন্দর্য্য আছে, যাহা কিছু রমণীয় দর্শন সকলই আছে—সাধক প্রত্যহ দৃঢ় ভাবনা করেন আমি সেই রাজ্যে প্রিয় জনের সহিত প্রিয় জনের পূজা করিতেছি, সেবা করিতেছি, ধ্যান করিতেছি।

সেখানে বহুমূর্ত্তি আছে সত্য কিন্তু সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটি ভাব। নাম ও রূপে একজনই বহু সাজিয়াছেন এইজন্য সেখানে অপ্রিয় কিছুই নাই, অসুন্দর কিছুই নাই।

এই দৃঢ় ভাবনা করিতে পারিলেই ধারণাভ্যাস পূর্ণ হইল তখন নিশ্চয়ই ঐ লোকে স্থিতি হইবে।

আর এক প্রকার দৃঢ় ভাবনা আছে যদ্দারা নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হয়, এই জন্মেই হয়, এই দেহেই হয়। এইটি আত্ম ভাবনা।

ভগবানই আত্মা। মনই প্রকৃতি। কীট যেমন অগ্নিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে, মন সর্ব্বদাই আপন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কারানলে পড়িয়া

ছটফট করিতেছে, শান্তিভাব কিছুতেই নাই। চিন্তানলে মন সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতেছে। লোক সঙ্গে যখন থাকে তখন কত কথাই সে কয়। ভোলা মন বোঝে না যে, বহু কথা কহিয়া সে আপনার চিতা আপনি সজ্জা করে। আবার যখন একা থাকে কেহই নিকটে নাই তবুও সে কথা কয়। কার সহিত কথা কয়? সংস্কারের সহিত। ভূতের মত গত কর্ম্মসংস্কার ইহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না।

মন যখন বিকারপ্রাপ্ত হয়; বুদ্ধি তখন ঐ মনের সহিত যুক্ত হয়। কুবুদ্ধি ঐ বিকারী মনকে কু পরামর্শ দিয়াই উহাকে আরও অধঃপ্রদেশে প্রেরণ করে।

আবার যখন ভাগ্যবশে বুদ্ধি শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে উজ্জ্বলা হয়, তখন এ অধঃপতিত মনকে সর্ব্বদা উপদেশ করে। শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি উপদেশ দিয়া এবং সাধনা করাইয়া কুসংস্কারাবিষ্ট মনকে তখন প্রকৃত ভাবে অনুতপ্ত করে। তুমি সৎশাস্ত্র পড়, অভ্যাস কর—তোমার বুদ্ধিও শাস্ত্রোজ্জ্বলা হইয়া তোমার অবিচারী মনকে প্রবুদ্ধ করিবে।

মন একবার বৈরাগ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিলে ইহা সুন্দর আকার ধারণ করে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী নিজের ব্যভিচার বুঝিতে পারিলে যেমন কাতরা স্বামীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে—সে শত প্রকারে আপনাকে অপরাধিনী দেখিয়া স্বামীর রূপ ও স্বামীর গুণ বড় উজ্জ্বল চক্ষে দেখিতে থাকে। মনের অবস্থাও বৈরাগ্য সহায়ে তাই হয়।

এই সময়েও মন আপনার সহিত আপনি কথা কয়। অপর লোককে ডাকিয়া যেমন কথা কওয়া হয়, মনকে ডাকিয়া সেইরূপ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কহিতে হয়। এই ভাবনা মন যখন অভ্যাস করিয়া করিয়া ইহাকে দৃঢ় ভাবনায় পরিণত করে, তখন ইহা দ্বারাই ইহার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। আমরা এই আত্মভাবনার কথাই বলিতেছি।

দুষ্টা স্ত্রী স্বামীকে যেমন বিষয়াসক্ত করে সেইরূপ যে কুবুদ্ধি এক দিন মনকে বিষয়ভোগের উপদেশ দিত আজ সেই বুদ্ধি শাস্ত্রোজ্জ্বলা

হইয়া সতী স্ত্রীর মত স্বামীকে বিষয়াসক্তি ত্যাগের উপদেশ করিতে লাগিল। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিলেই হইল; প্রথমে বিষয়ত্যাগেরও ত প্রয়োজন নাই। যেমন প্রথম অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ প্রথম অবস্থায় আসক্তি ত্যাগ করাই উচিত, বিষয়ত্যাগ আপনা হইতে হইয়া যায়। পরে ব্যবহারমত কার্য্য চলে।

বিষয়-জর্জ্জরিত মন কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না; এই মনকে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি বিচার করিতে বলিল—

"দেখ দেখি কে তোমার আপনার? দেখ দেখি কে তোমার আত্মীয়? কাহার জন্য তুমি ভাবনা করিতেছ? কত লোককে ত আপনার বলিয়াছিলে, কোথায় তাহারা বল? মধু থাকিলে পিপীলিকা জুটে, কিন্তু যখন মধু নাই তখন তাহারা কোথায়? স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতামাতা! বল আজ তোমার আত্মীয়বর্গ কোথায়?

দেহ এবং মন ও তোমার আত্মীয়? বল এই আত্মীয় কাহার চিরদিন ছিল যে তোমার ইহারা থাকিবে? বল কাহার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছ?

এতদিন দেহের জন্য কত ব্যস্ত হইয়াছ—কত সাবধান হইয়াছ, কত প্রকারে ইহাকে আহার দিয়াছ—কত প্রকারে স্নান দানাদি করাইয়াছ—কতপ্রকার করিয়া ইহাকে শৌচ করাইয়াছ এত করিয়াওত শরীরকে এইরূপ ভাল রাখিয়াছ? এখন একবার ইহার উপর মনোযোগ ত্যাগ করনা! শাস্ত্রমত প্রাতরুত্থান, পরিমিত সাত্ত্বিক বস্তু আহার—আধপেটা করিয়া খাওয়া—ইহাই দিন কতক আচরণ করিয়া দেখনা? ইহাই প্রধান কথা নহে, শাস্ত্রমত জপ আহ্নিক ত্রিসন্ধ্যায় নিয়ম করিয়া করনা? করিয়া দেখ কি হয়?

আর এক কথা—যেমন যেমন বিচার করিবে—কে তোমার আত্মীয়, সেইরূপ ভাল করিয়া দেখ কিসে তোমার ইষ্ট হয়, কি সে তোমার অনিষ্ট হয়?

ভোগে ইষ্ট আর তপঃক্লেশই অনিষ্ট এই ত তোমার ধারণা ছিল, এখন ইহা উল্টাইয়া লও। ভোগে অনিষ্ট এবং তপস্থায় ইষ্ট ইহাই ভাবনা করিতে থাক। যাহাতে ইষ্ট হয় ভাবিয়া ছিলে তাহাতেই অনিষ্ট ভাবনা কর আর যাহাতে অনিষ্ট হয় ভাবিয়াছিলে তাহাতেই ইষ্ট ভাবনা কর। লোকজন বন্ধু-বান্ধব সকলের সম্বন্ধেই ইষ্টে অনিষ্ট ও অনিষ্টে ইষ্ট দৃঢ় ভাবনা কর। করিয়া দেখ কিছুদিন পরে তুমি তপস্থা করিতে সমর্থ হইবে তখন ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই ত্যাগ হইয়া যাইবে আর তুমি সমদর্শী হইয়া যাইবে। ইষ্টে অনিষ্ট চিন্তা এবং অনিষ্টে ইষ্ট চিন্তা ইহাই প্রকৃত সমদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায়।

আপনাকে প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার নিত্য অভ্যাসই যথেষ্ট, তাহার পরে প্রকৃত আত্ম-ভাবনা।

(২)

আজকাল জনক রাজার অভাব নাই। "লোক ঘর ঘর জনক বন্ গয়া" একজন মুন্সী ইহা বলিয়াছিলেন। ঘরে ঘরে সব জনক বনিয়া গিয়াছে। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে সবাই শিখিয়াছে। বেশ মুখরোচক আহারটুকু আছে, আহারের পরে বেশ ইন্দ্রিয়রোচক নিদ্রা টুকুও আছে—'খাসা' মনরোচক রাগটুকুও আছে কিন্তু বলিবার যো নাই—সব অনাসক্ত হইয়া করিতেছি। কিন্তু জনক রাজা যে অনাসক্ত হইয়া সংসার করিয়াছিলেন তাঁহাকে ত প্রথমে অনেক ব্যাপার করিতে হইয়াছিল। কোন এক সময়ে রাজা জনক কোন এক নির্জ্জন গিরি-শৃঙ্গে মনোহর কুঞ্জরাজির মধ্যে একা বনবিহারসুখ অনুভব করিতে ছিলেন। সিদ্ধপুরুষেরা উন্নত গিরির গুহায় বিচরণ করিতে ভাল-বাসেন। জনক রাজা যখন একান্তে তখন তিনি আকাশ ফলপাতবৎ সিদ্ধগণের আত্মভাবনাময় গীতি শ্রবণ করিলেন। তাহা শুনিয়া অবধি তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন—সর্ব্বদা একাকী থাকিতেন আর বিচার করিতেন—আত্মভাবনা করিতেন। আত্মভাবনা করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল। জ্ঞানের পরে

নিষ্কামভাবে সংসার করা ত অনিচ্ছার ইচ্ছায় কার্য্য করা বা পরেচ্ছায় কার্য্য করা, তাঁহার তাহাতে বাধে নাই! কিন্তু তুমি আমি ঢং করিয়া অনাসক্তি দেখাইয়া সংসার করিতে গেলে হইবে কেন? জ্ঞান নাই শুধু মুখের বুলিতে অনাসক্তি আসিবে কিরূপে? আর যদি কাহারও সত্য সত্য মনে হয় অনাসক্তি আসিয়াছে, তিনি একবার ভাল করিয়া দেখুন—রাজা জনকের মত তিনি কয়দিন আত্ম-ভাবনা করিয়াছেন?

৩

জনক রাজার সৎসঙ্গ হইল সিদ্ধগীতি। সিদ্ধদিগের আত্মভাবনা শ্রবণ করিয়া জনক রাজার একবারে আত্মভাবনা আসিল না-- প্রথমেই আসিল বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্য যাহার অভ্যস্ত হয় নাই তাহার কোন-কালে ভক্তি বা জ্ঞান আসিবে না। মর্কট বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য নহে, প্রকৃত বৈরাগ্য আসা চাই।

গীতি শুনিয়া রণধ্বনি শ্রবণে ভীরুর হৃদয়ের ন্যায় মহারাজ জনকের হৃদয় বিষাদ-রসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা গৃহে আসিয়া পরিবার-বর্গের সঙ্গ করিতে পারিলেন না। একাকী উচ্চ প্রাসাদের নির্জ্জন গৃহে উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষের ন্যায় অতি চঞ্চল সংসারগতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায় কি কষ্ট! কেন আমি এই অত্যন্ত ক্লেশকর সংসারে পাষাণে পাষাণের মত লুন্ঠিত হইতেছি! কাল অনন্ত—কিন্তু আমার জীবন কতটুকু সময়ের জন্য? এই অল্পকালের জন্য আমি সংসারে এত আসক্ত? ধিক্ আমাকে! আমার এই রাজ্য কয়দিনের জন্য? জীবনই বা কয়দিনের জন্য? কত পুত্র কন্যা মরিতেছে আর মূর্খ পিতামাতাকে বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে বলিয়া যাইতেছে। হায়! দেহ বা রাজ্য নষ্ট হইবে—এই ভাবনায় মূঢ়বুদ্ধির মত আমি দুঃখ পাইতেছি! এইমাত্র শুনিলাম—পূর্ব্বেও কতবার শাস্ত্রে শুনিয়াছি আত্মা অবিনাশী আর দেহটাই বিনশ্বর। কিন্তু কি ভ্রম! আমি তুচ্ছ দেহে আত্মজ্ঞান করিয়া চিত্রিত চন্দ্র দেখিয়া যথার্থ চন্দ্র জ্ঞান করিয়াছি

আর উল্লাসে আত্মহারা হইয়াছি। এক ঐন্দ্রজালিক আমার স্কন্ধে সংসার ইন্দ্রজাল চাপাইয়া দিয়াছে। ছি ছি! আমি ঐন্দ্রজালিকের মোহে মোহিত হইলাম? ছি ছি! একবার দেখিলাম না কে এই ঐন্দ্রজালিক?

তুমি নিজে নিষ্প্রপঞ্চ—কিন্তু সর্ব্বদাই তুমি প্রপঞ্চ রচনা-চতুর। আর না প্রভু—আমি ইন্দ্রজাল বুঝিতেছি। যাহা সৎ তাহা লইয়াই থাকিব! এই যে আত্মার কথা শুনিয়া আসিলাম—সর্ব্বদা সুখময়, সর্ব্বদা আনন্দময়, যাঁহাতে সংসার দুঃখ নাই, পরের অধীনতা নাই, আধি ব্যাধি নাই জরা মরণ নাই—হায় সেই পরম রমণীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া আমার বুদ্ধি অসৎ দেহ, অসৎ সংসার রক্ষার জন্য লালায়িত। ধিক্ আমাকে! আমার প্রিয় বস্তুত আমার মনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি বাহ্য বিষয়ের ভাবনা করিয়া আত্মভাবনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছি। এই আমি বাহ্য বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিলাম—শিব যেমন সংসার ভাবনা ত্যাগ করিয়া শ্মশানে গিয়া দগ্ধ সংসারকে ভস্ম করিয়া গায়ে মাখিয়া শবরূপে পড়িয়া থাকিয়া আপন বক্ষের উপর শিবার নৃত্য দেখেন, আমিও সেইরূপ দৃঢ়ভাবে যাহার উপরে আমার হৃদয়ে মন নাচিতেছে—সেই মনের সত্তাসহিত মনকেই দেখিতে থাকিব, আমি দ্রষ্টাভাবে নিরন্তর অবস্থান করিব, এই ত আমি দ্রষ্টা। এই ত সেই চোর। আমি আজ আত্মাপহারীকে দেখিতে পাইয়াছি। এই চোরের নাম মন। এই মন আমার চিরদিন সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! সকলেই দেখিতেছে সংসার কিরূপ অসার তথাপি কেহ ইহাকে ছাড়িতেছে না।

হায়! জলের আবর্ত্তের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক জীবগণের বৃথা অর্থান্বেষণে প্রবৃত্তি—হা অর্থান্বেষণ! হা উপার্জ্জন চেষ্টা!—এ চেষ্টা আদিতে ও অন্তে দুঃখেরই কারণ। লোকে ইহা জানিতেছে তথাপি চেতনা হইতেছে না। চাকুরী বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কতই কৌশল করে!

রে মোহহত মদীয় মানস! সব দেখিতেছ তথাপি জাগতিক

মহত্ত্বের উপর তোমার বিশ্বাস! জাগতিক উন্নতির উপর তোমার আস্থা! আহা! রজ্জু নাই অথচ আমি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। কোন পাপ করিলাম না অথচ আমি জগতে কলঙ্কিত হইলাম, সকলের উপরে উঠিয়াও পতিত হইলাম? হায়! আমি আমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করি অথচ এই বিষম মোহ কোথা হইতে আসিল?

কি অপূর্ব্ব মোহ! শত শত লক্ষ লক্ষ ইন্দ্র বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমি কিন্তু আমার জীবন কিসে চিরস্থায়ী হইবে তাহারই উপায়ে আস্থা করিতেছি। কোটী কোটী ব্রহ্মা কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, অনন্ত স্বর্গ ধ্বংস পাইয়াছে, ধূলির ন্যায় সহস্র সহস্র প্রতাপশালী নরপতি শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। অহো! আমার এই জীবনে এত প্রীতি কেন? এই সংসার রাত্রি? এখানে নিবিড় মোহবশে দেহরূপ স্বপ্ন দেখিয়া এই যে অবিবেকিতা করিয়াছি ইহা কতই নিন্দনীয়।

কোন্ কাপালিকের ছলনায় পড়িয়া মহেশমূর্ত্তিকে পদতলে ফেলিয়াছি—শালগ্রামকে খেলার কন্দুক করিয়াছি! রে আসক্তি! কেন আমার উপর তোমার এই নৃত্য। কতদিন গেল—যাইতেছে ও যাইবে, কৈ একদিনও সেই রমণীয় দর্শনকে দেখিলাম কৈ? দেখিবার চেষ্টা করিলাম কৈ? আমার চিত্তে ত বিচিত্র ভোগবিলাসই নৃত্য করিতেছে; আমি ত তাহাই দেখিতেছি। এ জগতে ক্রমশই কষ্ট হইতে কষ্টতর অবস্থা উপস্থিত হইতেছে—দুঃখ হইতে ভয়ানক দুঃখই ক্রমশঃ অনুভব হইতেছে—হায়! এই দুঃখময় সংসারের উপর বৈরাগ্য আসিল কৈ? আমি অধমাশয়! আমাকে ধিক্!

যে যে রমণীয় বস্তুর প্রতি অনুরাগ লাগিয়াছিল দেখিতেছি একে একে সকলই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। আয়ুর মধ্যাবস্থাই রমণীয়, বিষয়ের বর্ত্তমান অবস্থাই রমণীয় আর ধর্ম্মের পরিণামই রমণীয়।

মানব বাল্যে অজ্ঞানে উপহত থাকে, যৌবনে মদনতাপে তাপিত

হয়, বৃদ্ধে কলত্রচিন্তায় ব্যাকুল হয়—কোন্ সময়ে আর হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?

আজ আমার সম্পদকে বিপদ বলিয়া বোধ হইতেছে, বিপদকে সম্পদ বোধ হইতেছে—আজ যাহাকে দেখিয়া আমার এইরূপ হইতেছে আমি এক্ষণে সেই পরমানন্দ সাধন আত্মার আশ্রিত হই।

রাজা জনক বহুদিন ধরিয়া এইরূপ বিচার অভ্যাস করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার জ্ঞান আসিয়াছিল।

রাজর্ষি জনক ইন্দ্রিয় সংজ্ঞক রিপুগণকে বারম্বার পরাজয় করতঃ স্বয়ং পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার আত্মা আপনাতে আপনি প্রসন্ন হইয়াছিল। সর্ব্বব্যাপী দেবাদিদেব আত্মা স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া প্রকাশিত না হইলে কি কখন জীবের ভববন্ধন যায়? সংসারভীত ব্যক্তির নিজ চেষ্টা ব্যতীত শ্রীভগবান্ আত্মাকে কিছুতেই প্রসন্ন করা যায় না। এখানে অদৃষ্ট কিছুই করিতে পারে না। কর না এই বিচার? করিয়া জনক রাজা হইয়া যাও।

রাজা জনক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন—প্রতীহারী সংবাদ দিল—মহারাজ! স্নান ভোজনের সময় হইয়াছে। মূর্ত্তিমতী নদী-দেবতার ন্যায় রমণীগণ জলকুম্ভ লইয়া স্নান ভূমিতে অপেক্ষা করিতেছে, আপনার দেবপূজা গৃহ সুসজ্জিত। অঘমর্ষণ জাপী ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা করিতেছেন—আপনি আপনার দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করুন। প্রধান ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কাল অতিক্রম করে না। প্রতীহারী চলিয়া গেল। রাজা পূর্ব্ববৎ সংসার রচনা চিন্তা করিতে লাগিলেন:—

দেহসুখ, রাজসুখ তুচ্ছ, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ক্ষণভঙ্গুর তাহা লইয়া কি হইবে? যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিয়া একান্তেই থাকি। অসৎ ভোগজালে আমার প্রয়োজন কি? সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য বা আনন্দেই অবস্থান করি।

"রে চিত্ত! পুনর্জ্জন্ম, জরা, জড়তা দূর করিতে ইচ্ছা থাকে ত এই ভোগাভ্যাসের কুসম্ভ্রমের চতুরতা ত্যাগ কর। রে চিত্ত! যে অবস্থায়

তুই কৌতুক পাইবি তাহাই তোর দুঃখ। ভোগদ্রব্যে তোর কখন রুচি কখন অরুচি—ইহাই তোর স্বভাব। কিন্তু এইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বারা কখন চিত্তের তৃপ্তি হইবে না। এই তুচ্ছ ভোগচিন্তায় আর প্রয়োজন নাই। যাহার অনুসরণে অকৃত্রিম তৃপ্তি তাহারই অনুগামী হও।

রাজা তূষ্ণীম্ভাবে থাকিলেন। চিত্তের চঞ্চলতা আর নাই। রাজা চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ। কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। রাজা আবার মানবের কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন।

এই জগতে উপাদেয়ই বা কি, অবিনশ্বরই বা কি যাহার জন্য মানুষ চেষ্টা করিবে? এক্ষণে আমার কর্ম্মের আবশ্যক নাই, নিষ্কর্ম্মা হইবারও আবশ্যক নাই। কর্ম্ম মাত্রই নশ্বর। নশ্বরে আমার কোন্ প্রয়োজন? তবে মিথ্যাভাবে উৎপন্ন আমার এই দেহ—এই দেহ কর্ম্ম করুক বা না করুক আত্মচৈতন্য স্বরূপ যে আমি আমার তাহাতে ক্ষতি কি? আমি অপ্রাপ্ত বস্তুর গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা করি না, প্রাপ্ত বস্তুর ত্যাগেরও আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি আত্মভাবে থাকি ইহাতে যাহা হয় হউক। কর্ম্ম করা বা ত্যাগ করা উভয়ই সমান। চিরক্রমাগত উপস্থিত কার্য্য এই দেহ করুক। আমি 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ'। ক্রিয়াহীন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হইলেই যে উত্তম ফল হয় তাহা নহে। মন যদি নিষ্কাম ও বাসনা সম্পর্ক শূন্য হইয়া সমভাবে অবস্থান করে তাহা হইলেই শরীরের স্পন্দন ও নিস্পন্দভাব উভয়ই সমান।

কর্ম্মফলেই মনের কর্ত্তৃত্ব এবং মনই ভোক্তা। কর্ম্মের মূল দৃঢ়ভাবে মনেই সংবদ্ধ। আমার মন ব্রহ্মপথ ধরিয়াছে। আমি এক্ষণে কর্ম্ম বা কর্ম্মের মূলীভূত আন্তরিক চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়াছি।

সূর্য্য যেমন অনাসক্ত ভাবে দিবারাত্রি সম্পাদন করেন রাজর্ষি জনকের কার্য্যও সেইরূপ হইল। ইষ্ট অনিষ্ট বাসনা আর নাই। দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া ধ্যানযোগে একাকী রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। আবার রাত্রিশেষে চিত্তকে বুঝাইতে লাগিলেন—

রে চিত্ত! সংসার তোর স্বীয় সুখের জন্য নহে। শান্ত হও।

যতই মনে মনে তুই কল্পনা জল্পনা করিবি ততই তোর সংসার বাড়িয়া যাইবে। যেরূপ জলসেকে বৃক্ষ বাড়ে সেইরূপ ভোগাভিলাষে শত শত দুঃখ বাড়িবে। জন্ম বল, সংসার বল—কেবল চিন্তার লীলা মাত্র। মন! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হও। হে সুন্দর চিত্ত! তোমার চিন্তা সংসারের ন্যায় চঞ্চল। চঞ্চল চিন্তা ও চঞ্চল সংসার তুলনা কর—করিয়া যদি সার পাও, ভজনা কর। সংসারে আস্থা শূন্য হও—চিন্তাতেও আস্থা শূন্য হও।

সংসারের কোন বস্তু অভিলাষ বশে ত্যাগ বা গ্রহণ করিও না—শুধু স্বচ্ছন্দে বিহার কর। দৃশ্য সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তোমার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই ইহার দোষ গুণে তুমি ব্যস্ত হইও না। চিত্ত! তুমিও অসত্য সংসারও অসত্য। সংসারবাসনা ত্যাগ করিয়া শান্ত পরমানন্দে অবস্থান কর। ধৈর্য্য অবলম্বন কর—চপলতা ত্যাগ কর। অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য অভ্যাস ও অবিরত বিবেকানুসন্ধানের ইহাই পথ।

—•—

উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, ফাল্গুন। { ১১ সংখ্যা।

শ্রীগুরু।

ভরসা হে নাথ, তব ও চরণতরি,
ভীমভবার্ণবে প্রভু, তুমি হে কাণ্ডারী।
কত যে তুফান তুলি তরঙ্গে
প্রকৃতি দেখায় রঙ্গ, বিভঙ্গে;
বারে বারে সখা, চাহি তব মুখ পানে;
তুমি অমৃত দানি যে জীয়ালে পরাণে।
রিপু-দলিত শমন-তাড়িত,
আহা! সদা মরণ-ভয়ে ভীত;
এ ভেলা বাঁধিনু তব অভয় চরণে।
মৃত্যু-সংসার পারে লহ দীন সন্তানে॥

২৫৩৭

ডুব দেনা মন কালী ব'লে।

রে মন! একবার কালী ব'লে ডুব দাও। শ্রীগুরু মৃদু অঙ্গুলী-সঙ্কেতে ঐ বলিয়া দিতেছেন—হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে কালী ব'লে ডুব দাও! স্রোতের জলে শেওলার মত আর ভাসিয়া বেড়াইও না।

চেষ্টা ত করি কিন্তু পারি না যে।

কেন পারনা তাহা একবার ভাল করিয়া বোঝ। বুঝিয়া নিজের ত্রুটীগুলি সংশোধন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর। "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ। যত্ন করিলে, যদি সিদ্ধিলাভ না হয় তবে আর দোষ কি? এই উক্তি কাপুরুষের। যিনি পুরুষ, তিনি অর্থ করিবেন—যত্ন করিলে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তবে "অত্র কঃ দোষঃ অস্তি" ঐ যত্ন বিধিমত করা হয় নাই, উহাতে কোন প্রকার দোষ নিশ্চিতই আছে। কথাটা অবসাদগ্রস্ত প্রাণে অত্যন্ত কঠোর ভাবে লাগিবে। উপায় ত আর নাই! তাই কাপুরুষের মত শুধু বিষাদ-গীতি গাহিলে আর কি হইবে?

হৃদি-রত্নাকরে সত্য সত্যই অগাধ জল। মন! তুমি নামরূপের চশমা পরিয়া দেখিতেছ, তাই শুধুই লয় বিক্ষেপের তরঙ্গমালা তোমার চ'ক্ষে পড়ে। অসীম, অতলস্পর্শী হৃদি-রত্নাকরকে তুমি "আমার" বলিয়া এক বেষ্টনী দিয়াছ, তাই তোমার সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত ভোগায়তন দেহে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত হৃদয়-সাগর এবং উহাতে 'হাঁটু' জল। বৃথা বিলাপ ক্রন্দন ছাড়িয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য মত কর্ম্ম করিয়া যাও, ফলাফল শ্রীজগদম্বার হাতে।

মন! তুমি যে ডুবিতে পারনা তার কারণ অনেক। তোমার আহার-শুদ্ধি নাই। গাভীগুলি সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য দেখিলেই যেমন জিহ্বা বাহির করিয়া অবাধে উহা গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করে, তুমিও সেইরূপ "প্রাপ্তি মাত্রেণ ভোক্তব্যং ন তু কাল বিচারণা" নীতি অনুসরণ করিয়া খাদ্য দ্রব্য পাইবা মাত্র বিনা বিচারে উহা উদরস্থ কর;

ফলে সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারক খাদ্য তোমার খাওয়া হয় না, যাহা আহার কর তাহাতে রজঃ ও তম গুণই বৃদ্ধি করে। রজঃ ও তমের প্রসাদে তুমি ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছ; নিতান্ত হাল্‌কা হইয়া গিয়াছ। হাল্‌কা জিনিষ কি জলে ডোবে? তবে তুমি হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুবিবে কিরূপে?

তোমার আচারশুদ্ধি নাই। তুমি নিজের সুবিধামত শাস্ত্রবিধিসঙ্গত আচারকে মনগড়া করিয়া লইয়াছ। এইরূপ পাটোয়ারী বুদ্ধির কাজ করিলে চলিবেনা। মনে পড়ে কি সেই স্মরণীয় ঘটনা? সেই যে তোমার দুঃখময় জীবনের মাহেন্দ্র ক্ষণ—যখন শ্রীগুরুর কৃপা লাভ করিয়া তুমি তাঁহার চরণপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়াছিলে—সেই যে গলদশ্রুলোচনে করযোড়ে বলিয়াছিলে—

ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়ামৃত্যু মহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥

হে দেব! আজ আপনার কৃপায় আমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতকৃত্য, মায়ামৃত্যু-মহাপাশ হইতে বিমুক্ত এবং মৃত্যুঞ্জয় শিব; কারণ মায়ামৃত্যু-পাশ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র কৌশল আপনি দয়া করিয়া আমাকে শিখাইয়া দিলেন। আর তিনি কত আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন—

উত্তিষ্ঠ, বৎস! মুক্তোঽসি সম্যক্ আচারবান্ ভব।
কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥

বৎস! উঠ, মুক্ত হও, সম্যক্ আচারবান্ হও। কীর্ত্তি, শ্রী, কান্তি, পুত্র, আয়ু, বল ও আরোগ্য প্রভৃতি সর্ব্বদা তোমার লাভ হউক। হায় দুর্ভাগ্য! মন্ত্রগুলি তুমি দ্রুত সন্তরণে পার হইয়া গিয়াছিলে, উহার নিম্নেই যে কত অমূল্য রত্ন ছড়ান ছিল, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। অতীত ঘটনা স্মৃতিপথে আনিয়া পুনরায় মনন কর। শ্রীগুরুদেবের প্রথম আদেশ উত্তিষ্ঠ, দ্বিতীয় মুক্তোঽসি, তৃতীয় সম্যক্ আচারবান্ ভব। শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন:—

ততঃ প্রভৃতি কুর্ব্বীত গুরোঃ প্রিয়মনন্যধীঃ।
শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ॥

দীক্ষা লাভের দিন হইতেই শরীর, অর্থ ও প্রাণ অর্থাৎ নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই শ্রীগুরুর চরণে সমর্পণ করিয়া অনন্য মনে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবে।

কৈ তাঁহার প্রীতির জন্য ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া সিংহাধিক পরাক্রমে স্বকর্ম্মসাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলে কৈ, ? মুক্তিলাভের জন্য তেমন দৃঢ় অধ্যবসায় কৈ ? সম্যক্ আচারবান্ হইবার জন্য তেমন অদম্য চেষ্টা কৈ ? তোমার যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় দর্শনে যে তাহার কত আনন্দ, তাহা ত বুঝিলে না। মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরবৃন্দ পদ্মের নিকটে আসিলে, পদ্ম তাহার বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং আকণ্ঠ মধুপান করিয়া ভ্রমরবৃন্দ আনন্দে বিভোর হয়। এ আনন্দ স্থূলে। আর পদ্ম! পদ্ম আপন মধু বিলাইয়া -আত্মদান করিয়াই তৃপ্ত। এ তৃপ্তি, এ আনন্দ স্থূলে নয় এ আনন্দ সূক্ষ্মে। ইহা স্থূল চক্ষে দেখা যায় না। সেই তৃপ্তি, সেই আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ তিনি যে বড় আদর করিয়া বলিয়াছিলেন— "আবয়োস্তুল্য ফলদো ভবতু"। তিনি যে তোমাকে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। তুমি গুরুনামের ডঙ্কা বাজাইয়া হেলায় মায়ামৃত্যুপাশ অতিক্রম করিয়া যাও।

তাই বলা হইতেছিল, তুমি যে ডুবিতে পারনা ইহার কারণ অনেক। বাহিরে যে পরিমাণে তুমি শুচি হইবে, ভিতরে হৃদয়-রত্নাকরের জলও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। তুমি ডুব দাও। আর ডুবুরীরা যেরূপ ভারী প্রস্তর কোমরে বাঁধিয়া জলে ডুব দেয়, তুমিও সেইরূপ কালী, কৃষ্ণ, শিব অর্থাৎ তোমার কুলমন্ত্র—তোমার ইষ্টদেবতার নাম সঙ্গে লইয়া, নামের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে ডুব দাও, তবেই তুমি অধিকক্ষণ ডুব দিয়া থাকিতে পারিবে। দুই চারিবার ডুব দিয়া যদি কোন ভাব-রত্ন তোমার লাভ না হয়, তবুও হতাশ

হইও না। "তুমি দম্ সামর্থ্যে একডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে"। প্রাণায়াম করিতে করিতে কুম্ভকে অধিকক্ষণ থাকিতে চেষ্টা কর, ভাব-রত্ন আপনিই আসিবে। এই সময় শ্রীগুরুর উপদেশ ভাল করিয়া মনন কর। নাম এবং রূপ লইয়া তুমি সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, নাম ও রূপ এক হইয়া হইল শুধুই জ্যোতিঃ। তারপর জ্যোতিঃ হইল তত্ত্ব। এইস্থানে শ্রীগুরুর উপদেশ অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে থাক। এই যে শব্দরাশি, এই যে রূপ-রাশি ইহাদের স্বরূপ কি? শ্রীগুরু জানাইয়া দিয়াছেন—এক শব শিব মহাপুরুষ শুইয়া আছেন, তাঁহার উপর মহাকাল—এই মহাকালের বক্ষে মহাকালীর নৃত্য। লীলাময়ী মায়ের এই লীলা-নৃত্যের স্পন্দন হইতেই নিখিল শব্দরাশি উৎপন্ন। যখনই কোন শব্দরাশি তোমার অনুভূতিতে আইসে, তখনই ঐ শব্দের তত্ত্বময়ী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দাও। যে পরিমাণে তুমি এই তত্ত্বের সঙ্গে সুপরিচিত হইতে পারিবে, সেই পরিমাণে মায়ের নৃত্যস্পন্দনের বিকৃত পরিণতি—বাহিরের এই শব্দরাশি তোমার অনুভূতিতে আসিবে না, সেই পরিমাণে তুমি "তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী" হইয়া যাইবে।

এই যে ভূতগ্রাম, ইহাদের স্বরূপ কি? সেই তত্ত্বময়ীর—চৈতন্য-ময়ীর—চিন্ময়ীর—আনন্দময়ীর রূপজ্যোতিঃ কারণ হইতে সূক্ষ্মে ইন্দ্রিয়-গ্রামের মধ্য দিয়া স্থূলে আসিয়া এই ভূতগ্রাম সাজিয়াছে। ভূতগ্রাম তোমার অনুভূতিতে আসিবা মাত্র তুমি হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়া ভূতগ্রামের স্বরূপ চৈতন্যময়ীর নিকটে যাইতে চেষ্টা কর।

যে পরিমাণে এই তত্ত্বের আলোচনা তোমার অভ্যাসের বস্তু হইয়া যাইবে, সেই পরিমাণে উঁহা তোমার অপরোক্ষানুভূতিতে পরিপক্বতা লাভ করিবে। তাই ঘটি, বাটি, ছাতা, লাঠি, নস্যির কৌটা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের মত হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে নামের সঙ্গে অর্থ ভাবনা করিতে করিতে ডুব দেওয়া নিত্য অভ্যাসের কার্য্য করিয়া লও। শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণের মত শ্রীগুরু-মুখ-শ্রুত

তত্ত্বগুলি নিত্য একান্তে জীবন্ত সাধনায় নিজস্ব করিয়া লও। মন! এই পর্য্যন্তই তোমার কর্ত্তব্য—অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য। তার পর তোমার আর কর্ত্তব্য নাই, তখন যাঁর কাজ তিনিই করাইয়া লইবেন। এই ভূমিকায় স্থিতিলাভ করিলে বলিতে ইচ্ছা হইবে—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। ইহার পূর্ব্বে যদি বলিতে প্রয়াস কর তবে উহা তোমার ধৃষ্টতা, আত্মপ্রতারণা।

এই তত্ত্বের পরেই পরম তত্ত্ব। উহার বিশ্লেষণ আর হয় না। ঐখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। মন! ঐখানে গেলেই তোমার মহানির্ব্বাণ বা নিত্যস্থিতি। উহার বিশ্লেষণে জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন—

"মনোনিবৃত্তি পরমোপশান্তি সা কাশাকাহং নিজবোধরূপা"। উহা নিজবোধরূপ।

বুঝিলাম—তোমার চরণে শত শত প্রণাম। "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং।" আমি তোমার শরণাগত। শাস্তিপ্রদানে কিম্বা যেরূপেই হউক তোমার মনের মতন করিয়া আমাকে গড়িয়া লও। আমার পরম কল্যাণের নিমিত্ত তুমি যে সকল উপদেশ দিয়াছ উহা আমি যেরূপ বুঝিলাম, তোমাকে তাহাই নিবেদন করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা আমাকে ছুঁইয়া আছ ইহা অনুভব করিয়া সাধনার প্রতি পদবিক্ষেপে যেন তোমার প্রেরণা অনুভব করিতে পারি।

বলা হইল ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থা কাটাইবার জন্য শাস্ত্রবিধিগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানগুলি ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্নভোজনের মত, তৃষিত ব্যক্তির জলপানের মত ঐকান্তিকতার সহিত করিতে হইবে। উহা করিতে করিতে যে মুহূর্ত্তে সরসতা জাগিবে, তখনই হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে নামের সহিত নামীর অর্থ ভাবনা করিতে করিতে ডুব দিতে হইবে। এই অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে, শুধুই ডুব দিতে ইচ্ছা হইবে। পুনঃ পুনঃ ডুব দিতে দিতে তত্ত্বের সহিত সুপরিচিত হইলে আর ডুব দেওয়া, না

দেওয়া থাকিবে না—থাকিবে শুধুই তত্ত্ব। তখন আমি আমার কারণস্বরূপে থাকিতে পারিব—তখন আমিই তত্ত্ব।

তারপর আমার স্পন্দন যখন একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে—তখন আমি শক্তি, শক্তিমানে মিশিয়া যাইব। তখন থাকিবে কেবল এক ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীগুরু॥

উত্তম! আমি ত তোমার সঙ্গেই আছি। যাহা বুঝিয়াছ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। এই মুহূর্ত্ত হইতেই কর। "অদ্যৈব কুরু যঃ শ্রেয়ঃ বৃদ্ধ সন্ কিং করিষ্যসি।" যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াছ তাহা পাইবার জন্য এই মুহূর্ত্ত হইতেই চেষ্টা কর, আর আপাতরম্য প্রেয়ের জন্য লালায়িত হইও না। বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই করিবার সামর্থ্য থাকিবে না। তখন "নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং" —তখন নির্ব্বাণ-প্রায় দীপে তৈল প্রদানে আর কোন ফল হইবে না। এই মুহূর্ত্তেই তুমি তোমার জীবন-ব্রতের অনুষ্ঠান কর। "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

শ্রীগুরুদাস।

—০—

কাঙ্গালের সাধনা।

আমি কাঙ্গাল বলিয়া আর বৃহৎ কিছুই ধরিতে চাইনা। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ যাহা তাহাই লইয়া থাকিতে চাই। তোমার সহিত কথা কহিয়া আমি সুখ পাইলাম। আমি এখন তোমার মতন হইতে চাই। কেন চাই জান? এত দিন—এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া কত বড় বড় কথা কহিলাম কিন্তু কাজে ত কিছুই করিলাম না; সব রকম করিয়া ত দেখিলাম, নিরন্তর ত কোন কিছু লইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি আমার অবস্থা দেখিয়াই কাঙ্গাল হইলাম।

আমি প্রাণ লইয়া কত কি করিলাম, মন লইয়া কত কি করিলাম কিন্তু যার জন্য করিলাম তাহা দূর হইল কৈ? প্রাণের স্পন্দন

ছাড়িল কৈ? মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ বা স্বরূপ মনন না হইয়া অন্যথা মনন গেল কৈ? শুনিলাম ত আমি যাহা তাহা আত্মা। আর "আত্মা অপ্রাণোহ্যমনঃ শুদ্ধঃ" আত্মা স্বরূপে অপ্রাণ অমন—ইনি শুদ্ধ। প্রাণের স্পন্দন আর মনের মনন এই দুইটি ব্যাপার মায়িক। জ্ঞানস্বরূপ চিৎস্বরূপ আত্মার স্বভাব দুইটি। বুঝিলাম মায়াকেই স্বভাব বলা হইয়াছে। চিৎবস্তুটি স্পন্দ স্বভাব ও অস্পন্দ স্বভাব। অস্পন্দ স্বভাবে যখন আমি থাকি তখন আমি থাকি আমার স্বরূপে পরমশান্ত চলনরহিত অবস্থায়। আবার স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট যে চিৎ তিনিই সবীজ ব্রহ্ম। চিতের যে স্বাভাবিক স্পন্দন তাহাই হইতেছে চেত্যতা—সৃষ্টি উন্মুখতা—সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা। স্পন্দন উঠিলেই আত্মা জীবভাব ধারণ করেন। স্পন্দনটি প্রাণ। জীবভাবের পর মন মনন করিতে থাকে। তখন আত্মা মন আখ্যা লাভ করেন। মনের আদি মনন হইতেছে পঞ্চতন্মাত্র। আত্মা তন্মাত্রাকার ধরিয়া যখন চিদাকাশে ভাসেন তখন তাঁহার যে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি হয়, সেই মূর্ত্তি সূর্য্যের মত প্রভাবিশিষ্ট। এই হিরণ্ময় পুরুষই হইতেছেন আতিবাহিক দেহী হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। তবেই ত দেখি সমষ্টি-প্রাণ ও সমষ্টি-মন হইতেই 'অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুদ্ধঃ' পুরুষের এই সংসার আড়ম্বর। প্রাণের স্পন্দন ও মনের মনন এই দুই ব্যাপারের অন্ত না হইলে আর আমার স্বরূপ বিশ্রান্তি নাই। এই দুইটিই মিথ্যা মায়িক ব্যাপার। ইহা জানিলেও ইহাদের হাত এড়াইতে পারিনা। তাই আমি কাঙ্গাল হইয়াছি। আমার ক্ষমতায় আর বুঝি আমার বন্ধন গেলনা। মুখে বুঝিলাম অসঙ্গ আমি, আমার বন্ধন কখন নাই। ইহাই বুঝিলাম—যে বন্ধনটার কথা লোকে বলে সেটা স্বাপ্ন বন্ধন। কিন্তু এই মায়াস্বপ্নই আমার ছুটিলনা আর এই স্বাপ্নবন্ধনও আমার কার্য্যে কাটিল না। আমি সব জানিয়া শুনিয়াও স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছিনা বলিয়া কাঙ্গাল।

মনের মনন ছুটাইতে লঘূপায় যে কথা কওয়া তাহাও ধরিলাম। করিও তাহা। প্রাণের স্পন্দন ছুটাইতে প্রাণায়াম ধরিলাম, তাহাও করি। সন্ধ্যাবন্দনাদি যে মিশ্রপথ—যে মিশ্রপথে যোগ আছে, ভক্তি আছে এবং জ্ঞান আছে—সমকালে এই তিনে যে সহজে হয় তাহাও বুঝিলাম। তবুও বিশ্রান্তি হইতেছে না। তাই তুমি কাঙ্গাল তোমার ঐ কাঙ্গালের সাধনা করিলাম। যাহা কিছু সাধনা করি তার সঙ্গে ঐ কাঙ্গালের সাধানাটিকে ভিত্তি করিলাম। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধনা যদি কেহ বুঝিয়া ইহা করে। যতদিন করা ধরা থাকে ততদিন ইহাকেই ভিত্তি করা উচিত।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ সাধনাটা কি, তাহা বলি নাই বলিয়া। শুনিতে ছোট কথা, করিতে বড় শক্ত কিন্তু।

যখন দেখ আত্মার তিন অংশ—প্রথম অংশকে সত্তাসামান্য বলে—এইটি সৎ; দ্বিতীয়টি স্বরূপ—ইহা চিৎ ও আনন্দ অংশ আর তৃতীয় অংশটি কল্পিত। ইহা হইতেছে আত্মাকে জগৎ রূপে দেখা—তখন জগৎটাকে স্বরূপে আত্মাই জানিবে। আর অন্যথারূপে এটা জগৎ। আচ্ছা যাহা দেখ, যাহা শুন সবই আত্মার অন্যথারূপ ইহা কি সর্ব্বদা মনে থাকে? যাহার মধ্যে প্রাণ আছে তাহাই কিন্তু চৈতন্যই স্পন্দন যুক্ত হইয়া নামরূপ ধরিয়াছেন—বল ইহা কি মনে থাকে? আর যাহাই সঙ্কল্প বিকল্প রূপে মনে ভাসে তাহাই আদিমন যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহারই মনন। এই সঙ্কল্পই জগৎ সৃষ্টি করে। সঙ্কল্প যে কত শক্তিশালী তাহা কি মনে থাকে? যখন থাকেনা তখন ত তুমি কাঙ্গাল। কাঙ্গাল আর কি করিবে? সে ত সকলের কাছে অণু হইয়া থাকিবে। সে ত সকলের কাছে ক্ষুদ্র হইবে। অণু হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া সকলকে সেই ভাবিয়া সে প্রণাম করিতে অভ্যাস করুক—ইহাই কাঙ্গালের সাধনা। আহা সব প্রণাম! তারকা বৃক্ষ লতা গিরি নভ নর নারী কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী নদী সমুদ্র চন্দ্র সূর্য্য দিবা সঙ্কল্প বিকল্প বাক্ প্রাণ—সব তুমি সব তুমি সব প্রণাম।

সন্ধ্যা আহ্নিকে বসিতে গিয়া সব প্রণাম করিতে করিতে কার্য্য করা। প্রণাম করিতে করিতে জপ, প্রণাম করিতে করিতে ধ্যান, প্রণাম করিতে করিতে আত্মবিচার, প্রণাম করিতে করিতে কথা কওয়া, প্রণাম করিতে করিতে সংসার সেবা তাঁর অর্চ্চনা, প্রণাম করিতে করিতে স্নান করা, প্রণাম করিতে করিতে আহার করা, প্রণাম করিতে করিতে শয়ন করা, প্রণাম করিতে করিতে ভ্রমণ করা—আহা সব প্রণাম, সব প্রণাম। তাই বুঝি শ্রীভগবান্ মাং নমস্কুরুকে সহজ সাধনা বলিতেছেন ? কাঙ্গালের সাধনা জয়যুক্ত হউক।

—০—

তোমার সংসার।

দেখগো ! তোমার সংসার করা বড় কঠিন।

যে সংসার করিতেছিলে তাই করা সহজ কেমন ? এর উত্তর দিতে পারিলাম না। যে সংসার সবাই করে তাহা যে অতিশয় দুঃখময় তাহা ত সবাই জানে। সেই জন্যই না তোমার সংসার করিতে আইসে। কিন্তু এ সংসারও বড় কঠিন হইয়া উঠে।

দুঃখ করিতে পাওনা তাই কঠিন কেমন ? রকম ত তাই বটে। তোমার সংসারে যে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কোন প্রকার দুঃখ করিবার যো নাই। তুমি সুখময়, তুমি আনন্দময়। আবার তোমার না জানা কোন কিছুই আমার উপরে পতিত হয় না। আর যা তোমার নিকট হইতে আসিবে তাহাই আমার ভাল। কেননা তুমি মঙ্গলময়। শুধু মঙ্গলময় নও, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি মনে করিলেই আমার যত কিছু অসুবিধা তাহাকে সুবিধা করিয়া দিতে পার। তবুও যখন করনা—তখন আমার উপর যাহা পড়ে তাহাই আমার শুভকর। কিন্তু এই যে শারীরিক অসুবিধা—ইহাতেই ত আমি ভাল করিয়া, মনের মত করিয়া তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতেও পারি না। ইহাতেও আমার বিরক্তি দেখাইবার যো নাই। যদি

কেহ মরে তাহাতেও শোক করিবার যো নাই। কেননা তুমি বল "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং'--অশোচ্য বিষয়ে যে শোক তাহাই অজ্ঞান।

আচ্ছা শোক করিতে না পাও বলিয়া যদি কষ্ট পাও—না হয় একটু মাথায় হাত দিয়া শোক করিও।

না গো! আমি তা বলিতেছি না। তুমিই ত আমার ভালবাসার বস্তু। শোক বা দুঃখ ত আমি ভালবাসি না। তবে তোমায় ছাড়িয়া আমার ভালবাসার বস্তু ছাড়িয়া শোক লইয়া থাকিব কেন? আমি বলিতেছি তুমি যেমন করিয়া আকাশের মত নির্লিপ্ত থাক—সব কর কিন্তু কিছুই করনা—লোকদেখান শোকও কর কিন্তু সেই সময়ে যে পরীক্ষা করিতে চায় তাহাকে হাসিয়া বল—আমাকেও পরীক্ষা না করিলে চলে না? এইরূপ সংসার করিতে চাই।

পারিবে আরও কিছুদিন ভালবাসিয়া আজ্ঞাপালন কর, আমারই মতন হইতে পারিবে। তাই করিব।

—০—

রামায়ণের কিছু।

(১)

আমার মত কলি-উপদ্রুত জীব যাহাতে একটু রসের সহিত ভজন সাধন করিয়া এই দুস্তর সঙ্কট-সাগরে কুল কিনারা পায় তাহার জন্যই এই লঘূপায় আশ্রয় করা। এজন্য প্রথমেই সাধনার কথা বলিয়া তবে কথা আরম্ভ করা যাইবে।

ব্রহ্মর্ষি ও দেবষির কথা হইয়াছিল ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে। উপস্থিত সময়ে যে স্থানকে কাণপুর বলে তাহার নিকটে বিঠুর। বিঠুর তমসা তীরে। এই তমসা নদীর তীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। এই আশ্রমে ভগবতী জনকনন্দিনী এখনও অবস্থান করিতেছেন। এই আশ্রমেই শ্রীভগবানের প্রতিচ্ছায়া দুইটি আজ দ্বাদশ বৎসরে উপনীত।

মায়ের কুটীর মহর্ষির আশ্রম হইতে কিছু দূরেই হওয়া সম্ভব। সম্ভবতঃ দেবর্ষি মহর্ষির আশ্রমে আসিয়াছেন প্রাতঃকৃত্যাদির পরে। কারণ মহর্ষি পরেই মধ্যাহ্নক্রিয়ার জন্য তমসাতীরে যাইতেছেন ইহা আমরা দেখি।

যখন দেবর্ষি কথা কহিতেছিলেন তখন মহর্ষির নিকটে আর কেহ কি ছিলেন? মহর্ষির শিষ্য শ্রীভরদ্বাজের ওখানে থাকা সম্ভব হইতে পারে।

আমাদের সাধনার কথা হইবে যিনি যখন কথা-রামায়ণে কোন কথা কহিবেন তখন আমাকে অথবা আমার মত যাঁহারা এই লঘূপায় অবলম্বন করিতে চাহেন তাঁহাকে সেইস্থানে উপস্থিত থাকিতে হইবে। শুধু উপস্থিত থাকা নয় কিন্তু বক্তা ও শ্রোতার কথা কহিতে কহিতে বা কথা শুনিতে শুনিতে কখন্ কি মুখের ভাব হয় বা কখন কিরূপ চক্ষের অবস্থা হয়, মুখ হইতে কখন কিরূপ ভাষা বাহির হয়, কখন্ বা শরীর রোমাঞ্চিত হয় এই সব লক্ষ্য করিতে হইবে। নিজের ঘরে বসিয়া চক্ষু দুইটিতে নিত্য নূতন রসোদ্গারী হৃদয় কমল দেখিতে দেখিতে এবং নিঃশব্দোচ্চারিত ইষ্টনাম আপন কর্ণে শ্বাসে শ্বাসে শুনিতে শুনিতে অন্ততঃ অপর লৌকিক কথার বিরাম কালে চক্ষু কর্ণের এই দুইটি সাধনা করিতে করিতে কথা রামায়ণ শুনিতে হইবে। সাধনা এই পর্য্যন্ত এখন, ক্রমে অন্য প্রকারও আসিতে পারে।

(২)

দেবর্ষি ও মহর্ষি রামকে কিভাবে দেখিতেন তাহাও আমাদের জানিয়া রাখা উচিত। বিদ্মহে না হইলে ধীমহি হয়না। তাই প্রথমেই রামকে জানা চাই। দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে যে ভাবে জানিয়া ব্যবহারিক জগতে চলিয়াছিলেন অথবা চলিতে বলিতেছেন তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। তাহা হইলে সর্ব্বদা নাম লইয়া থাকা সুবিধা হইবে। আর ক্রমে অনুরাগে নাম করাও হইবে।

বিবাহের পরে রাম ও সীতা দ্বাদশ বৎসর অযোধ্যায় আছেন।

কাল রাজ্যভিষেকের অধিবাস। দেবতারা একটু বিচলিত হইয়াছেন। যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান রাবণ-বিনাশের কথা বিস্মিত হইয়া থাকেন? কথাটা মিথ্যা নয়। রাম ত কলিতেও সুর, মানুষ তির্যগাদি দেহ ধারণ করিয়াছেন কিন্তু সব মনে কি আছে? তাই দেবগণ নারদকে পাঠাইয়াছেন স্মরণ করাইতে। সীতারাম অন্তঃপুরে স্বমন্দিরে আছেন। সীতা সেবা করিতেছেন—রাম ও সেবা লইতেছেন—সেবা ও করিতেছেন। এমন সময়ে বড় অতর্কিত ভাবে শুদ্ধ স্ফটিক-সঙ্কাশ নির্ম্মল শারদশশীর মত এক পুরুষ স্বীয় অঙ্গজ্যোতিতে মন্দিরপাঠ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তুমি আমি এই ভাবে এমন সময়ে কাহাকেও নিভৃত গৃহে আসিতে দেখিলে কি করি? আর ইঁহারা কি করিলেন? উভয়ে চমকিত হইয় নবাগত মহাপুরুষের সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং বলিলেন–আমাদের মত সংসারীর, আপনার মত সাধুপুরুষের দর্শন বহুপুণ্যেই হইয়া থাকে। বলুন আপনার কোন্ কার্য্য আমরা সম্পাদন করিব? এখানে যাহাতে রস আসিবে তাহা ধর। তুমি আমি রাম-মন্দিরে কি প্রবেশ করিতে পারি? পারিনা। তাই দেবর্ষির সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করি চল। আর তাঁহাদের কথা শ্রবণ করি চল। ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে নাম করিতেও কি রস লাগিবেনা?

নারদ কিছু বিস্মিত হইয়াছেন। বলিতেছেন ঠাকুর আমি ত তোমার ভৃত্যের ভৃত্য। আমি ত তোমার চিরদিনের চিহ্নিত কিঙ্কর। তবে এ নূতন ভাব কেন? নূতন দেহ ধরিয়াছ বলিয়াই কি এই নূতন অপরিচিত সম্বোধন? ঠাকুর! আমি কোন দোষ দিতেছি না। ঐ যে তুমি বলিলে আমার মতন সংসারী—এ কথাও ত মিথ্যা নয়। যে বিশ্ববিমোহিনী মায়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে অনন্ত অনন্ত জগৎ প্রসব করিতেছেন যখন "সা মায়া গৃহিণী তব" যখন সেই মায়া তোমার গৃহিণী, তখন তোমার মত গৃহস্থ, তোমার মত সংসারী আর বা কে আছে? তবে প্রভু আমি এই বলিতে চাই যে আমি জানি তুমি কে আর ইনিই বা কে!

শ্রুতি যেমন অধঃশাখ এই জগৎ বৃক্ষকে উমামহেশ্বরাত্মক বলিতেছেন—বলিতেছেন রুদ্রো নর উমা নারী তস্মৈ তস্যৈ নমঃ॥

রুদ্রো ব্রহ্মা উমা বাণী ,, ,, ,,
রুদ্রো বিষ্ণু উমা লক্ষ্মী ,, ,, ,,
রুদ্রঃ সূর্য্য উমা ছায়া ,, ,, ,,
রুদ্রঃ সোম উমা তারা ,, ,, ,,
রুদ্রো দিবা উমা রাত্রি ,, ,, ,,
রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদি ,, ,, ,,
রুদ্রো বহ্নি রুমা স্বাহা ,, ,, ,,
রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং ,, ,, ,,
রুদ্রো বৃক্ষ উমা বল্লী ,, ,, ,,

রুদ্রো গন্ধ উমা পুষ্পং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।

শ্রুতি সর্ব্বশেষে বলিতেছেন—

কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণস্বরূপিণঃ।
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥

স্বরূপে পূর্ণ যিনি তাঁর আবার গমনাগমন কোথায় হইবে? এক পূর্ণ আকাশ—সে কি গ্রামে প্রবেশ করে?

শ্রুতির মতন দেবর্ষিও রামকে বলিতে লাগিলেন—

ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্ত্বং জানকী প্রভা॥
ভবান্ শশাঙ্ক সীতা তু রোহিণী শুভলক্ষণা।
শক্রস্ত্বমেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্॥

ভগবান্ নারদ আরও কতকি বলিলেন—শেষে বলিলেন—

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং ত্বংহি রাঘব॥
তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন॥

স্ত্রীবাচক এখানে যাহা কিছু তাহাই সীতা আর পুরুষবাচক যাহা কিছু তাহাই রাম। ফলে ত্রৈলোক্যে যাহা কিছু আছে তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দেবর্ষি তবে সর্ব্বত্রই এক সীতারামই দেখিতেন। জগতের কোলে কোলে সীতারাম খেলা করেন ইহাই শ্রীনারদের জগদ্দর্শন।

আর ভগবান্ বাল্মীকি ? বনগমন কালে যখন সীতারাম চিত্রকূট পর্ব্বতে আগমন করেন তখন ভগবান্ বাল্মীকির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

সেই নানামৃগদ্বিজাকীর্ণ নিত্য পুষ্পফলাকুল আশ্রমে শ্রীভগবান্ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন। ভগবন্ আমরা ত

পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতা বয়ম্॥

আমরা পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ তিন জনে দণ্ডকারণ্যে আসিলাম এখন

যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ কালং বদস্ব তৎ।
সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিত্তত্র নয়াম্যহম্॥

যেখানে আমার সুখবাসের সময় হয় তাহাই বলুন। সীতার সহিত কিঞ্চিৎ কাল তথায় কাটাইতে আমি চাই।

শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া শ্রীবাল্মীকি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

ত্বমেব সর্ব্বলোকানাং নিবাসস্থান মুত্তমম্।
তবাপি সর্ব্বভূতানি নিবাস সদনানি হি॥

রাম তোমাতেই সর্ব্বভূত বাস করে আবার সর্ব্বভূতের দেহকে আপন দেহ করিয়া তুমিই সর্ব্বদেহে বাস করিতেছ। "এবং সাধারণং স্থানং" অর্থাৎ হে রঘুনন্দন! সাধারণভাবে এই তোমার থাকিবার স্থান। কিন্তু তোমার প্রশ্নের মধ্যে একটু বিশেষত্ব এই যে, তুমি বলিতেছ সীতার সহিত তুমি কোথায় থাকিবে ? তদ্বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ! যত্তে নিয়ত মন্দিরম্। তাহা বলিতেছি যেখানে হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তোমাদের মন্দির নিয়ত বিরাজিত আর যে মন্দিরে তোমরা নিয়ত বাস কর তাহাই বলিতেছি। ভগবান্ বাল্মীকি রামকে কি ভাবে

দেখিতেন, কি ভাবে ভজিতেন তাঁহার এই উক্তিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাল্মীকি বলিতে লাগিলেন—

শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদ্বেষ্টৃণাং চ জন্তুষু।
ত্বামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেঽধিমন্দিরম্॥
ধর্ম্মাধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য হৃৎসুখমন্দিরম্॥
তন্মন্ত্রজাপকো যস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্॥
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জ্জিতাঃ।
সমলোষ্ট্রাশ্মকনকাস্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম॥
ত্বয়ি দত্ত মনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ।
ত্বয়ি সন্ত্যক্তকর্ম্মা যস্তন্মনস্তে শুভং গৃহম্॥
যো ন দেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্॥
ষড়্ভাবাদি বিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি।
ক্ষুত্তৃট্ সুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণবুদ্ধ্যোর্নিরীক্ষতে॥
সংসারধর্ম্মৈর্নির্ম্মুক্ত স্তস্য তে মানসং গৃহম্॥
পশ্যন্তি যে সর্ব্বগুহাশয়স্থং
ত্বাং চিদ্ঘনং সত্যমনন্তমেকম্।
অলেপকং সর্ব্বগতং বরেণ্যং
তেষাং হৃদব্জে সহ সীতয়া বস॥
নিরন্তরাভ্যাস দৃঢ়ীকৃতাত্মনাং
ত্বৎপাদসেবা পরিনিষ্ঠিতানাম।
ত্বন্নামকীর্ত্ত্যা হতকল্মষাণাং
সীতা সমেতস্য গৃহং হৃদব্জে॥

চিত্রকূট পর্ব্বতে রাম-বাল্মীকির এই কথা হইয়াছিল। সেই সময়ে কিন্তু সেইখানে সীতা সৌমিত্রীও ছিলেন। তুমিও সেইখানে এইটি

কিন্তু বিশেষ কথা—তুমিও শুনিতেছ বাল্মীকি কি বলিতেছেন। কি সুন্দর কথা! শ্রীভগবান্ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ" আমি কোথায় সুখে বাস করিতে পারি তাহাই আপনি বলুন। তাহার পরেই বলিলেন—সীতার সহিত আমি থাকিব এইরূপ স্থান আপনি দেখাইয়া দিন। ইহারই উত্তরে বাল্মীকি বলিতেছেন—অধিষ্ঠান-চৈতন্য তুমি, তোমাতেই জগৎ বাস করিতেছে এবং জগতের সর্ব্বত্র তুমিই বাস করিতেছ। এই ত তুরীয় তুমি, তোমার বাসস্থান; কিন্তু সীতার সহিত—যেখানে তুমি থাকিতে পার সেই কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্যই ত সগুণ দেবতা, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কোথায় থাকেন?

হৃদয় যাঁহাদের শান্ত—যাঁহাদের হৃদয়ে একটি ভিন্ন আর দ্বিতীয় অভিলাষ উঠে না, যাঁহারা সমদৃষ্টি—যাঁহাদের চক্ষু এক ভিন্ন অন্য আর কিছুই দেখেনা, কোন প্রাণীকে, এমন কি সর্ব্বদা তীব্র বাক্যবাণ-বর্ষণকারী বা বর্ষণকারিণী, এমন কি যে সংহার করিতে আসিতেছে তাহাকেও যিনি শত্রুভাবে দেখিতে পান না, তাহাকেও যিনি তুমি দেখিয়া ফেলেন; তোমাকেই যিনি নিত্য ভজনা করেন, এক ক্ষণকালও কর্ম্ম, বাক্য, ভাবনা দ্বারা তোমার ভজনা ছাড়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না—এমন কি নিদ্রাও যাঁহার তোমাকে না লইয়া হয় না এমন লোকের হৃদয়ই তোমার মন্দির—সীতার সহিত সেই হৃদয়মন্দিরে, সেই হৃদয়কমলে তোমার থাকিবার স্থান। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতির সমস্ত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বদা তোমাকে ভজনা করেন সীতার সহিত হে রাম সেই হৃদয়ই তোমার সুখমন্দির। যিনি তোমার মন্ত্র জপ করেন—জপ করিতে করিতে তোমার শরণে থাকেন, যিনি সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, মিষ্টবাক্য তীক্ষ্ণবাক্য—ইহা আর অনুভব করেন না—দ্বন্দ্বভাব যাঁহার আর নাই; অন্য কোন কিছুতে যাঁহার আর অভিলাষ নাই এমন জনের হৃদয় তোমার সুন্দর

মন্দির। আমি করি, আমি খাই, আমি দেখি শুনি, আমি চলি ফিরি এই কর্ত্তা ভোক্তা অভিমান যাঁহার নাই, যিনি সবই তোমায় দিয়া নিজে শান্ত হইয়া গিয়াছেন, যিনি একবারে রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ অলকামণ্ডিত ঐ শ্রীমুখমণ্ডল সর্ব্বদা স্মরণে কোন প্রকার দুঃখ আর যাঁহার মনে উঠে না বলিয়া যিনি রাগদ্বেষবর্জ্জিত, পথের লোষ্ট্র আর অন্তঃপুরের কাঞ্চনে যাঁহার সমান বোধ হইয়া গিয়াছে এমন জনের হৃদয় তোমার মন্দির। যাঁহার মন আর কোন সঙ্কল্প করিতে পারেনা—যাঁহার মনোঘট একবারে বিষয়বায়ু শূন্য হইয়া রামসমুদ্রে সর্ব্বদা ডুবিয়া আছে, যাঁহার বুদ্ধি বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছে রাম ভিন্ন আর সৎ কিছুই নাই, রাম ভিন্ন আর সবই অনিত্য—কাজেই যিনি সদা সন্তুষ্ট, আর তোমাতে যাঁহার সর্ব্ব ভাবনা, সর্ব্ব বাক্য এবং সর্ব্ব কর্ম্ম সদা অর্পিত হয়, এমন জনের মনই তোমার মঙ্গল-মন্দির। অপ্রিয় কিছু আসিলেও যে দ্বেষ করেনা, প্রিয় কিছু পাইয়াও যে আনন্দে বেঁহুস হয় না—কেননা তিনি জানিয়াছেন তুমিই নিত্য মঙ্গল আর যাহা কিছু প্রিয় অপ্রিয় বোধ হয় সমস্তই মায়িক সমস্তই মিথ্যা—এইটি নিশ্চয় জানিয়া যিনি তোমার ভজনা করেন এমন জনের মনই তোমার গৃহ। জন্ম, প্রকটতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় আর বিনাশ এই ষড়্‌বিধ বিকার যিনি দেহেই দেখেন, যিনি আত্মারূপী যে তুমি চৈতন্য—তোমাতে রাম! এই বিকার যিনি দেখেন না; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, ভয়, দুঃখ এসব প্রাণের বুদ্ধির এই যিনি দেখেন—এই দেখিয়া যিনি সংসার যে শরীরের জন্ম-মৃত্যু, প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং মনের শোক মোহ—এই ষড়্‌বিধ ঊর্ম্মিমালাসঙ্কুল, সংসার ধর্ম্ম হইতে যিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন এমন জনের মন তোমার বাসের গৃহ। যিনি সকলের হৃদয়-গুহাতে—সকলের হৃদয়-কমলে তোমাকেই শয়ান দেখেন আর দেখেন তুমি চিদ্ঘন—জনে জনে প্রাণীতে প্রাণীতে যে আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করে, যে জ্ঞান প্রাণে প্রাণে অনুভব করে—সেই ব্যষ্টি আনন্দের, ব্যষ্টি জ্ঞানেরও সমষ্টি তোমরা সীতারাম, একমাত্র

সত্য, একমাত্র সীমাশূন্য অনন্ত, একমাত্র অলেপক, নির্লিপ্ত, একমাত্র সর্ব্বগত, একমাত্র বরণীয় বস্তু তুমি, যাঁহারা তোমাকে এইরূপ দেখেন এমন জনের হৃদয়-কমলে সীতার সহিত তোমার বাস হয়।

রাম! আর বা কি তোমায় বলিব? অভ্যাস! অভ্যাস! সদাসর্ব্বদা অভ্যাসে যিনি তোমার রাম রাম রূপ মাখান মূর্ত্তি দেখেন আর জগৎ শ্যাম শ্যাম রূপ মাখান দেখেন, নিরন্তর দৃঢ়াভ্যাসে যাঁহার রসনা সর্ব্বদা রাম রাম করে একটি শ্বাসও রামনাম না করিয়া বৃথা ব্যয় হয় না, তোমার ভক্ত সঙ্গ ভিন্ন প্রাকৃত জনের সঙ্গ যাঁর আদৌ হয় না; সর্ব্ব প্রাণীতে, সর্ব্ব বৃক্ষ লতাতে, আকাশে, বায়ুতে, জলে পর্ব্বতে, পক্ষীতে, পতঙ্গে, সর্ব্ব স্থাবরে, সর্ব্ব জঙ্গমে, সর্ব্ব নর নারীতে যিনি রামস্বরূপ—সেই তুরীয়—সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্য দেখিতে দৃঢ়-অভ্যস্ত—এক কথায় নাম রূপ গুণ কর্ম্ম ও স্বরূপ এইগুলির বা ইহার কোন একটির নিরন্তর অভ্যাসে যাঁহার মন তুমি ভিন্ন আর কোথাও আর যাইতে পারে না, হৃদয়-কমলে তোমার চরণ সেবাই যাঁহার সর্ব্বদাই নিষ্ঠার বস্তু; তোমার মধুর রামনাম কীর্ত্তন করিয়া যে আমার মতন সর্ব্বপাপ শূন্য হইয়াছে, এমন জনের হৃদব্জে সীতার সহিত তোমার বাসমন্দির।

ভগবান্ বাল্মীকি আবার বলিতে লাগিলেন—রাম তোমার নাম-মহিমা কি দিয়া, কিরূপেই বা বর্ণনা করিব? তোমার নামের প্রভাবেই আমি কিন্তু আজ ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে কিরাতদের সঙ্গে লালিত পালিত হইয়াছিলাম। জন্ম মাত্রই আমার ব্রাহ্মণের ঔরসে, আমি কিন্তু প্রথম হইতেই শূদ্রাচার-রত। অসংযমী আমি—আমি কত শূদ্রাণীতে কত পুত্রের জন্ম দিয়াছিলাম। কত চোর ডাকাতের সঙ্গে মিশিয়া আমি চুরী ডাকাতি করিতাম আর নিপুণ ডাকাত হইয়া গিয়াছিলাম। এ হেন পাপ নাই যাহা ব্রাহ্মণ পুত্র আমি—আমি না করিয়াছি। কিন্তু রাম! ধন্য তোমার নামের মহিমা। এত পাপী আমি যে, ঋষিগণ যখন দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তোমার নাম

দিলেন—আমি তখন "রাম" নাম করিতে পারিলাম না। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া "মরা" বলিতে বলিলেন। আমি অতিকষ্টে 'মরা' উচ্চারণ করিলাম। তখন তাঁহারা বলিলেন "একাগ্রমনসাত্রৈব "মরেতি জপ সর্ব্বদা"। কে বলে নামজপে কিছু হয় না? আমি একাগ্র মনে বহু বর্ষ ধরিয়া "মরা" "মরা" জপিয়াই আজ ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি। আহা! রামনামের মহিমা আমি কি বলিব? আজও নাম করিয়া আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমাকে বন্দনা করিয়া লোকে বলে—

যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরং।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥

আরও বলে—

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং।
আরুহ্য কবিতা শাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্॥
বাল্মীকের্মুনি সিংহস্য কবিতা বনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রাম কথা নাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্॥

আহা! আমার সম্বন্ধে লোকের এই সমস্ত সুখ্যাতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই সুখ্যাতি আমার নহে। এ সুখ্যাতি তোমার রাম! হে রাজীবপত্রাক্ষ! আর কি বলিব! আজ সীতার সহিত তোমাকে দেখিয়া আমি মুক্ত হইলাম। এস! তোমায় দেখাইয়া দি সীতারাম লক্ষ্মণের বাসস্থান এই দণ্ডকারণ্যে কোন্ পর্ব্বত গঙ্গাকূলে হইবে।

(৬)

এই লঘূপায়ে সাধনা অভ্যাস করি আর আমার মতন যাঁহারা তাঁহারাও করুক—এই ত বাসনা। ইহাতেই অনুরাগ আসিবে। তখন শোয়ত আঁচাওত রাম হইয়া যাইবে।

অনুরাগে ভজন হইতেছে কি না তার পরীক্ষা করিবে? একজন সাধক বলিয়াছিলেন "হেরিলে ও মুখ দূরে যায় দুঃখ, এই গুণ শ্যামা মার রে"। হয়ত এই সাধকের একখানি সুন্দর কালীমূর্ত্তি ছিল। মায়ের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তাঁহার দুঃখ দূর হইত। অথবা যখন

দুঃখ আসিত তখনই ছুটিয়া গিয়া মায়ের মুখ খানি ইনি দেখিতেন ; আর তাঁহার দুঃখ থাকিত না। বুঝা যায় ইঁহার মায়ে অনুরাগ লাগিয়া ছল।

তুমি আমিও বলি এস
স্মরিলে সে মুখ, দূরে যায় দুঃখ"

কাহারও মুখ স্মরিয়া কি দেখিয়াছ—দুঃখ ভুল হইয়া গিয়াছে? যাহার মুখখানি মনে করিলে দুঃখ ভুল হইয়া যায়, জানিও তাহাই তোমার অনুরাগের বস্তু। হৃদয় কমলে তারে বসাও। বসাইয়া চক্ষে রূপ দেখিতে দেখিতে ইষ্ট নাম জপ কর। প্রতি দুঃখে সেই মুখ স্মরণ কর—দেখিবে দুঃখ আর থাকেনা। নিরন্তর অভ্যাসে ইহাই দৃঢ় করিয়া ফেল। ইহা হইলেই ধারণাভ্যাসী হইয়া যাইবে। ইহাতেও আর সংসারে পুনরাবৃত্তি নাই। আর ইহারও উপরে যাইতে চাও হৃদয় কমলে যারে বসাইয়াছ তাহারই উপরে গায়ত্রী জপিতে দৃঢ় অভ্যাস কর। ভাল করিয়া বিদ্মহে করিয়া ধীমহি কর। বিদ্মহে করিতে করিতে যখন স্বরূপে লক্ষ্য পড়িবে, যখন শ্রেয়োহি জ্ঞান-মভ্যাসাৎ জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে হইয়া যাইবে, যখন শুধু অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানপূর্ব্বক অভ্যাস শ্রেয়ঃ অনুভব করিবে আবার জ্ঞানের অপেক্ষা জ্ঞেয়ের ধ্যান শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিবে আবার সর্ব্বদা ধ্যান পূর্ব্বক বসিয়া থাকা অপেক্ষা সর্ব্বদা ধ্যানে থাকিয়াও সমস্ত কর্ম্ম, হইয়াও যাইতেছে দেখিবে আর কোন ফলকাঙ্খাও নাই, যখন বুঝিবে ধ্যান অপেক্ষা সর্ব্বফল ত্যাগটি শ্রেয়ঃ তখনই এই জীবনেই তাঁতে মিশিয়া যাইবে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয় যখন কর্ম্মান্তে বিচার দ্বারা বুঝিবে—রামই সব, রাম ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, যখন দেখিবে সব রাম সব রাম, তুমিও সব ছাড়া নও তবে তুমিও রাম ; এই ভাবে সব রামময় দেখিয়া দেখিয়া যখন রামরামেই স্থিতিলাভ করিবে তখন আর প্রাণের উৎক্রমণ পর্য্যন্ত হইবেনা। এইখানেই তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইবে।

এই কারণেই ত লাঘূপায় ধরিতে বলিতেছি। শ্রীমতী যে বলিয়াছিলেন "ওই অলকামণ্ডিত শ্রীমুখমণ্ডল নিরখিয়া যেন মরি" তুমি ও কি বলিতে সাধ করনা—মরিবার সময়ে একবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইও ? কেন বল একথা ? মরার সময় যে শত বৃশ্চিকের দংশন হয়। কিন্তু যদি তোমার ঐ মুখ দেখি, তখন ত আর কোন যাতনা থাকেনা। ইহা ত জীবন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আর বুঝিলাম অনুরাগে দেখিতে না পারিলে ঐ মুখ দেখিয়া ত সব দুঃখ দূরে যায় না। অনুরাগ কিন্তু সকলকেই একবার না একবার দেখা দিয়া যায়। মানুষ অনুরাগ রাখিতে পারেনা কেন ? দেহের সঙ্গ-করিয়া ফেলে বলিয়াই অনুরাগ থাকেনা। দেহের সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ জন্যই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী স্থূলে কোন প্রকার দেহ সঙ্গ ত করিবেই না, অপিচ মনে মনেও দেহসঙ্গ করিবেনা। ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী সর্ব্বদা আলোচনা করিতে করিতে অনুভব করিবেন—

স্বদেহাশুচি গন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বিরাগ কারণং তস্য কিমন্যৎ উপদিশ্যতে॥

আপনার দেহের গন্ধটা একবার আঘ্রাণ কর, কত অশুচিজনক ইহা। নিজের দেহের অশুচিগন্ধে যাহার বৈরাগ্য জন্মেনা, তাহার বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য আর উপদেশ কি করিব ?

তাই বলি লাঘূপায় যেটি সেটি হইতেছে রসের সহিত ভজন। এই ভজনই অনুরাগে ভজন। এস এস পুরাণে যে লঘূপায়ের সাধনা দেখান হইয়াছে তাহাই আমি বুঝি আর বুঝিনা অভ্যাস করি—দৃঢ় অভ্যাস করি। প্রত্যহ তিন বেলায় সাধনা দ্বারা এবং অন্য সময়েও ইহা লইয়া থাকি। দৃঢ় অভ্যাস করিয়া ফেলি আইস। আমারা বড় সুখে সর্ব্বদা তাহাকে লইয়া থাকিতে পারিব।

(৪)

যারে দেখ্‌লে প্রাণ জেগে উঠে
হরিনাম আপ্‌নি ফুটে।
এমন মানুষ পেলাম্‌ কৈ ?

"যারে দেখ্‌লে প্রাণ জেগে উঠে" এমন মানুষ না পাইলে বুঝি অনুরাগে ভজন হয় না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে ভজন, আশায় ভজন আর ভয়ে ভজন--এসব এক রকমের আর অনুরাগে ভজন আর এক রকমের। অনুরাগ জিনিষটি যখন উদয় হয় তখন হরিনাম আপনিই ফুটিয়া উঠে। সাধন ভজন না করিয়া থাকা যায় না।

সকলের ভাগ্যে অনুরাগে ভজন মিলে কৈ? যাহাতে মিলে তাহার জন্যই এই শাস্ত্রপ্রদর্শিত লঘূপায় আশ্রয় করা যাইতেছে। শুধু বই লিখিয়া জগতের উপকারের জন্য ছুটিলেও সব হয় না। অন্ততঃ শ্রীভগবতের মতে ব্যাসদেবেরও জগৎ হিতকার কার্য্য করিয়াও মন শান্ত হয় নাই। তাই শ্রীনারদ তাঁহাকে শ্রীভগবানের চরিত্র চিন্তা করিয়া করিয়া তাহাই জীবের জন্য লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীবাল্মীকিকেও স্বয়ং ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে এমন হইয়া যাওয়া চাই যে, যেন ধ্যানে শ্রীভগবানের মনের কথা, তাঁহার সঙ্গীগণের মনের কথা—সর্ব্বদা তোমার মনে জাগিয়া উঠে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় শ্রীভগবানের মুখ চক্ষুর ভঙ্গী কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কথা তিনি কিরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন এবং মনে মনেই বা কি করিতেছিলেন—এই সমস্ত যখন ভিতরে দেখা যাইবে তখন বুঝা যাইবে অনুরাগ ধরিয়াছে। তখন আর ভয় নাই। অনুরাগে ভজন করিতে পারিলে আর সকলই সহজে লাভ হয়। এই অনুরাগে ভজন ধরিবার জন্য, সর্ব্বদা লইয়া থাকিবার জন্য, এই আয়োজন করা যাইতেছে এবং ইহারই শেষ ফল যাহা তাহাতে লক্ষ্য করা যাইতেছে।

"জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং" "ভিক্ষাং দেহি"

বাল্মীকি চিরদিনই বাল্মীকি ছিলেন না। প্রথম বয়সে ছিলেন রত্নাকর। যাঁর নাম জপিয়া জপিয়া তাঁহার দেহের মাংস বল্মীকে খাইয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি তাঁহার হুঁস হয় নাই; না জানি সেই নামে তিনি কত মধু পাইয়াছিলেন যে, এখনও নাম করিয়া করিয়া তিনি

অতৃপ্ত আবার যখন যখন ত্রেতা আসিবে—ত্রেতা যুগের ঘটনাগুলি হৃদয়ে বহিবে তখন তখন তিনি আবার আসিবেন আবার নাম করিবেন, আবার তাঁহার চরিত্র জীবকে শুনাইবেন। তাই বলি সে নাম না জানি কত মধুময়! অনুরাগ যখন ধরে তখন বস্তুটি যে মধু হইতেও মধু হইয়া যায় তাহা যেন সকলেই এক একবার বোধ করিতে পারে। তখন বায়ু মধু বহন করে, সমুদ্র মধুক্ষরণ করে, সূর্য্য চন্দ্র বনস্পতি সমস্তই মধুময় হইয়া যায়। এই অনুরাগ সকলকেই এক একবার দেখা দিয়া যায়। মানুষ অনুরাগ রাখিতে পারে না—অনুরাগ লইয়া দেহের সম্পর্ক করিয়া ফেলে বলিয়া অনুরাগ হারাইয়া ফেলে। অনুরাগ হারাইয়া মানুষ বড় দুঃখী হইয়া পড়ে। অতি দুঃখী যাহারা তাহারাও যে উপায়ে অনুরাগ ধরিতে পারে তাহাই হইল লঘূপায়।

চোর রত্নাকর যে নাম জপিয়া জগৎপূজ্য হইলেন, সেই নামের নামীকে কি তিনি জানিতেন না? পঞ্চবটীতে বাসকালে যিনি তাঁহার সহিত দেখা করেন আবার যাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী তিনি বার বৎসর ধরিয়া আশ্রমে রক্ষা করিতেছেন; যাঁহার অঙ্গের প্রতিচ্ছায়া দুইটি আজ তিনি এত বড় করিয়াছেন—ভগবান্ বাল্মীকি কি তাঁহাকে জানেন না? জানেন নিশ্চয়ই। তবুও যে একটু ঢাকা দিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করা সেটা বুঝি "রসপরিপাটীর কারণ"। আপনার প্রিয়তমের নামোল্লেখ না করিয়া অন্যের মুখে তাঁহার গুণগ্রাম শ্রবণ করায় ভারী একটা বুঝি রস আছে। তাই ভগবান্ বাল্মীকি শ্রীনারদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চরিত্রেণ চ কোযুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈক প্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্যবিভ্যতি দেবাশ্চ জাত রোষস্য সংযুগে॥

বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আপনি ত তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান লইয়াই আছেন। কায়িক তপস্যা—স্নানাদি দ্বারা শরীর-শুদ্ধি, দেবদ্বিজ গুরু পূজা, সেবা, প্রণাম, ব্রহ্মচর্য্য, শরীরদ্বারা হিংসা না করা; বাচিক তপস্যা—প্রিয় শীতল বাক্য বলা, অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রণবের অর্থধারণা এবং বেদাভ্যাস; মানস তপস্যা অর্থাৎ চিত্তকে সদা সন্তুষ্ট রাখা, মৌন, একাগ্রতা, আত্মচিন্তা এবং মনোনিবৃত্তি—এই সমস্ত আপনার লাভ হইয়াছে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সম্প্রতি এই পৃথিবীতে এমন কাহাকেও কি আপনি জানেন যিনি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, সদা নিয়মপ্রতিপালনকারী, পবিত্র চরিত্রবান্, সর্ব্বভূতহিতে রত, বিদ্বান্, সকল কার্য্যে সমর্থ, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন, আত্মবান্, জিতক্রোধ, তপস্যা প্রভাবে অগ্নিকল্প; আপনি অধুনা এমন কাহাকেও কি জানেন যিনি পরের গুণে দোষারোপ করেন না; সমরে যাঁহার ক্রোধ দেখিলে দেবতাগণও ভয় পান—দেবর্ষে! আপনি যদি এমন লোকের কথা জানেন্ তবে আমাকে বলুন। এরূপ লোক দেখিবার জন্য আমার তীব্র বাসনা জাগিয়াছে। ভগবান্ বাল্মীকি প্রশ্ন করিয়াই বুঝি মনে মনে বলিতেছেন—আমি জানি আপনি আমার মনের মানুষের কথাই বলিবেন। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেহ ত এরূপ নাই। বাল্মীকির তীব্র বাসনা জাগিয়াছিল।

তোমার আমার জাগেনা? এমন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, লোকাভিরাম পুরুষকে দেখিতে পাইলে কার না প্রাণ জাগিয়া উঠে? সেকালেও এইরূপ পুরুষের দরকার হইত। আর এখন? এই যুগে যখন আমরা চারিদিকে চরিত্রহীন, ভূতপীড়ক, অবিদ্যাসেবক, পরচর্চ্চাপরায়ণ, ক্ষীণবীর্য্য, গৃহে নর্দ্দী, নিতান্ত অক্ষম, ক্রোধী, দেহাত্মপ্রত্যয়শীল, কদর্য্যদর্শন, সদা নিয়মভঙ্গকারী, মিথ্যাবাদী, অধার্ম্মিক নর নারীই প্রায় দেখিতে পাই, তখন বাল্মীকি-প্রার্থিত পুরুষের কত আবশ্যকতা? আহা যে কৃতঘ্নতাকে তাঁহারা সর্ব্বপেক্ষা দূষনীয় কঠিন পাপ বলিয়া জানিতেন; গোঘ্ন সুরাপায়ীর প্রায়শ্চিত্তবিধান শাস্ত্রে আছে, কিন্তু "কৃতঘ্নে নাস্তি

নিষ্কৃতি"; এমন কি কৃতঘ্নঃ "সর্ব্বজীবানাং বধ্যঃ" ইহাও যাঁহারা বলিতেন; যখন মনুষ্য মধ্যে এই কৃতঘ্নের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিতেছে; যার তার কাছে কৃতঘ্ন নয়—লোকে কৃতঘ্ন হইতেছে পিতা মাতার কাছে; কৃতঘ্ন হইতেছে স্বামীর কাছে; কৃতঘ্ন হইতেছে গুরুর কাছে; কতঘ্ন হইতেছে অগ্রজের কাছে। অহো! স্বামীর কাছে ইহারা কতই অবিশ্বাসিনী; পিতা মাতার চক্ষে জল ফেলিয়া ইহারা সন্ন্যাস করে; গুরুকে মূর্খ প্রতিপাদন করিয়া ইহারা ধার্ম্মিক হয়; ইহারা ঋষিগণকেও নিজের মতন করিয়া গড়িয়া লইতে চায়; শাস্ত্রকে এমন কি শ্রীভগবানকেও ইহারা নিজের ইচ্ছা মত গঠন করে; চারিদিকে এইরূপ নরনারী দেখিয়া যখন লোকে বড়ই ব্যথিত হয়, তখন "যারে দেখ্‌লে প্রাণ জেগে উঠে" এমন পুরুষ কে না চায়?

"শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ" ত্রিকালদর্শী নারদ বাল্মীকির বাক্যে হৃষ্ট হইয়া বলিলেন শ্রবণ কর। বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন—হে মুনে "বহবো দুর্ল্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্ত্তিতা গুণাঃ"॥ তুমি যে সকল গুণের কথা বলিলে তাহা একাধারে নিতান্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু এই কালেও এমন লোক আছেন যাঁহাতে এই সমস্ত গুণও পরিলক্ষিত হয়।

নারদ বলিতে লাগিলেন—

ইক্ষ্বাকুবংশ প্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।

ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মিয়াছেন; নাম তাঁহার রাম; সকল লোকে তাঁহার কথা শুনিয়াছে। নাম, রূপ, গুণ, কার্য্য এবং স্বরূপ সকলই তাঁহার সুন্দর।

কোন কবি বলিয়াছেন—

মনোঽভিরামং নয়নাভিরামং বচোঽভিরামং শ্রবণাভিরামং।
সদাভিরামং সততাভিরামং বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামম্॥

সত্যই এমন মন নয়ন বাক্য শ্রবণ অভিরাম, এমন সদা অভিরাম, সতত অভিরাম, পুরুষ আর নাই। নারদ তখন তাঁহার রূপ গুণ বর্ণনা

করিতে লাগিলেন। আমরা সকল কথা না বলিয়া বিশেষ বিশেষ রূপ গুণের উল্লেখ করিতেছি।

রাম বড় স্নিগ্ধবর্ণ আর সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ। তিনি দ্যুতিমান্, কম্বুগ্রীব, স্থললাট। তিনি পীনবক্ষঃ, বিশালাক্ষ।

রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য পরিরাক্ষিতা।
রক্ষিতা স্ব স্ব ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা॥

তিনি সমস্ত জীবের রক্ষাকর্ত্তা; সকলের ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; তিনি স্বধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; তিনি স্বজনের রক্ষাকর্ত্তা।

তিনি বেদাঙ্গ সকলের তত্ত্ব জানেন। তিনি ধনুর্ব্বেদ বিশেষ করিয়া জানেন। এমন সর্ব্বলোকপ্রিয়, এমন সাধু, এমম অদীনাত্মা আর নাই। নদী সকল যেমন সর্ব্বদা সমুদ্রে প্রবেশ করিলেই সুখ পায়, রামও সর্ব্বদা সাধুজন দ্বারা সেইরূপে অভিগত। এমন প্রিয়দর্শন কেহ কখনও দেখে নাই। বুঝি তাঁরই পুনরাবৃত্তি ভিন্ন পৃথিবীও কখন পায় নাই। কত আর বলিব? এই রাম—

সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব।
বিষ্ণুণা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥
কালাগ্নিঃ সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবী সমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ॥

সমুদ্রের জলরাশির যেমন পরিসীমা করা যায় না, সেইরূপ রামের কোন আশয়ের সীমা কেহ করিতে পারিত না। হিমালয় পর্ব্বত এত স্থির যে কিছুতেই যেমন তাহাকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ রামের মন কি যুদ্ধে, কি ইষ্টবিয়োগে কিছুতেই বিচলিত হইত না। তিনি সামর্থ্যে বিষ্ণুর মত আর চন্দ্র যেমন সকলের প্রিয়দর্শন, সেইরূপ তিনিও সকলের প্রিয়দর্শন। প্রলয়কালের অগ্নিজ্বালা যেমন অসহনীয়, ক্রোধকালে ইনিও সেইরূপ। ক্ষমা অর্থ হইতেছে প্রতীকার সামর্থ্য সত্ত্বেও অপকার সহিষ্ণুতা। এই ক্ষমাতে তিনি পৃথিবীর মত। পৃথিবী মনে করিলেই তোমার এই সমস্ত বিলাস নগরী

একক্ষণেই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন কিন্তু তিনি তথাপি যেমন সর্ব্বদা জীবের অপকার করেন না এই রামও ক্ষমাগুণে সেইরূপ। ধর্ম্মার্থ ধন ত্যাগ বিষয়ে নব নিধীশের মত তিনি। আর সত্যবাক্য ব্যবহারে তিনি দ্বিতীয় ধর্ম্মের মত। আর গুণের কথা কতই বলা যাইবে?

বলনা এইরূপ মনের মানুষ যদি পাও তবে কি তুমি একদণ্ডও তার সঙ্গ ছাড়িতে পার? সঙ্গ কি ছাড়া যায়? বলনা কত সহজে তখন বৈরাগ্য হয় আর কত সহজে তখন চিত্ত সেই মনের মানুষেই একাগ্র হইয়া যায়। বলনা মন কি তখন অন্য অভিলাষ কিছু রাখিতে পারে? সকল বস্তুর স্বরূপ যে সেই। যাহাতে চিত্ত একাগ্র হইবে সেই একাগ্রের বস্তুই যে সমস্ত নিরোধ করিয়া সেই পরমব্যোমে স্থিতিলাভ করাইয়া দিবে। আর সেই পরমপদে স্থিতিলাভ করিয়া স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তিতে বিহার করা যখন আয়ত্ত হইয়া যায়—বল তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কেহ কি ধারণা করিতে পার? না জগতে কেহ কখন ধারণা করিয়াছে?

ভগবান্ বাল্মীকি ত এই মায়ামানুষে মন ধারণা করিবার জন্যই তাঁহার চরিত্র চিন্তা করিয়াছিলেন আর ঋষিগণের মতে ইহা ঘোর কলিযুগ অতিক্রমের বড় সহজ উপায়। তুমি আমি যদি এই লঘূপায় অবলম্বন করি তবে আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হওয়াই সম্ভব। অভ্যাস করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

আহা সেই স্নিগ্ধবর্ণ একবার চিন্তা করনা! স্নিগ্ধবর্ণ কি—কখন কি চিন্তা করিয়াছ? নবীন মেঘেরবর্ণ স্নিগ্ধবর্ণ বটে; নবদূর্ব্বাদলের বর্ণ স্নিগ্ধবর্ণ বটে; কালাম্ভোধর কান্তি স্নিগ্ধবর্ণ বটে; চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখনা—কি স্নিগ্ধ রাম রাম রং মাখান এই তরুলতা, এই পর্ব্বত, এই হরিৎবর্ণ ক্ষেত্র। কখন কি ইহা দেখিয়া তাঁরে স্মরণ করিয়াছ? কখন কি শ্যাম শ্যাম রং মাখান নবীন মেঘ দেখিয়া সেই অলকা আবৃত মুখ মাধুরীর স্মরণ অভ্যাস করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক তবে সেই

চরিত্র অগ্রে একটু হৃদয়ে আলোচনা কর, পরে সেই রূপরাশিতে চক্ষু রাখিতে অভ্যাস কর। বড় সহজেই শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকিতে পারিবে।

দেবর্ষি রূপ ও গুণের কথা বলিয়া লীলার কথা বলিতে লাগিলেন।

যৌবরাজ্যে সংযুক্ত হইবার দিনই ইনি পিতৃবাক্য পালন জন্য বন গমন করেন।

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্ব্বচননির্দ্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ ॥

প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁর অনুগমন করেন। আর অনুগমন করেন

রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা।
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ ॥

নারদ তখন সমস্ত রামায়ণের ঘটনাগুলি বলিতে লাগিলেন। শৃঙ্গবের পুরে গুহকমিলন; চিত্রকূটে ভরতমিলন; রাজা দশরথের মৃত্যুসংবাদ; কৈকেয়ী শাস্তুনা; রামপাদুকা লইয়া ভরতের প্রত্যাগমন; দণ্ডকারণ্য প্রবেশ; বিরাধ বধ; শরভঙ্গ, সুতীক্ষ, অগস্ত্যদর্শন; শূর্পনখা বিরূপ করণ; খর, দূষণ, ত্রিশিরা বিনাশ; মারিচ সহায়ে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ; জটায়ু মোক্ষ; কবন্ধবধ; ধর্ম্মচারিণী শ্রমণী শবরী মিলন; পম্পাতীরে হনুমৎমিলন; সুগ্রীব সমাগম; বালীবধ; বানর কর্ত্তৃক সীতান্বেষণ; স্বয়ংপ্রভা সাহায্যে সমুদ্রতীরে আগমন, সম্পাতি সংবাদ; সমুদ্র লঙ্ঘন, সীতাদর্শন; লঙ্কাদাহন; সেতুবন্ধ; লঙ্কাবরোধ; রামরাবণের যুদ্ধ; রাবণবধ; অগ্নিপরীক্ষা; বিভীষণের লঙ্কারাজ্য লাভ; পুষ্পকরথে অযোধ্যা আগমন; ভরতের নিকটে হনুমানের প্রেরণ; নন্দিগ্রামে জটাত্যাগ; রামের রাজ্যলাভ। দেবর্ষি এই সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তার পরে বলিতে লাগিলেন—এই রাজা এখন অযোধ্যার রাজসিংহাসনে।

ইঁহার রাজত্বে এখন কোথাও আর

ন পুত্র মরণং কেচিৎ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষা ক্বচিৎ।
নার্য্যশ্চা বিধবা নিত্যং ভবিষ্যতি পতিব্রতাঃ॥
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা।
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্য যুতানি চ॥
নিত্যং প্রমুদিতা সর্ব্বে যথা কৃত যুগে তথা।

* * * *

চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ লোকেস্মিন্ স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযোক্ষ্যতি॥
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥

নারদঋষি আরও বলিলেন—রামরাজ্যে

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্ম্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জ্জিতঃ॥

এখন এই রাজার রাজ্যে আমরা বাস করিতেছি। তুমি এই রাজার চরিত্র বর্ণনা কর।

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম।
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পঠন্ দ্বিজো বাগৃশ্রত্বমীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমীপতিত্বমীয়াৎ
বণিগ্ জনঃ পুণ্যফলত্বমীয়াৎ
জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ॥

মুনে! তুমি যে রাম চরিত্র লিখিবে তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাগীশ্বর হইবে, ক্ষত্রিয় ভূপতি হইবে, বৈশ্য বাণিজ্যে বিশেষ লাভবান্ হইবে এবং শূদ্র মহত্ত্বশালী হইবে।

—

স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন।

নিজের ঘরে একটি আত্মপ্রবাহ আছে। এই আত্মপ্রবাহের দিকে একবার ফের, শুভ হইবে। বাহিরে ছুটিলে, বাহিরের প্রবাহে ভাসিয়া চলিলে, সুখ পাইবে না। তোমরা আমার আপনার জন. তাই বলিতেছি ঘরে ঢোক, বাহিরে ভাসিও না। করিয়া দেখ। অনেক দিন ত অনেক করিলে—কি হইল বল? এটাও কর না, দেখনা কি হয়?

রূপের জন্য ছুটিতেছ, রসের জন্য ছুটিতেছ, শব্দের জন্য ছুটিতেছ—কত আর ছুটিবে বল। চক্ষু. কর্ণ. জিহ্বা ইত্যাদিকে বিশেষতঃ মনকে একবার আত্মপ্রবাহের দিকে ছুটাও। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়াই উঠিয়া আসিও না। একবার সুখাসনে নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন কর। সকল ইন্দ্রিয়কে আত্মপ্রবাহ একবার লক্ষ্য করাও। আত্মপ্রবাহ বলিতেছি এই জন্য—যে বহু প্রবাহের মধ্যে আপনাকে ফেলিয়াছ। কিন্তু আত্মশক্তির যে প্রবাহ—ইন্দ্রিয়শক্তির প্রবাহ নহে, মনের শক্তির প্রবাহ নহে—এই প্রবাহে একবার চল।

এই আত্মপ্রবাহটা কি জান? আত্মার আহার নিদ্রা নাই, আত্মার মরণ নাই, আত্মার দুঃখ নাই, আত্মার কোন নালিশ নাই; নালিশ করিবারও কেহ নাই; আত্মার বাহিরে দেখারও কিছু নাই; বাহিরে শ্রবণেরও কিছু নাই; ইনিই দ্রষ্টা, ইঁহার দ্রষ্টা কেহ নাই—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে এই চিন্তাপ্রবাহে এক একবার ত্রিসন্ধ্যায় ফেলিতে অভ্যাস কর।

সকল লোকের বিরুদ্ধেই ত নালিশ কর। সংসারটা বড় খারাপ, সমাজ খারাপ, জাতি খারাপ—সব খারাপ বল কিন্তু যে জিনিষটি খারাপ বলা আবশ্যক, তাকে খারাপ কখন বল না। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সহিত মনকে খারাপ বল তবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে, সুখ পাইবে।

কালের স্রোত।

শ্রীভগবান্‌ও কালের স্রোত রোধ করেন না। ধর্ম্মের গ্লানী, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। ধর্ম্মের বিঘ্ন যাহা, তাহা সরাইয়া দিয়া এবং ধর্ম্মের বীজ উপযুক্ত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া তিনি স্বস্থানে গমন করেন। তখন কতকগুলি মানুষ শ্রীভগবানের আজ্ঞামত কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু কালধর্ম্ম সমান ভাবেই চলিতে থাকে; আর কালস্রোতে অধিকাংশ নরনারী ভাসিয়া চলে। ত্রেতার পরে দ্বাপর আসিল। দ্বাপরের পরে কলি আসিয়াছে। অথচ শ্রীভগবান্ ইহার ধর্ম্মস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইহা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি কলির স্রোতে যাহারা গা ঢালিয়া না দিবে তাহাদের সংখ্যা অল্পই। এই অল্প পরিমিত লোক ধর্ম্মপথে চলিবে বটে কিন্তু ইহাদের সম্মুখে বহু লোক কলিস্রোতে ভাসিয়া চলিবে।

যাহারা শাস্ত্র মান্য করিবে, নিত্যক্রিয়া করিবে, দেব দ্বিজে ভক্তি করিবে, শুদ্ধ আচার, শুদ্ধ আহার আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহাদের সংখ্যা অল্পই হইবে। এই অল্প লোকের হতাশ হইবার কিছুই নাই। ইহাদের দ্বারাই শ্রীভগবান্ সত্যযুগ আনয়ন করিবেন। সর্ব্ব যুগেই ইহা হইয়াছে, এখনও ইহা হইতেছে, চিরদিনই ইহা হইবে।

তবে ধীর, স্থিরভাবে ঋষিগণের পথে চলি আইস। ইহাই শুভপথ, ইহাই কল্যাণপথ।

উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১২শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, চৈত্র। { ১২ সংখ্যা।

বর্ষ-পরিবর্ত্তন।

(১)

যেই হইনা কেন জীবন যদি কাহারও জন্য না হয় তবে জীবনটা বড়ই ভারবহ বোধ হয়। তোমার আমার জীবন কার জন্য? প্রকৃতির প্রাণ কার জন্য?

প্রাণ ত দিবার বস্তু। প্রাণ যদি কোথাও না পড়ে তবে ত ইহা জুড়াইতে পারে না। যে প্রাণ কোথাও না দিয়াছে, সে পুরুষই হউক বা স্ত্রীলোকই হউক—সে বায়ুতাড়িত শুষ্ক পত্রের মত কেবল তাড়িতই হইবে। সে কেবল দিন গুণিবে কবে জীবনের দিন কটা ফুরাইয়া যায়। কিন্তু জীবন ত ফুরায় না। আবার আসে; আবার আসে।

বুঝিলাম প্রাণটি দিবারই বস্তু। কিন্তু দিব কাহাকে? প্রাণ নিতে পারে কে? প্রাণের আদর কে জানে?

কত লোকে কত লোককে ত প্রাণ দিতে ছুটে। কিন্তু তবু ত জুড়ায় না। কিছু দিনের জন্য দিয়া—কত প্রকার ঘা করিয়া—নকড়া

ছকড়া করিয়া—বহু ছক্কাই পঞ্জাই খেলিয়া আপনার প্রাণ আপনার কাছেই ফিরিয়া লয়। কত যাতনা ভোগ করে শেষে এই বলিয়া মরে—হায়! কিছুই করিয়া গেলাম না। অনেকেই ত আমরা আছি—এই মুহূর্ত্তে একবার ভাবনা করা হউক না কি করিলাম? নিজের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য—কত কর্ম্মই ত করিলাম, করিতেছি, শেষ পর্য্যন্ত করিব—কিন্তু ঐ প্রশ্নের কি উত্তর পাই? কত লোক ত সুখ্যাতি করে, দেশ বিদেশে নাম জারিও করে, দেশের লোকে—সবাই না হউক—কতক লোকেও ত কত কি বলে কিন্তু প্রাণ জুড়াইয়াছে কি? মরিবার সময় হাসিয়া মরা যাইবে কি?

যে যাহা উত্তর করেন করুন কিন্তু ঋষিগণ বলেন হৃদয়-বল্লভের জন্য জীবনধারণ যে করেনা তার প্রাণ কিছুতেই জুড়ায় না। হৃদয়-বল্লভের জন্য যে কর্ম্ম না করিয়াছে তার কোন কর্ম্মেই—কি লৌকিক, কি বৈদিক—কোন কর্ম্মেই প্রাণের তৃপ্তি আসিবে না, প্রাণের হাহাকার ঘুচিবে না।

আহা! জীবন তখন কত সুখের যখন সকল কর্ম্মই হৃদয়-বল্লভের জন্য হয়? দেহের জন্য, মনের জন্য, পিতা মাতার জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, পুত্র কন্যার জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য, দেশের জন্য, যাহা করি—সবই যদি হৃদয়-বল্লভের জন্য হয় তবে কত সুখ! তার জন্য সবার সেবা করি আহা! ইহা কত সুখের! তার জন্য কর্ম্ম—এ ত যা হোক তা হোক করিয়া করা যায় না। সব প্রাণটি দিয়া যে, তার কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। যতটুকু করি ততটুকুতেই যেন প্রাণ ভরিয়া যায়। যদিই আমার শক্তির অভাবে কর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হয় তথাপি সে কর্ম্মে তার তৃপ্তিই হয়, কেননা সে যে প্রাণই দেখে।

দেহের জন্য, মনের জন্য, পিতা মাতার জন্য, স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, ভুবনত্রয়-স্বদেশের জন্য যাহা করি তাহা আবার হৃদয়-বল্লভের জন্য হইবে কিরূপে?

সেই জন্যই ত বলি হৃদয়-বল্লভকে চিনিতে হয়। জীবের হৃদয়-বল্লভ কে? জড় প্রকৃতির হৃদয়-বল্লভ কে? তোমার আমার সকলের হৃদয়-বল্লভ কে?

শাস্ত্র ত বলেন "মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ"। আমার হৃদয়-বল্লভই জগতের হৃদয়-বল্লভ। কে আমার তবে হৃদয়-বল্লভ—যিনি জগতের হৃদয়-বল্লভ? আমি কি তাঁহাকে আমার প্রিয়তম বলিয়াই চিনি? তিনি কি সত্য সত্যই আমার প্রিয়?

শুন শাস্ত্র কি বলেন—

ইস্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।
তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মমবল্লভম্॥

ক্ষুধার্ত্তের কাছে অন্ন যেমন প্রার্থিত, কৃপণের কাছে ধন যেমন প্রিয়, তৃষ্ণার্ত্তের কাছে জল যেমন মিষ্ট—শ্রীচৈতন্য তেমনি আমার ইষ্ট প্রিয় মিষ্ট—শ্রীচৈতন্যই সেইরূপ আমার হৃদয়-বল্লভ।

আমার হৃদয়-বল্লভের কোথাও কৃপণতা নাই। সদা পূর্ণ থাকিয়াই সবার হৃদয়ে বিরাজ করেন। কাহাকেও ঘৃণা করেন না, কাহাকেও উপেক্ষা করেন না। সকলকেই ধরা দেন—সকলের অনুভবেই আসেন। শ্রীচৈতন্য আছেন—ইহা কে না অনুভব করে? তবে যে তাঁহারে চিনিতে চায়, যে তাহারে জানিতে চায় তিনি তারে বড় আপ্যায়িত করেন। শ্রুতি তাই না বলেন "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি"—তোমাকে জানাই মরণের পরপারে যাওয়া—চিরকাল তারে লইয়া থাকা।

তুমি আমি যাহাকে আমি আমি করি তিনিই কি চৈতন্য? আমি আছি এ অনুভব ত সকলেই করে। কিন্তু এই চৈতন্যই কি সেই পরম পুরুষই? এই চৈতন্যই কি জগৎ চৈতন্য? এই চৈতন্যই কি সর্ব্ব শক্তিমান্? এই চৈতন্যই কি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইষ্টদেব? এই চৈতন্যই কি অনন্তগুণের—অনন্তরূপের—অপার করুণার আকর? এই চৈতন্যই কি সর্ব্বব্যাপী? ইনিই কি নির্গুণ, সগুণ, অবতার, আত্মা? ইঁহারই নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপের কি উপাসনা হয়?

আমি যে সর্ব্বদা বলি আমার শক্তি নাই, আমার কত দুষ্কর্ম্ম হইয়া-গিয়াছে, আমার রোগ শোক আছে, আমি ক্ষুদ্র, আমি কাঙ্গাল, আমি দরিদ্র? কোথায় সেই রাজ-রাজ্যেশ্বর, কোথায় সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক আর কোথায় এই আমি? আমি সেই হইব কিরূপে? জীব শিব কিরূপে?

জীব আপনাকে শিব বোধ করিতে যে পারেনা তাহাই জীবের অজ্ঞান, তাহাই জীবের অবিদ্যা। এই অবিদ্যা দূর করিবার জন্য সেই শিবের শরণাপন্ন হইতে হয়, সেই শিবের আজ্ঞা পালন করিতে হয়। সেই শিবকথিত নিয়ম, সেই শিবকথিত নিত্য কর্ম্ম, সেই শিব-কথিত সংযম, সেই শিবকথিত ধর্ম্ম পালন করিতে প্রাণপণ করিতে হয়। তবেই সেই শিবস্বরূপ পরমপুরুষ জীবকে বরণ করেন, সেই হৃদয়-বল্লভ আপন অনুগতের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন; করিয়া অনুগতকে দেখাইয়া দিয়া থাকেন—দেখ আমিই তোমার স্বরূপ; দেখ আমিই তুমি সাজিয়াছিলাম; আমি সর্ব্বদাই তোমাকে জানিতাম তুমি কিন্তু আমি আছি অনুভব করিলেও আমাকে চিনিতে না, আমাকে জানিতে না, সেই জন্য আমাকে ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে—আমাকে শক্তি-শূন্য করিয়া ভাবিতে—আমাকে কাঙ্গাল দরিদ্র মনে করিয়া কষ্ট পাইতে। আমি তোমার সঙ্গেই আছি, আমি এক দণ্ডও তোমায় ত্যাগ করি না। তুমি আমাকে এত ছোট মনে কর কেন?

দেখ ঘটের মধ্যে যে আকাশ আছে বল দেখি সে আকাশ কি মহাকাশ হইতে খণ্ড হইয়াছে? আকাশের খণ্ড কি তুমি করিতে পার? আকাশকেই যদি খণ্ড করিতে না পার, তবে আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম যে আমি চৈতন্য,বল দেখি সে চৈতন্যকে খণ্ড করে কে? চৈতন্যের কি কখন খণ্ড হয়? আমার অঘটনঘটনা পটীয়সী মায়া তোমাকে ভুলাইতেছে; আমি কিন্তু বলিয়া দিতেছি আমার প্রিয়তমা তুমি, আমার হৃদয় রাণী তুমি, আমার হৃদয়েশ্বরী তুমি, তুমি আমার দিকে চাও দেখিবে মায়া আর তোমায় ভুলাইবে না, আমিই না বলিয়াছি "মম মায়াদুরত্যয়া"

কিন্তু "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" "মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইহাও ত বলিতেছি। তুমি ভয় পাও কেন? এস আমার হৃদয়ে এস। এস তোমার হৃদয়ে আমাকে বসাও। দেখ দেখি তখন তোমার দৈন্য কোথায় যায়?

আমাকে হৃদয়ে না বসাইলে নীচত্ব যাইবে না, ক্ষুদ্রত্ব দূর হইবে না প্রাণ বড় হইবে না। শুন শাস্ত্র কি বলেন—

বিশাল দৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্যত্র পতির্ম্মম।
যেন দৃষ্টির্বিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্॥

আমার পতি—আমার হৃদয়-বল্লভ বিশাল দৃষ্টি বড় ভাল বাসেন। তুমি বাসনা? বড় বড় চক্ষু—পদ্মপত্রের নিম্নে আঁকা চক্ষুর মত পদ্মপলাশলোচন কে না ভালবাসে? ক্ষুদ্র দৃষ্টি কে ভাল বাসে? কোটর চক্ষু প্রিয় কার? যে অবিশাল চক্ষু দলাদলি সম্প্রদায় গড়ে—সকলের মধ্যে হৃদয়-বল্লভ শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মতভেদ উপেক্ষা করিতে না পারে—তারে কে ভালবাসে? আহা! তুমিও বলনা—যেন দৃষ্টির্বিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্—যাহাতে আমার দৃষ্টি বিশাল হয়—যাহাতে সর্ব্বত্র আমি আমার হৃদয় বল্লভ শ্রীচৈতন্যকে দেখি—যাহাতে "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে হয়—আহা! আমাকে সেই মন্ত্র দাও।

এস এস একবার হৃদয়-বল্লভ শ্রীচৈতন্যকে দেখ। সে যে সব সাজে, সব সাজিতে পারে। সে পুরুষ দেহে পুরুষ-চৈতন্য, স্ত্রীদেহে স্ত্রী-চৈতন্য, আকাশ দেহে আকাশ চৈতন্য, সূর্য্য দেহে সূর্য্য চৈতন্য, জল দেহে জল চৈতন্য, বায়ু দেহে বায়ু চৈতন্য, পশু দেহে পশু চৈতন্য, পক্ষী দেহে পক্ষী চৈতন্য, প্রাণে প্রাণ চৈতন্য, বাক্যে বাক্য চৈতন্য। বল আমার হৃদয়-বল্লভের খণ্ডত্ব কোথায়? বল আমার হৃদয়-বল্লভের অভাব কোথায়?

এই যে আজ চৈত্র মাসে ফলে ফুলে নব পল্লব দলে প্রকৃতি দেহ সাজিয়া আসিল—বল এ কার জন্য? এই যে আজ পাখীর স্বর মিষ্ট হইল, ভ্রমরগুঞ্জন মধুর হইল—বল ইহা কার জন্য? বল এই যে জড় প্রকৃতি কত কার্য্য করিতেছে—এ কার জন্য? এ যে তারই সেবায় সবাই ব্যস্ত। এস এস তোমার আমার সব কর্ম্ম তারই জন্য করি এস।

বলনা বসন্তে সারা প্রকৃতিতে কার সাড়া পাও? পাও না কি? বৃক্ষ সকল পত্রশূন্য হইয়া কেমন হইয়াছিল কিন্তু দেখিতে দেখিতে নূতন পল্লবে নূতন পুষ্পেফলে যখন ভরিয়া উঠিল, তখন তোমার মন কি কিছুই চিন্তা করিল না? এ যদি তার সাড়া না হয়, তবে তার সাড়া কিরূপে বুঝিবে বল?

(২)

সাড়া পাওয়া খুব ভাল। মগ্ন হওয়া আরও ভাল। সাড়া পাওয়া ও ডুবে যাওয়া এই দুই যখন ইচ্ছাধীন হয় তখন শেষ।

কেহ ক্লেশ দিতেছে আবার সমস্ত ক্লেশের শান্তি যার কাছে সেও আছে। ক্লেশ ধরিয়া ক্লেশের শান্তি এই ত সব।

ঘটের ভিতরের আকাশ ঘটের বাহিরের মহাকাশকে যখন দেখে, ঘটমধ্যস্থিত খণ্ডমত আকাশটুকু যখন আপন হৃদয়ে বিশাল মহাকাশকে বসায়, তখন যে ক্লেশ দিতেছিল সে ত থাকে না।

চক্ষের উন্মেষ নিমেষেও আয়াস আছে একটি পুষ্পমর্দ্দনেও ক্লেশ আছে—ক্লেশ নাই কেবল সেই অনায়াস-পদে।

যেখানে কর্ম্ম, যেখানে চলন, যেখানে স্পন্দন—সেখানে অনায়াস পদে স্থিতি নাই। স্থিতিশূন্য কোন প্রকার গতিতে অনায়াস নাই।

কর্ম্ম—বৈদিক বল বা লৌকিকই বল—অনায়াসের বিরোধী ইহা। তথাপি কর্ম্ম ধরিয়াই কর্ম্মশূন্য অনায়াস-পদে স্থিতিলাভ করা যায়।

উভয় কর্ম্মই সমকালে করিতে হইবে। একটিকে প্রবল করিয়া অপরটিতে শ্রদ্ধা না করিলে ঋষিপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় জীবন শুকাইয়া যাইবে। এখন সেই কাল চলিতেছে।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহাদের উপদেশ সমকালে দুইই কর। দুই কর্ম্মই কর, সমকালে কর, একজনের সাড়া পাওয়ার জন্য; একজনে ডুবিয়া থাকিবার জন্য; সাড়া পাওয়া ও ডুবে থাকা ইচ্ছাধীন করিবার জন্য; এই ত উৎসব। এই প্রবন্ধে সেই উৎসবের কথাই বলা হইতেছে।

উৎসব উঠিবে তখন, যখন সদা চঞ্চল চিত্তভ্রমর সেই অচঞ্চল

আনন্দভরা স্থিরকমলে আকৃষ্ট হইবে; যখন ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সুখপদ্মে উঠিয়া বসিবে—বসিয়া বসিয়া যখন মধুপান করিবে। এসনা আমরা সেই হৃদয়-বল্লভ-দর্শন-মধু পান করি—আর উৎসব করি।

(৩)

ঘন কুয়াসা! যত সরাও ততই জমে। পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—দূর আকাশে উঠা। সংসারের নরনারীর চিন্তা কুয়াশার চিদাকাশে না উঠা পর্য্যন্ত শান্তি নাই।

আকাশে উড়িতে পাখীর দুইটি পাখারই আবশ্যক হয়। চিদাকাশে উঠিয়া স্থিতিলাভ করিতে হইলে কর্ম্ম দ্বারাই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করা চাই। কর্ম্মসন্ন্যাস জন্যও ফলসন্যাস প্রথমেই চাই। তবেই দেখা গেল কর্ম্ম করিতেই হইবে।

আবার বলি কর্ম্ম করা তখন হয় যখন বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ কর্ম্মই মানুষ করে। সমকালে উভয় কর্ম্ম করারই বিধি। শুধু লৌকিক কর্ম্ম কর, জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। শুধু বৈদিক কর্ম্মকর আটপৌরে ও পোষাকী চরিত্র হইয়া গেল। সমকালে উভয় কর্ম্ম কর, একের সাহায্যে অন্যটি পুষ্টিলাভ করিবে এবং জীবনের লক্ষ্য ভেদ হইবে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা ইহা দেখিয়াছিলেন এবং সেইমত সমাজ গড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ঋষিদিগের গঠিত সমাজশরীর এখন কঙ্কালসার হইয়াছে। তথাপি ঋষিদিগের প্রথামত এখনও ইহা চলিতেছে। ঋষিগণের বংশধরেরা বহু উপায়ে সমাজ ভাঙ্গিতে চান কিন্তু এ সমাজ ভাঙ্গিবে না।

প্রাণ-প্রয়াণও যাঁহাদের চক্ষে উৎসব তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী। সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের উপদেশ মত জীবন গঠিত হউক এই আমাদের লক্ষ্য।

আপনাকে যদি কোন আদর্শের ছাঁচে গঠন না করি তবে আমি পরিবার, সমাজ, জাতি গঠন করিতে সাহস করি কিরূপে? আমার মনটি যে ভাবে গঠিত হইতেছে আমি সেই ভাবেই অন্যকে উপদেশ দিতে সমর্থ। যাহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, যিনি কোন নিয়মের অধীনে থাকিয়া নিজের মনকে কখন নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন

না তাঁহার উপদেশ কখন সজীবভাবে অপরের মধ্যে ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যিনি নিরন্তর মনের গোলামী করেন তিনি প্রতিভাশালী হইতে পারেন অথবা বিদুষী হইতেও পারেন কিন্তু তাঁহার মতের কোন ঠিক থাকিবে না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে মত বদলাইবেন এবং বহু প্রকারে তিনি সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিবেন। উপস্থিত সময়ে এই বিশৃঙ্খলতা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে। সকল জাতির মধ্যে এই বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে। সেই জন্য সকল জাতির মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তনের সময় আসিতেছে।

তাই আমরা ঋষিগণের প্রদর্শিত উৎসবের কথা পাড়িতেছি।

মনুষ্য-জীবনে উৎসব একটিই হয়। এই উৎসবের মূর্ত্তি দুইটি। একটি ভিতরের একটি বাহিরের। বাহিরের উৎসবে সর্ব্বদা অন্য লোকের সাহায্য আবশ্যক করে; ভিতরের উৎসবে প্রথমে মহতের শিক্ষার আবশ্যকতা থাকিলেও শেষে আর কোন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

দুই মূর্ত্তি বিশিষ্ট উৎসব কোনটি?

বলিতেছি হৃদয়-বল্লভের জন্য ভিতরে বাহিরে কর্ম্ম করাই একমাত্র উৎসব। তাঁহার জন্য কর্ম্ম, তাঁহার প্রীতি অনুভব জন্য সংসারধর্ম্ম বা বা রাজধর্ম্ম ইহা যিনি মনে না রাখেন তিনি যত বড় লোকহিতকর কর্ম্মই কেন না করুন ইহাতে জগতের অভ্যুদয় কখনই হইতে পারেনা। কারণ ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব জন্যই মানুষের জীবন। যাঁহার জীবনে এইরূপ লক্ষ্য নাই তাঁহার জীবন কখন ধন্য হয় না। তিনি নিজেও কখনও পূর্ণভাবে আপ্যায়িত হইতে পারেন না, সংসারের কাহাকেও যথার্থ ভাবে আপ্যায়িত করিতে পারেন না।

বাহিরের লোকহিতকর কর্ম্ম যে হৃদয়বল্লভের জন্য করিব তাহা কখনও সুসম্পন্ন হইবে না—যতক্ষণ মানুষ নিজের ভিতরের কর্ম্মদ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা ভিতরে অনুভব করিতে চেষ্টা না করেন। উপস্থিত সময়ে লোকহিতকর কর্ম্মকেই নিজের নিঃশ্রেয়স্ কর্ম্ম ধরিয়া লওয়া

হইয়াছে। এইটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস। যাহারা নিজের হৃদয়ে তাঁহাকে চিনিতে না চেষ্টা করে, নিজের ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে অভ্যাস না করে তাহারা কখনও লোকহিতকর কর্ম্ম তাঁহার জন্য করিতেছি ইহা মনে রাখিতে পারিবেনা। এইরূপ ব্যক্তি তাঁহাকে ভুলিয়া কর্ম্মে মাতিয়া উঠেন এবং কর্ম্মটি সুসিদ্ধ হইলে আনন্দে বেঁহুস হন, আবার নিষ্ফল হইলে হা হুতাশে ম্রিয়মাণ হন। কেন হন? না এক্ষেত্রে তাঁহারা কর্ম্মকেই মুখ্য করিয়া ফেলেন ঈশ্বরের প্রসন্নতাকে গৌণ করেন। এইরূপ লোকের দৃষ্টান্ত আজকাল সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ভাল ভাল লোকও যাঁহারা তাঁহারা আজীবন পরোপকার ব্রত করিয়াও শেষে বড় দীনভাবে দুঃখ করিতে করিতে সংসার হইতে বিতাড়িত হয়েন ইহা দেখা যায়। মরিবার সময় ইঁহাদের মুখে শুনা যায় আমার জীবন নিষ্ফল হইল। ইঁহারা যদি পরহিতকর বাহিরের কর্ম্মের সহিত আত্মহিতকর ভিতরের কর্ম্মও বিশেষ ভাবে করিতেন, তবে ইঁহাদের কোন অনুতাপ আসিতনা।

ঋষিগণ যে উপদেশ দিতেছেন তাহাতে কোন অনুতাপ আইসেনা। তাঁহারা উপদেশ করেন নিত্যকর্ম্ম দ্বারা হৃদয়-বল্লভকে ভিতরে সেবা কর, তবেত লৌকিক কর্ম্মদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতেছ অনুভব করিতে পারিবে। ঋষিগণ এই জন্য সমকালে নিঃশ্রেয়স্ ও অভ্যুদয়ের কর্ম্ম করিতে বলেন ইহার কোন একটি মাত্র করিলে চলিবে না। দুইটি সমকালে অভ্যাস চাই। নিত্যকর্ম্মগুলিকেই মুখ্য কর; করিয়া নিত্যকর্ম্ম পুষ্টিজন্য লোকহিতকর কর্ম্ম ক্রম অনুসারে করিতে থাক। শুধু লোকহিতকর কর্ম্ম করা যেমন দোষের সেইরূপ শুধু আত্মকর্ম্ম করাও অসম্পূর্ণতা। অসম্পূর্ণতা কেন প্রথম অবস্থায় লৌকিককর্ম্ম দ্বারাই আত্মকর্ম্মের পুষ্টি হয়! একটু বিচার করিলেই বুদ্ধিমান্ লোকে ঋষিগণের ব্যাকের গভীরতা দেখিতে পাইবেন। এক্ষেত্রে অন্য যুক্তি দিয়া ইহা বিশদ করা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমরা উৎসবের বর্ষশেষ বলিব।

লৌকিক কর্ম্মের হিসাব অনেকেই লইয়া থাকেন। আমরা বৈদিক

কর্ম্মের হিসাব রাখিতেই বলিতেছি। বৈদিক কর্ম্মগুলি শিথিল হইয়াই ভারতবাসীর দুঃখ বড় বাড়িয়া যাইতেছে। অথচ এই সমস্ত কর্ম্ম, মানুষ আপন আপন চেষ্টায় বেশ করিতে পারে। যদিও বৈদিক কর্ম্ম করা লৌকিক কর্ম্ম করা অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন তথাপি বৈদিক কর্ম্মের ভিতরেই বিশেষ ভাবে ভবরোগের প্রশমন বীজ রহিয়াছে। দুই কর্ম্মেই হৃদয়-বল্লভের সেবা চলুক—ইহাই আমরা বলিতেছি।

কি ভাবে বৈদিক কর্ম্ম করিলে হৃদয়ে সেই হৃদয়-বল্লভের সাড়া পাওয়া যাইবে, কি ভাবে স্বকর্ম্মণা তমভ্যচ্চ্য করিলে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবে তাহা আমরা বর্ষপ্রথমে আলোচনা করিব।

অবগুণ্ঠনে।

যেখানে যা সাজে নানা অলঙ্কারে
সখা! অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়ে,
আভরণে তনু আবরিবে ভাবি
আহা! কত সাজে আছ সাজিয়ে।
'আন' আবরণে আপনা ভুলাতে গিয়ে
আপন প্রেমে ধরা পড়ে গেছ,
নিঠুর সাজিয়ে আমারে কাঁদাতে ছলে,
আহা! কত আপনি কেঁদেছ।
সখা! ও বেশেতো বেশ পড়েনি'কো ঢাকা
লুকাতে পারনি অপার স্নেহ,
ওগো! করুণা তোমার হিমগিরি ভেদি
প্লাবিয়া দিয়াছে জগৎ-গেহ।
রূপ আবরণে বৃথা অরূপ রতনে
ঢাকিতে গিয়েছে যতন করি,
ওযে তোমার প্রকৃতি ধরায়ে দিয়েছে
বসনে বিজলী রাখিবে ধরি!

অনুষ্ঠানতত্ত্ব।

(প্রাতঃস্মরণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[২য়]

চক্ষুঃ, কর্ণ, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এখন আমাদের বহির্মুখী। বাহ্যজগতের শোভা, বাহ্যজগতের ভোজ্য, বাহ্যজগতের নৃত্যগীতাদি সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতেছে, এ আকর্ষণে কর্ত্তব্যপথে অটল থাকা নিতান্তই দুঃসাধ্য, কদাচিৎ পদস্খলন হওয়াও সম্ভব। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যদি কেহ কখনও কোন গুরুতর পাপ আচরণ করিয়া ফেলে, তবে কি "ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি" ভেবে অগাধ পাপপঙ্কে নিজকে ডুবাইয়া অনন্তকাল দারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে, না উদ্ধারের কোন উপায় আছে? যদি উপায় থাকে তবে ত আশা হইবে; আশা-সূত্র ধরিয়া তবে ত পাপী পাপপঙ্ক ধৌত করিতে সচেষ্ট হইবে। ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এমন কি কাহারও চরিত্র দেখা যায় না, যিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে অতি গর্হিত পাপ আচরণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় সাধনা লইয়া পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পুনশ্চ পাপমুক্ত হইয়াছেন? পাপ-রাহুগ্রস্ত তাঁহার বিবেক-সূর্য্য পুনঃ দীপ্তি পাইয়াছে? যাঁহাদের চরিত্র এরূপ তাঁহারা, ইন্দ্রিয় আকর্ষণে কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট— আমাদের আদর্শ। তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের শোকের বড়ই শান্তি-দাত্রী। অনেকে আজকাল প্রশ্ন করেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীগণ থাকিতে অহল্যা প্রভৃতি ব্যভিচারিণীগণ কেন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া? তাহার উত্তর এই "পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী" দময়ন্ত্যাঃ নলস্য চ" প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকে সীতা প্রভৃতিকে ত স্মরণ করাই হয়। সীতা প্রভৃতির চরিত্র আমাদের স্পৃহনীয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের

চরিত্রের অনুকরণ করা একান্ত দুঃসাধ্য, কারণ নিত্যশুদ্ধা, নিত্যমুক্তা তাঁহাদের চরিত্রে ও আমাদের চরিত্রে অনেক প্রভেদ-আকাশ-পাতালের প্রভেদ, স্বর্গ-নরকের প্রভেদ। আমাদের হৃদয় অনুসন্ধান কর—বুঝিবে পাপের সে লীলাভূমি, শত শত ব্যভিচার সেখানে, তাই কলুষহৃদয় তোমার আমার সীতা প্রভৃতি দেবীগণের চরিত্র স্পৃহনীয় হইতে পারে ; অনুকরণ করা দুঃসাধ্য কারণ পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন, মূকের বাচালতা যেরূপ অসম্ভব, সেরূপ অসম্ভব তোমার আমার পক্ষে তাঁহাদের চরিত্রের অনুকরণ করা।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট অথবা অন্য কোন কারণে ব্যভিচারিণী হইয়াও পরে সাধনা দ্বারা পাপপঙ্ক ধৌত করিয়া অনুতপ্ত হইয়া পবিত্র হইয়াছেন, সেই অহল্যা প্রভৃতির চরিত্র পাপানলদগ্ধ তোমার আমার অনুকরণায়।

সুন্দরী শিরোমণি অপ্সরা অহল্যা, মহাতপা গৌতমের পত্নী। একদা গৌতমের অবর্ত্তমানে অহল্যারূপমুগ্ধ গৌতমবেশধারী ইন্দ্র অহল্যা সকাশে উপস্থিত হইয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনা জানাইল। গৌতমবেশধারীকে ইন্দ্র বলিয়া জানিয়াও বাহ্যেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, দুর্ব্বুদ্ধি ও দিব্য রমণকৌতুক বশতঃ ইন্দ্রের সে বাসনা পূর্ণ করিল পাপীয়সী অহল্যা। গোপনে দুষ্কর্ম্ম করিয়া কে কবে অব্যাহতি পাইয়াছে ? সেই বিশ্বপতি বিশ্বময়কে কে কবে ফাঁকি দিতে সক্ষম হইয়াছে ? যে স্থলে যত গোপনের চেষ্টা, সে স্থলে তত শীঘ্র পাপ প্রকাশ পায়। কুটীর হইতে বহির্গত হইবার সময় গৌতমবেশধারী ইন্দ্রের সহ গৌতমের সাক্ষাৎ ঘটিল। ইন্দ্র ও অহল্যা গৌতম কর্ত্তৃক অভিসপ্ত হইলেন। অহল্যাকে গৌতম বলিলেন তুই এই আশ্রমে বহু সহস্র বৎসর নিরাহারা বাতভক্ষ্যা ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর পতিত তারণ দীনবন্ধু রামচন্দ্রের পূত চরণরজঃস্পর্শে পাপমুক্তা হইবি ও তাঁহাকে আতিথ্য করিয়া লোভ মোহবর্জ্জিতা হইয়া স্বীয় রূপ পুনঃ লাভ করিয়া আমার

সহিত মিলিত হইবি”। শাপগ্রস্তা অনুতপ্তা অহল্যা দিবারাত্র “রাম রাম” নাম জপ করিতে করিতে,তৃষিতা চাতকিনীর মত আশাপথ চাহিয়া রহিল। যে দেহের ও যে ইন্দ্রিয়ের সুখের আশায় প্রাণনাথকে ভুলিয়া, কল্পনায় জগন্নাথের চক্ষে ধুলি দিয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল, শীত আতপে সে দেহের সে ইন্দ্রিয়ের শোষণ করিতে লাগিল। খাদ মিশ্রিত স্বর্ণ অগ্নিতে পুড়িতে লাগিল। পাপের হৃদয়শোষী দীর্ঘনিশ্বাস জগন্নাথের উদ্দেশে ত্যাগ করিত আর ভাবিত প্রাণ বুঝি যায় দেখা বুঝি ঘটিল না। বহু বৎসর গত হইল দয়াময়ের আসন টলিল, নীরদ যেমন তৃষিতা চাতকিনীর তৃষ্ণা মিটায়, দয়াময় নীরদবরণ সেরূপ ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পাপ করিয়া, পরে অনুতপ্ত হইয়া সাধনায় সে পাপ পঙ্ক দয়াময়ের করুণাবারি দ্বারা ধৌত করিয়া পবিত্রা অহল্যা পুনঃ স্বামীসোহাগিনী হইলেন। একবার ব্যভিচার ঘটিলে, কিরূপে ব্যভিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পাপকে পরাস্ত করিয়া পবিত্র হওয়া যায় জগতকে অহল্যা তাহা শিক্ষা দিলেন, তাই ঐরূপ চরিত্র আমাদের স্পৃহনীয় অনুকরণায় দুইই। পাপীর ব্যভিচারীর উদ্ধারের আশা, অহল্যার স্মৃতি। দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীকে এক ইন্দ্র জানিয়া পাঁচে এক করিয়া সংসার করিয়াছেন। তারা নিজের হৃদয়বিদারক দীর্ঘনিশ্বাস আর্ত্ত ত্রাতার চরণ উদ্দেশে ত্যাগ করিতেন। “ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক নারীর তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে” স্বামীর এই কথা শুনিয়া “আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া” ইহা মনে করিয়া পতিব্রতা কুন্তী দেবগণ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, এত যাঁর স্বামীভক্তি তিনি লোকচক্ষে ভ্রষ্টা, কিন্তু ভগবানের কাছে নয়, তাই কৃষ্ণ তাঁকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। ব্যভিচারের মধ্যেও ভগবান্‌কে লইয়া কিরূপে অব্যভিচারিণী থাকিতে হয় মন্দোদরী তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। এ পঞ্চকন্যা জীবন্মুক্তা ইহা ভগবদুক্তি। ঝুনো নারিকেলের উপর নিরস, কিন্তু ভিতরে শীতল জল ও শাঁস থাকে শুধু উপর হইতেই, (বিশ্লেষণ না করিয়া) সমালোচনা করিতে

নাই, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হয়, পঞ্চ কন্যার চরিত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিলে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। কয়জনই শিক্ষা দিয়াছেন যতই দুষ্কর্ম্ম কর না কেন শেষে যদি অনুতপ্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাপন্ন হও ভগবান্ সকল পাপ নাশ করেন। তাই ব্যভি-চারগ্রস্ত তোমার আমার ঐ পঞ্চ কন্যা আদর্শ। এস তাঁহাদের স্মরণ করিয়া নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, ভগবানের শরণাপন্ন হই; পাপের তরাশে আমাদের যে হৃদয় কাঁপিতেছে সেই কম্পিত হৃদয় তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া শরণাপন্ন হই, তাহা হইলে এ হা হুতাশের শান্তি হইবে। অহল্যা দ্রৌপদী প্রভৃতি পঞ্চ কন্যা, আমাদের আশ্বাস দিতেছেন ভগবৎ কৃপায় তাঁহারা এখন জীবন্মুক্ত—এস প্রতি প্রভাতে তাঁহাদিগকে স্মরণ করি। বলি—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

ইহাতে দুর্ব্বল হৃদয়েও বল সঞ্চার হইবে।

গাঢ় অন্ধকার, যে অন্ধকারকে মনুষ্য শত শত চেষ্টা করিয়াও নাশ করিতে পারে না সূর্য্যের উদয়ে যে অন্ধকারের নাশ হয়, যাঁর শক্তিবলে সূর্য্য বলীয়ান্ ভর্গস্বরূপিনী দুর্গতিহারিণী সেই দুর্গার নাম যে প্রাতঃ-কালে স্মরণ করে তার কি আপদ থাকিতে পারে? সূর্য্যোদয়ে যেমন তমোনাশ হয় তারও আপদ দুর্গানাম স্মরণ করিলে সেইরূপ নষ্ট হয়। বিপদ নাশ করিতে অভিলাষী হইয়া এস প্রতি প্রভাতে সেই বিপত্তারি-ণীর নাম স্মরণ করি। বলি—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

আরও ইষ্টদেবতা প্রভৃতির নাম যিনি যেরূপ সক্ষম হন করিবেন বিস্তারভয়ে এইখানেই প্রাতঃস্মরণ সমাপ্ত করিলাম।

(ইতি প্রাতঃ স্মরণ)

শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ,—(ভাটপাড়া)।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচয়।

কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ॥

মহাকবি কালিদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি যেমন অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক, তদ্রূপ মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কারের অক্ষয় কীর্ত্তি "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা"। এইরূপ একটী উদ্ভট কবিতা পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধ আছে।

বস্তুতঃ, নব্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রায় শেষ অথচ সর্ব্বোত্তম পণ্ডিত মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার কীর্ত্তি অতুলনীয় বলিলেই হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলি সর্ব্বাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এমন পণ্ডিত, আজ জগতে অতি বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা জগদীশের স্বরচিত গ্রন্থ, ইহা কোন গ্রন্থের টীকা নহে। টীকা লিখিয়া যদ্যপি অনেকে আরও উচ্চপদবী লাভ করিয়াছেন, কিন্তু স্বরচিত গ্রন্থদ্বারা এত উচ্চস্থান লাভ, আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা গ্রন্থে ব্যাকরণশাস্ত্রখানি ন্যায়ের সাহায্যে প্রোজ্জ্বলিত করা হইয়াছে, ন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ব্যাকরণোক্ত লক্ষণ ও নিয়মাদিকে পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে। পদ, পদার্থ, বাক্য ও বাক্যার্থ হইতে কিরূপ শাব্দ জ্ঞান হয়, তাহা এই গ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এমন আর কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। এই শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া যিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহার সংস্কৃতভাষায় নিরতিশয় প্রগাঢ় অধিকার জন্মে। অল্প দিন হইল এই গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার দুরধিগম্যতাপ্রযুক্ত ইহার মধ্যে প্রবেশ-লাভে অনেকেই বঞ্চিত আছেন। সাধারণের এই অভাব উপলব্ধি করিয়া আমরা তাহার যথাসাধ্য অপনয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধসামর্থ্য, তাহার প্রকাশক। এতদ্দারা এই শাস্ত্রের বিষয় ও সম্বন্ধ কথিত হইলে বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থের প্রামাণ্য ও প্রয়োজনকথন যে কারণে আবশ্যক, সেই কারণেই গ্রন্থের অধিকারী, বিষয় আর সম্বন্ধকথনও উচিত। এই জন্য গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞাবাক্যের মধ্যে কৌশলে তাহাই বলিলেন।

টীকা। গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতাং শব্দময়ীং দেবতাং গ্রন্থকৃৎ স্মরতি স্ম—

অনুবাদ—গ্রন্থের আরম্ভকার্য্যে গ্রন্থকার বিঘ্নবিনাশার্থ যথোপযুক্ত শব্দময়ী দেবতার স্মরণ করিতেছেন।

তাৎপর্য্য—'গ্রন্থারম্ভ' শব্দের অর্থ—গ্রন্থের আরম্ভ। গ্রন্থশব্দের অর্থ আনুপূর্ব্বী বা পারম্পর্য্যবিশিষ্ট বাক্যসমূহ। 'আনুপূর্ব্বী' শব্দের অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট চরণবর্ণত্ব। আরম্ভ শব্দের অর্থ—আদ্যকৃতি, অর্থাৎ প্রথম প্রযত্ন।

'বিঘ্নবিঘাতায়' শব্দের অর্থ—বিঘ্নবিনাশের জন্য। সুতরাং, এতদ্দারা বুঝা গেল মঙ্গলাচরণের ফল—বিঘ্ননাশ অর্থাৎ দুরদৃষ্টধ্বংশ। গ্রন্থসমাপ্তি, মঙ্গলাচরণের ফল নহে। গ্রন্থসমাপ্তি, ইহার ফল হইলে দুরদৃষ্টধ্বংসকে দ্বার অর্থাৎ ব্যাপার বলিতে হয়, অতএব গৌরব হয়। এজন্য বিঘ্নধ্বংসই এই মঙ্গলাচরণের ফল। সমাপ্তিটী, বুদ্ধি ও প্রতিভাদির ফল। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ মুক্তাবলী অথবা তত্ত্বচিন্তামণির মঙ্গলবাদে দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলাচরণম্।

অনুভবহেতুঃ সকলে সদ্যঃ সমুপাসিতা মনুজে।
সাকাংক্ষাসন্না চ স্বার্থে যোগ্যা সরস্বতী দেবী ॥২

অন্বয়—সাকাংক্ষা আসন্না স্বার্থে যোগ্যা চ সরস্বতীদেবী সমুপাসিতা (সতী) সকলে মনুজে সদ্যঃ অনুভবহেতুঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—দয়াদ্র হৃদয়া নিকটবর্ত্তিনী এবং উপাসকের অভিলাষিত-প্রদানে সমর্থা সরস্বতীদেবী সম্যক্ উপাসিতা হইলে সকল ব্যক্তিরই পক্ষে অনুভবের হেতু হন।

অথবা ভাষা যদি আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি এবং নিজ অর্থে যোগ্যতাযুক্ত হইয়া সমুপাসিতা অর্থাৎ উচ্চারিতা হয়, তবে তাহা সকল ব্যক্তিরই সম্ব অনুভবের হেতু হয়।

তাৎপর্য্য—এস্থলে সাকাঙ্ক্ষপদের অর্থ—আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। আকাঙ্ক্ষা শব্দের অর্থ—যে পদটী ব্যতীত বাক্যের অর্থবোধ হয় না, সেই পদবত্তা।

বাক্যে এই আকাংক্ষা না থাকিলে অর্থাৎ বাক্যটী সাকাংক্ষ না হইলে শাব্দবোধ হয় না। যেমন "রামো গচ্ছতি হসতি চ" এই বাক্যে "চ" পদটী না থাকিলে 'রামো গচ্ছতি হসতি' এই মাত্র বলিলে ঐ 'চ' পদরূপ আকাংক্ষা না থাকায় এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। এজন্য সাকাংক্ষা এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে। নব্যগণ আনুপূর্ব্বীকেও আকাংক্ষা বলিয়া থাকেন। 'আনুপূর্ব্বী'র অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট চরমবর্ণত্ব। ইহার জ্ঞান শাব্দবোধে কারণ হয়।

'আসন্না' পদের অর্থ—আসত্তিবিশিষ্ট। 'আসত্তি' পদের অর্থ—সান্নিধ্য। ইহার জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ হয়। যেহেতু "পর্ব্বত অগ্নিমান্ এবং দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি আহার করিয়াছে" এইরূপ তাৎপর্য্যে যদি কেহ বলে "গিরির্ভুক্তম্ অগ্নিমান্ দেবদত্তেন" অর্থাৎ 'পর্ব্বত খাইয়াছে, অগ্নিমান্ দেবদত্ত কর্ত্তৃক' এরূপ হইলে শাব্দবোধ হয় না। কারণ 'গিরি' ও 'অগ্নিমান্' এবং 'ভুক্তং' ও 'দেবদত্তেন' এই সকল পদের নৈকট্য নাই। এজন্য 'আসন্না' বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। 'স্বার্থে যোগ্যা' অর্থ—নিজের অর্থে যোগ্যতাবিশিষ্টা। 'যোগ্যতা' শব্দের অর্থ—যে পদার্থে যে পদার্থের অন্বয় করিতে হইবে, সেই পদার্থে সেই পদার্থবত্তা। ইহার জ্ঞানও শাব্দবোধের হেতু, কারণ 'অগ্নিনা সিঞ্চতি' বলিলে অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে বুঝায়। কিন্তু, সেচন পদার্থে বহ্নি-করণকত্ব নাই, অর্থাৎ বহ্নির দ্বারা সেচন ক্রিয়া সম্ভব নহে, এজন্য সৎ শাব্দবোধও হয় না। সুতরাং 'স্বার্থে যোগ্যা' এই পদটীকে সরস্বতীরূপ বাক্যের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ।

বর্ষ-বিদায়।

তোমারেই সাথী করি যাপন ক'রেছি
সুখ দুখে মিশামিশি দ্বাদশটি মাস;
সম্পদে প্রীতির হাসি বিপদে আশ্বাস
তোমারি নিকট হ'তে সতত পেয়েছি।

কি মহৎ উদ্দেশ্যের ধরি অবয়ব
ধনী কি নির্ধন মাঝে হে প্রিয় বান্ধব!
দেশ ও দশের আহা উন্নতি কারণ
জ্ঞানীর লেখনী হ'তে লভেছ জনম!

কি দিব তোমারে আমি কি আছে আমার,
বিভু পাশে মাগি দীর্ঘ জীবন তোমার;
শিরে ধরি বিধাতার অমূল্য আশিস্
ঢালহ সবার প্রাণে অপূর্ব্ব হরিষ।

নববর্ষে ঘরে ঘরে বিরাজিত হও
সাধনতত্ত্বের কথা শুনিয়ে বেড়াও!

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্।

কারিকা ও ভাষ্যাবলম্বনে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে

মূল উপনিষদ্ বুঝিবার প্রয়াস।

প্রথম খণ্ড।

"माण्डूक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये"

मुक्तिकोपनिषद्।

শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) এম, এ

আলোচিত।

উৎসব আফিস ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮৩৯, সাল ১৩২৪, ইং ১৯১৭ ৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

"নিউ আর্য্য মিসন প্রেস" ৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,

শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভি র্ব্যাপ্যলোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপিধিষণোদ্ভাসিতান্ কাম্যজন্যান্।
পিত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্ মায়য়া ভোজয়ন্ নো
মায়াসংখ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥১॥

যো বিশ্বাত্মা বিধিজবিষয়ান্ প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্চান্যান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা স্বেন সূক্ষ্মান্।
সর্ব্বানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা
হিত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ বিগতগুণগণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥২

[ভগবান্ ভাষ্যকার পরম দেবতার নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন]।

"পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি" অমৃত-মরণ রহিত, অজ-জন্ম-রহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি। সেই পরব্রহ্ম কিরূপ ? না—যিনি স্থির-স্থাবর, চর-জঙ্গম এই চরাচর সমূহ ব্যাপী সূর্য্যের রশ্মি বিস্তারের ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিস্তার করিয়া সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন; যিনি জাগ্রৎকালে স্থূল বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া স্বপ্নকালে পুনরায় বুদ্ধি সমুদ্ভাসিত, অবিদ্যা কাম কর্ম্মজাত সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ ভোগ করেন; যিনি সুষুপ্তিকালে জাগ্রতের স্থূল বিষয় এবং স্বপ্নের সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ পান করিয়া, আপনাতে লয় করিয়া অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কোন বিষয় অনুভব না করিয়া আর কিছুনা থাকা জন্য মধুরভুক্ বা আনন্দভুক্ হইয়া শয়ান থাকেন; যিনি মায়াদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ আমাদিগকে মায়াকৃত মিথ্যারূপা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা ভোগ করান এবং যিনি মায়াকল্পিত মিথ্যা সংখ্যা যে জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি তাহার সম্বন্ধে তুরীয়—চতুর্থ কিন্তু বাস্তবপক্ষে সর্ব্বসংখ্যাতীত

শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে কোন সংখ্যাই হইতে পারে না এইরূপ অমৃত অজ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥১॥

[চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার কল্পনা দেখাইতেছেন]। যে বিশ্বাত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বিধি হইতে উৎপন্ন স্থূল বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বপ্নের হেতুভূত যে সমস্ত কর্ম্ম তাহাদের অভিব্যক্তি হইলে পর স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে উৎপন্ন অপরাপর সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ আত্ম জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশ করিয়া তাহাতে আমি আমার রূপ অভিমান করেন পুনরায় যিনি এই সমস্ত বিষয় ধীরে ধীরে আপন আত্মায় লয় হইতে দেখেন এবং পরিশেষে যিনি সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভাবও ত্যাগ করিয়া গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন সেই তুরীয়রূপ পরমাত্মা মোক্ষ প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥২॥

প্রশ্ন—বিশ্বাত্মা কে ?

উত্তর—আত্ম-চৈতন্য যিনি, তিনি তাঁহার এই বিরাট শরীর রূপ যে বিশ্ব তাহাতে যখন "আমি আমার" রূপ অভিমান করেন তখন তিনি বিশ্বাভিমানী জীবরূপ হয়েন। ইনিই বিশ্বাত্মা।

প্রশ্ন—বিশ্ব কোনটি ?

উত্তর—পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের বিচিত্র কার্য্য এই লইয়া বিশ্ব। বিরাট পুরুষের স্থূল শরীর হইতেছে এই বিশ্ব। জাগ্রৎ কালে যিনি এই বিপুল বিশ্বে "আমি আমার" রূপ অভিমান করেন তিনি বিশ্বপুরুষ। তুরীয় আত্মা, মায়া ভাসিলে যখন বিশ্বাভিমানী হয়েন তখন ইনি বিশ্বাত্মা।

প্রশ্ন—বিধিজ বিষয়ান্ স্ববিষ্ঠান্ ভোগান্ প্রাশ্য-ইহা কিরূপ ?

উত্তর—স্থূল ভোগ সমূহ বিধি হইতে জাত কিরূপে দেখ।

অবিদ্যা ও কাল এই উভয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ বিধি। বিধি হইতে জন্মিতেছে সূর্য্যাদি দেবতা। সূর্য্যাদি দেবতার অনুগ্রহ সহিত যে চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় তদ্দ্বারা বুদ্ধির যে পরিণাম তাহা হইতেছে বিষয়। বিষয় যাহা তাহা অত্যন্ত স্থূল।

স্থূল বলিয়াই ভোগ করিবার যোগ্য। জাগ্রৎকালে বিশ্বপুরুষ ভোগ্য স্থূল বিষয়কে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া স্থিত হয়েন।

প্রশ্ন। চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রৎ অবস্থার কল্পনা বুঝিলাম এখন বলুন চৈতন্য আত্মাতে স্বপ্নাবস্থার আরোপ কিরূপে হয়?

উত্তর। জাগ্রতের হেতু যে সমস্ত কর্ম্ম সেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পর স্বপ্নের হেতু যে সমস্ত কর্ম্ম তাহারা উদ্ভূত হয়। উদ্ভূত হইলে জাগ্রৎকালের স্থূল বিষয় হইতে ভিন্ন, সূক্ষ্ম বিষয় সকল অনুভূত হয়। ঐ সময়ে বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। তখন অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম ইহাদের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি আপনার প্রকাশরূপ প্রভাবে অন্তঃকরণের বাসনা সমূহ উৎপন্ন হইতে দেখেন। স্বপ্নকালে সূর্য্যাদির প্রকাশ অনুভূত না হইলেও ঐরূপ একটা সংস্কার বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত হয়। সূর্য্যাদির প্রকাশ নাই তথাপি বাসনা সমূহ দেখা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয় আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত—অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রারূপ পঞ্চমহাভূত এবং তাহাদের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চময় হিরণ্যগর্ভ শরীর। হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতেছে এই বাসনাময় স্বপ্নাবস্থা। এই স্বপ্নাবস্থাতে "আমি আমার" রূপ অভিমান যে চৈতন্য আত্মা করেন তিনিই হইতেছেন তৈজস নামক জীব।

বিশ্বপুরুষ, পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তাহাদের কার্য্যরূপ স্থূল প্রপঞ্চময় যে বিরাটের শরীর তাহাতে অভিমান করেন; আবার তৈজস পুরুষ অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রারূপ পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চময় যে হিরণ্যগর্ভের শরীর তাহাতে অভিমান করেন।

প্রশ্ন। আত্মার স্থূল বিষয় ভোগ এবং সূক্ষ্ম বিষয় ভোগের কথা বুঝিলাম এখন আত্মাতে সুষুপ্তি অবস্থার কল্পনা কিরূপ তাহাই বলুন।

উত্তর। যে কোন রূপ ভোগ হউক না কেন—স্থূল ভোগই বল আর সূক্ষ্ম ভোগই বল তাহাতে শ্রম আছেই। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে পুরুষের যে শ্রম উৎপন্ন হয় সেই শ্রমকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলে আত্মা

সব ছাড়িয়া আপন স্বরূপে প্রবেশ করেন। তখন কোন ভোগেচ্ছাও থাকে না কোন স্বপ্নও থাকে না। অবিদ্যা বশে আত্মা এই সুষুপ্তিতে আগমন করেন স্বরূপে প্রবেশ করিলেও পুরুষ আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারেন না। এই অবস্থায় চৈতন্য আত্মা প্রাজ্ঞ নামক জীব।

প্রশ্ন। যে তুরীয় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে "পাত্বসৌ ন স্তুরীয়ঃ" ইনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অভিমানী পুরুষ হইতে ত স্বতন্ত্র ?

উত্তর। শ্রুতির উপদেশ স্মরণ—সেই উপদেশ পুনঃ পুনঃ মনন অভ্যাস তাহার পরে শ্রুতি প্রমাণ জনিত জ্ঞানে স্থিতি বা ধ্যান এই হইলে তবে তুরীয় আত্মার দর্শন হয়। যখন জাগ্রতের স্থূল দৃশ্য দর্শন থাকে না, স্বপ্নের সূক্ষ্ম দৃশ্য দর্শন থাকে না, সুষুপ্তির অজ্ঞান আচ্ছাদন থাকে না, গুণময়ী প্রকৃতি হইতে পুরুষ আপনাকে পৃথক্ করিয়া যখন অবস্থান করেন—যে মন লইয়া সাধনা হইতেছিল সেই মন লবণপুত্তলিকার সমুদ্র মাপিতে গিয়া গলিয়া যাওয়ার মত যখন সেই সচ্চিদানন্দ চলনরহিত পরমপদ দেখিয়া দেখিয়া তাহাতে ডুবিয়া তাহাই হইয়া যায়, দেখিতে দেখিতে "থির নয়ন জনুভৃঙ্গ আকার মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার"—শুধু "উড়ই না পার" নয়, মন যখন আপন সত্তা হারাইয়া সেই পরমপদের সত্তাকে নিজ সত্তা করিয়া স্থিতিলাভ করে তখনই তুরীয়রূপ পরমাত্মা স্বস্বরূপে বিশ্রাম করেন। ইহারই কাছে কল্যাণ ভিক্ষা করা হইল।

—০—

মাণ্ডূক্য উপনিষদের অবতরণিকা।

অবতরণিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

(১) সকল মানুষের প্রয়োজন কোন্‌টি ?

(২) বেদে উপনিষদের স্থান।

(৩) উপনিষদে কি আছে ?

(৪) উপনিষদ্‌ কাহাকে বলে ? অর্থ কি ? অধিকারী কে ? প্রয়োগ।

(৫) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায়।

(৬) শেষ কথা।

(৭) মাণ্ডুক্যে কি আছে ? এই নাম কেন ? ইহার বিশেষত্ব।

অবতরণিকার সার কথা বলিয়া অবতরণিকার বিষয়গুলি আলোচনা করা হইয়াছে।

তমেব বিদিত্বাऽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেऽয়নায়॥

মৃত্যু অতিক্রম করাই নরনারীর জীবনের সর্ব্বপ্রধাম উদ্দেশ্য। তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা। মৃত্যু অতিক্রম করা রূপ বিষয় সংসার মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

তোমাকে জানিতে হইবে। জানা দুই প্রকার। পড়িয়া শুনিয়াও জানা এবং যাহা জানিতে চাই তাহা অনুভব করিয়া তাহা হইয়া যাওয়াও জানা। প্রথম জানা পরোক্ষ, দ্বিতীয় প্রকার জানা অপরোক্ষ।

যাঁর মৃত্যু নাই তাঁর মতন হইয়া স্থিতিলাভ ভিন্ন মৃত্যু অতিক্রম করা যায় না। আত্মার মৃত্যু নাই। আত্মাই চেতন। চেতন কখন অচেতন হন না। স্বরূপের ধ্বংস কখনও হয় না। এই আত্মভাবে স্থিতিই স্বরূপ বিশ্রান্তি। ইহাই অমর হওয়া। ইহাই মুক্তি। এই মুক্তিই মনুষ্য নামধারী জীবভাবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন জন্যই মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি।

আত্মাকে জানা যাইবে কিরূপে ?

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।
আত্মাকে দেখিতে হইবে। সেই জন্য আত্মার কথা শুনিতে হইবে। শুনিয়া সদাসর্ব্বদা মনন করিতে হইবে। তবেই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করা যাইবে। ধ্যান করিতে করিতে আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারাই আত্মার দর্শন পাওয়া। আত্মাকে দেখা, আত্মাকে জানা এবং আত্মভাবে স্থিতিলাভ করা একই কথা। **ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।**

আত্মার কথা শুনিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই। এই অবলম্বন ত্রিবিধ। প্রথমটি ওঁকার। দ্বিতীয় গায়ত্রী বা শক্তি বা বীজ। তৃতীয় নামরূপধারী মূর্ত্তি।

ওঁকারকে বিবৃত করেন গায়ত্রী। গায়ত্রী ধ্যানের জন্য নামরূপ বিশিষ্ট মূর্ত্তি। এই তিন অবলম্বন লইয়াই মন্ত্র। মন্ত্রে প্রণব বীজ ও নাম থাকে। কোথাও এই তিনটির একটি একটি মাত্রকেও অবলম্বন করা হয়।

ওঁকারই এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগৎ। আবার এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতই ব্রহ্ম। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই জন্য আত্মার ব্যাখ্যা আবশ্যক। মাণ্ডূক্য শ্রুতি আত্মার কথাই শুনাইতেছেন। শ্রুতিমুখে শুনিয়া সদা মনন করা, পরে ধ্যান করা ইহা ভিন্ন মৃত্যুসংসারসাগর অতিক্রম করা যাইবে না। এই সার কথা কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা যাইতেছে।

(১)

সকল মানুষের প্রয়োজন কোনটি ?

রোগাতুরের প্রয়োজন যেমন রোগশান্তি করিয়া সুস্থ হওয়া, তেমনি ভবরোগাতুরের প্রয়োজন হইতেছে ভবরোগের উপশম করিয়া সুস্থ হওয়া বা স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করা।

সকল মানুষই কি ভব রোগাক্রান্ত ?

যাহারা ভবরোগের উপশম জন্য কোন সাধনা করে না তাহারা সকলেই রোগাক্রান্ত।

ইহাও ত আশ্চর্য্য যে রোগাতুর মানুষ নিজে বুঝিতে পারে না যে, সে রোগার্ত্ত। সকল মানুষই যে ভবরোগগ্রস্ত তাহারা ত ইহা স্বীকারই করে.না।

স্বীকার না করাই ত রোগের চিহ্ন। পাগল প্রায়শই বলিতে চায় না যে, সে পাগল। টাইফয়িডের রোগী, বিকার অবস্থায় পড়িয়া থাকে কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে কেমন আছ তাহার উত্তরও দেয়। .বলে বেশ আছি। ইহা কিন্তু বিকারেই বলে। বিকার একটু যখন কাটিতে আরম্ভ হয় তখন নিজের বিপদ্ বুঝিতে পারে।

যাহারা ভবরোগগ্রস্ত তাহাদের বিকারও এতদূর প্রবল যে, তাহারা বুঝিতেই পারেনা তাহাদের রোগ কি ?

আচ্ছা রোগ ত মানুষকে আতুর করে। ভবরোগী আর্ত্ত কোথায় ?

দেহের রোগ যখন হয় তখনও কিন্তু মানুষ একটানা যাতনা ভোগ করে না। সময়ে সময়ে ভালও থাকে।

ভবরোগগ্রস্তেরও ইহা হয়।

ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ভবরোগটা কি ?

মনের রোগই ভবরোগ। এই রোগের লক্ষণ হইতেছে ক্ষণে ক্ষণে মনের অসুস্থতা। এই মনে করিতেছে বেশ আছে, পরক্ষণেই বলিবে কিছুই ভাল লাগে না।

এই থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করা, এই সময়ে সময়ে কিছুই ভাল না লাগা ইহাই হইতেছে ভবরোগের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু রোগের সামান্য সামান্য লক্ষণও বহু আছে।

কি সে সব ?

সব বলিবার প্রয়োজন নাই। কোন প্রকার দুঃখ যে করে সেই রোগগ্রস্ত। নিরন্তর নূতন নূতন বিষয়ভোগেচ্ছা, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি জন্য ছট্‌ফট্ করা, ভবরোগের শান্তি জন্য কর্ম্ম না করিয়া যা তা কর্ম্মে মনকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা, কর্ম্মটি মনের মত ফল

দিলে বেশ আনন্দ করা আর বিফলতা মুখে চলিলে হা হুতাশ করা, কেহ নিন্দা করিলে ক্রোধে অন্ধ হওয়া, আর স্তুতি করিলে বেশ লাগা এই সব ভবরোগের বিকার অবস্থা। আমি এত কাল ধরিয়া লোকের উপকার জন্য কতই করিলাম, মানুষ কি অকৃতজ্ঞ আমার কথা মত চলিল না ; এখন জরা আসিতেছে আর কদিনই বা বাঁচিব—আহা! জগৎটাকে উন্নত করিয়া যাইতে পারিলাম না, জগতের সব দুঃখই রহিয়া গেল—এই সব দুঃখও ভবরোগের লক্ষণ।

ভবরোগের কথায় তুমি ত সকল মানুষকেই আক্রমণ করিতেছ ?

হাঁ তাহা করিতেছি। আর বলিতেছি যাহার মন সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অতিক্রম করিতে না পারিয়াছে সে ভবরোগাতুর। কাজেই বলিতে হয় [সিদ্ধজনের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু] দুই চারি জন সাধক বাদে জগতের সকল মানুষই ভবরোগাতুর।

ভবরোগের কি প্রতীকার আছে ?

আছে। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি দেবী সেই প্রতীকার দেখাইয়া দিতেছেন। এই মাণ্ডূক্য শ্রুতি প্রধান ভাবেই ভবরোগের ঔষধ।

কিরূপে ?

শ্রবণ কর। ভবরোগের প্রতীকার জন্য শ্রুতি বলেন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

জগতে যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন ব্যক্তি সাধনা করে বা সাধনা করিয়াছিল বা সাধনা করিবে তাহা এই আত্মারই সাধনা। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সাধনা নাই। জগতের সমস্ত সাধনা এই আত্মার সাধনার অন্তর্ভূত।

বড় জোরের কথা বলা হইতেছে কি ?

হাঁ। যাহা সত্য তাহা জোরেরই কথা। বেশ করিয়া মিলাইয়া লও চৈতন্যই একমাত্র সাধনার বস্তু। আত্মা ভিন্ন চেতন আর কিছুই নাই। যাঁহাকে ঈশ্বর বল বা পরমেশ্বর বল বা অন্তর্যামী বল বা প্রণব বল বা সর্ব্বব্যাপী বল বা নিরাকার বল বা অবতার বল—এক কথায় সগুণ,

নির্গুণ, অবতার বা আত্মা—যাহা কিছু মানুষের উপাস্য হইয়াছিল বা হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহা এই চৈতন্য—এই আত্মাই।

কথা ঠিক। এ সত্য কথার প্রতিবাদ নাই। এখন বল "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইহাতে কি করিতে হইবে?

আত্মাকে দেখিতে হইবে এইত? আর এই দেখা হইলে ভবরোগের উপশম কিরূপে হইবে?

আরও ভাল করিয়া প্রশ্ন কর।

আচ্ছা। আত্মা বা চৈতন্য এমন কি বস্তু যাহাকে দেখিলে জীবের সর্ব্বদুঃখ, সর্ব্বব্যাধি দূর হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই আত্মা যেন ঐরূপই হইলেন তাঁহাকে দেখা এখন ভার কর্ম্ম কি যাহাতে সর্ব্বশ্রুতি ইহা অপেক্ষা আর কোন কর্ম্ম কঠিন হইতে পারে না' এইরূপ বলিতেছেন? চক্ষু আছে কোন কিছু দেখা ত অতি সহজ কিন্তু আত্মদর্শন এত কঠিন কেন হইবে?

তোমার দুইটি প্রশ্ন এই—

(১) আত্মা এমন কোন্ বস্তু যাঁহার দর্শনে মানুষ চিরতরে জুড়াইয়া যায়?

(২) আত্মদর্শন অত্যন্ত কঠিন কিরূপে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। শুধু শ্রবণ করিলেই যে আত্মাকে অনুভব করিতে পারিবে তাহা মনে করিও না। শ্রবণ কর, তারপরে মনন, তারপরে ধ্যান—এই সব করিলে তবে অনুভব করিতে পারিবে।

শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন; সমস্ত ঋষি, সমস্ত সাধু এক বাক্যে বলিতেছেন যে, যিনি চেতন তিনি কখন অচৈতন্য অবস্থায় আসেন না। চেতন যিনি তাহার খণ্ডও কখন হয় না। একখণ্ড আকাশ যেমন কাটিয়া লওয়া যায় না, সেইরূপ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যে আত্মা তাঁহাকে কিছুতেই খণ্ডিত করা যায় না। আবার এই আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। ইঁহার কোন দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে না। আমি পারি না, আমার শক্তি নাই, আমি অতি

হীন এ সব উক্তি আত্মার নহে—এ সব উক্তি অজ্ঞানীর। আমি বৃদ্ধ হইতেছি, আমার জরা আসিতেছে, আমায় মরিতে হইবে, আমার আবার জন্ম হইবে এ সমস্ত কথা আত্মা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ আত্মা "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" আত্মা "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" লোকে যে বলে আমি মরিলাম, আমি দুঃখী, আমি জরাগ্রস্ত এ সমস্তই অজ্ঞানীর উক্তি মাত্র। তার পরে আত্মার যেমন জনম মরণ নাই সেইরূপ আত্মার ক্ষুধা পিপাসাও নাই, আত্মার শোক দুঃখও নাই অর্থাৎ জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ এই যে ষড়োর্ম্মিতে জীব লুট্‌পুট্ খাইতেছে ইহার কোন কিছুই আত্মাতে নাই। ষড়োর্ম্মি কেবল অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র।

তবেই দেখ আত্মা সদা পূর্ণ, সদা শান্ত, সদা আনন্দময়। আত্মাতে কোন অজ্ঞান নাই তিনি জ্ঞানস্বরূপ। আত্মাতে কোন অভাব নাই তিনি সদাপূর্ণ এবং তিনি মাত্রই নিত্য। এই সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ আত্মা অতি রমণায় দর্শন। আর জীব যখন জানিতে পারে যে সে আত্মা, সে চেতন, সে জড় নহে—তখন বল জীবের আর কোন্ অভাব থাকিবে, কোন্ ছট্‌পটানি থাকিবে, কোন্ ভয় থাকিবে? তুমি যতক্ষণ ক্ষুদ্র হইয়া থাক ততক্ষণই তোমার অভাব থাকিবেই। আত্মাই পূর্ণ। সেই জন্য আত্মভাবে না থাকা পর্য্যন্ত তোমার অভাব ঘুচিবে না। তুমি যদি আত্মাকে জানিতে পার, আত্মাকে দেখিতে পার, জানিয়া দেখিয়া আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পার—তবে তুমি চিরতরে জরা, মরণ, শোক, মোহ, আধি, ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে।

আহা—আত্মার কথা শুনিতে শুনিতে আমি কিরূপ হইয়া যাইতেছি। এখন বল এই আত্মাকে দর্শন করিব কিরূপে?

এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিল। আত্মদর্শন এত কঠিন কিরূপে? শ্রবণ কর। দর্শন হয় চক্ষু দ্বারা। কিন্তু দর্শন করে কে? চেতনা না থাকিলে চক্ষু ত দর্শন করিতে পারে না। তবে চৈতন্যই দ্রষ্টা।

আত্মাই দ্রষ্টা। আত্মাকে দর্শন করিবে কে? যিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই তাঁহার দর্শন করে কে? আরও যদি একটু তত্বের মধ্যে প্রবেশ কর, তবে দেখিবে চেতনই একমাত্র বস্তু। সমস্তই চেতন। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি—যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ? তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ? যেখানে দুই মত হয়, যেখানে অনাত্মামত কিছু হয়—সেখানেই অন্য অন্যকে দেখে, অন্য অন্যকে জানে। কিন্তু যেখানে সমস্তই আত্মা হইয়া যায় তখন কাহা দ্বারা কাহাকে দেখা যাইবে? কাহা দ্বারা কাহাকে জানা যাইবে? তত্বের মধ্য দিয়া যাইতে পারিলে যাহা হয়, শ্রুতি তাহাই বলিলেন। কিন্তু তত্ব বস্তুটি ত অনেকের বুদ্ধিতে প্রবেশ করেনা। ইঁহাদের জন্য সহজ করিয়া বলিতে হইবে। তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

দেখ চক্ষু দ্বারা আমরা সমস্ত দর্শন করি। কিন্তু চক্ষুকে দর্শন করা যায় কিরূপে? অথবা আরও একটু সূক্ষ্মে কথাটা আলোচনা করা যাউক। চক্ষুগোলকে এক পুরুষ থাকেন। মনে করা হউক তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই চেতন পুরুষ, তিনিই আত্মা। এখন এই পুরুষকে দেখা যাইবে কিরূপে? চক্ষুকে বা চক্ষুগোলোকস্থ পুরুষকে দেখা যায় দুই প্রকারে।

(১) দর্পণ অবলম্বনে দেখা যায়।

(২) অন্য লোকে তোমার চক্ষুগোলকে পুরুষ দেখিয়া যখন বলে "এই আমি দেখিতেছি" তখন তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। করিয়া তুমিও অন্যের চক্ষে এইরূপ পুরুষ দেখিয়া বিশ্বাস কর—তোমারও চক্ষে এইরূপ পুরুষ আছেন।

তবেই দেখ আত্মাকে দেখিতে হইলে দর্পণের মত একটি অবলম্বন চাই অথবা যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাস করা চাই, তবে আত্মাকে দেখা যায়।

আত্মদর্শন কত কঠিন তাহা অন্যরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। আত্মদর্শন অর্থ আপনাকে আপনি দেখা। কিন্তু আপনাকে আপনি দেখিবে কে? মাতাল যেমন আপনাকে আপনি দেখিতে পায়না, জানিতেও পারেনা, কেহ বলিয়া দিলেও বুঝিতে পারেনা সে কে? সেইরূপ ভূতের ঘরে প্রবেশ করিয়া যে আপনাকে অসৎ সঙ্গে, অসৎ কার্য্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে যতই কেন স্মরণ করাইয়া দাও তুমি আপ্তকাম, তোমার বাসনা করিবার কিছু নাই, ভাবনা করিবার কিছু নাই, তুমি পূর্ণ তোমার প্রাপ্তির কিছু নাই, তুমি আনন্দময় তোমার দুঃখ বলিয়া কোন কিছু নাই—ভূতাবিষ্ট জনের মত এই বিষয়-মদিরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার স্বরূপের কোন কিছুই মানিতে চায় না; কি এক ঘুমঘোরে সে এতই আচ্ছন্ন যে, সে তাহার প্রকৃত স্বরূপের কোন কথাই স্মরণ করিতে পারে না। রাজার সন্তান ভূতের সঙ্গে ভূতের ঘরে থাকিয়া থাকিয়া ভূতের কার্য্যকেই আপনার কার্য্য মনে করে। সে যে স্বরূপে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মতুষ্ট, তাহার দুঃখই নাই, দুঃখে উদ্বেগ আসিবে কিরূপে? সুখেই বা তাহার স্পৃহা থাকিবে কি? রোগ, ভয়, ক্রোধ তাহার থাকিবে কিরূপে? আত্মস্বরূপ সে—তাহার আবার স্নেহ থাকিবে কি? শুভাশুভ পাইয়া হর্ষ বা দ্বেষ তাহার আসিবে কোথা হইতে? আপন চৈতন্যস্বরূপকে জানিতে পারিলে ইহা যে পূর্ণ সত্য যে

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

অর্থাৎ স্বরূপে দৃষ্টি পড়িলে যে বুঝিতে পারা যায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন্, ঘ্রাণ, গমন, শয়ন, নিশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ—এ সব আমি কিছুই করিতেছি না—এই সমস্তই ভূতের কার্য্য ইহা বিষয়মদিরাপানোন্মত্ত ব্যক্তি কিছুতেই স্বীকার করেনা। তাই বলিতে-

ছিলাম যে ব্যক্তি ভূতের কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, ভূতের বাক্যকে নিজের বাক্য বলিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ভূতের ভাবনাকে নিজেরই ভাবনা বলিয়া ডুবিয়া রহিয়াছে সে আত্মদর্শন করিবে কিরূপে? মাথার উপরে যাহার দশহাত জল সে যেমন তীরের কোন কিছুই দেখেনা, সেইরূপ যে যতক্ষণ অন্য কিছু দেখে ততক্ষণ আপনাকে দেখিতে পায়না। জগৎ-দর্শন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আত্মদর্শন হয় না। ভ্রমে যে জন পরিবেষ্টিত সে ভ্রম না যাওয়া পর্য্যন্ত সত্যকে দেখিতে পায়না। জগৎ দর্শন, দেহ দর্শন, মনের সঙ্কল্পাদি দর্শন এ সব যতদিন থাকে ততদিন আপনাকে আপনি দেখা পায় না। কিন্তু দৃশ্যদর্শনটা ভ্রম জানিয়াও যে ভ্রমের সঙ্গে মিশ্রিত চৈতন্যে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত, সে একদিন দৃশ্যদর্শন ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনে, আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম স্থূল জগৎ যিনি দেখেন না, সূক্ষ্ম মনোময় বা বাসনাময় জগৎ যিনি দেখেন না, আর কারণ জগৎ বা অজ্ঞান দেহ বা বীজাংশ যাঁহার নাশ হইয়াছে, তিনিই আত্মদর্শনে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারেন। বুঝিতেছ আত্মদর্শন কঠিন কিরূপে? দৃশ্যদর্শন না থাকা অর্থাৎ দ্বৈতভাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কত কঠিন?

আকাশ অতি সূক্ষ্ম। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। আত্মা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি ব্যাপক। অতিসূক্ষ্ম বস্তুকে চিন্তা করিতে হইলে কোন একটি অবলম্বন চাই।

সকল শ্রুতিই আত্মদর্শনের জন্য ওঁকার অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বলিতেছেন ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইতেছে ওঁকার।

एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परं ।
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥

ওঁকার অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। ওঁকার অবলম্বনই সর্ব্বোত্তম। এই অবলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করা যায়।

তিন মাত্রা বিশিষ্ট ওঁকারকে অবলম্বন করিলে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পরে ব্রহ্মার সহিত ওঁকার সাধক মুক্তি-লাভ করেন। মাণ্ডূক্যশ্রুতি ইহাও বলিতেছেন যে, অমাত্রিক ওঁকারকে অবলম্বন করিতে পারিলে কিন্তু সদ্যোমুক্তি লাভ করা যায়।

ত্রিমাত্রিক ও অমাত্রিক ওঁকার অবলম্বন করিতে হয় কিরূপে তাহা মূলশ্রুতিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

বৈদিক সন্ধ্যা উপাসনা ওঁকার অবলম্বনেই উপাসনা। ওঁকারকে বুঝাইবার জন্যই গায়ত্রী—গায়ত্রী ওঁকারেরই বিস্তৃতি। আবার গায়ত্রী ধ্যানের জন্যই কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মূর্ত্তির আশ্রয় আবশ্যক।

এই ওঁকার উপাসনার জন্যই জ্ঞানপথ, যোগপথ ও ভক্তিপথ। জ্ঞান পথের সাধনা তত্ত্ববিচার, যোগপথের সাধনা প্রণব-জ্যোতি অবলম্বন এবং ভক্তিপথের অবলম্বন মূর্ত্তি ধরিয়া অনুরাগে ভজন।

তত্ত্ববিচার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে করিতে হইবে। যোগপথে যে জ্যোতির্ম্ময় প্রণব অবলম্বন করিতে হয়, সেখানে স্মরণ রাখিতে হইবে "প্রণবময় মরুৎ"। সকল সাধনাতেই অনুরাগে ভজন আবশ্যক। বিনা ভক্তিতে কখন জ্ঞান হইবেনা। আবার যোগমার্গেও ভক্তি আবশ্যক। অবলম্বন ভিন্ন যখন নিরাকারের চিন্তাতে কোন ফল হয় না—তখন প্রণব অবলম্বনই কর আর সাকার মূর্ত্তিই অবলম্বন কর—কথা একই। মূর্ত্তিপূজা বেদেরই বিধি। নতুবা শ্রুতি হৈমবতীর কথা উল্লেখই করিতেন না এবং বৈদিক সন্ধ্যাতে গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে মূর্ত্তিধ্যান বা প্রাণায়ামে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের ধ্যানও থাকিত না।

নিরাকার পরমপদে স্থিতিলাভ জন্য ওঁকার জ্যোতি বা মূর্ত্তি অবলম্বনের কথা বলা হইল। তন্ত্রেও মহাদেব বলিতেছেন—

সাকারেণ মহেশানি! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি! নিরাকারং ন পশ্যতি॥

সাকার মূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্যতি।
অভ্যাসেন সদা দেবি! নিরাকারং প্রপশ্যতি ॥
কুব্জিকাতন্ত্রে নবম পটলে।

অগস্ত্য সংহিতায় বলা হইয়াছে

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকোরেহভূন্নিরাকৃতিঃ ॥

যিনি সর্ব্বেশ্বর, যিনি সর্ব্বময়, যিনি সর্ব্বভূতহিতেরত তিনিই সকলের হিতের জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন। সাকার, মানুষের কল্পনা নহে। মায়া আপন শক্তি দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মকে রূপ ধরান এবং আপনিও রূপ ধরেন।

ভগবান্ ভাষ্যকার ওঁকার অবলম্বন সম্বন্ধে বলিতেছেন—ওঁকারই পরমাত্মার প্রিয় নাম। প্রিয় নাম ধরিয়া ডাকিলে লোকে যেমন প্রসন্ন হয় সেইরূপ এই প্রিয় নাম ওঁকার ধরিয়া পরমাত্মাকে ভজিলে পরমাত্মা সহজেই প্রসন্ন হয়েন।

ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোহভিধানং নেদিষ্টম্ তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি, প্রিয়নাম গ্রহণে ইব লোকঃ। শাঙ্কর ভাষ্য। ছান্দোগ্য।১ মন্ত্র।

নেদিষ্ঠম্ নিকটতমমতিশয়েন প্রিয়ম্।

ওঁ এই অক্ষর হইতেছে পরমাত্মার নিকটতম অভিধান-বাচক নাম। ওঁকার নাম উপাসনায় প্রয়োগ করিলে তিনি প্রসন্ন হন। প্রিয় নাম গ্রহণে সাধারণ লোকে যেমন প্রসন্ন হয় সেইরূপ।

ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিতেছেন

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

ওঁ জপ কর এবং ওঁ অর্থ ভাবনা কর। কারণ ওঁ পরমেশ্বরের বোধক। ভগবান্ ব্যাসদেব ভাষ্যে বলিতেছেন।—

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনেৎ।
স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে।

প্রণবের উচ্চারণ ও বেদপাঠ রূপ স্বাধ্যায় এবং যোগ অনুষ্ঠান কর। যোগের অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় ওঁকারের অর্থ মনন কর। স্বাধ্যায় ও যোগসম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান হয়।

শ্রুতি ইহার সহিত মূর্ত্তি অবলম্বনও করিতে বলেন। শ্রুতিতে সাঙ্গোপাঙ্গ অবতারকেও প্রণবের অউম নাদ বিন্দুর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে দেখা যায়।

শ্রুতিতে যেরূপে আত্মদর্শন করিতে হয় তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে এখন ভক্তিমার্গে আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শনের কথা সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করা যাউক।

মনে করা হউক আত্মপুরুষ স্বেচ্ছায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি দেখিতেছেন সকল মনুষ্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেছে; বলিতেছে তিনি বড় মধুর। এখন এই পুরুষ আপনাকে আপনি যদি দেখিতে চান, আপনাকে আপনি যদি আস্বাদন করিতে চান তবে তিনি কি করেন? একজনকে সকলেই ভালবাসে কিন্তু সকলের ভালবাসা পাইয়া তিনি এই পর্য্যন্ত বুঝিতেছেন যে, তিনি অতি রমণীয় দর্শন। কিন্তু তিনি আপনাকে আপনি ঐ রমণীয় ভাবে দর্শন করিবেন কিরূপে? ভক্তিমার্গের উত্তর এই যে, সকলের মধ্যে যিনি তাঁহাকে বেশী আস্বাদন করেন—যদি ঐ পুরুষ সেই আস্বাদনকারীকে চিন্তা করিতে করিতে আস্বাদন কারীর মত হইয়া যান, তবেই তিনি অন্য হইয়া আপনাকে আস্বাদন করিতে পারেন। এখানে এই পর্য্যন্ত সঙ্কেত করা হইল। ফলে ইহাও যাহা প্রণব অবলম্বন ও তাহাই।

এক্ষণে অবতরণিকার প্রথম অংশ আমরা উপসংহার করিতেছি।

শ্রুতি প্রথম মন্ত্রে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্তকেই ওঁ এই অক্ষর স্বরূপ বলিতেছেন। শুধু বর্ত্তমান সমস্তকেই যে বলিতেছেন তাহা নহে। যাহা গত হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে হইবে, এমন কি যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অতীত তাহাকেও ওঁকার বলিতেছেন।

কেন বলিতেছেন, কি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—শ্রুতি মন্ত্র ব্যাখ্যা কালে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম। পূর্ব্বে বলিলেন সমস্তই ওঁকার। এখন বলিতেছেন সমস্তই ব্রহ্ম। তাহা হইলেই বলা হইল এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তাহা ওঁকার এবং তাহাই ব্রহ্ম। ওঁকার ও ব্রহ্ম একই। দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ অংশে হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন এই আত্মা ব্রহ্ম। বলা হইল বিশ্ব, ওঁকার, ব্রহ্ম এবং আত্মা—এই সমস্তই এক। পরে বলিতেছেন সেই আত্মা চতুষ্পাদ্। ওঁকারের মাত্রা ও আত্মার পাদের সাদৃশ্য দেখাইয়া ওঁকার অবলম্বনে শ্রুতি দেখাইতেছেন—ওঁকারের সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন বা আত্মভাবে স্থিতি বা স্বরূপে বিশ্রান্তি কিরূপে হয়। আমরা গ্রন্থমধ্যে ইহা বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে অবতরণিকার অপরাপর বিষয়গুলি আলোচিত হউক।

(২)

বেদে উপনিষদের স্থান। পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য বেদের মধ্যে উপনিষদের স্থান এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন ঃ—
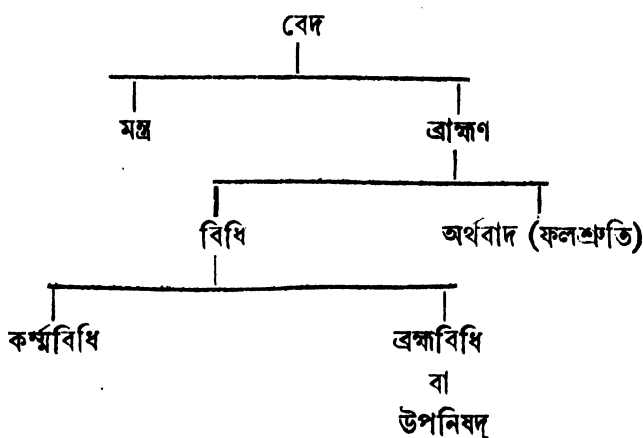
মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বাক্যরাশিই বেদ। বেদ ছন্দমত বাক্যেরই নাম।

শব্দ হইতেই এই জগৎ। সকল শব্দকে বেদ বলা যায় না। ছন্দমত শব্দই বেদ।

বেদে প্রধানতঃ কতকগুলি মন্ত্র আছে এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছে। বেদের মন্ত্রভাগের প্রয়োজন যজ্ঞসম্পাদন। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" যজ্ঞকে বিষ্ণু নামেও অভিহিত করা যায়। আবার যজ্ঞ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ করা যায়।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রগুলির অর্থ এবং কোথায় মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিধি আছে।

বেদ গদ্যপদ্যময়। বৈদিক গদ্যগুলির নাম ব্রাহ্মণ বা নিগদ, বৈদিক পদ্যগুলির নাম ঋক্ বা মন্ত্র।

বৈদিক মন্ত্রের ছন্দ প্রধানতঃ সাতটি। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী। গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপদী। এক এক চরণে আটটি করিয়া অক্ষর। ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দে ব্রাহ্মণের জন্ম। গায়ত্রীর ছন্দের ২৪ অক্ষরের উপর আর ৪টি অক্ষর বাড়াইলে উষ্ণিক ছন্দ হয়। এইরূপে চারি চারি অক্ষর বাড়াইয়া গেলে অন্য অন্য ছন্দগুলি পাওয়া যায়। জগতীছন্দ ৪৮ অক্ষর বিশিষ্ট।

ব্রাহ্মণভাগের যে গুলি বিধি, তাহা ভিন্ন কোন্ যজ্ঞের কি ফল, কোন্ যজ্ঞ সম্পাদনে কোন্ গতি লাভ করা যায়, এইরূপ অর্থবাদ বা স্তুতিও আছে। ইহাই অর্থবাদ। ইহাকে ফলশ্রুতিও বলা যায়।

বিধির মধ্যে কতকগুলি কর্ম্মবিধি কতকগুলি ব্রহ্মবিধি। ব্রহ্মবিধিগুলিই উপনিষদ্। উপনিষদ্ কি এবং উপনিষদ্ দ্বারা জীবনের কোন্ কার্য্য সাধিত হয় আমরা পরে আলোচনা করিতেছি; এখানে প্রসঙ্গক্রমে বেদাঙ্গগুলিও উল্লেখ করিতেছি।

বেদ ষড়ঙ্গ

> শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতি।
> জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

(১) শিক্ষা—এই শাস্ত্র বর্ণ-উচ্চারণবিধি শিক্ষা দেয়। ইহা দ্বারা বেদ পাঠের বিধি জানা যায়।

(২) কল্প—সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার রীতি ইহাতে লিখিত।

(৩) ব্যাকরণ—ইহাতে বেদের শব্দ সমূহের শুদ্ধতার জ্ঞান হয়। "ব্যাকরণমস্যাঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি"।

(৪) নিরুক্ত—ইহাতে বেদের কঠিন শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ লিখিত আছে।

(৫) ছন্দ—ইহাতে অক্ষর মাত্রাবৃত্তের জ্ঞান হয়।

(৬) জ্যোতিষ—যজ্ঞাদি কোন্ সময়ে করিতে হইবে সেই কাল-নিরূপক শাস্ত্র।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারা পৃথিবীর সার অগ্নি, অন্তরীক্ষের সার বায়ু এবং স্বর্গের সার আদিত্য গ্রহণ করিলে পরে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সাম বেদ উদ্ধার করেন। ঋগ্বেদ হইতে অ, যজুর্ব্বেদ হইতে উ এবং সাম বেদ হইতে ম—এই অ উ ম মিলিয়া ওঁকার হইয়াছে।

অকারং চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥

মনু বৃহদ্বিষ্ণুশ্চ।

উপবেদ

(১) গন্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীত শাস্ত্র—ইহা সাম বেদের উপবেদ।

(২) আয়ুর্ব্বেদ বা বৈদ্যক শাস্ত্র—ইহা ঋগ্বেদের উপবেদ।

(৩) ধনুর্ব্বেদ—ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ।

(৪) শিল্পবিদ্যা—ইহা অথর্ব্ববেদের উপবেদ।

[হিন্দুশাস্ত্র, (র, দ,) অবলম্বনে লিখিত]

বেদ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ :—বেদে ব্রাহ্মণসমূহে মন্ত্রের অর্থ, যজ্ঞের নিয়ম, যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপের আলোচনা আছে—পূর্ব্বে ইহা বলা হইল। প্রত্যেক বেদেই ব্রাহ্মণ ভাগ আছে।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ—(১) শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।
(২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

সামবেদের ব্রাহ্মণ—(১) তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ।
(২) ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ।
(৩) মন্ত্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ—(১) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
(মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রায় একসঙ্গে)

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ—(১) শতপথ ব্রাহ্মণ।

অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ—(১) গোপথ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহার নাম আরণ্যক। "অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদারণ্যকম্" শঙ্কর। উপনিষদ্ আরণ্যকেরই অংশ।

আরণ্যকগুলি গভীর তত্ত্বালোচনাপূর্ণ। আর উপনিষদ্ অংশে সৃষ্টি-ব্যাখ্যা, জীবের জন্মকথা এবং বিশেষ ভাবে পরমাত্মার কথা দৃষ্ট হয়।

চতুর্ব্বেদে ১০৮ খানি উপনিষদ্ আছে। মুক্তিকোপনিষদে ইহার একটি তালিকা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য চারি বেদের প্রধান প্রধান যে যে উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই :—

ঋগ্বেদীয় উপনিষদ্—(১) কৌষীতকী উপনিষদ্। কৌষীতকী আরণ্যকে যে ১৫টি অধ্যায় আছে তাহার মধ্যে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত কৌষীতকী উপনিষদ্।

(২) ঐতরেয় উপনিষদ্—ঐতরেয় আরণ্যকের যে ৫টি ভাগ আছে তন্মধ্যে দ্বিতীয় আরণ্যকের ৪ হইতে ৬ অধ্যায়কে ঐতরেয় উপনিষদ্ বলে।

সামবেদীয় উপনিষদ্—(১) ছান্দোগ্য উপনিষদ্—সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণে যে ৪০টি ভাগ আছে,

তন্মধ্যে শেষের ভাগকে বলে ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

(২) কেন উপনিষদ্ বা তলবকার উপনিষদ্।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্—(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে দশটি প্রপাঠক আছে, তন্মধ্যে ৭।৮।৯ প্রপাঠককে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলে।

(২) কঠ উপনিষদ্।

(৩) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্—(১) ঈশাবাস্য উপনিষদ্।

(২) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। শুক্লযজুর্ব্বেদের কাণ্ব-শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪টি কাণ্ড আছে। চতুর্দ্দশ কাণ্ডকে আরণ্যক বলে। এই আরণ্যকের শেষ ছয় অধ্যায় হইতেছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্—অথর্ব্ববেদের উপনিষদ্ ৫২টি। ইহাদের মধ্যে ভগবান্ শঙ্কর তিন খানির মাত্র ভাষ্য করিয়াছেন।

(১) মাণ্ডূক্য উপনিষদ্।

(২) মুণ্ডক উপনিষদ্।

(৩) প্রশ্ন উপনিষদ্।

এই পর্য্যন্ত আমরা বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ মাত্র সংগ্রহ করিলাম। এক্ষণে কাজের কথা আলোচনা করিব।

(৩)

উপনিষদে কি আছে? পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে উপনিষদে কি আছে তাহা বলা হইয়াছে। এখানে আবার বলি জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিছু ত্রিজগতে আছে সমস্তই উপনিষদে আছে। ভগবান্ শঙ্কর যে

বারখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া যাহারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাতে (১) কোথাও ব্রহ্মনিরূপণ। (২) কোথাও ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ। (৩) কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, সত্যসম্ভাষণ, ব্রহ্মচর্য্যাদির নিরূপণ আছে। (৪) কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল জীবন্মুক্তির কথা আছে। (৫) কোথাও বা বিদেহমুক্তির কথা বলা হইয়াছে।

(৪)

উপনিষদ্ কাহাকে বলে? অর্থ কি? অধিকারী কে? ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদক যে বিদ্যা তাহার নাম উপনিষদ্। "উপনিষীদতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মাত্মভাবোহনয়া," "যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মভাবে পাওয়া যায় তাহাই উপনিষদ্। অথবা "উপনিষীদতি শ্রেয়োহস্যামিত্যুপনিষদ্"। সদ্ ধাতু বিশরণ গতি অবসাদন (নাশ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। "উপ নি পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাত্তাদর্থ্যাদ্ গ্রন্থোহপ্যুপনিষদুচ্যতে" শঙ্করঃ। উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ = সমীপে; নি = নিশ্চয় বা নিরন্তর; সদ্ ধাতু নিবৃত্তি অথবা প্রাপ্তি। তুমি অতি সমীপে (উপ) ইহা নিশ্চয় করিয়া দিয়া (নি) যে বিদ্যা সংসার সাদন (সদ্) অর্থাৎ সংসার নিবৃত্তি করে তাহাই উপনিষদ্; অথবা মুমুক্ষের সমীপে নিশ্চয় পূর্ব্বক অভেদ ভাবে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে যে বিদ্যা তাহাই উপনিষদ্। "ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুঃ।" কঠবল্লী।

উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ইহা বেদশীর্ষ; শ্রুতিশির। "ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্।" ভগবান্ শঙ্কর আবার বলিতেছেন "বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম্।"

উপনিষদ্ যেমন ব্রহ্মকে নিকটে আনয়ন করেন, সেইরূপ অবিদ্যাদি সংসারবীজও ধ্বংস করেন। শঙ্কর বলেন—"সংসার নিবিবৃৎসুভ্যঃ সংসার-হেতু-নিবৃত্তি সাধন ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা প্রতিপত্তয়ে। সেয়ং

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ।"

ভাবার্থ এই—যাঁহারা সংসার নিষ্কৃতি লাভে ব্যাকুল তাঁহারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব সাধন করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারেন। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব সাধন বিদ্যাই উপনিষদ্। এই বিদ্যা দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ও সংসার যুগপৎ ধ্বংস হয় বলিয়া, উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যা বলে। এই বিদ্যা মুমুক্ষুগণের সমীপে পরমাত্মাকে নিশ্চয়রূপে আনায়ন করেন বলিয়া ইনি উপনিষদ্।

উপনিষদ্ পাঠ করিলেই সমস্ত হইল না। উপনিষদ্ শ্রবণ মনন দ্বারা বিদ্যা লাভ করা চাই। "আয়ুর্বৈ ঘৃতং" ঘৃতই আয়ু, বৈদ্যক শাস্ত্রে পড়িয়া ইহা জানিয়া রাখিলে শুধু হইল না, ঘৃত খাওয়া চাই। সেই জন্য উপনিষদের অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

অধিকারী হইতে হইলে—দৃষ্ট এবং শ্রুত বিষয়ে যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, ইহলোক ও পরলোকের উত্তম মধ্যম ভোগ বিষয়ে যে অশেষ বৈরাগ্যবান্ পুরুষ মোক্ষ ইচ্ছা করেন, উপনিষদ্ বিদ্যার তিনিই অধিকারী। উপনিষদের বেদ্য বিষয় পরমাত্মা। তাঁহাকে জানাই দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। "**নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।**" মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

(৫)

উপনিষদের প্রয়োগ—**উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি।** কেনোপনিষদ্। ৪।৩২।৭॥

হে ভগবন্! উপনিষদ্ বলুন। এই প্রকার জিজ্ঞাসুর প্রশ্নে আচার্য্য বলিতেছেন—"**উক্তা ত উপনিষদ্** "তে উপনিষদ্ উক্তা" তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে। হে প্রভো! কোন্ উপনিষদ্ বলা হইল "**ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি।**" "বাব ব্রাহ্মীং উপনিষদং তে অব্রূম্ ইতি।" প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ তোমাকে বলিয়াছি। প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করা হইলেও পুনঃ

পুনঃ জিজ্ঞাসা, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, পুনঃ পুনঃ বিচার ভিন্ন এই ব্রহ্মবিদ্যা বীর্য্যবতী হয়েন না।

(৬)

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তির উপায়—কেন শ্রুতি বলেন---

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥

৪।৩৪।৮

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তি জন্য তপ দম কর্ম্ম প্রভৃতি উপায় আছে। অগ্নিহোত্রাদি বিহিত কর্ম্ম আগন্তুক পাপনাশক, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বর্ত্তমান পাপনাশক এবং দম অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে আপন আপন বিষয় হইতে নিগ্রহ করা—ইত্যাদি উপায়ে উপনিষদ্দেবীর কৃপা লাভ করা যায়। এইজন্য বলা হইল তপ, দম ও কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রথম উপায়।

"**সর্ব্বাঙ্গানি সহ বেদঃ প্রতিষ্ঠা**"—সর্ব্ব ষড়ঙ্গ সহ বেদ এই উপনিষদ্ বিদ্যার চরণ। অর্থাৎ উপনিষদ্ বিদ্যাই শিরোবিদ্যা—শিক্ষা কল্পাদি কর চরণের ন্যায় ইঁহার অধো অঙ্গ। "**সত্যমায়তনম্**" ব্রহ্মবিদ্যার নিবাসস্থান সত্য। যেখানে সত্য আছে, অমায়িকতা আছে, অকুটিলতা আছে, কায় বাক্য মনে যিনি সত্যপরায়ণ, তাঁহার দেহেই ব্রহ্মবিদ্যা বাস করেন।

শেষকথা—জরা ও মরণের মত ক্লেশকর আর কি কিছু আছে? জরা মরণের যাতনা হইতে যিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন তাঁহা হইতে হিতকারী বা হিতকারিণী আর কেহ নাই। যিনি জরা মরণের দারুণ যাতনা হইতে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা করেন—যিনি সত্য সত্যই জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব দেখিয়া সদাই ব্যথিত, আজ যাহাকে অতি আদরে আলিঙ্গন, কাল তাহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে শ্মশানে আনিয়া তাহার মুখাগ্নি—সংসারের এই মর্ম্মভেদী দুঃখে ব্যথিত হইয়া যিনি মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই উপনিষদ্ অবলম্বন করিবেন। যাঁহার চিত্ত এখনও ভোগের পশ্চাতে ঘুরিতেছে—ক্ষণস্থায়ী হইলেও

যিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এক ভোগেরই ব্যবস্থা করেন, তাঁহার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা আগমন করেন না। এক কথায় সংসারের প্রকৃত রূপ দেখিয়া যিনি ব্যথিত, ভোগের সর্ব্বনাশকর ফলাফল দেখিয়া যিনি ভীত, সেইরূপ বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু, উপনিষদের শীতল ছায়ায় অন্তঃশীতল হইতে পারিবেন। যিনি শাস্ত্রে যাহা ভাল দেখেন,কিন্তু তাহা জীবনে আচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না অথবা পারেন না, তাঁহার জন্য উপনিষদ্ নহে। যিনি কপট, যিনি শাস্ত্রশ্রদ্ধাশূন্য, যিনি ধর্ম্মধ্বজী, যিনি জম্বুক-ধর্ম্মী, যিনি অন্যকে কঠোর করিতে উপদেশ দেন কিন্তু নিজে ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন না --উপনিষদ্ তাঁহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন না।

একদিকে অনিষ্ট পরিহার অন্যদিকে অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি ; একদিকে সর্ব্বদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অন্যদিকে পরমানন্দ প্রাপ্তি ; ইহারই জন্য বেদ।

বেদে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ আছে। (১) পরা (২) অপরা। নিখিল বেদের সম্পূর্ণ কর্ম্মকাণ্ড অপরা বিদ্যা ; কিন্তু যদ্দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তাহা পরা বিদ্যা।

সংহিতা সমূহে কোথাও কোথাও জ্ঞানের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু জ্ঞানের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষদেই দৃষ্ট হয়। মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অন্য ভাগসমূহে যে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি আছে তাহা চিত্তশুদ্ধি জন্য। নিষ্কামভাবে কৃত হইলে এই কার্য্যে ভগবদনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যত সত্বরে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় সেরূপ আর অন্য কোন কর্ম্মে হয় না। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমূহকে এই জন্য কর্ম্মকাণ্ড বলে। উপনিষদ্‌সমূহ জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনা কাণ্ড কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ড এই হইতেছে বেদের বিভাগ। যাঁহারা বলেন বেদের উপাসনাকাণ্ডই শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড সেই উপাসনাকাণ্ড প্রাপ্তি জন্য অর্থাৎ যাঁহারা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিতে গিয়া জ্ঞানকে নিম্নে আনয়ন করেন,

তাঁহারা বেদের প্রকৃত অভিপ্রায়কে চাপিয়া রাখিয়া নিজ সম্প্রদায়কে প্রবল করিতে চাহেন। এরূপ মনুষ্য কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই।

আবার বলি বৈরাগ্যবান্ পুরুষ শম দমাদি সাধন সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারেন। যাঁহার অন্তঃকরণ ভোগের জন্য ব্যাকুল—ভোগ যাঁহার নিকটে এখনও রুচিকর, সংসারের বীভৎস রূপ দেখিয়া এখনও যাঁহার ভোগে অরুচি হয় নাই, তাঁহার মলিন অন্তরে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান সম্ভবপর নহে। এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পূর্ব্ব পাপ ক্ষয়, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ দ্বারা আগন্তুক পাপ নাশ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা বর্ত্তমান পাপ নাশ—এইরূপে পাপ ক্ষয় করিয়া ইন্দ্রিয় ও মনোনিগ্রহরূপ সাধনা করিলে ব্রহ্মবিদ্যার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে পুরুষ বৈরাগ্যবান্ নহেন তাঁহার উপায় কি কিছু আছে ?

আছে বৈকি। উপনিষদাদি গ্রন্থ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে সকলের ইচ্ছা হয় না। সংসারে নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া ইহারা যখন ব্যাকুল হয় তখনই ইহাদের পরিবর্ত্তনের সময় আইসে। বুদ্ধিমান্ লোক অন্যের দেখিয়া সাবধান হয়েন কিন্তু ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ। যাহারা বর্ব্বর তাহারা বহুবহু বার তিরস্কৃত হইয়া তবে চেতনা প্রাপ্ত হয়। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যাহাদের পাপ অন্তগত হইয়াছে "যেষাং অন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্" সেইরূপ ব্যক্তির আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ হয়। যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত কুপথে আছেন, নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে করিতে যাঁহারা আর কিছুতেই সুখ পান না—তাঁহাদের ত সংসারের সমস্ত বস্তুই ভোগ করিয়া দেখা হইয়াছে কেবল ধর্ম্মপথটি মাত্র বাকি আছে। এইরূপ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করা আবশ্যক।

স্বধর্ম্মাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্॥

অপরোক্ষানুভূতি।

বর্ণাশ্রম পালনরূপ তপস্যা দ্বারা যাঁহারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতেছেন—শ্রীভগবানের প্রীতি সাধন জন্য—শ্রীভগবানে অনুরাগ বৃদ্ধি জন্য যাঁহারা যথাপ্রাপ্ত জীবসেবায় ঈশ্বরসেবা হয় ভাবনা করিতে পারেন, সংসারের কার্য্যে ঈশ্বরসেবা করিতেছি মনে করিয়া সংসারের কুটিল ব্যবহার, সংসারের নিষ্ঠুরতা, স্ত্রীপুত্র কন্যাদির অকৃতজ্ঞতা অক্ষুন্ন মনে সহ্য করিয়া যাইতেছেন; আপন আপন বর্ণ ও আশ্রম মত কর্ম্ম যাঁহারা নিষ্কামভাবে করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদেরই বিবেক, বৈরাগ্য, শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই সাধন-চতুষ্টয় লাভের ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা জন্মিলে তবে জ্ঞাননিষ্ঠা হয়, তখন প্রত্যহ উপনিষদ্ শ্রবণ ও মনন করিতে রুচি জন্মে। নতুবা উপনিষদাদি অধ্যাত্ম গ্রন্থ, যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ একবার মাত্র পাঠ করিয়া যিনি মনে করেন "পাঠ ত করা হইয়াছে" শাস্ত্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত অধম বলেন।

শাস্ত্র বলেন :—

যস্ত্বেকবারমালোক্য দৃষ্টমিত্যেব সন্ত্যজেৎ।
ইদং স নাম শাস্ত্রেভ্যো ভস্মাপ্যাপ্নোতি নাধমঃ॥

যো, নি, উ, ১৬৩।৪৯

এই সমস্ত শাস্ত্র একবার দেখিয়াই "দেখা হইয়াছে" বলিয়া যাহারা ত্যাগ করে, সেই সমস্ত অধম ব্যক্তি এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে ভস্মও প্রাপ্ত হয় না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিতর দিয়া না গেলে কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় না? শ্রুতিতে দেখা যায় রৈক্কবা ও চক্রবী প্রভৃতি অনাশ্রমী থাকিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রুতিতে এ দৃষ্টান্ত আছে, ইহা কিন্তু বিশেষ দৃষ্টান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাঁহাদের কর্ম্ম করা থাকে, পরজন্মে একেবারেই তাঁহাদের জ্ঞান-নিষ্ঠায় রুচি হয়। যাঁহাদের অহং অভিমান নাই, বিষয়ে রাগ দ্বেষ

নাই, ভোগে রুচি নাই, সুখ্যাতি অখ্যাতিতে হর্ষামর্ষ হয় না, নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান করিয়াও যাঁহাদের আত্মশ্লাঘা হয় না—তাঁহারাই জ্ঞানানুষ্ঠানের যোগ্য পাত্র। এরূপ ব্যক্তি বর্ণাশ্রমের বাহিরে।

প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে কি না, ঈশ্বরে সর্ব্বদা চিত্ত একাগ্র কিনা, ঈশ্বর-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তায় তোমার রুচি নাই কি না, সমস্তই মায়িক, সমস্তই মিথ্যা, শ্রীভগবান্ মাত্র সত্য ইহা নিশ্চয় হইয়াছে কি না "অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ" আমি বদ্ধ, আমি বিমুক্ত হইব ইহা তোমার নিশ্চয় হইয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে তবে তুমি জ্ঞানানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবে নতুবা জ্ঞানমার্গে ভস্মও লাভ হইবে না। এই জন্য বেদান্ত সাধারণ নিয়ম বলিতেছেন—বর্ণাশ্রমাচারত্যাগী উপাসক অপেক্ষা. বর্ণাশ্রমাচার-বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ। অতস্তিত্বজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ। ৩। ৪। ৩৯। ত্যাগ অপেক্ষা আশ্রমে বাস শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ এরূপ সতর্ক ছিলেন যে, নিজের অবস্থা উন্নত হইলেও তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। লৌকিকাচার কখনও লঙ্ঘন করিতেন না— "তথাপি লৌকিকাচারো মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ"।

বলা হইল শাস্ত্রমত কার্য্য করিয়া উপনিষদাদি পাঠের উপযুক্ত হইয়া নিত্য ইহার শ্রবণ ও মনন আবশ্যক। যখন গুরু ও শাস্ত্রমুখে শ্রুত বাক্য-স্পন্দন মনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আবার যখন মনে প্রতিষ্ঠিত গুরু ও বেদান্ত বাক্য ও তদর্থ বাক্যে স্পন্দিত হইয়া বাহির হইবে; যখন বাক্যে শাস্ত্র কথা স্তব স্তুতি অথবা মন্ত্রজপ উচ্চারিত হইলেও মন অসম্বন্ধ প্রলাপ আর উচ্চারণ করিবে না—বাক্য জপ করিতেছে, সন্ধ্যা উপাসনা উচ্চারণ করিতেছে কিন্তু মন বিষয় লইয়া অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছে—এরূপ আর হইতেছে না তখন জানিও শাস্ত্র কৃপা করিয়াছেন। বাক্য মনে প্রতিষ্ঠা ও মন বাক্যে প্রতিষ্ঠা জন্য ঋষিগণ কার্য্যারম্ভেই যে শান্তিপাঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। ইহাঁর পূর্ব্বেই আমরা মাণ্ডুক্য উপনিষদের জ্ঞাতব্য বিষয় অল্প কথায় অবতারণা করিতেছি।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে কি আছে? মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঁকারের স্বরূপ যাহা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম ও আত্মা যে অভেদ এই অভেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে। আগম, বৈতথ্যাখ্য, অদ্বৈতাখ্য এবং অলাত শান্তাখ্য এই চারি প্রকারণে ওঁকার স্বরূপ সুন্দররূপে নিরূপণ করা হইয়াছে।

মাণ্ডূক্য নাম কেন? মণ্ডূকঋষি দ্বারা মানুষ্যলোকে প্রকটিত বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাণ্ডূক্য উপনিষদ্। কেহ বলেন মণ্ডূক অর্থ ভেক। ভেক যেমন প্রায় তিন লম্ফ ত্যাগে জল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মারূপী ভেক জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই তিন লম্ফ দ্বারা আপন নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপ তুরীয় অবস্থা লাভ করেন বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাণ্ডূক্য।

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যিনি ইচ্ছুক তিনি এই উপনিষদ্ আশ্রয়ে যথার্থ বিচারবান্ হয়েন। সেই বিচারবলে প্রথমে জাগ্রদবস্থাদি প্রথম পাদ রূপ স্থান ত্যাগ করিয়া স্বপ্নাবস্থারূপ দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েন; পরে স্বপ্নস্থান রূপ দ্বিতীয়পাদ অতিক্রম করিয়া সুষুপ্তি অবস্থারূপ তৃতীয় পাদ লাভ করেন; আবার ঐ অবস্থা পার হইয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপ তুরীয়পাদ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরমানন্দস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। **শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।** পরমশান্ত শিবস্বরূপ অদ্বৈত এই তুরীয় ব্রহ্মই আত্মার যথার্থ স্বরূপ। আত্মরূপ মণ্ডূককে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ জল প্রাপ্ত করাইতে পারেন বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাণ্ডূক্য।

মাণ্ডূক্য উপনিষদের কি কিছু বিশেষত্ব আছে? "মাণ্ডূক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।" মুমুক্ষুগণের মুক্তি সাধনে একমাত্র মাণ্ডূক্যই যথেষ্ট। ইহাতে যাঁহাদের মুক্তি না হয় তাঁহাদের জন্য ১০ খানি উপনিষদ্ আবশ্যক। **তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্জ্ঞানং দশোপনিষদং পঠ।** মুক্তিকোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

মাণ্ডূক্য শ্রুতি কেবল ওঁকারের ব্যাখ্যা। ইহা প্রণবের উপাসনা জন্য। ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন কথা এই শ্রুতিতে নাই। এই কারণে মাণ্ডুক্যকে সমস্ত উপনিষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ বলা হয়। অন্যান্য বহু উপনিষদে, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ও ঐ সমস্ত উপনিষদে দৃষ্ট হয়। মাণ্ডুক্য কেবল মাত্র ওঁকারকে প্রতিপাদন করিতেছেন। এই শ্রুতি কেবল মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদতা বোধক বলিয়া ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠতার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মহারাজের পরমগুরু শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের এককারিকা এই শ্রুতির উপর দৃষ্ট হয়। মাণ্ডূক্য উপনিষদের অর্থ বোধ জন্য গৌড়পাদাচার্য্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

যাঁহাদের শিক্ষা-সম্প্রদায় শুদ্ধ, তাঁহারাও বলেন "আমি অল্পজ্ঞ এই উপনিষদ্ বুঝিতে গিয়া যদি কোনও অনুচিত বলা হইয়া থাকে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" কৃতবিদ্য লোকেও যখন এইরূপ বলিয়াছেন, তখন মাদৃশ অধিকারীর অধিক আর কি বলিবার আছে? এই মাত্র বলি—আমি বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছিনা, বুঝিতেই প্রয়াস পাইতেছি। পদে পদে আমার দোষ হওয়ারই সম্ভব। সকলের কৃপাই আমার ভিক্ষা। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন ইহা স্মরণ রাখিয়া যথাসাধ্য জনসেবাও লক্ষ্য। এই কর্ম্মেও যদি শ্রীভগবদানুরাগ জন্মে তাহাই আমার পরম লাভ।

শান্তিপাঠ ভূমিকা।

উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ। তত্ত্ববিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে গ্রন্থের আদিতে ও অন্তে বিদ্যোৎপত্তির বিঘ্ন দূর করিবার জন্য শান্তি-মন্ত্র পাঠ করা আর্য্যঋষিগণের নিয়ম ছিল। গুরুপরম্পরাক্রমে এই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

শান্তিপাঠ মন্ত্রগুলি পরম পুরুষের নিকট প্রার্থনা। আমরা যে সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহাতে সর্ব্বকালেই একটি কামনা থাকে। সে কামনাটি কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য শক্তি প্রার্থনা। নিষ্কাম কর্ম্মও যাহা তাহাতেও কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য কামনা থাকে। কর্ম্মনিষ্পত্তি ইচ্ছা নাই অথচ কর্ম্ম করি ইহা হয়না। যদি শ্বাস প্রশ্বাস ফেলাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বল—এই অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মেও কর্ম্মনিষ্পত্তি হউক এই ইচ্ছা অন্ততঃ আদিতেও ছিল। অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা জনিত কর্ম্মেও কর্ম্ম-কর্ত্তার ইচ্ছা না থাকিলেও অপরের ইচ্ছায় কর্ম্ম হয়। আর স্বেচ্ছা-জনিত কর্ম্মে কর্ম্মনিষ্পত্তি হউক এই ইচ্ছা ত থাকিবেই, নতুবা কর্ম্ম হইতেই পারে না। শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্মে যখন আমাদের সুখ হউক বা দুঃখনিবৃত্তি হউক এইরূপ কোন কামনা না থাকে কিন্তু কর্ম্মনিষ্পত্তি হউক এইরূপ ইচ্ছা থাকে, তখন এরূপ কর্ম্মকে নিষ্কামকর্ম্ম বলিতে কোন বাধা নাই। শ্রীভগবানের আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করি আর এই কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য তাঁহারই নিকট শক্তি প্রার্থনা যখন করি তখন কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে কোন শঙ্কা হয় না।

কেহ কেহ বলেন "পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয়না"। ইঁহাদের যুক্তি এই যে "পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিশ্বকে কতকগুলিন অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।" "যখন বিশ্বের তাবৎ ঘটনা কেবল কার্য্যকারণের শৃঙ্খল, যখন কোন ঘটনা হইলে তাহার কার্য্যস্বরূপ আর এক ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে অবশ্যই ঘটিবে, তখন আমার

প্রার্থনাতে যে তিনি বাধিত হইবেন এমন আশ্বাস কি সাহসে করিতে পারি ?" "কেহ যত্তপি অপরিমিত ভোজন করে আর তন্নিমিত্তে তাহার জঠরে বেদনা উপস্থিত হয় তবে ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল আরোগ্য হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন ?" প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয় যুক্তি ঠিক। আমি যেমন কর্ম্ম করিব সেইরূপ ফল পাইব ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। অশুভ কর্ম্ম করিলাম, করিয়া ঈশ্বরের নিকট শুভ কামনা করিলাম, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম—এ প্রার্থনা তিনি শুনিবেন কেন ? এই যুক্তিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ বলেন প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই।

প্রার্থনার আবশ্যকতা আদৌ নাই এ কথাটি যুক্তিযুক্ত নহে। শুভ কর্ম্ম বা অশুভ কর্ম্ম যে যাহাই করুক না কেন—কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য শক্তি প্রার্থনা করিবার অবসর সর্ব্ব কর্ম্মকালেই আছে। শ্রুতিতে এই জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমেশ্বর আপন নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না এই যে মতটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এটিও অজ্ঞানীর উক্তি মাত্র। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্—তিনি ত আর জড়বস্তু নহেন যে, নিয়ম অতিক্রম করিবার শক্তি তাঁহার থাকিবে না ? যদি একথা ঠিক হইত তবে অগ্নি সর্ব্বদাই দগ্ধ করিত, পর্ব্বত প্রস্তর সর্ব্বদাই জলে ডুবিত। কিন্তু আমরা ত ইহার বিপরীত অনেকসময়ে দেখি। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত-প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করেন নাই, সেতুবন্ধকালে জলেও প্রস্তর ভাসিয়াছিল, তপস্যার বলে চন্দ্র সূর্য্যের গতিও স্থগিত হইত ; অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবসায়িত্বাদি অষ্টসিদ্ধি, দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার, পরকায় প্রবেশাদি কার্য্য, মৃত্তিকানিম্নে শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া অবস্থান—এই সমস্তই হইয়া থাকে। ভক্তের জন্য শ্রীভগবান্ আপন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন ইহা সর্ব্বকালেই দেখা যায়।

অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; প্রার্থনার প্রয়োজন সর্ব্বকালেই আছে। নতুবা শ্রুতি শান্তিপাঠ মন্ত্রে প্রার্থনা দেখাইতেছেন কেন?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন বেদের উপনিষদ্‌গুলি বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন বেদের শান্তিপাঠ মন্ত্রও বিভিন্ন। মুক্তিকোপনিষদ্ হইতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শান্তিমন্ত্রগুলি সংগৃহীত করিলাম।

······ঋগ্বেদগতানাং দশসংখ্যকানামুপনিষদাং "বাঙ্ মে

মনসীতি" শান্তিঃ।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ গতানামেকোনবিংশতিসংখ্যকানামুপনিষদাং

"পূর্ণমদ" ইতি শান্তিঃ।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ গতানাং দ্বাত্রিংশৎসংখ্যকানামুপনিষদাং

"সহনাববত্বিতি" শান্তিঃ।

সামবেদ গতানাং ষোড়শসংখ্যকানামুপনিষদাম্

"আপ্যায়ন্ত্বিতি" শান্তিঃ।

অথর্ব্ববেদ গতানামেকত্রিংশৎসংখ্যকানামুপনিষদাং

"ভদ্রং কর্ণেভিরিতি" শান্তিঃ।

শান্তিপাঠ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥

অথ সামবেদীয় শান্তিপাঠঃ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঽঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

আমার অঙ্গসকল আপ্যায়িত হউক। বাক্ প্রাণ চক্ষু কর্ণ বল এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্তিলাভ করুক। সমস্ত উপনিষদ্ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন। আমি যেন ব্রহ্মকে উপেক্ষা না করি। ব্রহ্মও আমাকে উপেক্ষা করিয়া যেন দূরে না থাকেন। তাঁহার নিকট আমার ও আমার নিকট তাঁহার অপ্রত্যাখ্যান বিদ্যমান থাকুক। চিত্ত আত্মাতে রমণ করিলে উপনিষদ্-প্রদর্শিত যে ধর্ম্মলাভ হয় সেই ধর্ম্মগুলি আমাতে প্রস্ফুটিত হউক, আমাতে প্রস্ফুটিত হউক। বেদধ্যায়ন কালে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উপদ্রবের শান্তি হউক। হরি ওঁ ॥

অথ ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠঃ।

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি ॥ বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি ॥ সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু ॥ তদ্বক্তারমবত্ববতুমামবতু বক্তারমবতুবক্তারম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

যথোক্ত তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তা মদীয়া বাক্ সর্ব্বদা মনসি প্রতিষ্ঠিতা-মনসি যদ্‌যচ্ছব্দজাতং বিবক্ষিতং তদেব পঠতি। মনশ্চ

মদীয় বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ যদ্‌যদ্বিদ্যাপ্রতিপাদকত্বেন বক্তব্যং শব্দজাতমস্তি, তদেব মনসা বিবক্ষতে। এবমন্যোন্যানুগৃহীতে বাঙ্মনসে বিদ্যার্থগ্রন্থং সাকল্যেনাবধারয়িতুং শক্নুতঃ। মনসঃ সাবধানত্বাভাবে সুপ্তোন্মত্ত—প্রলাপাদিবাৎ যৎকিঞ্চিদসঙ্গতং ব্রূয়াৎ তথা চ বাচঃ পাঠক ভাবে সতি গদ্‌গদরূপয়া বাচা বিবক্ষিতং সর্ব্বং যথাবন্নোচ্চার্য্যতে। অতস্তয়োরন্যোন্যাকুল্যমস্ত্বিত্যেবং প্রার্থতে।

আবিঃ শব্দেন স্বপ্রকাশং ব্রহ্মচৈতন্যমুচ্যতে। প্রজ্ঞান শব্দেন ব্যবহৃতত্বাত্বস্যাহবিভূতরূপত্বম্। তথাবিধ হে আত্মন্! মদর্থমাবিরেধি। অবিদ্যাবরণাপনয়েন প্রকটী ভব। হে বাঙ্মনসে! মে মদর্থং বেদস্য যথোক্ত তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকস্য গ্রন্থস্যাহণীস্থ আনয়নসমর্থে ভবতম্। মে শ্রুতং ময়া শ্রোত্রেণাবগতং গ্রন্থতদর্থজাতং মা প্রহাসীর্ম্মা পরিত্যজতু বিস্মৃতং মাভূদিত্যর্থঃ। অনেনাহধীতেন গ্রন্থেন বিস্মরণরহিতেনাহোরাত্রান্ সন্দধামি সংযোজয়ামি। অহনি রাত্রৌ চালস্যং পরিত্যজ্য নিরন্তরং পঠামীত্যর্থঃ। অস্মিন্ পঠিতে গ্রন্থ ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু বদিষ্যামি, বিপরীতার্থবদনং কদাচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ। ঋতং মানসং। সত্যং বাচিকং। মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য বাচা বদিষ্যামীত্যর্থঃ। তন্ময়া বক্ষ্যমাণং ব্রহ্মতত্ত্বং মাং শিষ্যমবতু সম্যগ্বোধেন পালয়িতু। তথা তদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বং বক্তারমিতি সাধনকালে শিষ্যাচার্য্যয়োঃ পালনং প্রার্থিতম্। ইদানীং ফলকালেহপি প্রার্থ্যতে। তত্র শিষ্যস্যাবিদ্যাকার্য্য-নিবৃত্তিঃ ফলম্। আচার্য্যস্তু তাদৃশশিষ্যদর্শনেন বিদ্যাসম্প্রদায়প্রবৃত্তিপ্রযুক্তঃ পরিতোষঃ ফলম্।

অনেন মন্ত্রপাঠেন বিদ্যোৎপত্তেঃ পুরা বিদ্যাপ্রতিবন্ধকা বিঘ্নাঃ পরিহ্রিয়ন্তে। বিদ্যোৎপত্তেরূর্দ্ধমসম্ভাবনাবিপরীতভাবনোৎপাদকা বিঘ্নাঃ পরিহ্রিয়ন্তে। অবতু বক্তারমিত্যভ্যাসোহধ্যায়সমাপ্ত্যর্থোদ্বিতীয়ারণ্যকসমাপ্ত্যর্থশ্চ ॥

আমি শ্রীগুরুর কৃপায় বহিঃপ্রবৃত্ত শক্তিসমূহকে প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিয়া সংযমী হইতে অভ্যাস করিতেছি। হে ভগবতি

ব্রহ্মবিদ্যে! গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত আমার বাক্য যেন মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, মনও যেন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য! তুমি আবির্ভূত হও। হে বাক্য! হে মন! তোমরা আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার শ্রুত গ্রন্থ ও তদর্থজাত যেন কখনও আমাকে ত্যাগ না করেন। আমি অহোরাত্রকে বিস্মরণরহিত অধীত গ্রন্থের আলোচনাতে নিযুক্ত রাখিব। বেদ এইরূপে অধীত হইলে তবে আমি ঋতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব। মাতঃ শ্রীব্রহ্মবিদ্যে! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর, আমার আচার্য্যকে শিষ্যবোধনশক্তি দিয়া রক্ষা কর। আবার বলি, হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে! আমাকে রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে রক্ষা কর। ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

মুমুক্ষু। প্রথমেই শান্তিপাঠ করিতে হয় কেন?

শ্রুতি। তত্ত্ববিদ্যা উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যাপ্রতিবন্ধক বিঘ্নসমূহ এই মন্ত্রপাঠে নিবারিত হয়। তত্ত্ববিদ্যা উৎপত্তির পরেও অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা জাত বিঘ্ন সমূহও এই মন্ত্রপাঠে দূর হয়। যাহা শুনিতেছি তাহা অসম্ভব—এইরূপ সংশয়ের নাম অসম্ভাবনা; ব্রহ্ম সম্বন্ধে গুরুমুখে এবং শাস্ত্রমুখে যাহা শুনিতেছি তাহা না হইয়া আমি যাহা নিশ্চয় করিতেছি তাহাই হইবে—এইরূপ ভাবনার নাম বিপরীত ভাবনা। গুরুমুখে যাহা শ্রুত হইল, তাহার মর্ম্ম ধারণা করিতে না পারা; মর্ম্ম শ্রবণকালে চিত্তের লয় ও বিক্ষেপ এইগুলি যেমন ব্রহ্মবিদ্যা উৎপত্তি সময়ের বিঘ্ন, সেইরূপ শ্রবণের পরেও যাহা শুনিলাম তাহার বিপরীতটি ঠিক—এইরূপ ভাবনা শেষকালের বিঘ্ন। শান্তিপাঠ মন্ত্র এই দ্বিবিধ বিঘ্ন নিবারণ জন্য শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট এবং গুরুপরম্পরাগত।

মুমুক্ষু। শান্তিপাঠ মন্ত্রে এই বিঘ্ন কিরূপে নিবারিত হয়?

শ্রুতি। গুরু ও শাস্ত্র মুখাগত বাক্য ও তদর্থ যদি মনে প্রতিষ্ঠিত হয়—যদি মনে রহিয়া যায়, যদি আর ভুলা না হয় এবং মন যদি ঐ ঐ

বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়—মন ঐ ঐ বাক্যে যদি থাকিয়া যায়—তদ্ভিন্ন অন্য চিন্তা না করে তবে বিঘ্ন নিবারণ হইবেই।

বাক্য ও তদর্থ যদি মনে প্রতিষ্ঠিত থাকিল, তবে মন যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবে, বাগিন্দ্রিয় যথাযথ তৎ তৎ শব্দই উচ্চারণ করিবে। আবার মন যদি বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাক্য যাহা উচ্চারণ করিবে মনে সেই সেই ভাবনাই থাকিবে। **"বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা"** ইহাতে এই বুঝাইতেছেন—মন দ্বারা যে যে শব্দ জাত বিবক্ষিত হয়, বাক্য তাহাই পাঠ করে; আবার ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদন জন্য যে যে বক্তব্য শব্দ জাত আছে, মন দ্বারা তাহাই বিবক্ষিত হয়। বাক্য ও মনের পরস্পর এইরূপ অন্যোন্যানুগ্রহে তত্ত্ববিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পারা যায়। মন যদি অসাবধান হয়, তবে বাগিন্দ্রিয় সুপ্তোন্মত্ত-প্রলাপাদিবৎ যাহা তাহা অসঙ্গত বকিয়া ফেলে। আবার বাগিন্দ্রিয় যদি বিকলতা প্রাপ্ত হয়, তবে গদগদ বাক্যে উচ্চারিত সমস্ত শব্দের যথাযথ উচ্চারণ হয় না। এই জন্য বাক্য ও মনের অন্যোন্যানুকূল্য নিমিত্ত এই প্রার্থনা।

তাই অধ্যয়নের প্রাক্কালে অন্তর্যামী আত্মরামের নিকটে প্রার্থনা করা হয়—হে প্রভো! **বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।**

শিষ্য। প্রার্থনা করিলেই কি প্রার্থনা পূর্ণ হইবে?

শ্রুতি। সেই জন্যই পুনরায় বলা হয় **"আবিরাবির্ম এধি"**। হে আবিঃ, হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য! তুমি অবিদ্যাআবরণ দূর-করিয়া আবির্ভূত হও, নতুবা আমার বাক্য ও মন পরস্পর পরস্পরকে অনুগ্রহ করিবে না এবং তাহা না হইলে অধীত গ্রন্থের মর্ম্মও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

মুমুক্ষু। **"বেদস্য ম আণীস্থ"** কি?

শ্রুতি। "হে বাঙ্মনসে মে মদর্থং বেদস্য যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকস্য গ্রন্থস্য আনীয়স্থ আনয়ন **সমর্থে ভবতম্"**। হে বাঙ্মনঃ! তোমরা

অবিদ্যামোহিত এই অজ্ঞের জন্য তত্ত্ববিদ্যাপ্রকাশক বেদকে আনিয়া দিতে সমর্থ। 'শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ' গুরুমুখ হইতে মৎকর্ণে আগত গ্রন্থ ও তদর্থ জাত যেন কখন আমাকে ত্যাগ না করে, যেন আমি কখন বিস্মৃত না হই। হে বাক্য! হে মন! তোমরা দুই জনে আমার জন্য গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ কর। যাহা শুনিয়াছি তাহা যেন না ভুলি।

মুমুক্ষু। আর কি প্রার্থনা আছে?

শ্রুতি। অধীত গ্রন্থগুলিকে আমি অহোরাত্র অধ্যয়ন করিব, সাবধানে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দিন যামিনী অতিবাহিত করিব। কখন না ভুলিয়া দিবারাত্র ইহাদের আলোচনায় কাটাইব। এইরূপে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে যখন তত্ত্ববিদ্যা প্রকট হইবেন, তখন পরমার্থভূত বস্তু যে ঋত, তাঁহাকে মনন করিতে পারিব, অসার বিষয়ের মনন আর হইবে না এবং তত্ত্বের প্রকাশ রূপ যে সত্য, সেই সত্যের কখনও অপলাপ আমাদ্বারা হইবে না—মিথ্যা বলা অর হইবে না।

মুমুক্ষু। "ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি" ইহার অর্থ কি?

শ্রুতি। ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু বদিষ্যামি বিপরীতার্থবচনং কদাচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ। ঋতং মানসং। সত্যং বাচিকং। মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য বাচা বদিষ্যামীত্যর্থঃ।

পরমার্থভূত বস্তু ঋত। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বকে মনন করাই 'ঋতং বদিষ্যামি' এবং যাহা মনন করা হইয়াছে তাহারাই যথাযথ প্রকাশকে বলা হয় 'সত্যং বদিষ্যামি'। বেদ অধীত হইলে যখন তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখন ঋতকে মনন ও সত্যকে কথন—ইহা হইবে। প্রথমে তত্ত্ববিচার দ্বারা তত্ত্বমনন, পরে তত্ত্বপ্রকাশ বা কথন।

মুমুক্ষু। শেষ প্রার্থনা কি?

শ্রুতি। তন্মামবতু। অবতু সম্যগ্বোধেন পালয়িতু। মাতঃ শ্রীব্রহ্মবিদ্যে! আমি শিষ্য, আমি বিদ্যালাভ জন্য আসিয়াছি, তুমি আমাকে

রক্ষা কর। বুঝিবার শক্তি দিয়া আমায় পালন কর। আর আমার আচার্য্যকে বিদ্যাদান-শক্তি দিয়া—বুঝাইবার শক্তি দিয়া রক্ষা কর।

মুমুক্ষু! ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ। তিনবার কেন?

শ্রুতি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শান্তি জন্য তিনবার শান্তি উচ্চারণ করা হয়।

অথ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শান্তি পাঠঃ।

ওঁ সহনাববতু ॥ সহ নৌ ভুনক্তু ॥ সহ বীর্য্যং করবাবহৈ ॥
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে (শিষ্য ও আচার্য্যকে) আসুরীসম্পদ্ হইতে রক্ষা কর। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে (শিষ্য ও আচার্য্যকে আপনার অভেদানন্দ ভোগ করাও। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাকে নিদিধ্যাসন সমাধির সামর্থ্য প্রদান কর। আমার অধীত ব্রহ্মবিদ্যা, অবিদ্যারূপা অপরাবিদ্যার নিবৃত্তিপূর্ব্বক (অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ ইতি শ্রুতিঃ) উজ্জ্বল হউক। আমাদের (আচার্য্য ও শিষ্য) মধ্যে যেন বিদ্বেষ না থাকে। বেদ অধ্যয়নের ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক।

অথ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শান্তিপাঠঃ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

একং সাবধিপূর্ণং, তদাপেক্ষিকং, যথা নদীহ্রদাৎতড়াগঃ পূর্ণঃ তড়াগাৎ সমুদ্রঃ তথা ইদং মূর্ত্তং পূর্ণং, তদপেক্ষয়া অদঃ অমূর্ত্তং পূর্ণং, তস্মাদপি পূর্ণমুদচ্যতে উৎকর্ষং প্রাপ্নোতি। তৎপূর্ণস্য পূর্ণং পূর্ণত্বং আদায় অঙ্গীকৃত্য সম্মেলনেন একীভাবং প্রাপ্য পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। তদেব পূর্ণাৎ পূর্ণং অতিশয়ং পূর্ণমিত্যর্থঃ।

অমূর্ত্তব্রহ্ম (অদঃ) সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া পূর্ণ। এই মূর্ত্ত জগৎ (ইদং) ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বলিয়া পূর্ণ। মূর্ত্ত পূর্ণ হইতে অমূর্ত্ত পূর্ণেরই উৎকর্ষ। কারণ জগৎটা সাবধিপূর্ণ—আপেক্ষিক পূর্ণ, ব্রহ্ম নিরবধি পূর্ণ। পূর্ণত্ব অঙ্গীকার পূর্ব্বক মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। এই জন্য ব্রহ্ম পূর্ণ হইতেও অতিশয় পূর্ণ, তুমি ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি করিয়া শান্তিময় হইয়া বিরাজিত হও।

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ ॥ শন্নো ভবত্বর্য্যমা ॥
শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ ॥ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো ॥ ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ॥ ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ॥ ঋতং বদিষ্যামি ॥ সত্যং বদিষ্যামি ॥ তন্মামবতু ॥ তদ্বক্তারমবতু ॥ অবতু মাম্ ॥ অবতু বক্তারম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

মিত্রদেব-চন্দ্র—আমাদের কল্যাণকর হউন। দেব বরুণ, অর্য্যমা-সূর্য্য, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকর হউন। ব্রহ্মকে প্রণাম, হে বায়ো! তোমাকে প্রণাম, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব; আমি মনে মনে ঋত—মানস সত্য বলিব; আমি বাক্যে সত্য বলিব। তাহা—ঋত ও সত্য—আমাকে রক্ষা করুন; তাহা বক্তাকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন; বক্তাকে রক্ষা করুন। বেদাধ্যয়নের ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক।

ওঁ তৎসৎ ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঁ শ্রীস্বাত্মরামায় নমঃ ॥

অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষদ্।

শান্তিপাঠঃ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ॥
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাꣳসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ ॥ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ॥
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ ॥ স্বস্তি ন বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ।

হে দেবগণ! [যজ্ঞে ব্রতী হইয়া] আমরা যেন কর্ণে ভদ্রশব্দ—শুভশব্দ—শ্রবণ করি। যজ্ঞে ব্রতী হইয়া আমরা যেন চক্ষে ভদ্ররূপ—শুভরূপ—দর্শন করি। নিশ্চল দেহে যেন আমরা তোমাদের স্তব করি; করিয়া দেববাঞ্ছিত আয়ু প্রাপ্ত হই।

যিনি বৃদ্ধ—ব্যাপক—শ্রুতি সম্পন্ন ইন্দ্র, যিনি সর্ব্বজনস্তবনীয় তিনি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। সর্ব্বজ্ঞ পূষা—পোষণকারী সূর্য্য আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। মঙ্গলময় তার্ক্ষ্য—অপ্রতিহতাস্ত্র গরুড় আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। বৃহস্পতি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক। হরিঃ ওঁ ॥

বেদের রশষসহ এই কয়েকটি বর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলে তাহার আকার হয় ꣳ। "স" এর পূর্ব্বে "বাং" এর অনুস্বার সেইজন্য ꣳ এইরূপ আকার বিশিষ্ট।

শ্রীমদাচার্য্য গৌড়পাদ কারিকা সহ শ্রুতি ভাষ্যের—অবতরণিকা।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। বেদান্তার্থ-সংগ্রহভূতমিদং প্রকরণ চতুষ্টয়ম্ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি আরভ্যতে। অতএব ন পৃথক্ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্যেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি, তান্যেব ইহাপি ভবিতুমর্হন্তি; তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যাসুনা সংক্ষেপতো বক্তব্যানি, ইতি মন্যন্তে ব্যাখ্যাতারঃ।

তত্র প্রয়োজনবৎ সাধনাভিব্যঞ্জকত্বেন অভিধেয়সম্বন্ধং শাস্ত্রং পারম্পর্য্যেণ বিশিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনবদ্ভবতি। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনমিতি? উচ্যতে—রোগার্ত্তস্যেব রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা, তথা দুঃখাত্মকস্য আত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা, অদ্বৈতভাবঃ প্রয়োজনম্। দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বাৎ বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্যাৎ ইতি ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশনায় অস্যারম্ভঃ ক্রিয়তে।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি"। "যত্র বা অন্যদিব স্যাত্ তত্রান্যোঽন্যত্ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্ বিজানীয়াত্"। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্, তত্ কেন কং পশ্যেত্, তত্ কেন কং বিজানীয়াত্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ।

তত্র তাবদোঙ্কার নির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্ আগমপ্রধানম্ আত্মতত্ত্ব-প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতম্। যস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপশমে অদ্বৈত প্রতিপত্তিঃ রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পোপশমে রজ্জুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ, তস্য দ্বৈতস্য হেতুতো বৈতথ্য-প্রতিপাদানায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্। তথা অদ্বৈতস্যাপি বৈতথ্য-প্রসঙ্গপ্রাপ্তৌ যুক্তিতস্তথাত্বদর্শনায় তৃতীয় প্রকরণম্। অদ্বৈতস্য তথাত্ব-প্রতিপত্তিপ্রতিপক্ষভূতানি যানিবাদান্তরাণি অবৈদিকানি সন্তি, তেষা-মন্যোন্যবিরোধিত্বাৎ অতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুর্থং প্রকরণম।

কথং পুনরোঙ্কারনির্ণয় আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বং প্রতিপদ্যত ইতি উচ্যতে—“**ওমিত্যেতৎ**” “**এতদালম্বনম্**” “**এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনে-নৈকতরমন্বেতি**”। “**ওঁমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত**” “**ওঁমিতি ব্রহ্ম**” “**ওঙ্কার এবেদং সর্বম্**” ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। রজ্জ্বাদিরিব সর্পাদি-বিকল্পস্যাস্পদম্ অদ্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদি বিকল্পস্যাস্পদম্ যথা, তথা সর্কোঽপি বাক্প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় ওঙ্কার এব। স চাত্মস্বরূপমেব, তদভিধায়কত্বাৎ। ওঙ্কার-বিকার-শব্দাভিধেয়শ্চ সর্ব্বঃ প্রাণাদিরাত্মবিকল্পঃ অভিধান ব্যতিরেকেণ নাস্তি “**বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্**” “**তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্, সর্ব্বং হীদং নামনি**” **ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ অত আহ—ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বমিতি।**

শ্রীমৎ গৌড়পাদাচার্য্য শ্রীমৎ শুকদেবের শিষ্য। তৎকৃত কারিকা মূল শ্রুতির সহিত গ্রথিত। মাণ্ডূক্যশ্রুতির অর্থবোধক এই শ্লোকবদ্ধ কারিকা। ব্রহ্মবিদ্যা গুরুপরম্পরাগত। শাঙ্করমঠ সম্প্রদায়ে প্রত্যহ এই গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করার বিধি ছিল। সকলে সমস্বরে পাঠ করিতেন।

ওঁ নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্॥
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিষ্যম্।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যান স্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি॥

নারায়ণ-ব্রহ্মা-বশিষ্ঠ-শক্তি-পরাশর-ব্যাস-শুক-গৌড়পাদ--গোবিন্দ পাদ-শঙ্করাচার্য্য-পদ্মপাদ-হস্তামলক-ত্রোটকাচার্য্য-সুরেশ্বরাচার্য্য——এই সমস্ত গুরুসম্প্রদায় দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত। এই জন্য গৌড়পাদের কারিকার এরূপ সম্মান। এই জন্য ভগবান্ শঙ্কর মাণ্ডূক্যভাষ্যের সহিত কারিকারও ভাষ্য করিয়াছেন। কারিকা প্রকরণচতুষ্টয়ে বিভক্ত।

(১) আগম প্রকরণ।

(২) বৈতথ্যাখ্য প্রকরণ।

(৩) অদ্বৈতাখ্য প্রকরণ।

(৪) অলাত শান্ত্যাখ্য প্রকরণ।

প্রকরণ এক প্রকার গ্রন্থ বিশেষ। ইহার লক্ষণ হইতেছে

শাস্ত্রৈকদেশ সম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।

আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।

কোন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের একটি মাত্র বিষয় যে পুস্তকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং প্রধান শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাতে সহজ ভাবে প্রদর্শন করা হয় তাহাকেই প্রকরণ গ্রন্থ বলা হয়। এই জন্য বেদান্তে অনুবন্ধ চতুষ্টয় অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—যাহা তাহা এই প্রকরণেরও অনুবন্ধ। তথাপি ভগবান্ শঙ্কর প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া সংক্ষেপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বর্ণনা করিতেছেন।

এই প্রকরণ চতুষ্টয়ে বেদান্তের যাহা অর্থ তাহারই সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। কাজেই বেদান্তের প্রয়োজন যাহা এই শ্রুতির প্রয়োজনও তাহাই। সেই প্রয়োজনটি কি?

রোগার্ত্তের প্রয়োজন যেমন রোগনিবৃত্তিদ্বারা সুস্থ হওয়া সেইরূপ অন্তঃকরণ উপাধি বিশিষ্ট দুঃখী জীবাত্মার প্রয়োজন হইতেছে দ্বৈত-প্রপঞ্চ নিবৃত্তি দ্বারা অদ্বৈত স্থিতিলাভে সুস্থ হওয়া।

এই শাস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে প্রপঞ্চোপশম বা দ্বৈতনিবৃত্তি অথবা অদ্বৈত ভাবে স্থিতি। দ্বৈত প্রপঞ্চ হইতেছে অবিদ্যার কার্য্য। বিদ্যাদ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের জন্য এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইতেছে।

আগম প্রকরণে ওঁকারের স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের একমাত্র উপায়। ওঁকার স্বরূপ নিশ্চয় করিলে আত্মজ্ঞান কিরূপে জন্মে তাহা শ্রুতির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে বলা

হইয়াছে। এখানে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে এই যে জগৎ দেখা হইতেছে ইহা ব্রহ্মই। অজ্ঞান প্রভাবে রজ্জুকে যেমন সর্প রূপে দেখা হয় সেইরূপ অজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মকে জগৎ রূপে দেখা যাইতেছে। রজ্জুটি সর্প নহে রজ্জুই ; এইরূপ প্রতীতি জন্মাইতে হইলে যেমন অজ্ঞান কল্পিত সর্পভাব বিনাশের আবশ্যক, সেইরূপ অজ্ঞানকল্পিত দ্বৈত বোধের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত অদ্বৈত বোধ জন্মিতেই পারে না। প্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতস্থিতি। এই জন্য বৈতথ্যাখ্য প্রকরণে দ্বৈত মিথ্যা কিরূপে তাহাই দেখান হইয়াছে। অদ্বৈতাখ্য তৃতীয় প্রকরণে অদ্বৈতই যে একমাত্র সত্য তাহা দেখান হইয়াছে। অলাত-শান্তাখ্য চতুর্থ প্রকরণে অদ্বৈত তত্ত্বের বিপরীত বেদ বিরুদ্ধ বাদ সমূহ খণ্ডন করা হইয়াছে।

মুমুক্ষু। মাণ্ডূক্য শ্রুতির একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দে চিরতরে স্থিতির উপায় প্রদর্শন। ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মুমুক্ষুকে উপদেশ করিতেছেন—অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ম্ ? সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্ম-তত্ত্বম্। অর্থাৎ স্বরূপ বিশ্রান্তি জন্য জীবকে একদিকে দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ সংসার যে মিথ্যা সর্ব্বদা তাহার চিন্তা করিতে হইবে, অন্যদিকে ব্রহ্মতত্ত্বই যে আত্মতত্ত্ব তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। তান্ত্রিক আচমনেও এই কথা বলা হইয়াছে। আত্মতত্ত্বায় স্বাহা বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা শিবতত্ত্বায় স্বাহা। হৃদয়ে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া যে আত্মাকে সকলেই দেখাইয়া থাকে সেই আত্মাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে শিবতত্ত্বে বা ব্রহ্ম-ভাবে দেখা—ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। তবেই হইল আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা এবং ঐ আত্মজ্ঞানে স্থিতিই জীবের সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি-রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের স্বরূপ বিশ্রান্তি আর কিছুতেই না হয় তবে শ্রুতি আত্মজ্ঞানের কথা একবারে আরম্ভ না করিয়া ওঁকার তত্ত্ব আরম্ভ করেন কেন ?

শ্রুতি। চক্ষুই বাহ্য বিষয় সকল দর্শন করে। কিন্তু সেই চক্ষুকে

দেখিতে হইলে যেমন দর্পণ অবলম্বন করিতে হয় সেইরূপ যে আত্মাই একমাত্র সকলের জ্ঞাতা তাহাকে জানিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই ; তাই শ্রুতি বলিতেছেন ওঁকারই আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান অবলম্বন। শ্রুতিবাক্যের যে শব্দ প্রমাণ এখানে তাহাই দেখান হইতেছে। এতদা-লম্বনং শ্রেষ্ঠম্। শ্রুতি আবার বলিতেছেন "এতদ্বৈ সত্যকামপরঞ্চা-পরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি। "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত"। "ওমিতি ব্রহ্ম" "ওঙ্কারমেবেদং সর্বম্" হে সত্যকাম! এই যে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম ইহাই ওঙ্কার সেইজন্য বিদ্বান এই ওঙ্কার সাধনা দ্বারা উভয়ের মধ্যে এককেই প্রাপ্ত হয়েন। আবার বলেন আত্মাকে ওম্ ইত্যাকারে চিন্তা করিবে। শ্রুতি পুনরায় বলেন ওঙ্কারই ব্রহ্ম ; ওঙ্কারই এই সমস্ত।

শ্রুতির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ইহা বিশেষ করিয়া বলা যাইবে এখানে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে রজ্জু সম্বন্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত যে সর্প নামটি ও সর্পরূপটি ঐ কল্পিত নাম ও রূপ রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন অসৎ বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা সম্বন্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত নাম ও রূপ লইয়া যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা তখন বুঝা যায় যখন অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ আত্মাকে ওঁকার অবলম্বনে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রূপ সাধনা করা যায়।

অদ্বৈত আত্মার উপরেই প্রাণাদি কল্পনার বিষয়ীভূত সমস্ত বাক্ প্রপঞ্চ—সমস্ত শব্দরাশি ভাসিয়াছে। ওঁকারকে ভাব ব্রহ্ম ও শব্দ ব্রহ্ম বলা হয়। শব্দের সহিত যেমন অর্থ জড়িত সেইরূপ শব্দ—ব্রহ্ম রূপ অপর ব্রহ্মের সহিত অর্থ—ব্রহ্ম রূপ পরব্রহ্ম জড়িত। নাম ও নামীর অভেদত্ব বুঝিতে পারিলেই ওঁকারের সহিত আত্মার একতা বুঝা যাইবে। শব্দমাত্রই ওঁকার-বিকার। শব্দ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য শব্দ ব্রহ্মরূপী ওঙ্কারই এই সমস্ত বলা হইয়াছে পরে এই সমস্ত তত্ত্ব বিশদরূপে বলা হইবে।

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

ওঁ ॥ উপনিষদ রত্নঃ ॥

ओमित्येतदक्षरमिदꣳ सर्व्वं तस्योपव्याख्यानं
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव ॥
यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥

যদিদম্ অর্থজাতম্ অভিধেয়ভূতম্, তস্য অভিধানাব্যতিরেকাৎ, অভিধানভেদস্য চ ওঙ্কারাব্যতিরেকাৎ ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। পরঞ্চ ব্রহ্ম অভিধানাভিধেয়োপায়পূর্ব্বকমবগম্যত ইত্যোঙ্কার এব। তস্যৈতস্য পরাপরব্রহ্মরূপস্যাক্ষরস্য ওমিত্যেতস্য উপব্যাখ্যানম্, ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাৎ ব্রহ্মসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনমুপব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যৎ, তদপি ওঙ্কার এব উক্তন্যায়তঃ। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদ্যমব্যাকৃতাদি, তদপি ওঙ্কার এব ॥১॥

যদ্বা ইদং সর্ব্বং জগদোঙ্কারমাত্রম্। তস্যোমক্ষরস্য। উপসমীপে হনন্তরমগ্রে ব্যাখ্যানং বোধ্যম্। ত্রিষু কালেষু যজ্জায়তে যচ্চ কালাতীতং কালস্যাপি কারণং স চিৎপ্রতিবিম্বাহবিদ্যাদিতদোঙ্কার এব নামার্থয়ো বিবর্ত্তাধিষ্ঠানয়োশ্চাহভেদাদিত্যর্থঃ ॥১॥

ওঁ নামক এই অক্ষর এই সমস্ত [পরিদৃশ্যমান্ জগৎ]। তাহার উপব্যাখ্যান—স্পষ্ট-কথন আরম্ভ হইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্তও ওঙ্কার। অন্য যাহা কিছু তিনকালের অতীত তাহাও ওঙ্কার ॥১॥

মুমুক্ষু। ওঙ্কার অবলম্বন না করিলে আত্মজ্ঞান জন্মিবে না ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছেন। কিন্তু ওঙ্কারকে ত অক্ষর বলিতেছেন। অক্ষর এই জগৎরূপে ভাসিয়াছে কিরূপে ?

শ্রুতি। "ন ক্ষরতি ন চলতি ইতি অক্ষরং স্বর উচ্যতে" অক্ষরকে স্বর বলা যায়। যাহার ক্ষয় হয়না, যাহা ফুরাইয়া যায়না এবং যাহার চলনও হয় না তাহাই অক্ষর। স্বর-শব্দ। ইহার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ পরে বলা হইতেছে। এখন ওঁ ইহাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার অর্থ কি তাহাই ধারণা কর। এই শ্রুতিই পরশ্লোকে বলিতেছেন এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তাহা ব্রহ্মই। এই আত্মা—যাহা সকলেই অনুভব করে তাহাও ব্রহ্ম। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই শ্রুতি-বাক্যে এরূপ বুঝিও না যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গোচর এই পরিদৃশ্যমান জগতই সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মনের অগোচর, বাক্যের অগোচর ব্রহ্ম বস্তু। ইন্দ্রিয়গোচর জড় বস্তুর সহিত সেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের বা আত্মার বা চেতনের কোন সাদৃশ্য নাই। তথাপি যে বলা হইতেছে এই সমস্তই ব্রহ্ম তাহা কেন বলা হইতেছে লক্ষ্য কর। রজ্জুর বিবর্ত্ত যেমন সর্প, ব্রহ্মের বিবর্ত্তও সেইরূপ এই জগৎ। রজ্জুকে না জানা বশতঃ সেই অজ্ঞানে যেমন ইহাকে সর্প বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ আত্মাকে না জানা জন্য—ব্রহ্মকে না জানা জন্য ব্রহ্মকেই জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। দৃষ্টান্তের সকল অংশে সাদৃশ্য গ্রহণ করিও না। বলিও না। পূর্ব্বে সর্প জানা ছিল সেইজন্য রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ জন্মিতে পারে কিন্তু জগৎ বলিয়া পূর্ব্বে কিছুই জানা নাই তথাপি ব্রহ্মকে জগৎ বলা হয় কেন? রজ্জুও পূর্ব্বে জানা ছিল, সর্পও জানা ছিল—সেইজন্য একটিতে আর একটির অধ্যাস হইতে পারে ইহা স্থূল কথা। কিন্তু ব্রহ্মকেও তুমি জান না তথাপি রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দাও কেন? সেইজন্য বলিতেছি সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য গ্রহণ করা দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা অধ্যাসটি মাত্র বুঝিতে বলা হইতেছে। এই যে জগৎটা দেখা যাইতেছে এটা স্বরূপে অন্য একটি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, জ্ঞান-স্বরূপ কিছু। সেইটি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগৎরূপে দেখা যাইতেছে। যেমন মরীচিকাকে জল বলিয়া ভ্রম হয় ইহাও সেইরূপ ভ্রমে দেখা যাইতেছে। অজ্ঞানেই জগৎ দেখা হয় জ্ঞানে ইহা নাই।

এই ওঁকারই যে এই সমস্ত ইহা কেন বলা হইতেছে ধারণা কর।

যাহা কিছু দেখ তাহাই স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষী এই চারি ভাবেই স্থিতিলাভ করিতেছে। শ্রুতি ওঙ্কার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অকারোকারমকারাঽর্দ্ধমাত্রাঽত্মিকা। শ্রুতি আরও বলেন **স্থূল সূক্ষ্মবীজসাক্ষীভেদানাঽঙ্কারাঽয়ম্বতুর্বিধা:।** ওঙ্কার মধ্যে অকার উকার মকার ও অৰ্দ্ধ মাত্রা (নাদবিন্দু) এই চারিটি ভাগ আছে। **তদবস্থা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুরীয়া:।** অকার উকার মকার ও অৰ্দ্ধ মাত্রা ইহারা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় অবস্থার পরিচায়ক। শ্রুতি সেইজন্য দেখাইতেছেন—

অকারস্থূলাংশে জাগ্রদ্বিশ্ব:। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজস:। বীজাংশে তৎ প্রাজ্ঞ: সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়: ॥

উকার স্থূলাংশে স্বপ্নবিশ্ব:। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজস:। বীজাংশে তৎ-প্রাজ্ঞ: সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়:।

মকার স্থূলাংশে সুষুপ্ত বিশ্ব:। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজস:। বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞ:। সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়:।

অৰ্দ্ধমাত্রাস্থূলাংশে তুরীয় বিশ্ব:। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজস:। বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞ:। সাক্ষ্যংশে তুরীয়তুরীয়:।

বিজ্ঞানবিৎ-বিশেষরূপ জ্ঞান যাঁহার আছে—তিনি জানেন স্থূল যাহা দেখা যায় তাঁহার মূলে সূক্ষ্ম আছে। সূক্ষ্মের মূলে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বীজাংশ আছে। বীজের মূলে সূক্ষ্মতম সাক্ষ্য অংশ আছে।

স্থূল জগৎ দেখিয়া ইহার সূক্ষাংশে যাও আবার সূক্ষ্ম হইতে বীজে যাও আবার বীজ হইতে সাক্ষ্যংশে যাও দেখিবে সেখানে ব্রহ্ম বা আত্মা বিরাজ করিতেছেন। ওঙ্কারই এই সমস্ত ইহার অর্থ এই জন্য সাক্ষী ব্রহ্মই বীজ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন।

মুমুক্ষু। মা! আপনার কৃপাদৃষ্টিতে বুঝিতেছি ওঁই এই সমস্ত ইহার অর্থ কি! **সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম** ইহা কি তাহাও বুঝিতেছি। বুঝিতেছি স্বরূপে যিনি সাক্ষী তিনিই প্রথমে বীজাবস্থায় পরে সূক্ষ্মাবস্থায়,

পরে স্থূলাবস্থায় বিবর্ত্তিত হইতেছেন। ওঁকারের তুরীয় বা সাক্ষী অবস্থাটিকে বলা হয় পরব্রহ্ম আর বীজ, সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা সমূহকে বলে অপরব্রহ্ম। এই সমস্ত অবস্থাকেই বলা হয় তুরীয়, সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পরা পশ্যন্তি মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি অবস্থার কথাও বলা হয়। কৃপাময়ি! এখন বলুন ওঙ্কার নামক অক্ষরই যখন এই সমস্ত তখন ওঁকারকে অক্ষর বলিতেছেন কেন? অক্ষরের সহিত এই পরিদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধ কি?

শ্রুতি। বাবা! বুঝিতেছ ত স্বরূপে ওঁই ব্রহ্ম। **ওমিতি ব্রহ্ম** ইতি শ্রুতিঃ। স্মৃতিও (গীতাও) বলেন "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ৮।১৩। ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম ইনিই পরব্রহ্ম। কিন্তু তটস্থে ইনিই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত। অক্ষর কেন ও অক্ষরের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি বলিতেছি শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। বলুন।

শ্রুতি। অক্ষরগুলিকে বর্ণও বলে। অক্ষর বা বর্ণ গুলি আত্ম-শক্তির—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমার পরে স্ফুট বৈখরী মূর্ত্তি। শক্তি যাহা তাহা অব্যক্ত। এই শক্তি অভিব্যক্ত হইবার কালে দেহ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া যে আকার প্রাপ্ত তাহাই অক্ষর বা বর্ণ। পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান্ এক হইয়া যখন পরম শান্ত চলন রহিত অবস্থায় থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। পরে সৃষ্টি সময়ে মণির ঝলকের মত পরব্রহ্মে স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্ম যে স্পন্দন উঠে—সেই স্পন্দন প্রথমেই ওঁকারের আকারে লক্ষিত হয়। পরমব্রহ্মের সঙ্কল্প বিকল্পময়ী এই স্পন্দ শক্তিই মায়া। এই মায়া ব্রহ্মকে যত যত রূপে বিবর্ত্তিত করেন, তত তত প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ রাশি অনন্ত। স্পন্দ শক্তির স্থূল সূক্ষ্ম বা বীজ অবস্থায় গতা গতিতে অক্ষর উৎপন্ন হয়। অক্ষরও শব্দ মাত্র শব্দ গুলি অক্ষর সমাম্নায় বা বর্ণ সংহতি বাক্; ইহার অর্থ জানিতে হইলে অক্ষর বা বর্ণ গুলির জ্ঞান হওয়া চাই। অক্ষরের জ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যায়—পরম ব্যোমে স্পন্দ শক্তির

আদি ক্রীড়াই ওঁকার অক্ষর। ওঁকার তবে পরম ব্রহ্মসাগরে অতি সূক্ষ্ম শক্তি তরঙ্গ মাত্র। জলের তরঙ্গ মত বায়ুর তরঙ্গ আছে কিন্তু ব্রহ্মসাগরে মায়াতরঙ্গ অব্যক্তেরও পূর্ব্বাবস্থা। কাজেই ওঁকারে ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিলেন! ভগবান পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিতেছেন "বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে" বর্ণজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয় হইতেছে বাক্। এই বর্ণ জ্ঞানে ব্রহ্ম আছেন। এই হেতু বলা হইতেছে ওঁকার অক্ষর জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায়।

যে স্পন্দশক্তি-মায়া, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াছিলেন ; সেই সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিই যখন শব্দ বা বাক্য হইলেন (সলিল সদৃশানি বাক্য পদানি) (বাক্য আবার অক্ষর সমাম্নায় মাত্র) তখন শব্দের সহিত বা অক্ষরের সহিত স্পন্দের একতা হইল। স্পন্দন আবার ব্রহ্মের সহিত এক ; শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া জলে যে তরঙ্গ উঠে তাহা যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ পরম শান্ত জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মসাগরে যে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তির তরঙ্গ উঠে তাহাও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য ওঁ নামক অক্ষরকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মূল তত্ত্ব এই যে ব্রহ্মই আছেন অন্য অন্য যাহা কিছু ব্যাখ্যা করা যায় তাহা মায়িক মাত্র। মায়া দ্বারা যে ব্রহ্মবিবর্ত্ত, ইহারও ক্রম আছে।

মুমুক্ষু। ওঁ নামক অক্ষরই এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ—এখন ইহা বল।

শ্রুতি। ব্রহ্মের উপরে শক্তির আদি ক্রীড়া যে ভাবে হয়—শক্তির অভিব্যক্তি কালে প্রথমে যেরূপ কুণ্ডলাকারে স্পন্দনের গতি হয়, শক্তির পরবর্ত্তী গতিও ঠিক ঐরূপ। পরব্রহ্মে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তি যে আকারে নাচিয়াছিলেন অতিক্ষুদ্র পরমাণু মধ্যেও শক্তির গতি ঠিক সেইরূপ। বৃহৎ সর্পের গতিও যেমন, অতি ক্ষুদ্র সর্পের গতিও সেইরূপ। কুণ্ডলিনী একভাবেই সর্ব্বত্র কার্য্য করেন। শক্তি হইতেই জগৎ—অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কার্য্য। জগৎ কর্ম্মেরই স্থূল

মূর্ত্তি। এই জন্য বলা হইতেছে ওঁনামক অক্ষরই এই জগদাকার ধারণ করিয়াছেন।

সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিটি কি ইহা বিচার করিলে স্পষ্টই অনুভব করা যায়—সঙ্কল্প ও বিকল্প যাহা তাহা কল্পনা বা মায়া মাত্র। ব্রহ্মই আছেন তাঁহার যে স্পন্দন কল্পনা করা যায় তাহাও কল্পনা মাত্র। ইহাই মায়া। ব্রহ্ম আত্মমায়া দ্বারা বহু নামরূপ যুক্ত এই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। এই জন্য বলা হইতেছে ওঁনামক অক্ষরই জগৎরূপে ভাসিলেও মূলে কিন্তু ব্রহ্মই আছেন, আর এই নাম রূপ বিশিষ্ট জগৎ একটা ইন্দ্রজাল।

রজ্জুর উপরে যে সর্প ভাসে তাহা মায়া বা অজ্ঞান বশে; ইহা রজ্জুরই বিবর্ত্তন। রজ্জুই সর্পরূপে যেমন বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই আত্ম-মায়ায় জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন মাত্র। ব্রহ্মকেই ভ্রম জ্ঞানে জগৎরূপে দেখা হয়। যদি বলা হয় এই ভ্রম জ্ঞান কার হয়—তাহার উত্তর এই যে ব্রহ্ম হইতে মহামন পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি তাহাতেও দ্বৈত থাকে না কারণ অহং অভিমান তখনও সৃষ্ট হয় নাই। অভিমান হইলেই ভ্রমজ্ঞানের কার্য্য হয়।

ব্রহ্মই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে আত্মমায়ায় জগৎ কল্পিত; যেমন রজ্জুর উপরে অজ্ঞানে সর্প কল্পিত। কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। অজ্ঞান কল্পিত সর্পটি অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে। এই কারণে বলা হইল এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ ওঁনামক অক্ষর হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু ওঁ অক্ষরই এই সমস্ত; ওঁকার অধিষ্ঠান চৈতন্যের বাচক।

যেমন শালগ্রামে বিষ্ণু মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া দৃঢ়রূপে ধ্যান করিলে শালগ্রাম আর শালগ্রাম থাকেন না, বিষ্ণুই হইয়া যান্, সেইরূপে ওঁকার অক্ষরে ব্রহ্ম স্বরূপের ধ্যান করিলে ওঁকারও ব্রহ্মরূপই হইয়া যান।

শক্তি ভিন্ন শক্তিমানের প্রকাশ যেমন আর কেহই করিতে পারেনা,

সেইরূপ ওঁকার ভিন্ন স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অন্য কোনরূপ প্রকাশ সম্ভবে না। আরও দেখ নাম ও নামী এক। ওঁকার ব্রহ্মের নাম। নামী ব্রহ্ম হইতে ওঁকার ভিন্ন নহে। অর্থপ্রপঞ্চে ব্যাপক যিনি তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু শব্দপ্রপঞ্চে ব্যাপক যিনি তিনি ওঁকার। ওঁকার উচ্চারণেও সাধনা হয়। শ্রুতি বলেন "যস্মাদুচ্চার্য্যমান এব প্রাণানূর্দ্ধমুন্নাময়তি তস্মাদুচ্যতেওঁকারঃ।

মুমুক্ষু—এই চিন্তায় আমার উপকার হইবে?

শ্রুতি—ওঁ নামক অক্ষরই অথবা অ উ ম এই ত্র্যক্ষর সমাম্নয়ই আদি বাক্, আদি শব্দ, ইঁহা অপেক্ষা সাধুশব্দ আর নাই। শুভ বাক্ই বেদ। শুভ বাক্যই ব্রহ্ম। এই সাধু বাক্য উচ্চারণে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে, চিত্ত শান্ত হইবেই। ওঁ নামক অক্ষরের অর্থ চিন্তনে পরমাত্মার ধ্যান হইবে। কারণ শাস্ত্র বলেন ঃ—

অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্বরূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥

ওঁকার শব্দপ্রপঞ্চ ব্যাপক, আর ব্রহ্ম অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক। ওঁকারই ব্রহ্ম। কারণ সূক্ষ্মবাক্যের মধ্যে যে অর্থরূপী আন্তর জ্ঞান তাহাই স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি জন্য শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। শব্দকে তবে অগ্রাহ্য করা যায় না। শব্দটা জড় মাত্র ইহা বলা চলে না "যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে"। শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই জগৎ। শব্দই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত শক্তি। মহাপ্রলয়ে ইহাই শক্তিমানের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান করে, আবার সৃষ্টিকালে ইহাই ব্রহ্ম হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জগদাকারে ব্রহ্মকে বিবর্ত্তিত করে।

মুমুক্ষু। শক্তি তত্ত্ব ও শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা কিরূপে হইবে?

শ্রুতি। সৃষ্টি সময়ে যাহা যাহা হয় তাহা ধারণা কর।

প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেন

প্রলয়াল্লীন সর্ব্বজগৎ কামায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃপ্রদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ। * * অপরিপক্ক প্রাণিকর্ম্মভিঃ কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ স্বফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টিমায়া পুরুষৌ প্রাদুর্ভাবতঃ। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোরচিদংশোবীজম্। চিদচিন্মিশ্রোংশো নাদঃ। অচিচ্ছন্দেন শব্দার্থোভয় সংস্কাররূপাঽবিদ্যোচ্যতে। অস্মাদ্বিন্দোঃ শব্দব্রহ্মাপরনামধেয়ম্। মঞ্জুষা—নাগেশভট্ট।

আঃ শাঃ ধৃত।

ভাবার্থ এই। প্রলয়ে (সুষুপ্তির মত) সর্ব্ব জগৎ চেতন ঈশ্বরে লীন থাকে। লয় অর্থে আত্যন্তিক নাশ নহে। কারণে যে কার্য্যের তিরোভাব তাহাই লয়। আবার কিন্তু কার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ভগবল্লীন প্রাণিদিগের কর্ম্ম যখন ফলদানে উন্মুখ হয়, তখন ভগবান্ হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে থাকে। প্রথমেই মায়া ও পুরুষের আবির্ভাব হয়। পরে পরমেশ্বরের সৃজন ইচ্ছা রূপিণী মায়াবৃত্তি জন্মে। পরে বিন্দুরূপ ত্রিগুণের অব্যক্তাবস্থার উদয় হয় অব্যক্ত ত্রিগুণের বিন্দুভাবে আবির্ভাবই শক্তিতত্ত্ব। সেই বিন্দুর দুই অংশ। অচিদংশ হইল জগৎ বীজ। চিদংশ ব্রহ্ম। এবং চিদচিদংশই নাদ। শব্দ ও অর্থের যে সংস্কার, তাহাই অচিদংশ; ইহাই অবিদ্যা। এই বিন্দুর অপর নাম শব্দব্রহ্ম।

তবেই দেখ বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তই শক্তি। শক্তিই শব্দ-ব্রহ্ম। অব্যক্তের প্রথম ব্যক্তাবস্থাই শক্তির প্রথম অভিব্যক্তি। ইহাই ওঁকার অক্ষরের ব্যক্ত স্থূলমূর্ত্তি।

শব্দব্রহ্ম চারি অবস্থাতে অভিব্যক্ত হয়েন। ভগবান্ পরমেশ্বর আধারচক্রাদি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মূলাধারে পরা, মণিপুরে আসিয়া পশ্যন্তি, বিশুদ্ধাখ্যে মধ্যমা এবং মুখমধ্যে অতি স্থূল হ্রস্বাদি মাত্রা উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণ ভাবে বৈখরীরূপে বেদশাখাত্মক হয়েন।

স এব জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্যরূপং মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ ॥

ভাগবত ১১।১২।১৫।

শ্রীভাগবত আরও বলেন, বাক্য বা বেদরূপা বাণী আমারই প্রকাশক। "তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী" বাক্য এই পরব্রহ্মেরই প্রকাশক। যেমন আকাশে উষ্মারূপে ব্যক্ত অগ্নি কাষ্ঠেতে অধিক মথিত হইলে বায়ু সহকারে সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া ঘৃত প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ এই বাক্য-বেদরূপা বাণী আমারই প্রকাশক জানিবে।

মুমুক্ষু। মাণ্ডূক্য শ্রুতির ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং এই অংশ টুকুতেই ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান রহিয়াছে দেখিতেছি।

শ্রুতি। সমস্ত মন্ত্রটি কেন, মন্ত্রের প্রথম শব্দ ওঁ অক্ষরটিই সমস্ত জ্ঞানের মূর্ত্তি। সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন "তস্যোপব্যাখ্যানম্" তাহার উপব্যাখ্যা ইচ্ছা করিতেছি।

মুমুক্ষু। উপব্যাখ্যানং অর্থে ত স্পষ্টরূপে কথন ?

শ্রুতি। উপ সমীপেহনন্তরমগ্রে ব্যাখ্যানং বোধ্যম্।

মুমুক্ষু। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এ সমস্তই ওঁকার-ইহার অর্থ কি ?

শ্রুতি। সর্ব্বনামরূপ স্থূল প্রপঞ্চ যেমন ওঁকার, সেইরূপ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকাল পরিচ্ছিন্ন যাহা কিছু পদার্থ তাহাও ওঁকার।

মুমুক্ষু। ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ওঁকার কিরূপে ?

শ্রুতি। যখন হইতে কর্ম্ম আরম্ভ হয়, তখন হইতে কালের গণনা আরম্ভ হয়। বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত অবস্থায় শক্তির কোন কার্য্য নাই। কার্য্য নাই বলিয়াই শক্তির অভিব্যক্তি নাই। শক্তি অব্যক্ত। এই অব্যক্তাবস্থাকেই আদি প্রকৃতি বলা হয়। সত্ত্ব, রজ তমোগুণের সাম্যাবস্থাই ইহা। ত্রিকালাতীত অর্থে অনাদি অব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি বা অজ্ঞান বা অবিদ্যা ইহা কালপরিচ্ছিন্ন নহে। ইহাও ওঁকার।

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে তবে কতদূর বলা হইল ?

শ্রুতি—বলা হইল দৃশ্যপ্রপঞ্চ যাহা তাহা ওঁকার। কালপরিচ্ছিন্ন যাহা, যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে তাহাও ওঁকার। আবার সৃষ্টিতরঙ্গ যখন অব্যক্ত, যখন পর্য্যন্ত—যাহাকে কর্ম্ম বলে তাহা আরম্ভ হয় নাই ; স্বভাবতঃ সৃষ্টিতরঙ্গ যখন অহং পর্য্যন্ত আইসে নাই, সেই অব্যক্ত বিন্দুরূপিণী যে প্রকৃতি বা অবিদ্যা, যাহা ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঁকার। এই অনাদি অব্যক্ত সাভাষ অজ্ঞান—ইহাই কালাতীত, ইহা কালেরও কারণ ; ইহা কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে।

"ত্রিকালাতীত" ইহাতে যেমন বিন্দুরূপী অব্যক্ত অনাদি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বুঝাইতেছে, সেইরূপ "ত্রিকালাতীত" ইহাতে বিন্দুর পূর্ব্ব হিরণ্যগর্ভকেও বুঝাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইল ওঁকার ব্রহ্ম। এখন এই ওঙ্কারকে সর্ব্বনামরূপ প্রপঞ্চ বলা হইতেছে। সর্ব্ববাচ্য প্রপঞ্চেরও বাচক এই ওঙ্কার। ইহাতে বলা হইতেছে বাচ্য ও বাচক, বা নাম ও নামী, উভয়কে শুদ্ধ ব্রহ্মে লয় করিয়া অধিষ্ঠান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে নিশ্চয় করিতে হইবে। যেখানে নাম ও নামীর কল্পনা নাই, তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

ওঁকারকে সর্ব্বপ্রপঞ্চরূপ বলা হইল। পরোক্ষ ব্রহ্মরূপ যাহা, তাহা নিশ্চয় করিয়া সেই পরোক্ষ ব্রহ্মকে 'ভগবতী শ্রুতি' হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে বলিতেছেন ॥১॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাত্ ॥২॥

অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বেঽপি অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ কৃতঃ "**ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্**" ইত্যাদি। অভিধান প্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টস্য পুনরভিধেয়প্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ অভিধানাভিধেয়য়োঃ একত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ইতরথা হি অভিধানতন্ত্রা অভিধেয় প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়স্য অভিধানত্বং গৌণমিত্যাশঙ্কা স্যাৎ। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ প্রয়োজনম-ভিধানাভিধেয়য়োঃ একেনৈব প্রযত্নেন যুগপৎ প্রবিলাপয়ন্ তদ্‌বিলক্ষণং

ব্রহ্মপ্রতিপদ্যেতি। তথাচ বক্ষ্যতি "**পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ**" ইতি। তদাহ।

সর্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মেতি। সর্ব্বং যদুক্তমোঙ্কারমাত্রমিতি, তদেতৎ ব্রহ্ম, তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নির্দ্দিশতি **অয়মাত্মা ব্রহ্ম** ইতি। যদ্বা যেষামোঙ্কারতোক্তা প্রণবশ্চৈতৎসর্ব্বং ব্রহ্ম চিৎ চিদ্-বিবর্ত্তত্বাৎ। ন কশ্চন পরোক্ষোব্রহ্ম পদার্থঃ কিন্ত্বয়মাত্মৈব। অয়মিত্য-ন্তঃকরণ দেশেঙ্গুলি নির্দ্দেশঃ। অয়মিতি চতুষ্পাত্ত্বেন প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগাত্মতয়া অভিনয়েন নির্দ্দিশতি **অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি**। সো২য়ম্ আত্মা ওঙ্কারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্ষাপণবৎ, ন গৌরিবেতি। চত্বারঃ পাদাঃ কল্প্যা ভাগাঃ কার্ষাপণ ইব যস্য সঃ॥

ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি করণ সাধনঃ পাদশব্দঃ, তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ॥ ২ ॥

এই সমস্তই (ওঁকারাত্মক জগৎ) ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই এই আত্মা চতুষ্পাদ ॥২॥

মুমুক্ষু---সমস্তই এই ব্রহ্ম, আর একবার বল।

শ্রুতি—পূর্ব্বে বলা হইল ওঁ অক্ষরই এই সমস্ত। ওঁকার শব্দ ব্রহ্মবাচক, ব্রহ্ম, ওঁকার শব্দের বাচ্য, ওঁকার শব্দপ্রপঞ্চ ব্যাপক এবং ব্রহ্ম অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক। অর্থই শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হয় বলিয়া ওঁ শব্দকে বিশ্বময় ও ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য এই সমস্তই ব্রহ্ম।

মুমুক্ষু—এই আত্মা ব্রহ্ম—ইহাতে কি বলিবে ?

শ্রুতি—সমস্তই যখন ব্রহ্ম হইলেন, তখন এই আত্মা—হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যাঁহাকে দেখান যায়---এই আত্মা ত সকলের বাহিরে হইলেন না---সকলের মধ্যে ইনিও বটেন। অতএব এই আত্মা ব্রহ্ম। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মও তবে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা।

শ্রুতি বলেন **অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ হৃদি।**

মুমুক্ষু--'ভগবতী শ্রুতি' আপন হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বলিতেছেন--এই আত্মা ব্রহ্ম, ইহাতে কি বুঝিব?

শ্রুতি--যুক্তি দ্বারা দেখান হইল ব্রহ্মই বিশ্বময়। ইহা পরোক্ষ। হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর, সেই পরোক্ষব্রহ্ম আর কেহই নহেন, এই প্রত্যক্ষ আত্মা। এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে অপরোক্ষ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, আত্মাই ব্রহ্ম।

মুমুক্ষু—মহাবাক্যরূপা 'শ্রুতি' আপনার অতি প্রিয় মুমুক্ষুকে বলিতেছেন—ভো মুমুক্ষু "**অয়মাত্মা ব্রহ্ম**"। এই ত?

শ্রুতি—আত্মা সাক্ষিস্বরূপ। অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা ইঁহাকে অনুভব করিতে হইবে। ইনি নিত্যই আছেন। আত্মাই ব্রহ্ম। এই মহাবাক্য শ্রবণ মাত্র যাঁহার জ্ঞান হয়, তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান্। যাহাদের হয় না, তাহারা মন্দভাগ্য। সেই মন্দভাগ্য পুরুষের জ্ঞানের জন্য আত্মার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন **সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ**।

মুমুক্ষু—আত্মার চারি পাদ্ ইহা কেন বলিতেছেন?

শ্রুতি—ব্যবহারের সুবিধার জন্য এক বস্তুকে যেমন চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ মুমুক্ষুজনের বুঝিবার সুবিধা জন্য—এক আত্মাকে চারিভাগ করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে; নতুবা, অখণ্ড আত্মা বা ব্রহ্মের কোন অংশ নাই।

মুমুক্ষু—এই চারি পাদ্ কি কি?

শ্রুতি—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়--আত্মার এই চারি পাদ্। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত চারি পাদের সহিত বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং সর্ব্বসাক্ষী এই চারিপাদের সম্বন্ধ আছে। বিশ্ব ব্যষ্টি; বিরাট সমষ্টি; এইরূপ সমস্ত। বহু বৃক্ষের সংক্ষেপ কথন হইতেছে বন—ইহা সমষ্টি। বৃক্ষের প্রত্যেকের বিস্তার কথন হইতেছে বৃক্ষ—ইহা ব্যষ্টি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই চারি অবস্থা-

ভেদে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে চারি প্রকার করিয়া বর্ণনা করা হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হইলে জাগরণ, জাগ্রতের সংস্কার জন্য যে সবিষয় জ্ঞানাবস্থা—তাহা স্বপ্ন। সকল বিষয়ের জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট যে অবস্থা, তাহাই সুষুপ্তি। এই অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট পুরুষের নাম বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ। যিনি জাগ্রৎ স্থূল শরীরাভিমানী, তিনি বিশ্ব পুরুষ। যিনি স্বপ্নাবস্থা বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী পুরুষ, তিনি হইলেন তৈজস পুরুষ; আর যিনি সুষুপ্তি অবস্থা বিশিষ্ট কারণ শরীরাভিমানী, তিনি হইলেন প্রাজ্ঞ পুরুষ। জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে, সুষুপ্তিকে তুরীয়ে লয় করিয়া যে তুরীয় অবস্থা থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জ্ঞেয়।

মুমুক্ষু—চতুষ্পাদ্=চত্বারঃ পাদাঃ কল্প্যা ভাগাঃ কার্ষাপণ ইব যস্য সঃ। কার্ষাপণ কাহাকে বলে?

শ্রুতি—এক মণ মাপিবার পাত্রতে এক মণ, পৌণমণ, আধমণ ও পোয়ামণ এই চারি চিহ্ন যদি থাকে, (যদ্দ্বারা ঐ সমস্ত পরিমাণ করা যায়), সেইরূপ মাপ করিবার পাত্রকে কার্ষাপণ কহে। গবাদি পশুর যেমন চারিপাদ—আত্মা সেরূপে চতুষ্পাদ্ নহেন। পশুর পাদ—এখানে পাদ অর্থে করণ—যদ্দ্বারা গমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আত্মা চতুষ্পাদ্—এখানে পাদ্ অর্থে ভাবের সাধন। জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থাতে লয় করা ইহা প্রথম সাধন। দ্বিতীয় সাধন—স্বপ্নাবস্থাকে সুষুপ্তিতে লয় করা। তৃতীয় সাধন—সুষুপ্তিকে তুরীয় অবস্থায় লয় করা। তুরীয় অবস্থায় স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি। "পাদ" ইহার ধাতুগত অর্থ ৩৫ পৃষ্ঠায় আবার বলা যাইবে।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোন-
বিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ।৩।

কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ—জাগরিতস্থান ইতি। জাগরিতং স্থানম-স্যেতি জাগরিত স্থানঃ। বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে—আত্মনো

বহিরনাত্মনি বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞঃ। বহির্বিষয়া ইব প্রজ্ঞা যস্য অবিদ্যাকৃতা অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্যস্য; **"তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্ বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ"** ইত্যগ্নিহোত্রাহুতিকল্পনাশেষত্বেন অগ্নির্মুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ, দ্যু-সূর্য্য-বায্বাকাশ জল-পৃথিব্যাহবনীয়াখ্যানি সপ্তাঙ্গানি মূর্দ্ধশ্চক্ষুপ্রাণ দেহ মধ্যাকাশ মূত্রাশয় পাদমুখানি যস্য—ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যস্য স সপ্তাঙ্গঃ। তথা একোনবিংশতিঃ মুখান্যস্য; বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি, মুখানীব মুখানি তানি উপলব্ধিদ্বারাণীত্যর্থঃ। স এবং বিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্দ্বারৈঃ শব্দাদীন্ স্থূলান্ বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে ইতি স্থূলভুক্। উক্ত দ্বারৈঃ স্থূলবিষয় ভোক্তা ইত্যর্থঃ। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ; যদ্বা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানরঃ এব বৈশ্বানরঃ; সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎ পূর্ব্বকত্বাদুত্তরপাদাধিগম্য প্রাথম্যমস্য। কথং **"অয়মাত্মাব্রহ্ম"** ইতি প্রত্যগাত্মনোঽস্য চতুষ্পাত্ত্বে প্রকৃতে দ্যুলোকাদীনাং মূর্দ্ধাদ্যঙ্গত্বমিতি? নৈষ দোষঃ—সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য সাধিদৈবিকস্য অনেনাত্মনা চতুষ্পাত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। সর্ব্ব-ভূতস্থশ্চ আত্মা একো দৃষ্টঃ স্যাৎ; সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। **"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি"** ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ শ্চৈবমুপসংহৃতঃ স্যাৎ—অন্যথা হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্মা সাংখ্যাদিভিরিব দৃষ্টঃ স্যাৎ; তথা চ সতি অদ্বৈতমিতি শ্রুতিকৃতো বিশেষো ন স্যাৎ সাংখ্যাদিদর্শনাবিশেষাৎ।

ইষ্যতে চ সর্ব্বোপনিষদাং সর্ব্বাত্মৈক্যপ্রতিপাদকত্বম্; অতো যুক্তমেবাস্য আধ্যাত্মিকস্য পিণ্ডাত্মনো দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বেন বিরাড়াত্মনা আধিদৈবিকেনৈকত্বম্, ইত্যভিপ্রেত্য সপ্তাঙ্গত্ব বচনম্ **"মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্"** ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ। বিরাজৈকত্বমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতা-ত্মনোঃ। উক্তঞ্চৈতৎ মধুব্রাহ্মণে **"যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ো-**

স্নেনময়: পুরুষ: যশ্চায়মধ্যাত্মম্" ইত্যাদি। সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োস্তেকত্বং সিদ্ধমেব; নির্ব্বিশেষত্বাৎ। এবঞ্চ সতি এতৎ সিদ্ধং ভবিষ্যতি—সর্ব্বদ্বৈতোপশমে চাদ্বৈতমিতি ॥ ২ ॥

আত্মার প্রথম পাদ্ যিনি,তিনি জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, জাগ্রদভিমানী বাহ্যবিষয়সমূহে প্রজ্ঞাবান্, সপ্তাবয়ব, ঊনবিংশ মুখ (উপলব্ধি-দ্বার) বিশিষ্ট; স্থূল ভোগী, বৈশ্বানর ॥৩ ,

মুমুক্ষু—জাগরিত স্থানঃ ইহার অর্থ কি ?

শ্রুতি -জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়েরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং। ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদির যে অনুভব, তাহাই জাগরণ। জাগ্রত অবস্থা হইতেছে অভিমানের বিষয় যাঁহার তিনি জাগরিতস্থানঃ। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্য, তিনি আত্মার প্রথম পাদ্। স্থান=অভিমানের বিষয়।

বিশ্ব পুরুষ হইতে অভিন্ন যে বিরাট, ইনিই আত্মার প্রথম পাদ্। এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট, জাগ্রৎ অবস্থার অভিমানী; ইনি স্থূল শরীরাভিমানী। জাগ্রৎ স্থূল শরীরাভিমানী বিশ্বঃ ॥

মুমুক্ষু—"বহিঃপ্রজ্ঞঃ" কিরূপ !

শ্রুতি—বহিঃ অর্থ=আত্মার আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা বা বিষয়। বহিঃপ্রজ্ঞঃ=আত্মার আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা বা বিষয়—সেই বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন যিনি—তিনি বহিঃপ্রজ্ঞঃ। বহিঃপ্রজ্ঞঃ পুরুষ বাহ্যশব্দাদি বিষয়ে বৃত্তিবান্। বিশ্ব হইতে অভিন্ন বিরাট অর্থাৎ জাগ্রদভিমানী, আত্মা, আপন মায়া প্রভাবে ঘট পট অবটাদি বাহ্যবিষয়কে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করিয়া ঐ দৃশ্য-প্রপঞ্চকে অনুভব করেন।

মুমুক্ষু—প্রকৃষ্টরূপ যে জ্ঞান তাহাই ত প্রজ্ঞা। চৈতন্যরূপ যে স্বরূপভূত প্রজ্ঞা, তাহা ত বাহ্য বিষয়ে ভাসিতে পারে না; এই প্রজ্ঞা ত আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত,—এই প্রজ্ঞা বাহিরের কোন বস্তুর ত অপেক্ষা করে না। বাহিরের বিষয়ে যে প্রজ্ঞা ভাসে, তাহাকে বুদ্ধিরূপা বলা যায়। আর এক কথা, বাহ্য বিষয় যাহাকে বলা হইতেছে, আত্মার

আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা বা বিষয় বা জগৎপ্রপঞ্চ—বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব কোথায়? তবে প্রজ্ঞা যাহা আত্মগত, তাহা বাহিরের অবাস্তব বিষয়ে ভাসিবে কিরূপে? ইন্দ্রজালের যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অজ্ঞানে আছে; বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চ সেইরূপে ভাসে বলা যায়—এই হেতু জিজ্ঞাস্য বহিঃপ্রজ্ঞঃ কিরূপ?

শ্রুতি—তোমার প্রশ্ন পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। উত্তর শুন। আত্মবিষয়িণী স্বরূপ ভূত যে প্রজ্ঞা, তিনি বাস্তবিক ইন্দ্রজাল স্বরূপ বাহ্য বিষয়ে ভাসেন না; পরন্তু বুদ্ধিবৃত্তিরূপা যে বিষয়াদি-বস্তুবিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা অজ্ঞানকল্পিতা প্রজ্ঞা, তাহাকে বাহ্যবিষয়িণী প্রজ্ঞা বলা হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তিরূপা প্রজ্ঞা প্রকৃত পক্ষে বাহ্য বিষয়ের ভাবকে অনুভব করিতেছে না; কারণ, অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া বাস্তব পক্ষে ঐ প্রজ্ঞার অভাবই দৃষ্ট হয়। আবার ঐ প্রজ্ঞার বিষয় যে বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চ বাস্তব পক্ষে তাহারও অভাব রহিয়াছে; কারণ, দৃশ্যপ্রপঞ্চ কেবল অজ্ঞান কল্পিত মাত্র। এই জন্য বুদ্ধিবৃত্তির যে বাহ্য প্রকাশ করা ভাব, তাহা প্রাতিভাসিক; উহা কল্পিত মাত্র। ব্যহ্য প্রজ্ঞা, বাহ্যবিষয়ে ভাসা কি এখন বুঝিতেছ?

মুমুক্ষু—বুঝিতেছি, এখন বল আত্মা সপ্তাঙ্গ কিরূপ?

শ্রুতি—এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট-পুরুষ সপ্তাঙ্গ। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন—**তস্যহবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্ব-রূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেবরয়িঃ পৃথীব্যেব পাদৌ**" "অগ্নিহোত্র কল্পনা শেষত্বেনাগ্নিমুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ।"

এই বৈশ্বানররূপী আত্মার মস্তক হইতেছে সুন্দর তেজোমণ্ডিত স্বর্গলোক, চক্ষু হইতেছে শ্বেতরক্তাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট সূর্য্য, প্রাণ হইতেছে নানা গতিতে বিচরণশীল বায়ু, দেহ-মধ্যভাগ হইতেছে চতুর্দ্দিক্ প্রসারিত এই আকাশ, মূত্রস্থান হইতেছে সমুদ্রাদি জলরাশি

পাদদেশ হইতেছে পৃথিবী, মুখ হইতেছে অগ্নিহোত্রের উপযোগী আহবনীয় নামক অগ্নি।

বৈশ্বানরের এই মানব দেহ ধরিয়া,—বিরাট পুরুষের মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, দেহমধ্যভাগ (ধড়), মূত্রস্থান, পাপদেশ ও মুখ ভাবনা কর। অনন্ত প্রসারিত আকাশ তাঁহার দেহমধ্যভাগ, এখান হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গলোক মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু, সর্ব্বত্রবিচরণশীলবায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস, জল উদর, পৃথিবী পাদদেশ এবং মুখ অগ্নি—এইগুলি ভাবনা করিয়া দেখ দেখি—এই পরিদৃশ্য জগদাকারে কে দাঁড়াইয়া আছেন? আর এই ক্ষুদ্র মানব দেহ ধারণ করিয়াই বা কে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন?

মুমুক্ষু—আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ ও সূর্য্য ইহারা ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থিতি করিতেছে, মানব দেহের অঙ্গরূপে ত ইহাদিগকে বোধ করা যায় না?

শ্রুতি—এই সকল বস্তু যে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত তাহা নহে, কিন্তু রজ্জুসত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্প বা মিথ্যা দণ্ডের অঙ্গ প্রতঙ্গ যেমন ভাসে,—সেই রূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া এই সপ্তাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে।

মুমুক্ষু—"একোনবিংশতি মুখং" কি কি?

শ্রুতি—মুখ অর্থে উপলব্ধি দ্বার। জাগ্রদভিমানী চৈতন্য পুরুষের বিষয় উপলব্ধি-দ্বার ১৯শ প্রকার।

৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় + ৫ প্রাণ + মন + বুদ্ধি + চিত্ত এবং অহংকার এই ১৯শ মুখ।

মুমুক্ষু—বিশ্ব পুরুষের জ্ঞানের সাধন ও কর্ম্মের সাধন এই ১৯শ প্রকার—এই ত বলিতেছ?

শ্রুতি হাঁ। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এক মন ও এক বুদ্ধি এই সাত দ্বার জ্ঞান বিষয়ে প্রসিদ্ধই আছে। বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়,—বচনাদি কর্ম্ম বিষয়ের সাধক। প্রাণ যিনি তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের সাধনত্ব আছে; কারণ, প্রাণ থাকিলে তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। প্রাণের অভাবে জ্ঞানের ও কর্ম্মের অনুপপত্তি। অহঙ্কারেরও প্রাণের মত জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় বিষয়ের সাধনত্ব আছে; কারণ, অহঙ্কার না থাকিলে আমার জ্ঞান, আমার কর্ম্ম, এইরূপ বোধই থাকে না। চিত্তও হইতেছে চৈতন্যাভাস—ইহা না থাকিলে সমস্তই জড়বৎ থাকে—কাহার জ্ঞান, কাহারই বা কর্ম্ম ?

মুমুক্ষু—"স্থূলভুক্" কিরূপ ?

শ্রুতি—বিশ্ব পুরুষ উক্ত ১৯শ দ্বার দিয়া শব্দাদি স্থূল বিষয় ভোগ করেন বলিয়া ইহাকে স্থূলভুক্ বলা হয়।

মুমুক্ষু—বৈশ্বানর কেন ?

শ্রুতি—বিশ্বেষাং নরাণামনেকধানয়নাদ্বিশ্বানরঃ। বিশ্ব সংসারের সমস্ত লোককে ইনি অনেক প্রকারে শুভাশুভ বিষয়ে আনয়ন করেন বলিয়া ইনি বৈশ্বানর।

অথবা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ। বিশ্ব এইরূপ যে নর—তিনি বিশ্বানর। বিশ্বানরই সমস্ত—সমস্ত বিশ্বই যে নর তিনি বৈশ্বানর।

মুমুক্ষু—সমস্ত মনুষ্য লইয়া এক বিশ্ব পুরুষ বা বিরাট পুরুষ। সকল মনুষ্যকে এক সঙ্গে কিরূপে ভাবনা করা যাইবে ? সকল মনুষ্য ত ঠিক এক অবস্থায় সকল সময়ে থাকে না। কোন মনুষ্য নিদ্রিত, কেহ জাগ্রত, কেহ বসিয়া আছে, কেহ শুইয়া আছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহখেলিতেছে, কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে,— ইহাদের সমষ্টিকে 'এক পুরুষ' ভাবনা কিরূপে হয় ?

শ্রুতি—একটি একটি পৃথক্ মনুষ্য লইয়া বিশ্ব পুরুষের চিন্তা হয়

না। যিনি সমষ্টি পুরুষ তাঁহারই ভাবনা হয়। জগতের সমস্ত প্রাণী, সেই বিরাট পুরুষের অন্তর্গত। যে প্রাণী যে ভাবেই কেন থাক্ না,—কেহ জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত, কেহ গমন, কেহ উপবেশন যে যে ভাবেই কেননা থাক্—তাহাতে সমষ্টি পুরুষের ভাবনা না হইবে কেন? এক একটি প্রাণা যোগ করিয়া সমষ্টি পুরুষ নহেন, কিন্তু সমষ্টি পুরুষের মধ্যে সমস্ত প্রাণী নানা অবস্থায় রহিয়াছে। যেমন একজন মনুষ্যের মধ্যে যে রক্ত আছে তাহাতে কোটি কোটি জীব অবস্থান করিতেছে,—এমন কি এক বিন্দু রক্তে কোটি কোটি জীব রহিয়াছে,—সেই সমস্ত জীবের দেহে যে রক্তবিন্দু তন্মধ্যে অনন্ত জীব,—তাহাদের রক্তে আবার জীব—এইরূপে জীবের সংখ্যা হয় না—এই সমস্ত জীব, আরও কত বৃহৎ ক্ষুদ্র প্রাণী এক মনুষ্য দেহে অবস্থান করিতেছে—ইহাদের মধ্যে কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ ক্রীড়া করিতেছে, কেহ আহার করিতেছে, কেহ নিদ্রা যাইতেছে,—এরূপ হইলেও এই সমস্ত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে মনুষ্যদেহটি যেমন বিরাট পুরুষ—সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথ্বী, মন, বুদ্ধি, সমস্তই যে বিরাট পুরুষের অঙ্গমাত্র—সেই বিরাট পুরুষকে ভাবনা করা আর দুঃসাধ্য কি? নানা জীব এই জগতে নানা ভাবে অবস্থান করিলেও ইহারা সকলেই সেই বিরাট পুরুষের দেহেই অবস্থান করিতেছে—এ চিন্তার বাধা কিছুই নাই।

মুমুক্ষু—আত্মার এই যে প্রথম পাদের কথা বল হইল—ইনি হইতেছেন জাগ্রদভিমানী চৈতন্য। আত্মতত্বটি চৈতন্য। ইনিই আত্মমায়ায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে অভিমান করেন; চেত্যভাবেরই এই তিন অবস্থা—চেতন ইহাতে অভিমান করেন মাত্র। অথচ ইহার স্বরূপ যে তুরীয় অবস্থা—এই তুরীয় ব্রহ্ম সর্ব্বদা আপন স্বরূপে, আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা ত বড়ই আশ্চর্য্য যে আপন শান্ত পরিপূর্ণস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও সেই পরম পুরুষ আত্মমায়ায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা নিত্য লাভ

করিতেছেন—যৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যম্ তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ ॥ আমার জিজ্ঞাস্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে তিনি অভিমান করেন। যে ব্যাপারে অভিমান করা যায়, সে ব্যাপারটী সত্য নহে। যেমন আত্মা দেহে অভিমান করিলেন—আত্মা স্বরূপতঃ দেহ নহেন, কিন্তু অভিমান করিয়া দেহটাকে আমি ভাবনা করিলেন। প্রতি অভিমানে একটা অধ্যাস আছে। যিনি পরিপূর্ণ তাহার অভিমান কিরূপে হয়? অধ্যাস ব্যাপারটা কি?

শ্রুতি—যিনি পূর্ণ তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ। যতক্ষণ অহং সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ স্বভাবতঃ যাহা সৃষ্টি হয়—তাহাতে অভিমানের কেহ থাকে না বলিয়া—অদ্বৈত ভাবই থাকে। অহং সৃষ্টি হইলেই বহু অভিমান হয়। অহংই বহু হয়। সচ্চিদানন্দ পরম শান্ত পরমাত্মাই আছেন। কোন চলন নাই, কোন স্পন্দন নাই, কোন সঙ্কল্প নাই,—তিনি চিন্মাত্র। মণিতে যেমন ঝলকমত কিছু উঠে বলিয়া মনে হয় সেইরূপ এই অখণ্ড চিন্মণিতে স্বভাবতঃ ঝলক-উঠা মত বোধ হয়। সেই ঝলকেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সূচীর শতপত্র ভেদের ন্যায় যেন ভাসিয়া উঠে। প্রথমে যখন ঝলকমত উঠে (এই ঝলক মত বস্তুটি সর্ব্বদা উঠিতেছে বলিয়া, ইহার প্রথম যদিও নাই, তথাপি এতদ্ভিন্ন কোনরূপে আর বলা যায় না) প্রথমে যখন ঝলক উঠে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত "অহং" পদার্থের সৃষ্টি না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুরীয়ব্রহ্মের উপরে সুষুপ্তির মত যেন কিছু ভাসে। এই সুষুপ্তির ভিতরে ভাবী নামরূপ কল্পনা সমস্তই থাকে কিন্তু তথাপি এখনও অহং জাগে নাই বলিয়া সমস্ত বিষয়জ্ঞানের অভাব ইহা। সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয় জ্ঞানাভাবঃ। সুষুপ্তি-অভিমানী পুরুষকে একীভূত বলে, কারণ কুজ্ঝটিকায় জগৎ আচ্ছন্ন হইলে নানা আকার বিশিষ্ট বস্তুসমূহ যেমন একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপ সুষুপ্তিতে স্বপ্রকাশ চৈতন্যের উপরে একটা তমোভাব জাগিয়া উঠে বলিয়া 'অদ্বৈত ভাবই' থাকে, 'দ্বৈত' উপলব্ধি হয় না। পরে শুনিবে—"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে

ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞান-ঘন এব” ইত্যাদি।

তুরীয় ব্রহ্ম যখন সুষুপ্ত অবস্থায় প্রকাশ হয়েন, তখন অজ্ঞানের আবরণ বেশী হয় নাই। কারণ, একটিমাত্র কিছু তুরীয়ের একদেশে যেন ভাসিয়াছে। বহু আকারের বহু বস্তু তখন অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে কার্য্য করিতে থাকে, তখনই অজ্ঞানের আচ্ছাদনে অধিষ্ঠান-চৈতন্য পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হয়েন; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতেও স্বরূপানন্দের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ হয়। ক্রমে মহৎ অহং পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়া গেলে—যৎক্ষণ পর্য্যন্ত “অহং” এর পূর্ণ বিকাশ না হইতেছে—আভাষ মাত্র জাগিয়াছে—তখন “সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি” সুষুপ্ত অবস্থাটি স্বপ্নের মত ভাসিয়া উঠে। স্বপ্নে কত বস্তু জাগিয়া উঠিতেছে, লয় হইতেছে—তখন জাগ্রৎ কালের অহং এর মত অহংটা নাই বলিয়া সব দেখা যাইতেছে বটে, তথাপি সব যেন সংস্কার মত, স্বপ্ন মত। ব্রহ্মও সেইরূপ ভাবে সৃষ্টিরূপে ভাসেন। সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ—ব্রহ্মাই সৃষ্টিরূপে ভাসেন। এইটি স্বপ্নাবস্থা। পরে স্বপ্নটি আরও স্পষ্ট হইয়া জাগ্রৎ অবস্থায় আসিলে পূর্ণ অজ্ঞান জাগে; জাগিয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া স্থূলভুক্ বৈশ্বানর প্রকাশিত হয়েন। সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ—আত্মার এই তিন অবস্থাই মায়িক। চিৎ আপন স্বরূপে সর্ব্বদা আছেন—তাঁহার যে চেত্যতা ইহাই মায়ার প্রথম স্ফুরণ; স্পন্দনের প্রথম বিকাশ। ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিবে কে? ব্রহ্ম যখন আপন শক্তির সহিত এক হইয়া থাকেন, তখন শক্তি আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না। যদি থাকেন, তবে অনুভব হয় না কেন? যদি নাই, তবে স্ফুরণ হয় কাহার? ব্যক্তাবস্থায় আসে কে? চন্দ্র ও চন্দ্রিকা যেমন অভিন্ন, অগ্নি ও উত্তাপ যেমন অভিন্ন অথচ উত্তাপটি অগ্নি নহে, চন্দ্রিকাই চন্দ্র নহে—সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও শক্তিটিই শক্তিমান্ নহেন। শক্তি নিজে অব্যক্ত। যন্ত্র না হইলে, পরিচ্ছিন্ন না হইলে—

শক্তি, ব্যক্তাবস্থায় আসেন না। শক্তির ব্যক্তাবস্থায় আগমন কালে আত্মার উপর সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা ভাসে। অহং সৃষ্টির পরে যখন ইহাদের পর অহং অভিমান হয়, তখনই বলা হয় -সুষুপ্ত্যভিমানী চৈতন্য, স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য এবং জাগ্রদভিমানী চৈতন্য। "যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং" ইহা মায়িক, মূলে নাই; তথাপি অজ্ঞান ঝলকে এই তিন অবস্থা যেন ভাসে বোধ হয়। আকাশে নীলিমা নাই; মনে হয় কিন্তু আকাশ নীল। বিচার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যেমন আকাশে নীলিমা ভ্রান্তি যাইতে পারে না, সেইরূপ বিচার ভিন্ন ব্রহ্মে জগৎভ্রান্তি বা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি ভ্রান্তি কিছুতেই যাইতে পারে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ—জাগ্রৎটাও ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ত ভ্রান্তিই বটে; কাজেই জাগ্রৎকালে যাহা কিছু চিন্তা হইতেছে, কার্য্য হইতেছে, দর্শন, শ্রবণ, সংকল্প, বিকল্প অনুভব ইত্যাদি হইতেছে—সে সমস্তই ভ্রান্তি। পরম শান্ত অভ্রান্ত পুরুষ, সমুদ্র-তরঙ্গের অন্তস্তলে স্থির শান্ত সমুদ্ররূপে সর্ব্বদা বিরাজমান। তুমিও সেই স্থির সমুদ্রের মত তোমার চঞ্চলমনের সত্তা। পরম শান্ত ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ। চঞ্চলতরঙ্গস্বরূপ মন তুমি নও। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি মনেরই হয়। ইহারা মায়া বা প্রকৃতি বা মনের খেলা—স্থির শান্ত ব্রহ্মের উপর। বুঝিতেছ—ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ, তুমিই ব্রহ্ম। শরীর তুমি নও, চিত্ত তুমি নও, অহং তুমি নও, প্রকৃতি তুমি নও—তুমি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। তুমি চিন্মাত্র, তুমি সচ্চিদানন্দ তুরীয় ব্রহ্ম। কোন দুঃখ তোমাতে নাই। সমস্ত দুঃখের অভাব যাহা তাহাই আনন্দ—ব্রহ্ম। সমস্ত অজ্ঞানের অভাব যাহা তাহাই ব্রহ্ম। অজ্ঞানের আবরণটা সরাইয়া ফেলাই মুক্তি—পূর্ণ আনন্দ ত আছেনই। অজ্ঞানটাই দুঃখ। অজ্ঞান যাহাকে আবরণ করিয়া ভাসে, তিনিই তুরীয় ব্রহ্ম---তিনিই আনন্দ স্বরূপ। অজ্ঞান বা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই আনন্দ স্বরূপে নিত্য স্থিতিলাভ করা যায়। সেই জন্যই আত্মার এই মায়িক তিনপাদ্ বিচার করা যাইতেছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘনবৎ হয় সেইরূপ। জলপূরিত কাল মেঘ, বৃষ্টি-ধারা সমূহ তাহার মধ্যে আছে কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না—সেই অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহমত, তরঙ্গশূন্য সমুদ্রমত অথবা নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখামত তিনি প্রজ্ঞানঘন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় মনের স্ফুরণরূপ যে ঘটপটাদি বিভাগ-যুক্ত প্রজ্ঞান তাহা সুষুপ্তি অবস্থাতে, বুদ্ধি যখন তমোগুণরূপ অবিবেক দ্বারা আচ্ছন্ন হয়—তখন ঘন অন্ধকার মত হইয়া যায়। ঘটপটাদির বিজ্ঞান না থাকিয়া, ঘটপটাদি বিভাগযুক্ত না থাকিয়া, এক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারঘন একটি পদার্থ যেন হইয়া যায়। এই জন্য আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন বলে। আনন্দময়, আনন্দভুক্ বিশেষণগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মুমুক্ষু। চেতোমুখ তিনি কিরূপে আর একবার বলুন।

শ্রুতি। মুখ বলে দ্বারকে। বোধরূপ যে চিত্ত তাহা দ্বারা সুপ্ত-আত্মা স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থাতেও আগমন করিতে পারেন। সুপ্ত আত্মা স্বপ্ন আর জাগ্রতময় প্রতিবোধরূপ চিত্তের প্রতিদ্বারভূত বলিয়া ইনি চেতোমুখ।

মুমুক্ষু। ইনি প্রাজ্ঞ কেন এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছেন নিরুপাধির জ্ঞান বা উপাধিশূন্য হওয়ার জ্ঞান তাঁহার প্রকৃষ্টরূপে তখন হয় বলিয়া তিনি প্রাজ্ঞ। অর্থাৎ "আর কিছুই নাই" এই জ্ঞানটি তাঁহার সুষুপ্তি-কালেও থাকে, কারণ নিদ্রাভঙ্গে মানুষ বলে আহা বেশ ছিলাম। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কিসে বেশ ছিলে, তখন বলে আহা! আর কিছুই ছিল না, বেশ ছিলাম। "আর কিছুই ছিল না" এই যে স্মরণ হয়—সেই স্মরণটি কিন্তু সুষুপ্তির অনুভবেরই স্মৃতি। যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় তাহাই স্মৃতিতে আইসে।

শ্রুতি। যদিও সুপ্ত পুরুষের নিকট অন্য সমস্ত জ্ঞানের লয় হয় আর "আর কিছুই নাই" এই অনুভব থাকার জন্য তাঁহাকে প্রাজ্ঞ বলা হয়, কিন্তু আরও এক কারণে তাঁহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। সুষুপ্তি-

কালে পুরুষ, সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানরহিত হন সত্য, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কালে উৎপন্ন সমস্ত বিষয়কেও তিনি জানিতে পারেন বলিয়া তিনি প্রাজ্ঞ।

আর কিছুই নাই—আমিই আছি—আমিই সেই—নিরুপাধির সময়েও স্বরূপ জ্ঞানের এই ক্রমগুলি বিশেষরূপে ধারণা করিও। আত্মার তৃতীয় পাদের কথা জানিলে; এখন এই প্রাজ্ঞই স্বরূপ অবস্থাতে কি, তাহা শ্রবণ কর।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥৬॥

এষ হি উক্তরূপঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপঃ স্বরূপাবস্থঃ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্য ভেদজাতস্য সর্ব্বস্য ঈশ্বরঃ ঈশিতা প্রভুঃ। নৈতস্মাৎ জাত্যন্তরভূতোঽন্যেষামিব **প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ"** ইতি শ্রুতেঃ। এষ সর্ব্বজ্ঞঃ অয়মেব হি সর্ব্বস্য সর্ব্বভেদাবস্থো জ্ঞাতা ইতি এষ সর্ব্বজ্ঞঃ। অতএব এষোঽন্তর্যামী অন্তরনুপ্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং যময়িতা নিয়ন্তাঽপ্যেষ এব। সর্ব্বান্তঃপ্রেরক ইতি বা। এষ যোনিঃ কারণং সর্ব্বস্য যতঃ যথোক্তং সভেদং জগৎ প্রসূয়ত ইতি। সর্ব্বস্যৈষ যোনিঃ কারণং হি যতোতো ভূতানাং উৎপত্তিধ্বংসশীলানাং বস্তূনাং প্রভবাপ্যয়ৌ উৎপত্তি প্রলয়ৌ অস্মাদেবেতি শেষঃ॥

এই প্রাজ্ঞ আপনি আপনি স্বরূপে যখন স্থিতি লাভ করেন, তখন ইনি মায়াধীশ বলিয়া সর্ব্বেশ্বর। ইনি তখন সমস্তই জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ। ইনি তখন সকলের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের নিয়ামক—সকলকেই যথানিয়মে সঞ্চালন করেন বলিয়া অন্তর্যামী। ইনি তখন সকলের যোনি—কারণ; যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান।

মুমুক্ষু। সুপ্ত পুরুষ ত অবিবেকাচ্ছন্ন থাকেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর কিরূপে?

শ্রুতি। সুপ্ত পুরুষ অবিবেকাচ্ছন্ন থাকেন যথার্থ। আর সুষুপ্তি অবস্থায় "আর কিছুই নাই" ইহার অনুভব মাত্র থাকে। কিন্তু যিনি সাধনা দ্বারা জাগ্রৎকে স্বপ্নে লয় করেন এবং স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে লয় করেন—ঐ সুষুপ্তিতে তিনি নিরুপাধিক হয়েন। কোন উপাধির প্রাধান্য না থাকায় তিনি অনুভব করেন "আর কিছুই নাই" এই অবস্থায় আপনার চৈতন্যস্বরূপে লক্ষ্য পড়ে। "আর কিছুই নাই" অনুভূত হইবার পরের অবস্থাই হইতেছে "চৈতন্যস্বরূপ আমিই আছি।" আর "চৈতন্যস্বরূপ আমিই সেই।" সাধনা দ্বারা এই স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিলে, সুপ্ত পুরুষ স্বস্বরূপে থাকিয়াও মায়াধীশ হয়েন। মায়ার মধ্যেই এই ব্রহ্মাণ্ড। কাজেই তখন তিনি সর্ব্বেশ্বর। তিনি অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সহ সমস্ত কার্য্য-জগতের ঈশ্বর—রুদ্র, বাসুদেব, ব্রহ্মা, চন্দ্রমা, প্রজাপতি, যম, বামন, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনিকুমার, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু, দিক্ এই সমস্ত অধিদৈব সহিত শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ; বচন, আদানপ্রদান, গমন, মলত্যাগ, রতিভোগ, সঙ্কল্পবিকল্প নিচয়, অনুসন্ধান এবং অহংপনা এই সমস্ত অধিভূত বা বিষয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শাসনকর্ত্তা ইনি।

মুমুক্ষু। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, কারণ সর্ব্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞ পুরুষই স্বরূপাবস্থায় বিভাগযুক্ত সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা। এই ত?

শ্রুতি। হাঁ। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল জগতের জ্ঞাতা ইনি; স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞাতা ইনি; আর সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ দুয়ের কারণস্বরূপ মুল অবিদ্যাকেও তখন ইনি জানেন তাই সর্ব্বজ্ঞ।

মুমুক্ষু। ইনি তখন অন্তর্যামী যেহেতু সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ইনি সর্ব্বভূতের নিয়ামক। এইত?

শ্রুতি। হাঁ। **যः পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যমযত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥** ইনি পৃথিবীতে ওতপ্রোতভাবে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্। ইঁহাকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাও জানেন না; পৃথিবী

ইঁহার শরীর; ইনি পৃথিবী-দেবতাকে প্রেরণা করেন; ইনি সকলের আত্মা; ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত অবিনাশী আত্মা। ইনিই জলরাশিতে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে; স্বর্গে, সূর্য্যে, দিক্‌সকলে, চন্দ্র-তারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে; সমস্ত ভূতে, প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, ত্বগিন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে, বীর্য্যে—সর্ব্ব-বস্তুতে অবস্থান করিয়াও এ সমস্ত হইতে পৃথক্; ইহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণও ইঁহাকে জানেন না; এই সমস্তই ইঁহার শরীর, ইনি ইহাদের ভিতরে থাকিয়া প্রেরণা করেন; ইনি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

মুমুক্ষু। অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারাও ইঁহাকে জানেন না কেন?

শ্রুতি। জানিবেন কিরূপে? এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা যে আর নাই। যখন আর কেহই ইঁহাকে জানিতে পারেন না, তখন এই অন্তর্যামী আর কাহার দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইবেন?

মুমুক্ষু। সর্ব্বস্য যোনিঃ বলিতেছেন, যেহেতু ইনি সকলের কারণ বা উৎপত্তিস্থান এই জন্য ত?

শ্রুতি। ভেদ সহিত সর্ব্বজগৎ ইঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ইনি সকলের যোনি। আর ঘটপদাদির উৎপত্তি আর বিলয় যেমন উহাদের উপাদান কারণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয় যে ইনি ইঁহা হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয়-স্থান ইনিই।

মুমুক্ষু। ইহার পরে কি বলিবেন?

শ্রুতি। তুরীয় বা চতুর্থ পাদের কথা বলিব।

মুমুক্ষু। মা! এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির কথা বলিলেন, এসম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ কথা জানিবার আছে।

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। মা! তুমি বলিতেছ—আত্মা এক। ইনি এক হইয়াও

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন; এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভোগ গ্রহণ করেন। মা! ইহা কিরূপে হয়?

শ্রুতি। বৎস! আমি তোমার উপরে বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। ইহাই ত জানিবার কথা। ইহা ধারণা করিতে পারিলে ধর্ম্মজগতে আর কোন দলাদলি সম্প্রদায় থাকে না। আমার প্রিয়ভক্ত শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদাচার্য্য। তাঁহার গুরু গৌড়পাদাচার্য্য। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যের যে কারিকা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয় তিনি ধরিয়াছেন। আমি তোমার সুবিধার জন্য তাহাও এখানে বলিয়া যাইব।

এক্ষণে প্রথমে আত্মা এক হইয়াও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে থাকেন কিরূপে তাহার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। মা বলুন।

শ্রুতি। আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অংশ কখন হয় না।

নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেত্তি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী॥

ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও শিষ্য, বুঝিবার জন্য, সেই ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া অংশাংশি ভাবে প্রশ্ন করেন। শ্রোতার হিতের জন্য শ্রুতিও শিষ্যের ভাষাতেই অংশাংশি ভাবেই উত্তর দিয়া থাকেন। ফলে ইহা দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মের অংশভাব সিদ্ধ হয় না।

মুমুক্ষু। মা! ইহাই ত বুঝিতে চাই। আমার মনে হয় আত্মা সর্ব্বকালে আপনার আপনি আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে থাকিয়াও সমকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে বিচরণ করেন। চিরজাগ্রত এক জন ঠিক এক সময়েই জাগ্রত আছেন, আবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, আবার সুপ্তও আছেন—ইহা কিন্তু ধারণা করিতে পারি না। ইহা যেন মানুষের অনুভব সীমার বাহিরে।

শ্রুতি। খণ্ডচৈতন্যে ইহা অনুভূত হয় না। প্রথমে অখণ্ডচৈতন্যে স্থিতি যিনি লাভ করিতেছেন, তিনি পরমপদে স্থিতিলাভ করেন;

তিনিও ইহা ঐ সমাধি অবস্থায় অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও স্বপ্ন, জাগর, সুষুপ্তি লইয়া খেলা করিতে পারেন। এই সমস্ত মনুষ্য-বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ অনুভূতি; ইহা ব্যষ্টিচেতন-মানুষে সম্ভব নহে; কিন্তু সমষ্টিচৈতন্যরূপা অবতারগণের ইহা আয়ত্তাধীন। আমি যত সহজে পারি, তোমাকে ইহার ধারণা করাইয়া দিতেছি মনোযোগ কর।

মানুষের যে চৈতন্য সেটা দেহব্যাপী মাত্র। মানুষ নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই নানাবিষয় অনুভব করে। চেতন যে সর্ব্ব-ব্যাপী তাহা মানুষ সাধারণভাবে অনুভব করিতে পারে না। কাজেই মানুষ অন্য কিছুর মধ্য হইতে নিজের দেহ বা অন্য কিছু অনুভব করিতেও পারে না। কিন্তু যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সমকালে সকল বস্তু অনুভব না করিবেন কেন? মানুষ ৺বদরীনারায়ণে যখন থাকে তখন দারুণ শীত অনুভব করে, আবার সেই মানুষ শীতকালেও ৺পুরীধামে সমুদ্র-তীরে গ্রীষ্ম অনুভব করে। কিন্তু যিনি ৺বদরীনারায়ণ ও ৺পুরীধামে সমকালে ব্যাপিয়া আছেন, তিনি সমকালে এক অঙ্গেই শীত ও গ্রীষ্ম অনুভব না করিবেন কেন? যিনি সর্ব্বেশ্বর—যদি বলা যায় তাঁহার অনুভব করিবার শক্তিও আছে, তবে তিনি সমকালে সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণাদি অনুভব করিবেনই নিশ্চয়। এখন আত্মার সমকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অনুভবের কথা বুঝাইতেছি শ্রবণ কর।

একটা দৃষ্টান্ত লও। মনে কর একটি বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর। একটি ঘর আলোকপূর্ণ। সেই গুপ্ত আলোকমণ্ডিত গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিবার চারিটি দ্বার। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডিত গৃহের মধ্যে একটি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় অষ্টদল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই পদ্মের মৃণাল কিন্তু গৃহের বাহিরে কোন জলরাশির মধ্যে প্রোথিত। তুমি কোন উপায়ে মৃণালতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। তুমি পদ্মটির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ। উপরে সীমাশূন্য আকাশের গায়ে দেখিতেছ আর একটি দ্বাদশদল পদ্ম, ছত্রের মত সেই অষ্টদল পদ্মকে

ছাইয়া আছে। আর সেই ছত্রাকার নিম্নমুখ পদ্মের পাপড়ী হইতে সুধাক্ষরণ হইতেছে। জ্যোতির্ম্ময় পদ্মের উপরে এক নীলাম্ভোজ-দলাভিরামনয়না, নীলাম্বরালঙ্কৃতা, গৌরাঙ্গী, শরদিন্দুসুন্দরমুখী, বিম্বোষ্ঠী রমণীমূর্ত্তি। মনে করা হউক--ইতি বেদমাতা। মনে করা হউক—এই কনকচম্পকদামবিভূষিতা, উত্তুঙ্গপীনকুচকুম্ভমনোহরাঙ্গী, চতুর্ম্মুখ-মুখাম্ভোজবনহংসবধূ, কম্বুকণ্ঠী, যামিনীনাথ-লেখালঙ্কৃতকুন্তলা, ভব-সন্তাপ-নির্ব্বাপণ-সুধানদী, জগজ্জননীই বাগ্‌বাদিনী মহাসরস্বতী। ইনি বহুরূপধারিণী। মনে করা হউক—এই লোচনবিজিতকুরঙ্গী আজ কুবলয়দলনীলাঙ্গী। সুন্দরহিমকরবদনা, কুন্দসুরদনা, গমন-বিজিতকাদম্বা জগদম্বা আজ বামকুচনিহিতবীণা সঙ্গীতমাতৃকা সাজিয়া-ছেন। এই নবজলকল্লোললোচনা দয়মানদীর্ঘনয়নে, করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত অপাঙ্গে আজ ঝঙ্কৃতবীণাগুঞ্জনে ভরিতহৃদয়া। মনে করা হউক—এই ওঙ্কারপঞ্জরশুকী, উপনিষদুদ্যান কেলীকলকণ্ঠী, আগমবিপিনময়ূরী, মণিময়দিব্যাভরণা আজ ঐ দিব্যালোকমণ্ডিত গৃহে শুভ্র অষ্টদল পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বীণাবাদন করিতেছেন। মায়ের কেশপাশ গ্রীবাদেশে বিগলিত; মা তন্ত্রীতাড়নে তালরক্ষা করিতেছেন; আর ইঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ মৃদুমন্দ আলোড়িত হইতেছে। বীণাবাদনে ব্যাপৃত থাকায় ইঁহার দেহ মৃদুমন্দ কম্পিত হইতেছে। মা বীণাবাদন করিতেছেন, আর তাঁহার আসনপদ্মের সম্মুখে একদিকে এক রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ পুরুষ, তাহার পরে নবঘনশ্যামল বর্ণ আর এক সুন্দর পুরুষ, তাহারও পরে মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জটে চ গঙ্গাজলং রজত-গিরিনিভং এক পুরুষ—ইঁহারা বিস্মিত নয়নে ইঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি এক প্রেম-সমুদ্রে যেন নিমজ্জিত হইতেছেন। আরও কত ভক্ত, ঐ মৃণালতন্তুর মধ্যপথ দিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। তুমিও প্রবেশ করিয়াছ।

ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডিত প্রাসাদের এক গৃহে ঐ দৃশ্য। অন্যত্র আর এক গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কতকগুলি লোক সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে বসিয়া

ঝিমাইতেছে। চণ্ডু খাইয়া মানুষ যেমন জাগিয়াও স্বপ্ন দেখে, ইহারা সেইরূপ ঐ অন্ধকার গৃহে বসিয়া বসিয়া কত প্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছে। উপরের দৃষ্টান্তটি শুভ ভাবনাময় রাজ্যের কথা—নীচের দৃষ্টান্তটি অশুভ ভাবনাময় রাজ্যের স্বপ্ন।

আরও দূরে আর এক গৃহে কতকগুলি লোক নানাপ্রকার লৌকিক আমোদ প্রমোদে, কেহ বা লৌকিক আহারে উন্মত্ত হইয়া বহুবিধ কথার আলাপ করিতেছে।

তিন প্রকোষ্ঠে তিন প্রকার কার্য্য হইতেছে। মনে করা হউক প্রাসাদটি যেন জীবিত হইল। ঐ জীবন্ত প্রাসাদ তখন সমকালে এই তিন ব্যাপার অনুভব করিবে কি না তাহাই বল?

আত্মাই ঐরূপে এই দেহ-গেহে দহরাকাশে সুপ্ত, আনন্দময়, আনন্দভুক পুরুষ। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের আনন্দের সহিত এ আনন্দের সাদৃশ্য নাই। এ আনন্দ সর্ব্বপ্রকার শ্রমশূন্য, নিরায়াস আনন্দ। এই আত্মাই আবার কণ্ঠকুহরে স্বপ্নরাজ্যে সূক্ষ্ম সংস্কার লইয়া কি এক ব্যাপারে ব্যস্ত। আবার ইনিই দক্ষিণ চক্ষে সমকালেই স্থূল বিষয় লইয়া তাহাই উপভোগ করিতেছেন। একই পুরুষ সমকালে এই তিন অবস্থায় তিন প্রকার ভোগ লইয়া আছেন। ইনিই সমকালে জাগ্রৎ পুরুষ, স্বপ্ন পুরুষ ও সুপ্ত পুরুষ। ইনিই সমকালে স্থূলভুক্, সূক্ষ্মভুক্ ও আনন্দভুক্। একজন মানুষ চৈতন্য-সমাধি লাভ করিয়া আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়া যদি সকল কথা কহিতে পারে, সকল কথা শুনিতে পারে, সকল কার্য্য করিতে পারে, তবে এই সর্ব্বেশ্বর অন্তর্যামী মায়াধীশ কেননা আপনি আপনি থাকিয়াও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে বিচরণ করিবেন? শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ ॥১৮॥৪।৩

বৃহদারণ্যক।

অসঙ্গ এই আত্মা যেহেতু জাগরিত অবস্থা হইতে যেন স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি, আবার সুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ-ক্রমে অনবরত সঞ্চরণ করেন, অথচ ইনি স্থানত্রয় হইতে ভিন্ন তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইতেছে। নদীস্রোতে অবিচলিত মহামৎস্য যেমন নদীর উভয় কূলে সঞ্চরণ করে অথচ বারিপ্রবাহে প্রতিহত হয় না, পুরুষও সেইরূপ বক্ষ্যমান্ অন্তদ্বয়ে অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করেন।

এখন শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের কথা শ্রবণ কর।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

[অথ গৌড়পাদাচার্য্য কৃত কারিকায়াং প্রথম আগমাখ্য প্রকরণারম্ভঃ]

বহিঃ প্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ ॥১
দক্ষিণাক্ষি মুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥২
বিশ্বো হি স্থূলভূঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্ত ভুক্।
আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥৩
স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তন্তু তৈজসম্।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত ॥৪
ত্রিষু ধামসু যদ্ ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে ॥৫

একই আত্মাকে তিনভাবে অবস্থিত দেখা যায়। তিনিই বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ ও ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞান ঘন। যখন বহিঃপ্রজ্ঞ তখন তিনি বিভু-রূপ বিশ্ব পুরুষ; যখন অন্তঃপ্রজ্ঞ তখন তাঁহার তৈজস পুরুষ আর যখন ইনি ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞানঘন তখন এই পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ পুরুষ। এই একই আত্মা তিন প্রকারে দেহে অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বপুরুষ দক্ষিণ চক্ষুরূপ দ্বারে অবস্থিত, তৈজস পুরুষ মনে অবস্থিত আর হৃদয় আকাশে প্রাজ্ঞ আত্মা অবস্থিত। বিশ্বপুরুষ সর্ব্বদা স্থূল বিষয়ই ভোগ করেন; তৈজস সর্ব্বদা সূক্ষ্ম বাসনাময় বিষয় ভোগ

করেন আর প্রাজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা আনন্দমাত্র ভোগ করেন। একই আত্মার তিন অবস্থার ভোগজ তৃপ্তিও তিন প্রকার। স্থূল বিষয়ে বিশ্ব-আত্মার তৃপ্তি জন্মে ; সূক্ষ্ম বিষয়ে তৈজসের, আর আনন্দমাত্রে প্রাজ্ঞ পুরুষের তৃপ্তি সাধন করে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন ধামে বা স্থানে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু এবং যিনি ভোক্তা বলিয়া কথিত হয়েন এই উভয়কে যিনি জানেন তিনি বিষয় ভোগ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না।

মুমুক্ষু। বাহিরে স্থূল প্রজ্ঞা বিশিষ্ট যিনি, তিনি বিভুরূপ বিশ্ব-পুরুষ। অন্তরের সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা বিশিষ্ট যিনি তিনি তৈজস পুরুষ আর ঘন প্রাজ্ঞ যিনি তিনি প্রাজ্ঞ পুরুষ। এই তিনই যে এক তাহার অনুভূতি কিরূপে হয় ?

শ্রুতি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে সর্ব্বত্রই "সেই আমি" এই প্রকার প্রতীতি সকলেরই হয় "যঃ সুপ্তঃ সোঽহং জাগর্ত্তীতি" যে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম সেই আমিই জাগিয়াছি এই অনুভব সকলেই করে। এই অনুসন্ধান দ্বারা আত্মা যে এক তাহা নিশ্চয় করা যায়। যদিও এক আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে প্রতীত হয়েন তথাপি তিনি এই অবস্থাত্রয় হইতে ভিন্ন, এই অবস্থাত্রয় হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্। তিনি শুদ্ধ এবং অসঙ্গ অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থা দোষে তিনি দুষ্ট হন না। জাগ্রদাদির দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মুমুক্ষু। আত্মা শুদ্ধ কিরূপে তাহাই বলুন।

শ্রুতি। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ; রাগ দ্বেষ এইগুলি হইতেছে মল। এইগুলি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। আত্মা ঐ সমস্ত মলিনতা হইতে ভিন্ন বস্তু। আমি আমি লোকে যাহাকে করে তিনিই আত্মার সূচক। আমিটি যাহাতে মাখাও তাহাই হইয়া যায় আমার। অর্থাৎ যাহাতে আমি অভিমান কর তাহাই হয় আমার। কাজেই যাহাকে আমার বলিবে তাহারই দুঃখ কষ্ট মলিনতা যেন "আমিতে" মাখান হইবে। অন্তঃকরণে যখন অভিমান কর আর বল আমার মন, আমার অন্তঃকরণ তখন

অন্তঃকরণের মলিনতা যে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, রাগ, দ্বেষ এই সমস্তই যেন আত্মার কলঙ্ক হইয়া যায়। কিন্তু আত্মা যিনি তিনি কখন মন নহেন। কাজেই মনের ময়লা যাহা তাহা আত্মাকে কখন অপবিত্র করিতে পারে না। আমি মন নই ইহা ভাবনা কর দেখিবে এই মুহূর্ত্তেই তুমি যে শুদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিবে।

মুমুক্ষু। আত্মা অসঙ্গ কিরূপে?

শ্রুতি। "ঘট দ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্ন" ঘটের দ্রষ্টা যিনি তিনি ঘট হইতে ভিন্ন এই ন্যায়ে তুমি দেখ রাগদ্বেষাদির দ্রষ্টা তুমি কি না। তুমি দ্রষ্টা বলিয়া তুমি অসঙ্গ। শ্রুতি বলিতেছেন **"অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" "সোঽহমস্মি"** এই পুরুষ অসঙ্গ" আর "আমিই সেই"। এই সমস্ত শ্রুতি প্রমাণে বুঝা যায় এই আত্মা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, আত্মা একই বস্তু; আত্মা দ্রষ্টা; আত্মা শুদ্ধ আর আত্মা অসঙ্গ। **"তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবায়ং পুরুষঃ।"** শ্রুতি এই দৃষ্টান্তও দিতেছেন।

মুমুক্ষু। পূর্ব্বে বলিয়াছেন জাগ্রৎ অবস্থাই সর্ব্বপ্রকার সাধনার ভিত্তি। আচ্ছা এই জাগ্রৎ অবস্থাতে কি বিশ্ব, তৈজস ও সুপ্ত পুরুষের অনুভব হয়?

শ্রুতি। হয়। কিরূপে হয় তাহা দেখ। "দক্ষিণাক্ষি মুখে বিশ্বঃ" দক্ষিণ নেত্ররূপী দ্বার দিয়া বিশ্ব পুরুষকে অনুভব করা যায়। স্থূল বিষয়ের দ্রষ্টা যে বিশ্বপুরুষ সেই দ্রষ্টা ধ্যাননিষ্ঠ বিশ্বপুরুষকে দক্ষিণ নেত্ররূপ দ্বার দিয়াই অনুভব করা যায়। শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন **"ইন্ধো হ বৈ নামৈষঃ, যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষ** ইতি শ্রুতেঃ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন এই যে দক্ষিণ অক্ষিস্থিত পুরুষ ইনিই প্রসিদ্ধ ইন্ধ অর্থাৎ প্রকাশবান্ এই নাম বিশিষ্ট। "ইন্ধ" হইতেছে প্রকাশগুণ-সম্পন্ন সূর্য্যান্তর্গত বিরাট্ আত্মা বৈশ্বানর। এই বৈশ্বানর আর চক্ষুতে অবস্থিত দ্রষ্টা এই দুই পুরুষই এক।

মুমুক্ষু। মা! এই দুই দ্রষ্টা এক কিরূপে? ইঁহাদের সমষ্টি ব্যষ্টি

রূপ ভেদ ত আছে, আরও স্থূল সূক্ষ্ম দেহধারণরূপ ভেদও ত আছে ?

শ্রুতি। ভাল করিয়া প্রশ্ন কর।

মুমুক্ষু। সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ আর চক্ষুগোলকস্থিত ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহ-কর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ ইঁহারা ত সংসারী জীব হইতে ভিন্ন। আবার সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত সমষ্টি স্থূল দেহের অভিমানী আর চক্ষুগোলকের অনুগ্রহ-কর্ত্তা বিরাট্ আত্মাও ত ভিন্ন। ব্যষ্টিদেহে অভিমানী দক্ষিণনেত্রস্থ দ্রষ্টা, দুই চক্ষু আর ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক এবং কার্য্য কারণের স্বামী যে ক্ষেত্রজ্ঞ তিনিও ঐ দুই সমষ্টি দেহের অভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্ হইতে ভিন্ন ইহা অঙ্গীকার করা হয়। যদি তাই হয়, তবে সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে স্থিত জীবের যে ভেদ তাহার একতা কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

শ্রুতি। সমষ্টি ও ব্যষ্টি আত্মার যে ভেদ সেটা কল্পিত ভেদ মাত্র। ঘটাকাশ ও মহাকাশের কি বাস্তব ভেদ আছে ? উহা বাস্তবিক অভেদ। শ্রুতি বলেন—"**একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ**" একটি মাত্র দেবতা—প্রকাশশীল আত্মা, সমস্তভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। গীতা স্মৃতিও বলেন "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত" "অবিভক্তঞ্চ" ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"। হে ভারত। সর্ব্বক্ষেত্রে—সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যিনি তিনি আমিই ইহা তুমি জান। আবার সমস্ত ভূত ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট হইলেও আমি বাস্তবিক বিভক্ত না হইয়াও বিভক্তবৎ তাহাদের মধ্যে অবস্থিত। কাজেই ইহা নিশ্চয় হয় যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে আমি থাকিলেও দক্ষিণ নেত্রে দর্শনপটুতা ও তজ্জন্য জ্ঞানের স্পষ্টতা দৃষ্ট হয় ; এই জন্য দক্ষিণ চক্ষুতে বিশ্বপুরুষের বিশেষভাবে অবস্থান বলা হয়।

মুমুক্ষু। বুঝিলাম আত্মা একই। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত যে ভেদ সেটা কল্পিতভেদ মাত্র বা উপাধিগত ভেদ মাত্র। এখন বলুন, জাগ্রৎ-কালে বিশ্বপুরুষের মত তৈজস পুরুষকে কিরূপে অনুভব করা যায়।

শ্রুতি। আচ্ছা দেখ। জাগ্রৎকালে স্থূল স্থূল বিষয়ের অনুভব হয়। কিন্তু স্বপ্নকালে জাগ্রতের স্থূল পদার্থ সমূহই বাসনারূপে প্রকট হয়। দ্রষ্টা পুরুষ সূক্ষ্ম বাসনারূপেই উহাদিগকে দেখেন। দক্ষিণ অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষ জাগ্রৎকালে স্থূলরূপ দেখিয়া যখন চক্ষু মুদ্রিত করেন, তখন পূর্ব্ব-দৃষ্ট রূপের জ্ঞান হইতে উদ্ভূত বাসনারূপেই তিনি মন দ্বারা উহা দেখিতে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ দেখাটা ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন নহে, উহা মনের দ্বারা স্মরণ মাত্র। ঐরূপে স্মরণকর্ত্তা ঐ বিশ্বপুরুষই তৈজস পুরুষ। এক পুরুষই দেখেন এবং স্মরণ করেন। যখন দেখেন তখন তিনি বিশ্ব, যখন স্মরণ করেন তখন তিনি তৈজস্। তবেই দেখ বিশ্ব ও তৈজসের ভেদ কোথায় রহিল? আবার বলি শ্রবণ কর। জাগ্রতে দক্ষিণ চক্ষে স্থিত বিশ্বপুরুষ একটা কুরূপ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন: করিয়া পূর্ব্ব-দৃষ্ট কুরূপকে মনে মনে স্মরণ করিতেছেন আর তিনি স্বপ্নবৎ উহাকেই বাসনারূপে প্রকটিত দেখিতেছেন। জাগ্রতে যেমন ইহা হয়, স্বপ্নকালেও তাহাই হয়। তাই বলা হইল "মনসি অন্তশ্চ তৈজসঃ"। অর্থাৎ মনের ভিতর যে তৈজস তিনিই বিশ্ব পুরুষ।

মুমুক্ষু। এখন বলুন ইনিই "আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞঃ" কিরূপে?

শ্রুতি। এই পুরুষই হৃদয়াকাশে প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিহিত। জাগ্রৎ পুরুষই সুপ্তপুরুষ কিরূপে এখন দেখ। যে পুরুষ বিশ্ব ও তৈজস ভাবকে প্রাপ্ত হন, তিনিই আবার দর্শন ও স্মরণ রূপ ব্যাপারের নিবৃত্তিতে হৃদয়াকাশে স্থিত প্রাজ্ঞ পুরুষ হয়েন।

রূপের দর্শন ও স্মরণ ছাড়িয়া শ্রেষ্ঠ আকাশে (অব্যাকৃতে) স্থিত জীবের সহিত প্রাজ্ঞের কোন ভেদ নাই। এই জন্যই ইনি একীভূত (বিষয় ও বিষয়ী রূপ আকার রহিত)। আবার একীভূত বলিয়াই ইনি ঘনপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানও নাই, অন্যরূপ জ্ঞানও নাই। বুঝিতেছ যিনি বিশ্ব ও তৈজস ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই স্মরণরূপ ব্যাপারের নিবৃত্তিতে হৃদয়গত আকাশে স্থিত হইয়া প্রাজ্ঞ একীভূত

এবং ঘনপ্রজ্ঞ হইয়া থাকেন; কারণ তখন মনের আর কোন প্রকার স্পন্দন থাকে না। দর্শন আর স্মরণ এই দুইরূপেই মনের স্ফুরণ হয়। ইহাদের অভাব হইলে এই পুরুষ অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে অবস্থান করেন—ইহাই জাগ্রতের সুষুপ্তি। শ্রুতি বলেন—**প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্ত** ইতি। প্রাণই এই সমস্তকে আপনাতে সংহার করেন। এই জন্য অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে জাগ্রৎগত সুষুপ্তিকালে যে প্রাজ্ঞের অবস্থান হয় বলা হইল, ইহা যুক্তিযুক্ত। এখানে ইহাও স্মরণ রাখ যে, তৈজস পুরুষই হিরণ্যগর্ভ; কারণ "**মনোময়োঽয়ং পুরুষ**" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ এই পুরুষ মনোময়। মন যাহা, তাহা লিঙ্গরূপ। এই মনে স্থিত বলিয়া যিনি তৈজস, তিনিই হিরণ্যগর্ভ।

মুমুক্ষু। আচ্ছা সুষুপ্তিকালে ইনি অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে থাকেন ইহা কিরূপে হইবে? সুষুপ্তিকালে প্রাণত ব্যাকৃতাত্মক অর্থাৎ ব্যক্তীভূত। প্রাণ ত তখনও নাম ও রূপের সহিত ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্টভাবে যুক্ত। কারণ যে পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় আছেন, তাঁহার নিকটে যে মানুষ বসিয়া থাকে সে অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রাণের ব্যাপার দেখে। তবে প্রাণের অব্যাকৃততা কিরূপে সম্ভব হয়?

শ্রুতি। ভাল করিয়া ধারণা কর। যাহা অব্যাকৃত তাহাতে দেশ ও কাল কৃত পরিচ্ছেদের অভাব থাকে। তুমি বলিতেছে—যখন 'আমার প্রাণ' 'অমুকের প্রাণ' ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণের প্রতীতি হইতেছে, তখন প্রাণকে অব্যাকৃত, অবিভক্ত, এক—এইরূপ বলা যায় কিরূপে? সত্য কথা। কিন্তু সুষুপ্তিবান্ পুরুষের দৃষ্টিতে প্রাণের দেশকাল বিষয়ে পরিচ্ছিন্নতা থাকে কি? এই জন্য বলা হয়—সুষুপ্তিবানের প্রাণ ও অব্যাকৃত এই দুই এক। "আমার প্রাণ" বলিয়া অভিমান যিনি করেন তাঁহার কাছে প্রাণ ব্যাকৃত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে দেহাদি সম্বন্ধাধীন যে পরিচ্ছিন্ন ভাব তাহার কিছুই ত থাকে না। সেই জন্য ঐ সময়ে "আমার প্রাণ" এইরূপ অভিমানেরও তখন নিরোধ হয়।

হয় বলিয়াই প্রাণকে তখন অব্যাকৃত বলা হয়। যেমন মরণের অভিমান যার নিরোধ হয় সেই লোকের প্রাণকে অব্যাকৃত বলা হয়,সেইরূপ প্রাণ অভিমানী পুরুষেরও সুষুপ্তিকালে প্রাণের অভিমানের নিরোধ হওয়ায়—প্রাণকে অব্যাকৃত বলা হয়। তাই বলা হইতেছে, অভিমান নিরোধ হইলেই প্রাণ অব্যাকৃত। আরও দেখ, জগতের উৎপত্তির বীজ হইতেছেন অধিদৈব পুরুষ অর্থাৎ যে পুরুষ অব্যাকৃত প্রকৃতিরও অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা। এই পুরুষ অব্যাকৃত। যেমন অধিদৈবরূপ অব্যাকৃত, জগতের উৎপত্তির বীজ—সেইরূপ প্রাণও সুষুপ্তি, জাগ্রৎ আর স্বপ্নের উৎপত্তির বীজ। এই জন্য কার্য্যোৎপত্তির বীজ স্বরূপ বলিয়া সুষুপ্তিকালীন প্রাণ ও অব্যাকৃত উভয়ই এক। কারণ অব্যাকৃত অবস্থাপন্ন প্রাণ ও সুপ্ত পুরুষ এই দুয়েরই যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য তাহা এক; সেই জন্য পরিছিন্ন উপাধি বিশিষ্ট যিনি জীবমত—তিনি ও অব্যাকৃত উভয়েই এক। এইরূপে প্রাণকেই একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি প্রাজ্ঞপুরুষের বিশেষণ বিশিষ্ট বলা হয়।

মুমুক্ষু। মা! যে প্রাণকে আমরা প্রাণবায়ু বলি, সেই প্রাণই কি একীভূত প্রজ্ঞানঘন সর্ব্বেশ্বর প্রাণ, যে প্রাণের কথা আপনি বলিতেছেন? অব্যাকৃতই প্রাণ কিরূপে?

শ্রুতি। শ্রবণ কর। **প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ**—হে প্রিয়দর্শন! মন যাহা, তাহা প্রাণরূপ বন্ধন অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আপনার লয়ের আধার। সুষুপ্তিকালে মনের স্পন্দন থাকে না। স্পন্দন না থাকিলেই মনের লয় হয়। কোথায় এই মন লয় হয়? প্রাণে। এই শ্রুতি-প্রমাণে অব্যাকৃতকে প্রাণ বলা হইতেছে।

মুমুক্ষু। আচ্ছা! "**সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ**" হে সৌম্য! অগ্রে সৎ ব্রহ্মই ছিলেন, ইহাতে ত মনে হয় সৎ রূপ ব্রহ্মই প্রাণশব্দ-বাচ্য; অব্যাকৃত নহে?

শ্রুতি। না, ইহাতে দোষ হয় না। কারণ সৎ রূপ ব্রহ্মেরই বীজরূপতা অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর যদ্যপি ঐ শ্রুতিতে সৎ

ব্রহ্মকেই প্রাণ বলা হয় বল, তবে ইহাও বল যে, জীবপ্রসব-বীজাত্মকত্ব অপরিত্যাগ করিয়াই সৎ ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্য অর্থাৎ জীবসমূহের উৎপত্তির বীজতা লইয়াই সৎ ব্রহ্ম প্রাণ। যদি বল নির্ব্বীজরূপ ব্রহ্মই প্রাণশব্দের বাচ্য ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা হইলে শ্রুতি **"নেতি নেতি" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"** অর্থাৎ নিগুর্ণব্রহ্ম কার্য্যরূপ নহেন, কারণরূপও নহেন; তাঁহার নিকটে কার্য্যের নিবৃত্তি হইয়া যায়; তিনি বিদিত (কার্য্য) হইতে অন্যরূপ এবং অবিদিত (কারণ) হইতেও অন্যরূপ; এইরূপ ভাবে নিগুর্ণ-ব্রহ্মকে কখন বলিতেন না, আবার স্মৃতিও বলিতেন না "ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে" তিনি সৎও নহেন, আর অসৎও নহেন। তবেই দেখ যদি নিগুর্ণ বা নির্ব্বীজ ব্রহ্মই প্রাণশব্দবাচ্য হয়েন, তবে সুষুপ্তি আর প্রলয়ে সৎ ব্রহ্মে লীন জীবপুঞ্জের উত্থান অসম্ভব হয়। হয়না কি? কেননা, মন যখন প্রাণে লয় হইল, আর প্রাণকেই যদি নির্ব্বীজ ব্রহ্ম তুমি বল তবে নির্ব্বীজে যাহা লয় হইল, তাহা নির্ব্বীজত্বও প্রাপ্ত হইল, সেখান হইতে মহাপ্রলয়ের পরে বা সুষুপ্তির পরে জীবপুঞ্জের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু সুষুপ্তির পরে বা প্রলয়ের পরে যখন আবার সৃষ্টি হয়, দেখা যায় আর বলা হয়—নির্ব্বীজ ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি হইতেছে, তখন ইহাই বলিতে হইবে যে, যাঁহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সংসারে পুনরাগমন করেন।

আরও দেখ, কর্ম্মবীজকে জ্ঞান দ্বারাই দগ্ধ করিতে হয়। কিন্তু যদি বলা যায় সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে সকলেই নির্ব্বীজ ব্রহ্মে লয় হয়, তবে সেই জ্ঞানদাহ্য বীজ আপনা হইতেই লয় হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। এই জন্য শ্রুতি যেখানে বলিতেছেন—প্রাণই সৎ ব্রহ্ম, সেখানে প্রাণকে সবীজ সৎ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে; প্রাণ নিগুর্ণ ব্রহ্ম বা নির্ব্বীজ ব্রহ্ম নহেন।

প্রাণকে সবীজ ব্রহ্ম বলা হয় বলিয়াই ইহার পরেও নির্ব্বীজ ব্রহ্মের কথা শ্রুতি বলেন। শ্রুতি বলেন—নিগুর্ণ ব্রহ্ম **"অক্ষরাৎ**

পরতঃ পরঃ" "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" "নেতি নেতি" অর্থাৎ তিনি পররূপ অক্ষর হইতেও পর; বাহ্য অন্তর সহিত হইয়াও জন্মরহিত; যাঁহাতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়; যিনি কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন; এই সমস্ত শ্রুতিতে সবীজ ব্রহ্ম-ভাবের উপরেও যে নির্ব্বীজ ব্রহ্মভাব আছেন—সেই সবীজ ভাব অপনয়ন জন্য নির্ব্বীজ ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাণ হইতেছেন সৎব্রহ্ম। ইনি সবীজ। ইনিই প্রাজ্ঞপুরুষ। ইনিই যখন তুরীয় অবস্থাতে গমন করেন, তখন ইনি দেহাদিসম্বন্ধরহিত এবং জাগ্রদাদি অবস্থা রহিত হয়েন। এই পারমার্থিক নির্ব্বীজ অবস্থাই তুরীয়াবস্থা। এই তুরীয়ের কথা পরে বলা হইবে।

মুমুক্ষু। মা! আর একবার বল সুষুপ্তিতে কি কিছু অনুভব হয়?

শ্রুতি। সুষুপ্তিতে বীজাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু সুষুপ্তি হইতে উত্থিত পুরুষের মুখে শ্রবণ করা যায় **"ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি"** অর্থাৎ আমি **কিছুই** বলিতে পারি নাই। এই যে স্মৃতি ইহাতে বুঝা যায়, বীজাবস্থাতেও আর কিছুই নাই ইহার অনুভব হইয়াছিল। কারণ যাহা কখন অনুভূত হয় নাই, তাহার স্মরণ হইতে পারে না।

"ত্রিধাদেহে ব্যবস্থিতঃ" অর্থাৎ জীব তিন প্রকার দেহে অবস্থিত, ইহার কথা বলা হইল।

মুমুক্ষু। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনের তিন প্রকারে দেহে স্থিতির কথা বলা হইল। এখন এই তিনের তিন প্রকার ভোগ কিরূপ তাই বলুন।

শ্রুতি। জাগ্রৎ অবস্থার অভিমানী বিশ্বপুরুষ নিত্যই স্থূলভোগের ভোক্তা; স্বপ্নাবস্থাভিমানী তৈজস নিত্যই বাসনাময় সূক্ষ্মভোগের ভোক্তা, আর সুষুপ্তি অবস্থার অভিমানী আনন্দের ভোক্তা।

মুমুক্ষু। ভোগের পরেই ত তৃপ্তি আসিবে? সেই তৃপ্তি এই পুরুষের কিরূপ হয়?

শ্রুতি। শব্দাদি স্থূল বিষয়ভোগ জাগ্রদভিমানী বিশ্বপুরুষকে তৃপ্ত করে; বাসনাময় সূক্ষ্মভোগ স্বপ্নাভিমানী তৈজসপুরুষকে তৃপ্ত করে; আর আনন্দ সুষুপ্ত্যভিমানী প্রাজ্ঞপুরুষকে তৃপ্ত করে।

মুমুক্ষু। আচ্ছা মা! উপরে যে ভোক্তা ও ভোজ্যের কথা বলিলে—সেই দুইকে যিনি জানেন, তাঁহার লাভ হয় কি?

শ্রুতি। স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে। তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না।

মুমুক্ষু। কিরূপে;

শ্রুতি। বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ এই যে তিন প্রকার ভোক্তা সে ত এক আমিই, আর স্থূল, সূক্ষ্ম এবং আনন্দ এই যে তিন প্রকার ভোজ্য সেও ত একই। ইহা ভাল করিয়া জান, তাহা হইলে বুঝিবে সকল প্রকার ভোজ্যই সেই এক ভোক্তার ভোগ্য অর্থাৎ ভোগের যোগ্য। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি তদ্বৎ॥ যাহার যাহা ভোগের বিষয়, সে তাহা ভোগ করিলেও, তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। অগ্নি যেমন নিজের ভোগের বিষয় যে বহুবিধ কাষ্ঠাদি তাহা দগ্ধ করিয়াও হানি বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, সেইরূপ এক ভোক্তা স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দ ভোগ করিয়াও সেই একই থাকেন। তিনি ভোগজনিত দোষে লিপ্ত হন না। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ভোগ পাইলে যে আপনাকে সুখী মনে করে আর প্রতিকূল পাইলে মনে করে আমি বড় দুঃখী, সে এক আমি হইয়া ত থাকে না। সেই জন্য ঐরূপ ব্যক্তি ভোগের দোষে লিপ্ত হয় বলিয়াই দুঃখী। কিন্তু যিনি আপনাকে এক বলিয়া জানেন, তিনি স্থূলভোগই আসুক বা সূক্ষ্মভোগ আসুক অথবা স্থূল-সূক্ষ্মের অভাবরূপ অনায়াসপদে আনন্দভোগই হউক তাঁহার আনন্দ অবস্থার বিচ্যুতি কখন ঘটে না। তিনি আপনাকে এক বুঝিয়াছেন বলিয়া "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ" এই অবস্থাতে সর্ব্বদাই থাকেন। যখন দুঃখ আসিল তখন তিনি

আপন সুষুপ্তি অবস্থার আনন্দভুক্ আনন্দময় অবস্থা চিন্তা করিয়া আপন স্বরূপে দৃষ্টি করেন। তিনি বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ। সুখের বা দুঃখের যেরূপ কর্ম্ম আসুক না কেন, তিনি সে সময়েও কর্ম্মশূন্য অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া স্থির থাকেন। বায়ু বহিলে বৃক্ষ নড়ে চলে, কিন্তু বায়ু না থাকিলে বৃক্ষ স্থির—তিনিও যাহা কিছু আসুক না তাহাতেই নিজের একত্ব চিন্তা করিয়াই অচঞ্চল থাকেন।

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এষ যোনিঃ—ইনি কারণ—ইনি প্রপঞ্চের কারণ আবার ইনিই **প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্** অর্থাৎ সকল ভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান; এই সৃষ্টি সম্বন্ধে সকলেই কি একরূপ বলেন? ইহাই এখন বলুন।

শ্রুতি। গৌড়পাদাচার্য্য সৃষ্টি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত যাহা বলিয়াছেন তাহাই শ্রবণ কর।

প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥৬॥
বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টি চিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা ॥৭॥
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ ॥৮॥
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থ মিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥৯॥

বিদ্যমান সমস্তভবনধর্ম্মীপদার্থ বা জন্য পদার্থের উৎপত্তি আপন অবিদ্যাকৃত নামরূপ মায়া স্বরূপ দ্বারাই হয় ইহা নিশ্চয়। প্রাণরূপ পুরুষ সমস্ত চৈতন্যের অংশ যে জীব সমূহ তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ উৎপাদন করেন।

মুমুক্ষু। ইহাতে কি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন?

শ্রুতি। হাঁ।

মুমুক্ষু। এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার ইহাকেই ত জন্য পদার্থ বলিতেছেন ? ইহা মায়া দ্বারা উৎপন্ন ইহাই ত বলিতেছেন ?

শ্রুতি। তাহাই বলিতেছি। "সতাং বিদ্যমানানাং সর্ব্বভাবানাং সকলজন্যপদার্থানাং স্বেন অবিদ্যাকৃতনামরূপমায়াস্বরূপেণ প্রভব উৎপত্তিঃ। সৎ যাহা, বিদ্যমান যাহা—তাহাই মায়া হইতে জন্মিয়াছে। "বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" ইতি। বন্ধ্যার পুত্র ইহা অসৎ। তত্ত্ব দ্বারা বা মায়া দ্বারা বন্ধ্যাপুত্রের জন্ম হইতে পারে না।

মুমুক্ষু। আমার অনেক জিজ্ঞাস্য উঠিতেছে।

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। সৎ কাহাকে বলিতেছেন ? অসৎটাই বা কি ?

শ্রুতি। অধিনচৈতন্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকেই সৎ বলি। বন্ধ্যা-পুত্রকে অসৎ বলি। যাহা বিদ্যমান আছে, ছিল, থাকিবে—তাহাই সৎ। যাহার বিদ্যমানতা আদৌ নাই তাহাই অসৎ। ব্রহ্মই বিদ্যমান চিরদিন আছেন, চিরদিন ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। বন্ধ্যাপুত্র কখন নাই। "**ব্রহ্মৈবেদম্**" "**আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ**" এই যে যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ব্রহ্মই। অগ্রে এই সব আত্মস্বরূপেই ছিল ইহা শ্রুতি বলিতেছেন।

মুমুক্ষু। জগৎটা তবে জগৎ নহে—ব্রহ্মই। জগৎটা তবে মূলে আত্মাই ? তবে যে বলা হয় "ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে" ইহা কি ?

শ্রুতি। পূর্ব্বে বলিয়াছি স্মরণ কর প্রাণপুরুষ যিনি তিনি সবীজ ব্রহ্ম। ইঁহার উপরে নির্ব্বীজ বা তুরীয় ব্রহ্ম আছেন। এই নির্ব্বীজ ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না। নেতি নেতি—কার্য্য-স্বরূপ তিনি নহেন, কারণস্বরূপ তিনি নহেন—এইরূপ সাধনা দ্বারা নির্গুণকে লক্ষ্য করা হয় মাত্র। কিন্তু কিছু বলা না গেলেও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। স্বরূপ কথা দ্বারা সেই নির্গুণকেই লক্ষ্য করা হয়। সৎ চিৎ ও আনন্দ

এইগুলি বিশেষণ বটে কিন্তু সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ যিনি—তিনিই আপনি আপনি, নির্গুণ, নির্বীজ ব্রহ্ম।

মুমুক্ষু। সগুণ ব্রহ্ম বা সবীজ ব্রহ্ম বা প্রাণপুরুষকেই অধিষ্ঠান-চৈতন্য বলা হইতেছে। কোন কিছু উঠিলেই বলা হয়, যাহা উঠিতেছে তাহা স্বগুণ ব্রহ্মের উপরেই তাঁহারই আত্মমায়া দ্বারা উঠিতেছে। কোন কিছু আশ্রয় না পাইলে এই জগৎটা উঠিতেই পারে না। অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া জগৎটা উঠে বলিয়াই বলা হয়—ইহার বিদ্যমানতা আছে। "যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ এবং সর্ব্বাভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বমিতি" রজ্জুতে সর্পোৎপত্তি হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সর্প কোথায় ছিল? ছিলনা। যদি বল ছিল, তবে বলিতে হইবে সর্পটা রজ্জুরূপেই ছিল। তবে সর্পটাকে যে সৎ বল সেটা সর্পকে রজ্জুরূপেই সৎ এইরূপ বলা হয় মাত্র। এইরূপে সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে উহারা সবীজ প্রাণরূপে সত্তাবান্ ছিল বলিতে পারা যায়; নিব্বীজ ব্রহ্মরূপে ছিল বলা যায় না। এই যে বলা হয়—জগৎটা সবীজ প্রাণ ব্রহ্মরূপে ছিল ইহার অর্থ কি? "সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং" প্রাণব্রহ্ম সত্তাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বটা উঠে। যেমন পটকে অবলম্বন করিয়া ছবি ভাসে সেইরূপ। ছবিগুলি মায়িক কল্পনা মাত্র। এই জগৎও সেইরূপ মায়ার কল্পনা মাত্র। অধিষ্ঠানচৈতন্যে এই মায়া বা আত্মশক্তি থাকে—ইনিই সগুণ ব্রহ্ম বা সবীজ প্রাণ। এখন বলুন এই জগৎটা তবে কি?

শ্রুতি। অসৎ হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই। সৎ হইতেই হইয়াছে পূর্ব্বে বলিলাম। সৎ ব্রহ্মের আত্মশক্তিই মায়া। মায়া দ্বারাই এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত অর্থাৎ মায়াই আপনার আবরণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দেখাইয়া থাকেন। রজ্জুসর্পাদীনাং অবিদ্যাকৃত মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্তম্। রজ্জুকেই যে সর্পরূপে দেখা যায় ইহা মায়াই রজ্জুসত্তা অবলম্বন করিয়া উহাকেই সর্পরূপে দেখায়। তবেই বুঝ এই বিচিত্র পরিদৃশ্যমান জগৎটা কি?

মুমুক্ষু। জগৎটা তবে কি নাই? সর্পটা ত নাই।

শ্রুতি। না নাই। ব্রহ্মই নামরূপাত্মক জগৎরূপে ভাসেন মাত্র। ব্রহ্মের আত্মশক্তি যে মায়া সেই মায়াই ব্রহ্মের উপরে উহা ভাসাইতে পারেন। যেমন তরঙ্গ যাহা, তাহা সমুদ্রই বটে কেবল উহা স্থির জল না হইয়া যেমন চঞ্চল জল সেইরূপ ব্রহ্মই এই জগৎ অথচ ব্রহ্ম যিনি তিনি চলনরহিত আর জগৎ যাহা তাহা গতিশীল, তাহা সদা চঞ্চল। জগৎটা কি বুঝিতে হইলে এই দুইটি দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা মনে রাখিও। (১) জলই তরঙ্গরূপে দেখা যায় (২) রজ্জুই সর্পরূপে ভাসে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে অথবা সর্প যেমন রজ্জু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—সেইরূপ জগৎটাও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তরঙ্গটা যাহা তাহা জল হইলেও ঐ যে চঞ্চল ভাবে তরঙ্গকে দেখা যায়; সর্পটা রজ্জু হইলেও ঐ যে সর্পভাবে রজ্জুটাকে দেখা হইয়া যায় উহা মায়ারই কার্য্য।

মায়ার একটি শক্তির নাম আবরণ শক্তি। এই আবরণশক্তি দ্বারা ভিতরে যিনি দ্রষ্টা তিনিই দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়েন। এই আবরণশক্তি দ্বারাই অধিষ্ঠানচৈতন্যস্বরূপ একীভূত ব্রহ্মই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে প্রতীয়মান হয়েন। আবরণ শক্তি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদটিকে অথবা এক ও বহুর ভেদকে আবরণ করিয়া ফেলে। যিনি মিথ্যা নামরূপ বিশিষ্ট মায়া বিলাসকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেখিতে পারেন, যিনি সর্ব্বদা একরূপ দ্রষ্টাকে দৃশ্য মনোভাব হইতে অথবা দৃষ্টবস্তু হইতে পৃথক্ দেখিতে পারেন তিনি বহু আর দেখেন না, একই দেখেন। তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে যিনি তরঙ্গের অভাব ভাবনা করিতে পারেন, যিনি সাধনা দ্বারা অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপ স্থির জল সর্ব্বদা দেখিতে অভ্যাস করেন তিনিই তরঙ্গ দেখিয়াও দেখেন না। আমরা রাগকেও জানি, রাগের অভাবকেও জানি। রাগ হইবার সময় রাগের অভাবকে যদি চিন্তা করিতে অভ্যাস করি, তবে রাগ থাকে না। সেইরূপ কর্ম্ম-কালে কর্ম্মের অভাবকে যিনি চিন্তা করিতে অভ্যাস করেন, তিনি কর্ম্ম

করিয়াও করেন না। প্রধান কথা হইতেছে তত্ত্বাভ্যাস। অধিষ্ঠান-চৈতন্যই তত্ত্ব। চৈতন্যকে বুঝিয়া যিনি সর্ব্বদা চৈতন্য লইয়া থাকিতে অভ্যাস করেন, তিনি চৈতন্যের উপরে এই মিথ্যা নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ দেখিয়াও দেখেন না অথবা তিনি এই জগৎকে চৈতন্যরূপেই দেখেন। ইহাই সাধনা। এই সাধনাতে সঙ্কল্পক্ষয় ও মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস সমাকালেই করা চাই। অন্য যত প্রকার সাধনা তাহা এই সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সাধনা হইতেই উদ্ভূত অথবা ঐ সাধনারই অঙ্গীভূত। সমকালে করা চাই। এই সমকালে কথাটিই অতি প্রয়োজনীয়। সমকালে কথাটীই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হয়।

মুমুক্ষু। মা! সৃষ্টিতত্ত্ব একরূপ ধারণা করিলাম। কিন্তু সকলেই কি সৃষ্টি সম্বন্ধে এই এক কথাই বলেন?

শ্রুতি। না সৃষ্টিসম্বন্ধে লোকে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া থাকে। শুনিতে চাও ত শ্রবণ কর।

(১) সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণগণ বলেন সৃষ্টিটা ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যবিকাশ কিন্তু পরমার্থদর্শিগণ বলেন সৃষ্টিটা স্বপ্ন ও মায়া সদৃশ মিথ্যা।

বিভূতির্ব্বিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে। নতু পরমার্থচিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ। **"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"** ইতি শ্রুতেঃ ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধ-মারুহ্য চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ পশ্যতাং তৎকৃতমায়াদি সতত্ত্বচিন্তায়া মাদরো ভবতি তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্ত স্বপ্নাদিবিকাসঃ। তদারূঢ় মায়াবি সমশ্চ তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ তৈজসাদিঃ। সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থ মায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থ তত্ত্বম্। অতস্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্ষূণামার্য্যাণাং ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইতি। অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ-স্বপ্ন মায়া সরূপেতি-স্বপ্নসরূপা-মায়াসরূপা চেতি।

বেদমতাবলম্বিগণ হইতে পৃথক্ মতাবলম্বী এই সৃষ্টিচিন্তকগণ। ইহারা বলেন সৃষ্টিটা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-বিস্তাররূপ বিভূতি। কিন্তু পরমার্থ চিন্তক যাঁহারা সেই সমস্ত তত্ত্ববেত্তাগণ সৃষ্টিবিষয়ে কোন আদর দেখান না; কারণ শ্রুতি বলেন"**ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে**" ইন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মা মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রতীত হয়েন। সাধারণ লোকেরও ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল এবং মায়ার কার্য্য সমূহে আদর থাকে না। দেখাগিয়াছে কোন বাজিকর মায়াবী সকল লোকের সমক্ষে আকাশে প্রথমে সূত্র নিঃক্ষেপ করে। পরে সেই সূত্র অবলম্বনে অস্ত্র লইয়া আকাশে আরোহণ করে। তাহার পরে আকাশমার্গে এত ঊর্দ্ধে উঠে যে তাহাকে আর দেখা যায় না। কতকক্ষণ পরে দেখা যায় অঙ্গপ্রতঙ্গগুলি যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইয়া অধঃপতিত হয় আবার সেই লোকটা উত্থিত হয়। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব্বে যেমন ছিল সেইরূপই আবার দেখা যায়। যাহারা এই মায়াবাজী দেখেন তাঁহাদের কি মায়াবী রচিত মায়া ও মায়ার কার্য্যের এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারে আদর থাকে? সেইরূপ মায়াবী ঈশ্বরের সূত্র প্রসরণ ব্যাপার হইতেছে সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদি বিলাস। আর সেই সূত্রোপরি আরূঢ় মায়াবীর সমান ঐ সুষুপ্তিও স্বপ্নাদিতে স্থিত প্রাজ্ঞ তৈজসাদি জীব। আর যেমন সূত্র ও সূত্রারূঢ় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্য পরমার্থরূপ মায়াবী আর একজন পৃথিবীতে স্থিত ও মায়াচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য থাকেন, সেইরূপ তুরীয় নামধারী পরমার্থ তত্ত্ব। যিনি মুমুক্ষু তাঁহার পরমার্থ তত্ত্ব চিন্তাতেই আদর থাকে; গর্দ্দভের লোম কতগুলি ইহা চিন্তা করা যেমন নিষ্প্রয়োজন সেইরূপ সৃষ্টিচিন্তাও পরমার্থচিন্তকগণের নিষ্প্রয়োজন। অতএব ইহা বলা যায়—সৃষ্টিচিন্তকগণের এই সমস্ত বিকল্প; তত্ত্বজ্ঞের নহে; সেইজন্য বলা হইতেছে স্বপ্ন মায়াস্বরূপা অর্থাৎ এই সৃষ্টি স্বপ্নের সমান ও মায়ার সমান।

(২) আবার কোন এক ঈশ্বরবাদী সৃষ্টিচিন্তক এই নিশ্চয় করেন যে, প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র এই সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ ঈশ্বর

সত্য সঙ্কল্প। যেমন ঘটাদির সৃষ্টি কুম্ভকারের ইচ্ছাতেই হয়, ইহাও সেইরূপ।

(৩) আবার কালচিন্তাকারী জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তাগণ বলেন, কাল হইতে জগতের উৎপত্তি। ইঁহারা বলেন যখন উৎপত্তির কাল আইসে তখন জগতের উৎপত্তি হয় আর যখন প্রলয়ের কাল উপস্থিত হয় তখন ইহার নাশ হয়।

(৪) অপর কতকগুলি লোক বলেন যে, ভোগের জন্য এই সৃষ্টি।

(৫) অপর কেহ কেহ বলেন এই সৃষ্টি ক্রীড়ার জন্য।

(৬) অপর স্বভাববাদী এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সৃষ্টি সেই দেবতার স্বভাব। তাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি ইহা বলা যায় না। কারণ যিনি পূর্ণকাম তাঁহার ইচ্ছা আবার কি?

ইঁহাদের মতে এই সৃষ্টি স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বরের স্বভাব। পরমেশ্বর পূর্ণকাম দেবতা। তাহার ঐ পূর্ণকাম অবস্থাতে ইচ্ছা হইতেই পারে না। তবে ঐ অবস্থা হইতে সৃষ্টি কিরূপে হইবে? হইতেই পারে না।

এখন দেখ কার্য্যকারণাত্মক স্থূলসূক্ষ্ম নামরূপ সৃষ্টি যখন হয় তখন ঐ সমস্ত সৃষ্টি ঐ পরিপূর্ণ দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই হয়। সৃষ্টি উঁহাতেই হয়, সৃষ্টি উঁহা হইতে অন্য কিছুই নহে। সৃষ্টি যখন এইরূপ তখন ইচ্ছা কাহার হইবে? কাহারও ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয় না।

আরও দেখ ইচ্ছা যে হইবে তাহা কিরূপে হইবে? যাহা আমার নাই সেই অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়েই ইচ্ছা হয়। আরও যে জন্য ইচ্ছা হইবে তাহা আমা হইতে ভিন্নও হওয়া চাই। কিন্তু পরমাত্মা হইতে অন্য আর তাঁহার অপ্রাপ্ত কোন কিছু আছে কি?

মুমুক্ষু। মা! এই যে বলা হইল "দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" এই দেবতার স্বভাবই সৃষ্টি—আপ্তকামের আবার ইচ্ছা কি—এই যে স্বভাব বলিতেছেন এই স্বভাবটা কি?

শ্রুতি। পরমেশ্বরের স্বভাবটিই মায়া। আর মায়াই সৃষ্টি। দেখ রজ্জুতে যে সর্প ভাসে তাহা ভাসে কিরূপে? অধিষ্ঠান-ভূত

রজ্জুর স্বভাব হইতেছে, উহা-স্থিত অজ্ঞান। সেইরূপ পরমাত্মায় আত্মমায়া শক্তিই উঁহার স্বভাব। ঐ স্বভাব বশেই আকশাদি ভাসে। শ্রুতিপ্রমাণেও পাওয়া যায় "**এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ**" আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হয়। রজ্জুতে অবিদ্যারূপ স্বভাব না থাকিলে সর্পাদি আকারের ভাসা কিছুতেই যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ পরমাত্মার মায়ারূপ স্বভাব বিনা আকাশাদিরূপে ভাসা অন্য কোন কারণেই হইতে পারে না।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টম্—অব্যবহার্য্যম্—অগ্রাহ্যম্—অলক্ষণম্—অচিন্ত্যম্—অব্যপদেশ্যম্—একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৭॥

অন্তঃপ্রজ্ঞং ন ইতি তৈজস প্রতিষেধঃ। বহিপ্রজ্ঞং ন ইতি বিশ্বপ্রতিষেধঃ। উভয়তঃ প্রজ্ঞং ন ইতি জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্তরালাবস্থা প্রতিষেধঃ। প্রজ্ঞানঘনং ন ইতি সুষুপ্তাবস্থা প্রতিষেধঃ। বীজভাবাবিবেকস্বরূপত্বাৎ। প্রজ্ঞং ন ইতি যুগপৎ সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্ব প্রতিষেধঃ। ন সর্ব্বজ্ঞ ইতি ভাবঃ। অপ্রজ্ঞং ন ইতি অচৈতন্য প্রতিষেধঃ। অজ্ঞানরূপো ন ইতি ভাবঃ। অদৃষ্টম্ অদৃশ্যম্। ন জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ। অব্যবহার্য্যম্ যস্মাদদৃশ্যং তস্মাদব্যবহার্য্যম্। ব্যবহারাযোগ্য ইতি ভাবঃ। অগ্রাহ্যম্ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ গ্রহীতুমশক্যং। ন কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। অলক্ষণম্ অলিঙ্গমিত্যেতৎ অননুমেয়মিত্যর্থঃ। অচিন্ত্যং মনসোঽপি অগম্যং। অতএব অব্যপদেশ্যং শব্দৈঃ। ন শব্দবাচ্য ইতি ভাবঃ। একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্রদাদি স্থানেষু এক এবায়মাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়ঃ তেনানুসরণীয়ম্ অথবা এক আত্মপ্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্য তুরীয়স্যাধিগমে তৎ তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্। "**আত্মেত্যেবোপাসীত**' ইতি শ্রুতেঃ।

অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিস্থানি ধর্ম্ম প্রতিষেধঃ কৃতঃ। প্রপঞ্চোপশমিতি জাগ্রদাদিস্থান সম্বন্ধশূন্যং। অতএব শান্তং অবিক্রিয়ং। জগদ্রহিতো-

হতঃ শান্ত ইতি ভাবঃ। শিবং মঙ্গলময়ং। অদ্বৈতং ভেদবিকল্প-রহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে প্রতীয়মান পাদত্রয়রূপ বৈলক্ষণ্যাৎ। স আত্মা স বিজ্ঞেয় ইতি প্রতীয়মান সর্পদণ্ডভূচ্ছিদ্রাদি ব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুঃ তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থঃ। আত্মা "**অদৃষ্টোদ্রষ্টা**" "**ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে**" ইত্যাদিভিরুক্তো যঃ স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্ব্বগত্যা। জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ ॥৭॥

আত্মা স্বরূপাবস্থায় অন্তঃপ্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ইনি স্বপ্নাভিমানী হয়েন না। ইনি বহিঃপ্রজ্ঞঃ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ জাগ্রৎ অভিমান করেন না। ইনি স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধি অবস্থা হইতেও ভিন্ন অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়ের অধিষ্ঠাতা এরূপও নহেন। ইনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন অর্থাৎ সুষুপ্তিস্থান নহেন অর্থাৎ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হইতেও ভিন্ন। ইনি প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইতেও ভিন্ন। ইনি অপ্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ অজ্ঞানরূপও নহেন। ইনি অদৃষ্ট অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের সাধ্য নাই তাঁহার দর্শন পায়। ইনি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ ইনি অমুক এই প্রকার ব্যবহারের অযোগ্য। ইনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অলক্ষণ অর্থাৎ ইঁহাকে কোন অনুমানের দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না। ইনি অচিন্ত্য অর্থাৎ মন এই সীমাশূন্যকে চিন্তা করিতে পারে না। ইনি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ ইনি শব্দবাচ্য নহেন অর্থাৎ কোন শব্দ দ্বারা ইঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। ইনি একাত্মপ্রত্যয়সার অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে ইনি একই আত্মা, ইনি একই চৈতন্যস্বরূপ এই নিশ্চয় প্রত্যয় লভ্য। ইনি প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ জাগ্রৎ—প্রপঞ্চ উপাধি-রহিত অর্থাৎ ইনি জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান। ইনি শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি মায়াতরঙ্গশূন্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত ইনি। ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপ। ইনি অদ্বৈত অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য আপনি আপনি। ইনি চতুর্থ অর্থাৎ পাদত্রয় হইতে ভিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম। ইনি আত্মা। ইনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

শ্রুতি। ওঁকারের তিন পাদ ব্যাখ্যা করা হইল। এখন চতুর্থ পাদের কথা শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। বলুন।

শ্রুতি। **"নান্তঃপ্রজ্ঞং" "ন বহিঃপ্রজ্ঞং" "নোভয়তঃ প্রজ্ঞং" "ন প্রজ্ঞানঘনং" "ন প্রজ্ঞং" "নাপ্রজ্ঞম্"।**

"নান্তঃ প্রজ্ঞং। ভিতরের বাসনাময় সূক্ষ্ম জগৎ হইতেছে অন্তর রাজ্য। ভিতরের রাজ্য যিনি জানেন তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ-তৈজসপুরুষ। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি তৈজস পুরুষ নহেন।

"ন বহিঃপ্রজ্ঞং" বাহিরের স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যিনি জানেন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্বপুরুষ। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি বিশ্ব-পুরুষও নহেন।

"নোভয়তঃ প্রজ্ঞং" এই পরিদৃশ্যমান্ স্থূল জগৎ এবং বাসনাময় সূক্ষ্ম জগৎ যিনি জানেন তিনি উভয়তঃ প্রজ্ঞ। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি ইহাও নহেন। ইহাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সন্ধিরূপ যে মধ্য অবস্থা তুরীয় সম্বন্ধে তাহারও নিষেধ করা হইল।

"ন প্রজ্ঞানঘনং" ঘনপ্রজ্ঞা বলে তাহাকে যেখানে নানাপ্রকারের ভেদ থাকে না। যেমন রাত্রির অন্ধকারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভেদ লক্ষ্য করা যায় না, সেইরূপ যে জ্ঞানে কোন কিছু ভেদ থাকে না, একটি মাত্র বস্তুর জ্ঞান থাকে—তাহাকেই বলে ঘনপ্রজ্ঞা। ভিতরের বাহিরের ভেদরহিত ঘনপ্রজ্ঞা যাঁর আছে তিনি প্রজ্ঞানঘন। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি, তিনি প্রজ্ঞানঘনও নহেন। ইহাতে তুরীয় ব্রহ্ম যে সুপ্তপুরুষ নহেন তাহাই বলা হইল।

"ন প্রজ্ঞং" প্রজ্ঞ বলে সর্ব্বজ্ঞকে। তুরীয় ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞও বলা যায় না। সর্ব্বের জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। তুরীয় ব্রহ্মে সর্ব্ব বলিয়া কিছুই নাই। কাজেই এককালে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান তাঁহাতে থাকিবে কিরূপে?

"নাপ্রজ্ঞং" অপ্রজ্ঞ বলে অচেতনকে। তুরীয় ব্রহ্ম কিন্তু অচেতনও নহেন, অজ্ঞানও নহেন।

মুমুক্ষু। আমরা আত্মাকে বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞঃ এই ভাবেইত জানি। কিন্তু তুরীয়ত এই সব নহেন বলিতেছেন। অথচ তুরীয়টিই স্বরূপ। তুরীয়ই সত্য। তবে কি জাগ্রৎস্থান, স্বপ্নস্থান সুষুপ্তিস্থান এগুলি মিথ্যা?

শ্রুতি। এক আত্মাই মায়া অবলম্বনে বিবিধ অবস্থা লাভ করেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এগুলি মায়ার কল্পনা বলিয়া মিথ্যা। অন্তঃপ্রজ্ঞাদির স্বরূপটি হইতেছে জ্ঞান। এই স্বরূপ জ্ঞান সকল অবস্থাতেই এক। কিন্তু রজ্জুকে যখন সর্প, জলধারা, দণ্ড ইত্যাদিরূপে দেখা যায় তখন অধিষ্ঠান-রজ্জুতে সর্পাদির অধ্যাস হয় মাত্র। অধ্যাসটা কল্পনা, এজন্য মিথ্যা। সর্প, দণ্ড, জলধারা এগুলি কল্পিত এবং পরস্পর ব্যভিচারী অর্থাৎ যে সময়ে রজ্জুকে সর্পরূপে প্রতীতি হয় তখন ইহাকে দণ্ড ও জলধারা দেখা যায় না। আবার দণ্ডরূপে দেখা গেলে সর্প ও জলধারা রূপে দেখা যায় না, আবার জলধারারূপে দেখা গেলে সর্প ও দণ্ডরূপে দেখা হয় না। এজন্য অধিষ্ঠান—রজ্জু হইতে বাস্তবিক অপৃথক্ যে কল্পিত সর্প, দণ্ড ও জলধারা তাহা পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পরস্পর ব্যভিচারী এবং কল্পিত বলিয়া অসৎ।

সেইরূপ বিশ্ব তৈজসাদি চৈতন্য, আপনার অধিষ্ঠান যে তুরীয় তাঁহা হইতে পৃথক্ সত্ত্বাবান্ নহেন, পরন্তু পরস্পর ব্যভিচারী এবং কল্পিত বলিয়া অসৎ। রজ্জু আদির ন্যায় অব্যভিচারী সেই জ্ঞানস্বরূপ যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য—তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। তিনিই মাত্র—সত্য। আর সমস্তই কল্পিত বলিয়া মিথ্যা—অসৎ।

মুমুক্ষু। যদি বলা যায় স্বরূপটিই সুষুপ্তি ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়েন?

শ্রুতি। তাহা বলা যায় না। কেননা তুরীয়কে অনুভব করা যায় না। কিন্তু সুষুপ্তিবান্ পুরুষ যিনি, তিনি অনুভবের বিষয় হয়েন।

আর **"ন হি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"**। শ্রুতি বলিতে-ছেন বিজ্ঞাতা যিনি তাঁর বিজ্ঞপ্তির লোপ কখন হয় না। সুপ্ত পুরুষের যে অনুভব থাকে তাহার প্রথম অবস্থা হইতেছে "আর কিছুই নাই"। যদি এই অনুভব না থাকিত তবে পুরুষ জাগ্রত হইয়া নিজের অবস্থা স্মরণে কিরূপে বলিবেন—বেশ ছিলাম, আর কিছুই ছিলনা! এই যে বেশ ছিলাম আর কিছুই ছিল না—ইহা ত স্মৃতি মাত্র। কিন্তু যাহা অনুভব হয় না তাহা স্মৃতিতে আসিবে কিরূপে? স্মরণ যাহা হয় তাহার মূলে পূর্ব্বের একটা অনুভব থাকিবেই। তবেই হইল সুপ্ত পুরুষের "আর কিছুই নাই" এই অভাবসূচক অনুভব থাকে। আর কিছুই নাই যখন এই অনুভব হয়, তখন এই অভাব অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ের ও অনুভব হয়। সেটি হইতেছে "আমিই আছি"। আবার "আমিই আছি" ইহার পরের অবস্থাটি হইতেছে "আমিই সেই"। এ অবস্থাটিকে স্থিতি বলে। ইহাই তুরীয় ভাব।

"আর কিছুই নাই" ইহার অনুভব যে সুপ্ত পুরুষ করেন, তিনি "আর কিছুই নাই" এই অনুভব করিয়া শূন্য হইয়া যান না। পরন্তু তিনিই "ভরিত চৈতন্য।" "আমিই আছি" এইটি হইতেছে ভরিত চৈতন্যের আত্মানুভূতি। ইহার পরের অবস্থা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান-স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি। ইনিই তুরীয়, ইনিই স্থিতি, ইনিই জ্ঞান-স্বরূপ, ইনিই আত্মা।

যিনি আত্মানুভব করেন তিনিই শ্রুতির বিজ্ঞাতা। এই বিজ্ঞাতার যে বিজ্ঞপ্তি সেইটিই তুরীয় ব্রহ্ম। ইহার লোপ কিরূপে হইবে? কাজেই এই তুরীয় ব্রহ্ম শূন্য নহেন।

তাই শ্রুতি বলিতেছেন—এই তুরীয় ব্রহ্ম "**অদৃষ্টম্**" "**অব্যবহার্য্যং**" "**অগ্রাহ্য**" "**অলক্ষণং**" "**অচিন্ত্য**" '**অব্যপদেশ্য**' '**একাত্মপ্রত্যয়সারং**' '**প্রপঞ্চোপশমং**' "**শান্তং**" "**শিবং**" "**অদ্বৈতং**" "**চতুর্থং** মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়:।**

'এই তুরীয় ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় নহেন বলিয়া

অদৃষ্ট। যেহেতু তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের বিষয় নহেন বলিয়া অদৃষ্ট সেই হেতু তিনি সমস্ত ব্যবহারের অযোগ্য অর্থাৎ তাঁহাকে কোন ব্যবহার বিষয়ে আনা যায় না। যেহেতু তিনি অব্যবহার্য্য সেই হেতু তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য। তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া কর্ম্মের ফলস্বরূপও নহেন সেই জন্য অগ্রাহ্য। সেই জন্যই তিনি অলক্ষণ অর্থাৎ লিঙ্গরহিত বলিয়া অনুমানাদি প্রমাণের অবিষয়। সেই জন্য আবার তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ অন্তঃকরণের যে সকল বৃত্তি সেই বৃত্তি সমূহেরও অবিষয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধ মাত্রেই তাহাতে স্থিতিলাভ হয়।। যে হেতু অচিন্ত্য সেই হেতু অব্যপদেশ্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের অবিষয় বলিয়া উপদেশ করারও অযোগ্য। শ্রুতি তাই বলেন **"ন বিদ্মো ন বিজনীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ"**।

নিষেধমুখে এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রুতি এখন বিধিমুখে তাঁহার কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন—এই তুরীয় ব্রহ্ম একাত্মপ্রত্যয়সার অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থারূপ স্থান বিষয়ে এই আত্মা একরূপ এইরূপ অব্যভিচারী যে প্রত্যয়-জ্ঞান সেই জ্ঞানের অনুভবেরই তিনি যোগ্য। অথবা একাত্মপ্রত্যয়সার বাক্যে ইহাও বলা যায় যে, এই তুরীয়কে প্রাপ্তি বা তুরীয়ে স্থিতিলাভ করিতে হইলে একমাত্র আত্মজ্ঞানটি সার অর্থাৎ আত্মজ্ঞান মাত্রই মুখ্যপ্রমাণ।

তুরীয়প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন **"আত্মেত্যেবোপাসীত"** আত্মা আছেন এই প্রকার উপাসনাই করিবে। আরও বলেন **"অস্তীত্যে-বোপলব্ধব্য"** আত্মা আছেন এই অস্তিভাবের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

জাগ্রদাদি অবস্থারূপ স্থান বিষয়ে আত্মা এক ইহা যেমন বলা হইল, সেইরূপ অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ভাবপ্রাপক জাগ্রদাদি স্থান বিষয়ে অভিমানীর যে ধর্ম্ম, সে সমস্ত ধর্ম্মেরও নিষেধ এই তুরীয় সম্বন্ধে করা হইল।

এই তুরীয় আবার প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ আত্মাই আছেন এই

অস্তিভাব দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবেন তিনি যিনি নিশ্চয় করিয়াছেন যে তিনি প্রপঞ্চ হইতে রহিত। সমূল দ্বৈত প্রপঞ্চ যে এই জগৎ তাহার অত্যন্তাভাব হওয়াই প্রপঞ্চের উপশম হওয়া। জগৎ একবারে নাই; সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গ একবারেই নাই এই বিষয়ে যিনি নিঃসন্দেহ; জগৎ নাই, একবারেই নাই এই শাস্ত্রবাক্যে যাঁহার কোন সংশয় নাই, তিনিই "জগৎ নাই ব্রহ্মই আছেন" সর্ব্বদা সমকালে এই জ্ঞানের দৃঢ় অভ্যাসে তুরীয়কে লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চের উপশম হইলে এই আত্মাকে পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতি বলিলেন—ইনি প্রপঞ্চোপশম।

মুমুক্ষু। মা! যে স্বরূপ বিশ্রান্তিকে লাভ করা, যে আত্মজ্ঞানকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইতেছিল, আবার বলি যে সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি অথবা নিরতিশয় আনন্দকে লাভ করা অথবা অনায়াসপদে স্থিতিলাভ করা নিতান্ত ক্লেশসাধ্য মনে হইতেছিল তাহা আপনার প্রসাদে অত্যন্ত সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে শাস্ত্রের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শাস্ত্র যে বলিতেছেন—একটি পুষ্পের পাপড়ীকে মর্দ্দন করিতেও আয়াস আছে, কিন্তু এই নিরায়াসপদে স্থিতিলাভ করিতে কোন প্রকার আয়াস নাই ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রুতি। বৎস! তোমার বিশ্বাসে আমি বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। সত্যই যিনি মাত্র সৎ বস্তু তিনিই আছেন। অন্য সমস্তই অসৎ। অসতের নাশ ত সর্ব্বদাই হইয়া আছে। আর সৎ আত্মা সর্ব্বদাই আপন স্বরূপে পরম শান্ত অবস্থায় পরমানন্দে আপনি আপনি ভাবেই আছেন। অজ্ঞানের আবরণ সরান অতি সহজ। কারণ এ আবরণটি সম্পূর্ণ কল্পিত। যিনি ঋষিগণের বাক্য যুক্তি দিয়া বুঝিয়াছেন, যিনি অন্ততঃ বিশ্বাস করিয়াছেন "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" এই সিদ্ধান্তে যাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয়ও নাই এইরূপ বিশ্বাসী শুধু তাঁহার বিশ্বাসেই মুক্তি-লাভ করিতে পারেন। যদি "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই গুরু বেদান্ত

সিদ্ধান্ত তাঁহার সর্ব্বদা অভ্যাসের বিষয় হয়; যদি "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" ইহার অভ্যাস বিশ্বাসী ভক্তের স্মৃতি হইতে একবারও মুছিয়া না যায়। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" ইহা তিনি লোককে বুঝাইতে না পারিলেও যদি সর্ব্বসংশয়শূন্য হইয়া ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং সেই বিশ্বাসের ফলে তিনি ধারণা করিতে পারেন এবং সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারেন "আমি অকর্ত্তা—আমি অভোক্তা"—যদি সর্ব্বদা স্মরণ অভ্যাস করিতে পারেন জগৎ মিথ্যা; করা, ধরা, খাওয়া, শোওয়া, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, জনন মরণ, রোগ শোক এ সমস্ত আমাতে নাই—এক কথায় মিথ্যা জগৎকে মিথ্যা জানিয়া ব্যবহারিক কার্য্যেও ব্রহ্মই সত্য আর কিছুই নাই এইটি অভ্যাস লইয়া নিরন্তর যিনি থাকিতে পারেন—তিনিই জীবন্মুক্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তাই শ্রীগীতা বলিতেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥২।৫৫
দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥২।৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২।৫৭

মনের সর্ব্বপ্রকার কামনা যিনি ত্যাগ করিয়া যিনি আপনি আপনি ভাবে তুষ্ট; যাঁহার মন দুঃখ আসিলেও অনুদ্বিগ্ন ও সুখ পাইয়াও ভোগেচ্ছাশূন্য; যাঁহার রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই, যাঁহার দেহ, মন, পরিবারবর্গ, জগৎ কোন পদার্থেই আর স্নেহ নাই; শুভ আসিলেও প্রশংসা নাই, অশুভ পাইয়াও দ্বেষ নাই—এমন যিনি তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ইঁহার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়ায় আত্মার অতি নিকটবর্ত্তিনী বুদ্ধি সংস্কার অবশিষ্টা মাত্র থাকিয়া আর বহির্ম্মুখ হইতে পায় না। ভর্জ্জিত বীজ যেমন বৃক্ষাদি জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ ইনি সংসারে থাকিলেও ইঁহার বুদ্ধি আর বিষয় প্রসব করে না।

দেখিতেছ না দৃঢ় অভ্যাসে জগৎ মিথ্যা এই বোধ যাঁহার হইয়াছে তাঁহার কামনা আর কোথা হইতে উঠিবে? একমাত্র আত্মাই আছেন আর কিছুই নাই সর্ব্বদা যিনি এই ভরিত চৈতন্যে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই শব্দাদি ভোগের বিষয় হইতে সঙ্কুচিত হইয়াই থাকিবে। ভোগের বস্তু পায়না বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আহার করে না কিন্তু ভোগ তৃষ্ণা তার থাকে, আর যিনি সেই ভরিত-চৈতন্য স্বরূপ তুরীয় আপনি আপনিতে স্থিতিলাভ করেন তিনি আর কোন্ রসে স্পৃহা রাখেন? তাঁহার সকল ভোগ বাসনা আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়। জগৎ মিথ্যা এই বোধ যাঁহার হয় তাঁহার ইন্দ্রিয় আপনা হইতে বশীভূত হইয়া যায়। তিনি আপন স্বরূপে যুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহার আর কোন চলন, কোন সঙ্কল্প, কোন ভাবনাই থাকে না। তাঁহার ইন্দ্রিয় আর কোন প্রকারেই বিষয়াভিমুখী হয় না। এই সংযমী তুরিয়ে জাগিয়া থাকেন আর বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়েন। তাই শ্রীগীতা আবার বলিতেছেন

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম-কামী॥ ২।৭০

সমুদ্রে সমস্ত বারি রাশি প্রবেশের ন্যায় সর্ব্ববিধ কামনা সেই স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া তিনি অতল গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় শান্ত স্থির ভাবে স্থিতিলাভ করেন। সমস্ত কামনা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর কোথাও মম বোধ নাই, কোথাও অহং বোধ নাই, কোথাও স্পৃহা নাই— তিনি শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন। এইটি ব্রাহ্মী স্থিতি। যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুষ্ট এমনও যিনি তাঁর কোন কার্য্যও থাকেনা। আর যিনি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইহার দৃঢ়াভ্যাসে তুরীয়ে পৌঁছিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে আর কথা কি? স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও যেমন ব্রহ্ম স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি লইয়া খেলা করেন মানুষে দেখে—

সেইরূপ আত্মজ্ঞ যিনি তিনি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্ম দেখেন, অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখেন। জ্ঞানেই সর্ব্ব কর্ম্মের কিন্তু পরিসমাপ্তি। জ্ঞানলাভ করিয়া জগৎ নাই, দেহ নাই, মায়া নাই এ সম্বন্ধে যাঁর সর্ব্বপ্রকার সংশয় নষ্ট হইয়াছে তিনিই আপ্তবস্তু। তত্ত্ববিৎ যিনি তিনি কিছুই করেন না, তিনি যুক্ত। তিনি শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণ অশন গমন স্বপ্ন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ সব করিয়াও কিছু করেন না। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে আমি কিছুই করি না ইহা তিনি স্থির জানেন।

মুমুক্ষু। শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়: ইহা বলিতে বাকী আছে।

শ্রুতি। শ্রবণ কর। এই তুরীয় ব্রহ্ম রাগ দ্বেষাদি সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত বলিয়া শান্ত। এই জন্যই ইনি শিব অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরমানন্দ বোধস্বরূপ। ইনি অদ্বৈত অথাৎ সর্ব্বপ্রকার ভেদ, সর্ব্বপ্রকার বিকল্প হইতে রহিত। ইনি চতুর্থ—তিন পাদের অপেক্ষা এখানে নাই অর্থাৎ প্রতীয়মান যে বিশ্বাদি তিন পাদ এই তিন পাদ হইতে ইনি বিলক্ষণ। ইনিই আত্মা, ইনিই জানিবার যোগ্য।

এই এক নির্ব্বিশেষ, চিন্মাত্রতত্ত্ব জাগ্রদাদি স্থানরূপ উপাধি রহিত, পরম শুদ্ধ সকলের প্রত্যগাত্মা ইনিই আছেন। অন্য কিছুই নাই। যাহা আছে বলিয়া মনে হয় তাহা মায়া, ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন মাত্র। জগৎ নাই ব্রহ্মই আছেন—এই ব্রহ্মই মুমুক্ষু জিজ্ঞাসু জনের জানিবার যোগ্য বস্তু।

মুমুক্ষু। আরও কিছু এই তুরীয় সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হয় যদিও সমস্তই বলিয়াছেন তথাপি নিঃসংশয় হইবার জন্য অভ্যাসের বস্তুটিকে দৃঢ় ভাবে জানিয়া লইতে চাই।

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদিতে বলিতেছেন যে তুরীয়কে প্রকাশ করিতে কোন প্রকার শব্দের সামর্থ্য নাই। ইনি শব্দবাচ্য নহেন। লোকে যাহা বুঝিতে পারে এরূপ কোন কিছু দিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি তাহাই হয় তবে তিনি কি শূন্য হইয়া পড়েন না?

শ্রুতি। না ইনি শূন্য নহেন। ইনি ভরিত চৈতন্য পূর্ব্বে ইহা একবার বলিয়াছি। আবার অন্য প্রকারে বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি আছেন বলিয়া চিত্তস্পন্দন কল্পনা সমূহ ইঁহারই উপরে ভাসিয়াছে। পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা ত স্থূল ভাবেই দেখিতেছ। যাহা দেখিতেছ তাহা না দেখিয়া যখন চক্ষু মুদ্রিত কর তখন স্থূলটাই সূক্ষ্ম হইয়া মনের মধ্যে আইসে। মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা ত কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা ত মিথ্যা। এই মিথ্যা কল্পনা কিন্তু শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না। কল্পনাও একটি সত্য বস্তু অবলম্বনে ভাসে।

শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প, স্থাণুতে পুরুষ, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকা এই যে সব ভ্রম প্রতীতি কল্পনা—এই ভ্রম কল্পনা একটি আশ্রয় অবলম্বনেই ভাসে। কল্পনা কখন নিরাশ্রয় ভাবে থাকিতে পারে না। তুরীয় যিনি তিনি সর্ব্ব কল্পনার আশ্রয় স্থান।

শূন্য যাহা তাহা ত বিকল্প কল্পনা। কল্পনা যখন আশ্রয়শূন্য হইয়া উঠিতে পারে না তখন অধিষ্ঠানরূপ তুরীয় যিনি তিনি শূন্য হইতে ভিন্ন পদার্থ। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যটি সৎ। ইহা যদি মান তবে এই জগদিন্দ্রজালের যিনি আশ্রয় তিনি শূন্য একথা তুমি বলিতে পার না।

মুমুক্ষু। নির্ব্বিশেষ যিনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণাদি বিকল্প ভাসে। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু রজ্জু যাহা তাহা ত সর্পশব্দ বাচ্য হয়। এইরূপে তুরীয় যিনি তিনিই ত শব্দ বাচ্য হইতে পারেন? তবে নিষেধমুখে তুরীয়ের প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক কি?

শ্রুতি। নিষেধমুখ বাক্যগুলি বাচারম্ভণ মাত্র অর্থাৎ শুধু কথা মাত্র। এই জন্য অসৎ—অবস্তু। সৎ ও অসতের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দজনিত বোধের বিষয় হইতে পারে না।

আরও দেখ গো আদি জন্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ আছে। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কারণ আত্মা যিনি তিনি নিরুপাধিক। গো আদির ন্যায় ইনি জাতিবিশিষ্ট নহেন।

অদ্বিতীয় যিনি তাঁহার কোন সামান্য বিশেষ ভাব নাই। আর পাচকাদির ন্যায় ইঁহাতে কোন ক্রিয়াবান্‌পণাও নাই। কারণ ইনি অক্রিয়। আবার নীল পীত ঘটাদির মত ইঁহাতে কোন গুণবান্‌পণাও নাই কারণ ইনি নির্গুণ। সেই জন্যই বলা হইল নিষেধমুখেই তুরীয়ের প্রতিপাদন, বিধিমুখে নহে। এইজন্য বলা হইতেছে শব্দের দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

মুমুক্ষু। এমন আত্মাকে জানিয়া লাভ কি? কোন কিছু দিয়াই ত ইহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না।

শ্রুতি। প্রয়োজন আছে। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পভ্রম দূর হয়, সেইরূপ এই তুরীয় আত্মার জ্ঞান হইলে তবে এই অজ্ঞানকৃত সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ ভ্রম দূর হয়। ভ্রম ভাঙ্গিবার আর অন্য পথ নাই। আত্মাকে না জানা পর্য্যন্ত অনাত্মবিষয়ক তৃষ্ণা কিছুতেই যাইবে না।

মুমুক্ষু। তুরীয়কে আত্মারূপে জানার কি কোন প্রতিবন্ধক আছে?

শ্রুতি। কোন প্রতিবন্ধক নাই। এই আত্মাকে জানিবার জন্যই শ্রুতি বহু উপদেশ করিতেছেন। **তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তৎ সত্যম্, স আত্মা, যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম, স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, আত্মৈবেদং সর্ব্বম্** ইত্যাদি। সেই তুমি, এই আত্মাই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, সেই আত্মা যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম, বাহিরে ভিতরে যিনি জন্ম রহিত, আত্মাই এই সমস্ত। এই সমস্ত দিয়া শ্রুতি ইঁহারই কথা বলিতেছেন।

মুমুক্ষু। তুরীয় যিনি তিনিই আত্মা। তুরীয়কে জানাই তবে আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান কিরূপে হইবে? শ্রুতি বলিতেছেন এই যে জগৎটা দেখা যাইতেছে ইহা রজ্জুকে যেমন ভ্রমজ্ঞানে সর্পমত দেখা হইয়া যায় সেই ভাবেই ব্রহ্মকেই এই জগৎরূপে দেখা হইতেছে। এই জগৎটা আবার সব সময়ে একরূপে দেখা হয় না। জাগ্রৎকালে ইহাকে স্থূল জগৎরূপে দর্শন করা যায় স্বপ্নে ইহাকে সূক্ষ্ম বাসনারূপে স্মরণ করা যায় আবার সুষুপ্তিতে দর্শন ও স্মরণ শূন্য একভাবে অর্থাৎ জগৎ নাই আমিই আছি এইরূপ অনুভব হয়।

আবার বলি তুরীয় যিনি তিনিই আত্মা। এই আত্মাকে জানাই জ্ঞান। তুরীয় আত্মা কিন্তু জাগ্রৎ কালের বিশ্ব পুরুষ নহেন, স্বপ্নের তৈজস পুরুষ নহেন, এই দুয়ের সন্ধিরূপও নহেন, ইনি সুপ্ত পুরুষও নহেন; ইনি সর্ব্বজ্ঞও নহেন ইনি অচেতনও নহেন; যদি এইরূপই হইল তবে আত্মজ্ঞান হইবে কিরূপে? ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম দূর হইবে কিরূপে? রজ্জুকে আর সর্পজ্ঞান করা যাইবে না কিরূপে? এ কথা আবার বলিতে হইবে।

শ্রুতি। রজ্জুকে রজ্জুভাবে জানাই রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান। কিন্তু রজ্জুকে সর্প কল্পনা করা হইয়া গিয়াছে। এই সর্প কল্পনার নিষেধ দ্বারাই রজ্জুর স্বরূপ জানা যাইবে। আত্মাকে যে বিশ্বপুরুষ, তৈজস পুরুষ ও সুপ্ত পুরুষরূপে দেখা হইয়াছে তাহা কল্পনা মাত্র। কল্পনাতে যাঁহাকে ঐ অবস্থাত্রয় বিশিষ্টরূপে দেখা হইতেছিল—ঐ অবস্থাত্রয়ের নিষেধ দ্বারাই তাঁহাকে তুরীয় ভাবে দেখা যায়। কল্পনা নিষেধে তুরীয় ভাব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

কিন্তু তুরীয় যিনি তিনি যদি ঐ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্মা হইতে পৃথক্ কিছু হইতেন তাহা হইলে আত্মজ্ঞান হইতেই পারিত না। স্বরূপটি হইতেছে চৈতন্য। সেই চৈতন্য অংশে সকল অবস্থা বিশিষ্ট আত্মা একই।

রজ্জু যেমন সর্পাদিরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যই অন্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্পিত। যে সময়ে এই কল্পিত অবস্থাত্রয়ের নিষেধ হয় সেই সময়েই আত্মাতে আরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত কোন পৃথক্ প্রমাণের আবশ্যক হয় না। যেমন সর্পভ্রান্তি নিবারণ জন্য রজ্জুর জ্ঞান ও সর্পের জ্ঞান আবশ্যক অর্থাৎ সর্পজ্ঞানটা কল্পনা বলিয়া মিথ্যা আর রজ্জুজ্ঞানটিই সত্য সমকালে এই দুইই চাই সেইরূপ জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য সমকালে এই দুয়ের অভ্যাসেই কল্পনাক্ষয় হয়।

আত্মজ্ঞান কিরূপে হইবে ইহার উত্তর তবে এই হইল যে আত্মাতে

অন্তঃপ্রজ্ঞ বহিঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদি যে অজ্ঞানের আরোপ হয় সেই অজ্ঞান সরাইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান হইবে। আমি বাহিরের জগৎ জানি আমি ভিতরের বাসনাময় সূক্ষ্ম জগৎ জানি এই সমস্ত অজ্ঞানের বিনাশ হওয়া ভিন্ন আত্মজ্ঞান বা আত্মভাবে স্থিতি হইবে না। শুধু অজ্ঞান নাশ হইলেই আত্মজ্ঞান হয়। আর অজ্ঞানের রাজ্য কতদূর তাহাত দেখিতেছ? জাগ্রৎ স্থান স্বপ্নস্থান সুযুপ্তি স্থান, সর্ব্বজ্ঞ এই সমস্তই অজ্ঞানের রাজ্য। আত্ম-স্বরূপটি যাহা তাহাই জ্ঞান রাজ্য। সেখানে আর কিছুই নাই। শুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান। মায়ার কোন স্পন্দন পর্য্যন্ত সেখানে নাই। এই অজ্ঞান নাশই সাধনা।

মুমুক্ষু। অজ্ঞানের নাশ হইলেই কি জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানের সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ কি আবশ্যক করে না?

শ্রুতি। না, অন্য কোন প্রমাণের আর আবশ্যক হয় না। অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি ঘট রহিয়াছে। অন্ধকারের নাশ হইলেই ঘটের জ্ঞান হয়।

মুমুক্ষু। কিরূপে তাহা হইবে? ঘটকে অন্য কোন বস্তু—অর্থাৎ কমণ্ডলুও ত বোধ হইতে পারে?

শ্রুতি। ঘটকে কমণ্ডলু বোধ হয় না। তুমি নাম দিতে ভুল করিতে পার কিন্তু গোলাপকে গোলাপ বল বা অন্য নাম দিয়া ডাক কথা কিন্তু একই। অন্ধকারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে অন্ধকার নাশ ভিন্ন অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

মনে কর অন্ধকার নাশকে ছেদন ক্রিয়া বলা হইতেছে। ছেদন ব্যাপারটা হইতেছে ছেদ্য বস্তুর অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংস করা। জ্ঞানটি সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। ইহার অবয়ব স্বরূপে উঠিয়াছে এই অজ্ঞান এবং অজ্ঞান প্রসূত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংস করাটিই যেমন ছেদন ব্যাপার সেইরূপ অজ্ঞানটি ধ্বংস করাই আত্মভাবে, জ্ঞান ভাবে পূর্ণভাবে স্থিতির ব্যাপার। জ্ঞানে স্থিতির জন্য অজ্ঞান নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারের আবশ্যকতা নাই।

এই জন্য বলা যাইতেছে আত্মাতে আরোপিত অন্তঃপ্রজ্ঞাদি অন্ধকার দূর করাই তুরীয় স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে মুহূর্ত্তে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয় সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধিরূপ অন্ধকার দূর হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে স্থিতি লাভ হয়।

মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদি বিশেষণগুলি ত সমস্তই প্রতিষেধ বাচক। নান্তঃপ্রজ্ঞ হইতেছে তৈজসের প্রতিষেধ। ন বহিপ্রজ্ঞঃ ইহা বিশ্বের প্রতিষেধ। নোভয়তঃ প্রজ্ঞ ইহা জাগ্রৎ স্বপ্ন এই দুয়ের সন্ধির প্রতিষেধ। ন প্রজ্ঞানঘন ইহা সুষুপ্তাবস্থার প্রতিষেধ। কারণ উহার স্বরূপটি বীজভাবাপন্ন অবিবেকাত্মক। ন প্রজ্ঞ ইহা সর্ব্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ। ন অপ্রজ্ঞ ইহা চৈতন্যের প্রতিষেধ।

কিন্তু অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ভাব সকল আত্মাতে ত প্রত্যক্ষ হইতেছে। রজ্জুতে যে সর্পবোধ এই সর্পবোধটা মিথ্যা। শুধু প্রতিষেধ দ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় যে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ইহা মিথ্যা হইবে কিরূপে?

শ্রুতি। পরিপূর্ণ চৈতন্য যিনি তিনি সকল অবস্থাতেই পূর্ণ। চৈতন্যের অংশ কিছুতেই হয় না। আকাশকেই যখন কেহ খণ্ড করিতে পারে না তখন চৈতন্যকে খণ্ড করিবে কে? স্বরূপগত চৈতন্যাংশে বিশ্ব তৈজসাদির কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু একটির অবস্থিতি কালে যে অন্যটি থাকে না তাহার কারণ একটি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান।

রজ্জুতে কল্পিত সর্প ও জলধারাদি যেমন মিথ্যা সেইরূপে জ্ঞানে অজ্ঞানটি কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। আরও এক কথা যে আত্মার দৃষ্টা ভাবটির কোথাও ব্যভিচার হয় না। ঐ দ্রষ্টা ভাবটি সর্ব্বত্র সত্য।

যদি বল সুষুপ্তিকালে আত্মার দ্রষ্টাভাব বা জ্ঞাতৃভাব ত থাকে না। না তাহা বলিতে পার না। সুষুপ্তিতেও আত্মার জ্ঞাতৃভাব অনুভব গোচর হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন **"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরি-লোপো বিদ্যতে"** অর্থাৎ বিজ্ঞাতা আত্মার জ্ঞান কখনই লুপ্ত হয় না।

এক্ষণে গৌড়পাদের কারিকার কথা শ্রবণ কর। অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥১০
কার্য্যকারণ বদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিদ্ধতঃ ॥১১
নাত্মানং ন পরঞ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতং।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুর্য্যং তৎ সর্ব্বদৃক্ সদা ॥১২
দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে ॥১৩
স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥১৪
অন্যথা গৃহ্নতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে ॥১৫
অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥১৬
প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥১৭
বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥১৮

সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি করিতে যিনি সমর্থ তিনিই প্রভু, তিনিই ঈশান অর্থাৎ তুরীয় আত্মা, তিনি অব্যয় অর্থাৎ কখন আপনার স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না—এই তুরীয় কখন আপন স্বরূপ ত্যাগ করেন না। ইঁহার স্বরূপের ব্যভিচার কখন হয় না। এই তুরীয় সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করিতে কিরূপে সমর্থ? না এই তুরীয়ের জ্ঞান হইলেই প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্বাদি রূপ সমস্ত অজ্ঞানের নাশ হয়। অজ্ঞানের ধ্বংসই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি।

আর সমস্ত ভাব মিথ্যা বলিয়া আত্মা অদ্বৈত। জাগ্রদাদি অবস্থারূপ তিন স্থান এবং ঐ তিনের বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ এই তিন অভিমানী এই সমস্ত রজ্জুতে সর্পবৎ অসৎ। ঐ সমস্তের আশ্রয়-অধিষ্ঠানরূপ তুরীয় আত্মাই অদ্বৈত। অপর সর্ব্বভাব মিথ্যা এই জন্য ব্যয় বা ব্যভিচারের হেতু যে দ্বৈত বস্তু, তাহার অভাব এই তুরীয়—সেই জন্য ইনি অব্যয়। আবার তুরীয় আত্মাই সমস্ত দ্বৈতের প্রকাশক বলিয়া ইনি দেব অর্থাৎ জাগ্রদাদি স্থান সহিত বিশ্ব তৈজসাদিকে,—রজ্জুতে সর্পবৎ অধ্যস্তরূপ ভাবকে আর স্বরূপ হইতে ঐ সমস্তের অভাবকে উহাদের অধিষ্ঠান সাক্ষী হইয়া প্রকাশ করেন, সেই জন্য আত্মা সর্ব্ব-প্রকাশের প্রকাশক দেব। আবার বিশ্বাদি অপেক্ষা চতুর্থ বলিয়া তুরীয় আর সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক বলিয়া বিভু এইরূপ তাঁহাকে বলা হয় ॥১০

এক্ষণে তুরীয়ের যথার্থ আত্মপনা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন "কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যতে বিশ্বতৈজসৌ" পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস কার্য্য কারণ দ্বারা বদ্ধ ইহা জ্ঞানিগণ অঙ্গীকার করেন। ইষ্যেতে স্বাকৃতৌ জ্ঞানিভিঃ। "প্রাজ্ঞঃ কারণ বদ্ধস্তু" প্রাজ্ঞ কিন্তু শুধু কারণ ভাবেই বদ্ধ। "দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিদ্ধতঃ" তুরীয় আত্মায় এই দুইই সিদ্ধ হয় না।

ফল যেটি সেইটি হইতেছে কার্য্য। আর ফল যাহা হইতে জন্মিতেছে সেই বীজ হইতেছে কারণ। স্বরূপটি গ্রহণ না করা অর্থাৎ স্বরূপের অগ্রহণ (অজ্ঞান) এইটি বীজ। স্বরূপকে কর্ত্তা ভোক্তারূপে অন্যথা গ্রহণ এইটি হইতেছে এই অজ্ঞান বীজের ফল। বিশ্ব ও তৈজস এই উভয়েই স্বরূপের অগ্রহণ এবং তজ্জন্য স্বরূপকে অন্যথা গ্রহণ এই দুই দোষ আছে। এজন্য বলা হইতেছে বিশ্ব ও তৈজস কার্য্য ও কারণ এই দুইটিতেই বদ্ধ। প্রাজ্ঞ কিন্তু শুদ্ধ কারণে বদ্ধ। কারণ প্রাজ্ঞ যিনি তাঁহাতে কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপ অন্যথাগ্রহণ নাই কিন্তু কেবল স্বরূপের অন্যথাগ্রহণ এখানে আছে। সুপ্ত পুরুষ কোন কামনাও করেন না,

কোন স্বপ্নও দেখেন না। এজন্য তিনি কার্য্যদ্বারা বদ্ধ নহেন। স্বরূপের অন্যথাগ্রহণটাই এখানে কার্য্য। কর্ত্তা ও ভোক্তা পনা প্রাজ্ঞে নাই বলিয়া ইনি কার্য্যে বদ্ধ নহেন। কিন্তু স্বরূপের বোধশূন্যতা রূপ বীজ ভাবটি মাত্রই প্রাজ্ঞে আছে। তাই বলা হইতেছে ইনি কারণভাবে বদ্ধ। তুরীয়ে কিন্তু স্বরূপের অগ্রহণ বা অন্যথা গ্রহণরূপ বীজ ও ফল ভাব কিছুই নাই। তুরীয় সর্ব্বদা স্বরূপ বিশ্রান্তিতেই আছেন। স্বরূপের ব্যভিচার তাঁহাতে কখন নাই। স্বরূপ বিচ্যুতি তাঁহাতে কখনও নাই ॥১১

প্রাজ্ঞ আত্মা আপনাকে জানেন না, পরকেও জানেন না। সত্যও জানেন না অসত্যও জানেন না। তুর্য্য কিন্তু সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত সমস্তই দর্শন করেন। ইনি অলুপ্ত চৈতন্য স্বভাব। প্রাজ্ঞ আত্মা আপনার স্বরূপ যে তুরীয় সেই স্বরূপটিকে জানেন না আর বিশ্ব ও তৈজস যেমন বহিঃস্থিত স্থূল বিষয় এবং অন্তস্থিত সূক্ষ্ম বিষয় জানেন সেইরূপ ভিতরে ও বাহিরে কিছুই অনুভব করেন না। আর যিনি প্রাজ্ঞ তিনিও ত আত্মা। **"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"** দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হয় না বলিয়া—আমিই আছি এই বোধ তাঁহার থাকে অথচ আমিই সেই তুরীয় এবং দৃশ্য যে অসত্য এই জ্ঞান তাঁহার থাকে না। এই কারণেই প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বরূপের অভাব এবং অবিদ্যা জনিত দৃশ্যপ্রপঞ্চের সম্যক্ উপলব্ধি এই দুই বন্ধনে বদ্ধ।

তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বদৃক্। অন্য কিছুই ত সেখানে নাই, তিনি আপনিই সর্ব্ব। অদ্বৈত বলিয়া তিনিই সর্ব্বাত্মক এবং দ্রষ্টা বলিয়া আত্মদৃক। আপনিই সর্ব্ব বলিয়া সর্ব্বদৃক্। তাঁহাতে স্বরূপের অভাবাত্মক অবিদ্যাবীজও নাই আর অবিদ্যাসম্ভূত বিপরীত বোধও নাই। স্বপ্রকাশ সূর্য্যে কখন অপ্রকাশ অন্ধকারও থাকে না অথবা অন্যরূপে প্রকাশও থাকিতে পারে না। শ্রুতি যে বলেন **"নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ"** ইহা ভিন্ন অপর দ্রষ্টা নাই—ইহাতে এই তুরীয়ই জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়েও সর্ব্বদ্রষ্টার ন্যায় থাকেন বলিয়া ইঁহাকে সর্ব্বদৃক্ বলা হইল।

মুমুক্ষু। সর্ব্বদৃক্ ইহা দুই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন ?

শ্রুতি। হাঁ। (১) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তত্তৎ অভিমানী আত্মা যেভাবেই থাকুন না কেন ইঁহাদের মূলে কিন্তু তুরীয় প্রভু আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই থাকেন; তাঁহার উপরেই সমস্ত খেলা হয় বলিয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্ব্ববস্তু দ্রষ্টার ন্যায় প্রতিভাসমান হয়েন তাই তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শী।

(২) তুরীয়টি আপনি আপনি। সেখানে দ্বৈত নাই। অন্য কোন কিছুই নাই। তিনি আপনিই সর্ব্ব বলিয়া তিনি সর্ব্বদৃক্ ॥১২

দ্বৈতের অগ্রহণ এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ পুরুষ ও তুরীয় আত্মা উভয়েই তুল্য। প্রাজ্ঞ আত্মা স্বরূপাবোধরূপ বীজ নিদ্রাযুক্ত কিন্তু তুরীয়ে স্বরূপের অবোধ নাই এই প্রভেদ।

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞও দ্বৈত জগৎকে উপলব্ধি করেন না আর তুরীয়ও করেন না। তবে প্রাজ্ঞের কারণ-বন্ধন হয়, তুরীয়ের হয় না কেন ?

শ্রুতি। প্রাজ্ঞ নিদ্রিত মত কিন্তু তুরীয়ের নিদ্রা নাই। তত্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা। তত্ত্ব বা স্বরূপের অপ্রতিবোধই নিদ্রা। বিশ্ব তৈজসাদি দ্বৈত বোধের উৎপত্তির কারণ হইতেছে স্বরূপের অবোধ। তুরীয় সর্ব্বদা স্বরূপকে জানেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ স্বস্বরূপকে জানেন না। প্রাজ্ঞ যিনি তিনি বীজনিদ্রাযুক্ত, বীজনিদ্রাই মূলাবিদ্যা। ইহাই আবার জগৎ-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ। তুরীয় কিন্তু সর্ব্বদাই দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করেন, এজন্য তাঁহাতে অভাবাত্মক বীজনিদ্রা নাই। এইজন্য তুরীয়ে কারণ-বন্ধন নাই ॥১৩

আদ্য দুই পুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজস স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত। (স্বপ্ন-নিদ্রাযুতাবাদ্যৌ। রজ্জুকে সর্পরূপে যে গ্রহণ সেই অন্যথাগ্রহণকে বলে স্বপ্ন। আর স্বরূপের অবোধ-প্রচুর যে অজ্ঞান তাহাই হইল নিদ্রা। বিশ্বপুরুষ ও তৈজসপুরুষ এই দুই দোষযুক্ত বলিয়া স্বপ্ন ও নিদ্রা যুক্ত। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইঁহারা কার্য্য ও কারণে বদ্ধ। কিন্তু প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া অর্থাৎ প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বপ্নরহিত যে নিদ্রা (অজ্ঞান)

কেবল তাহারই সহিত যুক্ত। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রাজ্ঞ কেবল কারণে বদ্ধ। আর ন নিদ্রা নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ॥ নিশ্চয়কে পাইয়াছেন যে স্থিরবুদ্ধি-ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহারা তুরীয়ে স্বপ্নকেও দেখেন না আর নিদ্রাকেও দেখেন না অর্থাৎ মহাবাক্যকে সম্যক্‌রূপে জানিয়া যাঁহারা তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন সেই ব্রহ্মবিদ্গণ তুর্য্যে স্বরূপকে অন্যথা দর্শনও করেন না আর স্বরূপের অদর্শনও তাঁহাদের নাই॥ ১৪

স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করাই স্বপ্ন আর স্বরূপের জ্ঞান আদৌ না থাকাই নিদ্রা। স্বরূপকে বিপরীতরূপে গ্রহণ ও স্বরূপের অগ্রহণ এই দুই বিপর্য্যয় জ্ঞান ক্ষয় হইলেই জীব তুরীয়ে স্থিতিলাভ করে।

মুমুক্ষু। আচ্ছা পুরুষ স্বপ্ন বিষয়ে স্থিত কখন হয় আর কখনই বা নিদ্রাবিষয়ে স্থিত হয় আর কবেই বা তুরীয়ে নিশ্চয়প্রাপ্ত হয়?

শ্রুতি। "অন্যথা গৃহ্ণতঃ স্বপ্নঃ" পুরুষ স্বপ্নবিষয়ে স্থিত তখন যখন তত্ত্বকে বা স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করে। পুরুষ যখন ব্রহ্মকে এই জগৎরূপে দর্শন করে অথবা তুর্য্যস্বরূপকে বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞরূপে দর্শন করে তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা। ইহাই তত্ত্বের অন্যথা গ্রহণ। আবার তত্ত্বকে বা স্বরূপকে আদৌ না জানা হইতেছে নিদ্রা। "নিদ্রা-তত্ত্বমজানতঃ"। স্বপ্ন ও জাগ্রতে লোকে যখন তত্ত্বের বা স্বরূপের অন্যথা গ্রহণ করে, তখন ঐ পুরুষের স্বপ্ন দেখা হয়। আবার তত্ত্বকে যাহারা জানে না সেইরূপ পুরুষের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা-তেই স্বরূপ অগ্রহণরূপ নিদ্রা থাকে। আর অন্যথা গ্রহণ এবং অগ্রহণ লক্ষণময় বিপর্য্যয় জ্ঞান ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে তুরীয় পদ প্রাপ্তি হয়॥১৫

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুদ্ধতে। জীব যখন অনাদি মায়া-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হয় অর্থাৎ অন্যথা গ্রহণ ও অগ্রহণ এই দুই ত্যাগ করে অর্থাৎ যখন স্বস্বরূপের জ্ঞানলাভ করে সে তখন "অজমনিদ্রম-

স্বপ্নমদ্বৈতং বুদ্ধ্যতে তদা ” জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থাবর্জ্জিত অদ্বয় জ্ঞানে স্থিতিলাভ করে।

ভাল করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই জীব অনাদি মায়াতে সুপ্ত। সংসারী জীব স্বরূপতঃ জানেই না অপিচ স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করিয়া ইনি আমার পিতা, ইনি মাতা, ইনি পুত্র, ইনি পৌত্র, এই ক্ষেত্র, এই পশু, আমি ইহাদের পোষক স্বামী, আমি দুঃখী, ইহা দ্বারা আমি উপদ্রুত, ইহা দ্বারা আমি বড় ভাল থাকি—এইরূপ স্বপ্ন দেখে। এই জীব যখন মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, যখন বোধপ্রাপ্ত হয় তখন বুঝিতে পারে চৈতন্য যিনি তিনি অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈত।

মুমুক্ষু। আহা! মায়ানিদ্রায় মোহিত বলিয়াই ত জীবের এই দুঃখ। সেই জন্যই ত তাহার নানা সম্বন্ধ। কিন্তু চেতন যিনি তিনি অসঙ্গ। কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয় না। তিনি সদা পূর্ণ, সদা আপ্তকাম। কিরূপে জীবের স্বরূপ জ্ঞান হইবে?

শ্রুতি। অনাদি মায়াসুপ্ত জীব যখন পরম দয়ালু বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিবেন যে, হে শিষ্য তুমিই সেই নিঃসঙ্গ আত্মা, তোমার পিতা, পুত্র, স্ত্রী, মাতা,তোমার দেহ, মন, তোমার আমি, আমার এ সমস্ত কিছুই নাই—তুমি আপনি আপনি, যাহা কিছু সঙ্গ, যাহা কিছু সম্বন্ধ, তাহা মায়িক—এই সমস্ত শুনিয়া শিষ্য প্রবুদ্ধ হইবে। যেমন নানা জাতীয় বৃক্ষের রস মক্ষিকার উদরে মধুভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত চিদাভাস জীব সুষুপ্তি অবস্থাতে সমান এক বিম্বরূপ চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হয়। আর এখানে পুত্র পিতাদি বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বা মনুষ্য পশ্বাদি বা জড় চৈতন্যাদি কোন প্রকার ভেদ ভাব আর থাকে না; বিশেষতঃ এই অবস্থাপ্রাপ্ত বিদ্বান্ যখন জীবভাবে আসিবে না, সেই সময়ে তিনি বুঝিবেন যে তিনিই সর্ব্ব জীবের আত্মা; শ্রুতি তখন তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা জীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ করিবেন তখনই স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিবেন।

মুমুক্ষু। জীব আপনস্বরূপ আত্মাকে কিরূপ জানিবেন ?

শ্রুতি। জীব জানিবেন যে আত্মার বাহ্য অন্তর বা কার্য্য কারণ কিছুই নাই, জন্মাদি ষড়্‌ভাব বিকারও নাই এজন্য ইনি অজন্মা অর্থাৎ আত্মার বাহ্য অন্তর এবং ভিতর বাহিরেব ধর্ম্মাদি কিছুই নাই। আরও বোধ হইবে যে, আত্মা সম্বন্ধে জন্মাদির কারণরূপা অবিদ্যা বা অজ্ঞান স্বরূপ বীজময় নিদ্রা বলিয়া কিছুই নাই; এজন্য ইনি অনিদ্র অর্থাৎ ইনি সর্ব্বদা বোধস্বরূপ। আবার যে নিমিত্ত আত্মা তুরীয় অনিদ্র এবং স্বরূপের অবোধরহিত, সেই নিমিত্তই তিনি অস্বপ্ন কারণ অন্যথাগ্রহণরূপ যে স্বপ্ন, সেটার উৎপত্তির কারণ হইতেছে স্বরূপের অবোধরূপ নিদ্রা। এই নিদ্রা তুরীয় আত্মাতে কখনই নাই, এজন্য তন্নিমিত্তক ঐ স্বপ্নও তাঁহাতে নাই। এই আত্মা অনিদ্র বলিয়া যেমন অস্বপ্ন, সেইরূপ অজন্মা ও অদ্বৈত। স্বরূপে জাগ্রত হইলে তুরীয় আত্মাকে এইভাবে জানা হয়।

প্রপঞ্চের নিবৃত্তি কিরূপে হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি—যদি পরমার্থ বিষয়ে সত্য সত্যই প্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি এবং অদ্বৈতের সিদ্ধি হইতেই পারে না। কিন্তু রজ্জুতে সর্প যেমন কল্পিত সেই ভাবে পরম-আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্পিত মাত্র; এজন্য সেখানে প্রপঞ্চ নাই, এই জন্য অদ্বৈতই সিদ্ধ।

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।

প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকে তবে নিবৃত্তও হইবে এ বিষয়ে সংশয় নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চ যদি স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইয়াও বিদ্যমান থাকে তবে তাহার নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হইবে। রজ্জুতে ভ্রান্তিবুদ্ধি দ্বারা কল্পিত যে সর্প তাহা বিদ্যমান দেখা গেলেও, বিচার বা সম্যক্ দর্শন দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় ইহাতে জানা গেল যে সর্পটা বাস্তবিক নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প কল্পিত, সেইরূপ আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্পিত। রজ্জুতে আশ্রিত যে অবিদ্যা তাহা দ্বারাই ভ্রম সর্প কল্পনা। সেইরূপ আত্মাতে জড়িত যে অজ্ঞান [অস্তির সহিত যে নাস্তিভাব জড়িত] সেই অজ্ঞানেই প্রপঞ্চকে সত্যবোধ করায়। ফলে যেখানে জ্ঞান সেখানে

প্রপঞ্চ নাই। আবার যেমন মায়াবী পুরুষ কর্তৃক প্রদর্শিত যে মায়া তাহা বিদ্যমান থাকিলেও তাহার দ্রষ্টা পুরুষের নেত্রবন্ধন যদি খুলিয়া দেওয়া যায় তবে সেই মায়ার নিবৃত্তি হয়—কারণ মায়াটা বাস্তবিক নাই সেইরূপ মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ এই দ্বৈত মায়া মাত্র পরমার্থে সবই অদ্বৈত অর্থাৎ রজ্জুতে যেমন সর্প আর মায়াবীতে যেমন মায়া সেইরূপ এই প্রপঞ্চ নাম বিশিষ্ট দ্বৈত মাত্র, ইহা ভ্রান্তি দ্বারাই কল্পিত। কিন্তু রজ্জু ও মায়াবী মত পরমার্থতঃ অদ্বৈতই আছেন। এই জন্য বলা হইতেছে অবিবেকীর প্রবৃত্ত বা বিবেকীর নিবৃত্ত এই উভয় প্রকার প্রপঞ্চ আদৌ নাই ॥১৭

"বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেন চিৎ" শাস্তা (উপদেষ্টা) শাস্ত্র ও শিষ্য এই প্রকার যে বিকল্প অদ্বৈত জ্ঞানে এ সমস্ত থাকে কিরূপে? যদি বিকল্প কোন কারণে কল্পিত হয় তবে তাহা নিবৃত্ত হইবেই। যেমন এই প্রপঞ্চ মায়াবীর মায়া আর রজ্জুতে সর্পবোধ এই সমস্ত যথার্থ জ্ঞানের পূর্ব্বে কল্পনা করা হয় সেইরূপ এই শিষ্যাদি ভেদরূপ বিকল্প তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই কেবল উপদেশের জন্য ব্যবস্থিত। কারণ উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে। এই শিষ্য শাস্তা আর শাস্ত্ররূপ যে ব্যবহারিক কথন তাহা তত্ত্বোপদেশের পূর্ব্বেরই ব্যবস্থা কিন্তু উপদেশের ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে উপদেষ্টাদিরূপ দ্বৈত থাকে না ॥১৮

পুনঃ শ্রুতিরারভ্যতে।

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্ পাদা মাত্রাঃ। মাত্রাশ্চ পাদা—অকার উকারো মকার ইতি ॥৮

স উক্তবিধঃ অয়ং আত্মা অধ্যক্ষরং অক্ষরং বর্ণমধিকৃত্য বর্ণ্যমান ওঙ্কারঃ। সোঽয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভজ্যমানঃ অধিমাত্রং মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিমাত্রম্ পাদরূপ ইতি। যতঃ আত্মনো যে পাদাঃ তে ওঙ্কারস্য মাত্রাঃ। মাত্রাত্মকাস্তুপাদাঃ। কাস্তাঃ? অকার উকারো মকার ইতি।

সেই এই আত্মা অধ্যক্ষর, ওঙ্কার, অধিমাত্র। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ওঁকারকে চতুষ্পাদ আত্মা বলা হইয়াছে সেই এই আত্মা অধ্যক্ষর—অর্থাৎ অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া বর্ণিত। কি সেই অক্ষর? না সেই অক্ষরই ওঁকার। আর সেই এই ওঙ্কার পাদ বা অংশ ক্রমে বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া অধিমাত্রা। অর্থাৎ মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে তাহাই অধিমাত্রা।

আত্মা যিনি তিনি পাদরূপে বিভাগ প্রাপ্ত হন, কিন্তু ওঙ্কার যিনি তিনি মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া স্থিত। তবে পাদবিভাগপ্রাপ্ত ওঙ্কারের অধিমাত্রত্ব কিরূপে হইবে? সেইজন্য বলিতেছেন "পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি। অর্থাৎ পাদ যাহা, তাহাই মাত্রা, মাত্রা যাহা তাহাই পাদ। আত্মার ত্রিপাদ যাহা, তাহাই ওঙ্কারের তিন মাত্রা অকার উকার এবং মকার।

এই মন্ত্র এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রে শ্রুতি কনিষ্ঠ অধিকারী কিরূপে আত্মার ধ্যান করিতে সমর্থ হইতে পারেন, তাহাই বলিতেছেন। উত্তম ও মধ্যম অধিকারী যাঁহারা তাঁহারা স্বরূপটিই গ্রহণে সমর্থ। অথাৎ ইঁহারা স্বরূপকে অন্যথা গ্রহণ করেন না। ইঁহারা অধ্যারোপ ও অপবাদ হইতে ভিন্ন যে পারমার্থিক তত্ত্ব তাহারই উপলব্ধি করেন। কনিষ্ঠ অধিকারীকে কিন্তু আরোপ দৃষ্টি অধিকার করিয়া আত্মধ্যান করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন এরূপ অধিকারীর অন্য উপায় নাই। শ্রুতি এক্ষণে তাহাই দেখাইবার জন্য এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিলেন।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাঽঽপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামনাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥৯

জাগরিত স্থানো বৈশ্বানরো যঃ স ওঙ্কারস্য প্রথমা মাত্রা আদ্যঃ অংশঃ অকারঃ। কেন হেতুনা? ইত্যাহ আপ্তেঃ। আপ্তির্ব্ব্যাপ্তিঃ। অকারেণ সর্ব্বা বাগ্ ব্যাপ্তা। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতেঃ। আপ্তেঃ ব্যাপ্তত্বাদ্ আদিমত্ত্বাৎ প্রাথমিকত্বাৎ বা। আদিরস্য বিদ্যত ইত্যাদিমৎ। যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং—যথা অকারঃ অক্ষরেষু আদিমান্ ব্যাপকশ্চ

তথা বৈশ্বানরঃ আদিমান্ সর্ব্বজগদ্ব্যাপী চ। তস্মাদ্ বা সামান্যাদ-কারত্বং বৈশ্বানরস্য। তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ। আপ্নোতি প্রাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং য এবং বেদ যথোক্তমেকত্বং বেদেত্যর্থঃ ॥৯

[বৈশ্বানর যিনি তিনিই যে অকার তাহাই দেখাইতেছেন। জাগ্রৎ-স্থান বৈশ্বানর যিনি তিনিই অকাররূপ প্রথমা মাত্রা। পাদ ও মাত্রার তুল্যতা দেখাইবার জন্য ইহাদের এই একতা। ব্যাপ্তি হেতু এবং সকলের আদি বলিয়াও বটে। যেমন অকার দ্বারা সর্ব্ব বাক্য ব্যাপ্ত "অকারো বৈ সর্ব্বা বাগিতিশ্রুতিঃ অকারই সর্ব্ব বাক্য সেইরূপ বৈশ্বানর দ্বারা জাগ্রৎ ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলেন—তস্য হবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ এই বৈশ্বানর রূপ আত্মার মস্তক হইতেছে তেজোমণ্ডিত স্বর্গ—এই শ্রুতি প্রমাণে বাচ্য-নামী এবং বাচক-নাম এই দুয়ের একতার কথা বলা হইতেছে। আদি বলা হইতেছে এইজন্য যে যেমন অকার অক্ষরের আদি সেইরূপ বৈশ্বানরও আর সকলের আদি। এই তুল্যতা হেতু বৈশ্বানরের অকারত্ব বলা হইল। এক্ষণে এই একতা যিনি জানেন তাঁহার কি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন। যিনি বৈশ্বানরই যে অকার ইহা জানেন তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রথম হয়েন। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ইহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ মুখ্য হয়েন।

ভাল করিয়া স্মরণ রাখিও বর্ণের মধ্যে অকার যেমন আদিবর্ণ, সেইরূপ চতুষ্পদ আত্মার মধ্যে বিশ্ব আত্মা আদি। অকারবর্ণরূপত্ব বলার সময়ে আদিত্ব সামান্য অর্থাৎ আদিত্ব সাধর্ম্ম্যই উদ্ভূত হয়। আবার বিশ্ব আত্মা যখন অকাররূপ বলা হয় সে সময় আপ্তি-সামান্য অর্থাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম্মসাম্য উদ্ভূত হয়।

মুমুক্ষু। বৈশ্বানরই যে অকার ইহা যিনি জানেন তিনি সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন বলিতেছেন। এই জানাটাই কিরূপে হয় এবং ভোগ পাওয়াই বা কিরূপ?

শ্রুতি। ওঁকারকে পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম এই দুই বলা হয়। ইনি সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। ইনি চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। চিতের স্বভাব দুই প্রকার। স্পন্দ স্বভাব ও অস্পন্দ স্বভাব। স্বভাব হইতেছে মায়া। মায়াকে আছেও বলা যায়না, নাইও বলা যায়না অথচ ইহা অঘটনঘটনাপটীয়সী। আদি অস্পন্দন হইতেছে আদি প্রাণ বা মহাপ্রাণ। পরব্রহ্ম যিনি তিনি স্পন্দরহিত শুদ্ধ আত্মা। ইনি হইতেছেন অমাত্রিক প্রণব। ইনি তুরীয় আত্মা। আর অপরব্রহ্ম যিনি তিনি স্পন্দসহিত আত্মা। ইনি ত্রিমাত্রিক প্রণব। আত্মার এই ত্রিমাত্রা হইতেছে অকার উকার মকার বা বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ। এই যে স্থূল জগৎ দেখিতেছ ইহা যাঁহার দেহ, ইহা যিনি অনুভব করেন, ইহা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভাসিয়াছে, ইহার যিনি প্রেরয়িতা তিনি বৈশ্বানর। স্থূল যাহা তাহার কারণটি সূক্ষ্মজগৎ। সূক্ষ্মজগৎ যাঁহার দেহ, সূক্ষ্ম জগৎকে যিনি জানেন, যিনি প্রেরণা করেন—তিনি তৈজস আত্মা। স্থূল ও সূক্ষ্ম আবার ইহাদের কারণে লয় হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যেখানে লীন হয়, যেখানে মনঃস্পন্দন বলিয়া কিছু থাকে না, যেখানে কোন ভোগেচ্ছা নাই, কোন স্বপ্নও নাই এই যে পুরুষ তিনি হইতেছেন প্রাজ্ঞ।

প্রশ্নোপনিষদে প্রশ্নকর্ত্তা সত্যকামকে পিপ্পলাদ মুনি বলিতেছেন—**এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনে নৈকতরমন্বেতি।** হে সত্যকাম! সত্য, অক্ষর, পুরুষনামক যে পরব্রহ্ম ইনি। এবং প্রথমোৎপন্ন প্রাণ নামক অপর ব্রহ্ম এই উভয় প্রকার ব্রহ্মইহইতেছেন ওঁকার। ওঁকারের লক্ষ্য সর্ব্বাধিষ্ঠান মাত্রারহিত পরব্রহ্ম। কারণ ইনি তিনমাত্রা হইতে পৃথক্ অথবা মাত্রাযুক্ত সোপাধি ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহারই প্রতীক অর্থাৎ প্রাপক বলিয়া তিনমাত্রা বিশিষ্ট অকার উকার মকার বর্ণাত্মক ওঁকার হইতেছেন অপর ব্রহ্ম।

পরব্রহ্মের উপাসনার ফল হইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর অপর ব্রহ্মের

উপাসনার ফল হইতেছে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হইতেছে সদ্যোমুক্তি। এই উপাসকের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে। এই উপাসকের প্রাণের উপক্রমণ হয় না। ইঁহারা এই খানেই ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন।

যাঁহারা অপর ব্রহ্মের উপাসক তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মকারের উপাসনা করেন অর্থাৎ অকার ও উকারকে মকারে লয় করিয়া উহাতেই স্থিতিলাভ করেন, মকারে চিত্ত সমাহিত করেন তাঁহারাও সদ্যোমুক্তি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইঁহাদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহারা ব্রহ্মার নিকটে মাত্রারহিত পরব্রহ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন। আর যাঁহারা এক এক মাত্রা অর্থাৎ অকার ও উকারকে উপাসনা করেন তঁহাদের গতি সম্বন্ধে মাণ্ডূক্য শ্রুতি এইখানে বলিতেছেন। গতির সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে সাধনার সম্বন্ধে এখানে এই মাত্র বলা যায় যে, মাত্রালয়রূপ ওঁকার উপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু মাত্রাসহিত ওঁকার জপ ও তদর্থ ভাবনায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। যাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী তাঁহারা ত্রিমাত্রিক প্রণবকে বিচার পূর্ব্বক তাহাদের অধিষ্ঠানভূত অমাত্রিক আত্মাকে পরব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ জানিয়া সদা ধ্যান রত। আর যাঁহারা নিম্ন অধিকারী তাঁহারা ত্রিমাত্রিক প্রণবে সমাহিত চিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন পূর্ব্বক প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ভাবনায় সদা রত থাকেন।

এখন শ্রবণ কর গতি বা ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ্ কি বলিতেছেন।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত সৈনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যা-মভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি।

একমাত্রা অবলম্বনে যিনি ওঁকারকে ধ্যান করেন, বিচার করেন— সেই পুরুষ, সেই পুরুষ সেই ওঁকারের এক মাত্রার ধ্যানের প্রভাবে

সেই মাত্রার সাক্ষাৎকারবান্ হয়েন। দেহান্তে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করেন; করিয়া তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য করিতে থাকেন। তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আত্মার মহিমা অনুভব করেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এই মহিমার সম্বন্ধে বলেন **"গো অশ্বমিহমহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যা ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি"** গো, অশ্ব, হস্ত্যাদি পশু, সেবকাদি ভৃত্য আর ভার্য্যা পুত্র পৌত্রাদি কুটুম্ব আর সুবর্ণরজতরত্নাদি ধন আর রোগাদিরহিত দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট সুন্দর শরীর এবং ক্ষেত্র পৃথিবী (রাজ্য) আর সুন্দর নিবাসস্থান— এই সকল হইতেছে মহিমা। ওঁকারের একটিমাত্র মাত্রার উপাসক এই সকল মহিমা প্রাপ্ত হয়েন।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পাদ্যতে সোঽন্তরীক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে। স সোমলোকং স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে। ওঁকারের জপ ও দুই মাত্রার ভাবনারূপ ধ্যান যে উপাসক করেন, তিনি যজুর্বেদময় চন্দ্রমারূপ দেবতাবিশিষ্ট যে মন সেই মনের একাগ্রতা হেতু আত্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। দেহান্তে ওঁকারের দুই মাত্রার প্রভাবে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তিনি সেই লোকের মহিমা বা বিভূতি অনুভব করিয়া ভোগক্ষয়ে আবার মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন। ওঁকারের তিন মাত্রা যিনি জানেন তিনি মরণের পর তেজোময় সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই।

মুমুক্ষু। সাধনার কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে চাই।

শ্রুতি। কি বলিবে বল।

মুমুক্ষু। অকার বা বৈশ্বানর অবলম্বনে ওঁকারের উপাসনা কিরূপে করিতে হইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রুতি। স্থূল বিশ্বের যাহা কিছু ভোগ তাহা যিনি ঊনবিংশতি মুখ দিয়া ভোগ করেন তিনিই না বৈশ্বানর বা অকার? আর ওঁকার যিনি এই বৈশ্বানর তাঁহার এক মাত্রা হইলেও অকার উকার মকারাদি তিন মাত্রা মায়িক মাত্র কিন্তু তিনি স্বরূপে যাহা তাহা ত্রিমাত্রিক নহে অমা-

ত্রিক। এই অমাত্রিক ওঁকারে স্থিতিলাভ করা বা পরম পদে স্থিতি-লাভ করা ইহা সকল সাধনার শেষ ফল। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর অকারের সাহায্যে ওঁকার-উপাসনা কিরূপে করিতে হয় এবং ইহা করিলেই বা কি লাভ লয়?

মুমুক্ষু। লাভের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন এবং তাহা ধারণা করিয়াছি এখন সাধনার কথা বলুন।

শ্রুতি। স্থূলভাবে বলিতে গেলে অকার অবলম্বনে ওঁকারের উপাসনা হইতেছে স্থূল ভোগ দিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা। ভোগ নিজে করিও না; ভোগ যাহা কিছু তাহা তাঁহার পূজার জন্য সংগ্রহ কর। "পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা" ইহাই অভ্যাস কর। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, করিতেছ সেই সকলে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে ভাবনা কর, যাহা দেখি যাহা শুনি যাহা করি তাহা তুমিই করিতেছ। অথবা সর্ব্বাশ্রয় তুমি, সকলের অধিষ্ঠান তুমি, তোমাকে লইয়া তোমার প্রকৃতি তোমার বক্ষে খেলা করিতেছে। যেমন সাগরের বক্ষে তরঙ্গমালা খেলা করে ভাঙ্গে ভাসে সেইরূপে তোমারই বক্ষে তুমিই প্রকৃতি সাজিয়া খেলিতেছ। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—আর এই চঞ্চলতার সাহায্যেই যেমন সাগর তরঙ্গ হইয়া খেলা করে সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তুমি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তুমি এক কিন্তু জগতের যে বহুরূপ, বহুনাম বহুভাব, এটা তুমি তোমার মায়াকে আশ্রয় করিয়াই দেখাইতেছ।

আমি বলিয়া যাহা কিছু তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক ইহার কর্ম্ম হইতেছে সমস্ত ভোগ দিয়া তোমার সেবা। যে ব্যক্তি নিজে কোন কিছু ভোগ করিয়া সুখী হইতে বাসনা করেন না কিন্তু জগতের সকল জীব সকল প্রকার ভোগ পাইয়া যেন সেই ভোগ নিজে ভোগ না করিয়া সেই ভোগ দ্বারা তোমার সেবা করিতে শিক্ষাপায় বা অর্চ্চনা করিতে শিখে জগত্‌কে এই উপদেশ যে ব্যক্তি করেন সেই ব্যক্তি অকারের সাহায্যে ওঁকারের উপাসনা করেন। যদি কোন দরিদ্র সাধক

নিরন্তর ভাবনা করে জগতের দুঃখী লোককে তিনি অন্ন বস্ত্রাদি সর্ব্বদা বিতরণ করিতেছেন—মনে মনেও যদি কেহ দরিদ্রকে নানা বস্তু দান করেন তবে তিনি পর জন্মে ঐ সমস্ত ভোগ দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীব সেবা করিয়া ইহার উপরের সাধন—ভূমি লাভ করিবেন। শ্রীগীতা "সকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব" এই কথা এই উপাসনা করিতেই বলিতেছেন। জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য কার্য্য কর—আজকালসবাই ইহা ধরিয়াছে, কিন্তু যখন সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি ইহা মনে রাখিয়া করিতে পারিবে তখন এইসব লোক ধার্ম্মিক হইবে।

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीयामात्रोत्कर्षादुभयत्वाद् वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति। नास्याब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद ॥१०

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ যঃ স ওঙ্কারস্য উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন ইত্যাহ—উৎকর্ষাৎ। অকারাদুৎকৃষ্ট ইব হি উকারঃ তথা তৈজসো বিশ্বাৎ। উভয়ত্বাদ্‌বা—অকার-মকারয়োর্মধ্যস্থ উকারঃ; তথা বিশ্ব প্রাজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে তৈজসঃ; তদ্বিজ্ঞান ফলমাহ—উৎকর্ষতি হবৈ জ্ঞানসন্ততিং—উৎকর্ষতি বর্দ্ধয়তি জ্ঞান সন্ততিং বিজ্ঞান—সন্ততিং বিজ্ঞানপ্রবাহং। সমানঃ তুল্যশ্চ ভবতি। মিত্রপক্ষস্যেব শত্রুপক্ষাণামপি অপ্রদ্বেষ্যো ভবতি। অব্রহ্মবিচ্চ অস্যকুলে ন ভবতি অস্য বংশ্যাশ্চ ব্রহ্মজ্ঞা ভবন্তি যঃ উপাসকঃ এবং উক্তপ্রকারং একত্বং বেদ বিজানাতি।

স্বপ্নস্থান তৈজস ওঙ্কারের উকাররূপ দ্বিতীয়া মাত্রা। উৎকর্ষ হেতু এবং উভয়ত্ব হেতু। যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার জ্ঞানপ্রবাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষকেও সমানভাবে দেখেন এবং ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মবিদ্ হয় না।

মুমুক্ষু। স্বপ্নস্থান—তৈজস এবং ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার—কোন্ সাদৃশ্যে এই উভয়ের একতা ?

শ্রুতি। যেমন পাঠক্রমে অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিলে অকারটি হ্রস্ব কিন্তু উকার দীর্ঘ বলিয়া অকার অপেক্ষা উকার উৎকৃষ্ট; সেইরূপ স্থূল উপাধিবিশিষ্ট বিশ্বপুরুষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম উপাধি বিশিষ্ট তৈজস উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ।

স্থূল ভূতরূপ উপাধিবিশিষ্ট স্থূল দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতরূপ উপাধিবিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ অবিনাশী। এই জন্য বিশ্ব অপেক্ষা তৈজস শ্রেষ্ঠ। এইরূপ উৎকর্ষতা হেতু উকার ও তৈজসের একতা দৃষ্ট হয়।

মুমুক্ষু। আর কোন্ বিষয়ে একতা ?

শ্রুতি। উভয়ত্ব হেতু। যেমন অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী হইতেছে উকার সেইরূপ বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যে অবস্থিত এই তৈজস। এইভাবে উভয়রূপ তুলত্যা জন্যও একতা।

মুমুক্ষু। এই একতা জানিলে কোন্ ফল লাভ হয় ?

শ্রুতি। যিনি একতা জানেন তিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, শত্রু মিত্র এই উভয় পক্ষকে সমান ভাবে দেখেন এবং ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মবিৎ জন্মে না। উকার ও তৈজসের একতা যিনি জানিতে পারেন সেই বিদ্বানের পুত্র ও শিষ্যবর্গ মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধিলাভ হয়; এজন্য উঁহার পুত্র বা শিষ্য মধ্যে কেহই অব্রহ্মবিৎ থাকেন না। ইনি সমান হন অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষকেও ইনি দ্বেষ করেন না—উভয় পক্ষে সমান ভাব রক্ষা করেন।

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा ; मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति ; य एवं वेद ॥ ११

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো যঃ স ওঙ্কারস্য মকারাখ্য তৃতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন ? ইত্যাহ—সামান্যমিদমত্র—মিতেরপীতের্ব্বা। মিতির্বিক্ষেপ

উৎপত্তিঃ অপীতির্লয়শ্চ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ সুষুপ্তিতো যথা তথা অকারো-কারয়োর্মকারোচ্চারণসময়ে পুনঃ প্রণবোচ্চারণ সময়ে চ লয়োৎপত্তী প্রতীয়েতে ততঃ প্রাজ্ঞঃ প্রণবস্য মকারাখ্য তৃতীয়া মাত্রা। যদ্বা মিতির্মানম্ পরিমাণম্। মীয়েতে ইব হি বিশ্ব তৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশনির্গমাভ্যাং প্রস্থেনেব যবাঃ। তথা ওঙ্কার-সমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্য নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে। অপীতের্ব্বা-অপীতিরপ্যয় একীভাবঃ। ওঁঙ্কারোচ্চারণে হি অন্ত্যেঽক্ষরে একীভূতাবিব অকারোকারৌ। তথা বিশ্ব-তৈজসৌ সুযুপ্তকালে প্রাজ্ঞে। অতো বা সামান্যাদেকত্বং প্রাজ্ঞমকারয়োঃ।

তৃতীয়াঽভেদবিদিদং জগৎ স্বস্মিন্নেব বিক্ষিপতি পুনস্তল্লয়াধিষ্ঠানং চ ভবতি। নেদমুপাসনত্রয়ং কিন্তু প্রণবব্রহ্মধ্যানৈকোপাসন স্তুত্যর্থ-মিদং বিভাগেন ফলকথনমিতি বোধ্যম্।

বিদ্বৎফলমাহ—মিনোতি হ বৈ ইদং সর্ব্বং জগদ্‌যাথাত্ম্যং জানাতী-ত্যর্থঃ। অপীতিশ্চ জগৎকারণাত্মা চ ভবতীত্যর্থঃ। অবান্তর ফল-বচনং প্রধানসাধনস্তুত্যর্থম্॥

[এক্ষণে তৃতীয় পাদ ও তৃতীয় মাত্রার একতা বলিতেছেন] সুষুপ্তিস্থান যে প্রাজ্ঞ পুরুষ তিনি মকাররূপ তৃতীয়া মাত্রা—পরিমাণ এবং একতাই তাহার হেতু। যিনি একতা পূর্ব্বোক্তরূপে জানেন, তিনি সমস্তই জানেন এবং জগতের কারণ হয়েন। অর্থাৎ যিনি উক্ত প্রকার প্রাজ্ঞ ও মকার মাত্রাকে এক করিয়া জানেন, তিনি কারণটি জানেন বলিয়া সমস্তই জানেন। আরও স্পষ্ট কথা এই— প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি এই কার্য্যকারণাত্মক সমস্ত জগৎই জানিয়াছেন আর তিনি নিজে প্রাজ্ঞরূপ মকার মাত্রার জ্ঞাতা বা অভেদোপাসক বলিয়া জগতের কারণভাবকে প্রাপ্ত হয়েন।

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞই যে মকার—কোন্ সাদৃশ্য থাকাতে উভয়কে এক বলা হইতেছে।

শ্রুতি। পরিমাণ হেতু উভয়ে অভিন্ন এবং একতা হেতুও অভিন্ন।

মুমুক্ষু। ভাল করিয়া বলুন।

শ্রুতি। প্রথম হেতুটি গ্রহণ কর। প্রস্থ বলে ধান্য বা যব মাপিবার পাত্র। ঐ পাত্র দ্বারা যেমন যব ধান্যদির মাপ করা যায় সেইরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষই বিশ্ব ও তৈজস পুরুষকে মাপিবার যেন পাত্র। কারণ লয়ের সময় ইঁহারা উঁহাতেই প্রবিষ্ট হয়েন আবার উৎপত্তি সময়ে উঁহা হইতেই ইঁহারা বাহির হন। ইহা যেমন হয় সেইরূপ অকার এবং উকার এই দুই অক্ষর ওঁকারের উচ্চারণের সমাপ্তিকালে এবং পুনরায় উচ্চারণের প্রারব্ধকালে মকারে প্রবেশ করে ও বাহির হয়।

ওঁকারকে উচ্চারণ করিবার সময় প্রথম অকার বাহির হয় বলিয়া উকারের উচ্চারণ হইয়া উকার লয় হওয়া মত হয় আবার অন্তের মকার উচ্চারিত হইলে ঐ উকার মকারে লয় হওয়া মত হয়। এই প্রকারে অকার উকার এই দুই অক্ষর ওঁকারের উচ্চারণ সমাপ্তিকালে মকারে প্রবেশ হওয়া মত হয়। আবার ওঁকার উচ্চারণের প্রারম্ভে অ উ এই দুই অক্ষর মকার হইতে বাহির হওয়ার মত হয় এই জন্য বলা হইতেছে মকারটি অকার ও উকারের যেন মাপ করিবার পাত্র। প্রাজ্ঞ ও মকারের এই তুল্যতা আছে বলিয়া উভয়ই এক ইহা বলা হইল।

অথবা যেমন ওঁকার উচ্চারণ করিলে মকাররূপ অন্তিম অক্ষরে অকার ও উকার এই দুই অক্ষর একরূপত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সুষুপ্তি-কালে বিশ্ব ও তৈজস পুরুষ দ্বয় প্রাজ্ঞ পুরুষে এক হইয়া যান। এই তুল্যতা জন্য প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা বলা হইতেছে।

মুমুক্ষু। এই একতা জানিলে জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় কিরূপে? কিরূপেই বা জগতের কারণ স্বরূপে স্থিতি লাভ করা যায়?

শ্রুতি। জাগ্রৎকে স্বপ্নে এবং স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে লয় করিতে পারিলে কোন ভোগেচ্ছাও থাকে না কোন স্বপ্নও থাকে না। অর্থাৎ

সুষুপ্তিতে জগৎ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না। ইহাই ত জগতের প্রকৃত তত্ত্ব। সুষুপ্তিকালে আর কিছুই নাই আমিই আছি এই অনুভব যখন থাকে তখন জগৎ নাই এবং যে চৈতন্যের উপরে অজ্ঞান—প্রসূত এই জগৎ ভাসিয়াছিল সেই চৈতন্য মাত্রই থাকেন; কাজেই বলা হইতেছে প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা যিনি জানেন তিনি জগৎ দেখা রূপ অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া কারণ স্বরূপ যে চৈতন্য তাঁহাতেই অবস্থান করেন।

গৌড়পাদীয় শ্লোকাঃ ॥

অদ্বৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

বিশ্বস্যাত্ব বিবক্ষায়ামাদি সামান্যমুৎকটম্।
মাত্রা-সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তি সামান্য মেব চ ॥১৯
তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্।
মাত্রা সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥২০
মকার ভাবে প্রাজ্ঞস্য মান-সামান্যমুৎকটম্।
মাত্রা সম্প্রতিপত্তৌ তু লয় সামান্য মেব চ ॥২১
ত্রিষু ধামসু যৎ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
স পূজ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ॥২২
অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্।
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ ॥২৩

বিশ্বও প্রথম, অকারও প্রথম এই প্রাথমিকরূপত্ব সামান্যই বিশ্বকে অকার বলার কারণ। সমস্ত বর্ণই যেমন অকার ব্যাপ্ত সেইরূপ বিশ্বপুরুষও সমস্ত জগৎ ব্যাপী এই ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই বিশ্বকে মাত্রা-রূপে ভাবনা করার প্রধান কারণ। প্রাথমিকত্ব ও ব্যাপকত্ব—এই দুইটি কারণে বিশ্ব পুরুষের ও অকারের একতা। [উৎকটম্=উদ্ভূতং]।

তৈজস যে উকার ইহার কারণ হইতেছে তৈজসের ও উকারের বিশ্ব ও অকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব। আর তৈজসকে মাত্রারূপে ভাবনার কারণ এই দুইই অকার এবং মকার আর বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্ত্তী।

শ্রেষ্ঠত্ব ও মধ্যবর্ত্তিত্ব এই দুই কারণে তৈজসের ও উকারের একতা।

প্রাজ্ঞকে মকার বলার কারণ উভয়েরই পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশ্য আছে। প্রাজ্ঞকে মাত্রারূপে বলার অন্য কারণ হইতেছে উভয়েরই লয়াত্মকত্ব রূপ সাদৃশ্য। প্রাজ্ঞ পুরুষ যেমন বিশ্ব ও তৈজসের পরিমাপক সেইরূপ অকার ও উকারের পরিমাপক হইতেছে মকার। আবার অকার ও উকার যেমন মকারে লয় হয় সেইরূপ বিশ্ব ও তৈজসও প্রাজ্ঞ পুরুষে লয় হয়। এই জন্য পরিমাণ ও লয়ই উভয়ের একত্ব দর্শাইতেছে।

যিনি নিশ্চয় করিতে পারেন যে উক্ত জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই স্থান ত্রয়ের তুল্যভাবে অকারাদি মাত্রার সহিত সাদৃশ্য আছে অথাৎ এই সমস্ত এই প্রকার ইহা নিঃসংশয়ে যিনি জানেন সেই সমদর্শী পুরুষ জগতের সর্ব্বভূতের পূজনীয় এবং বন্দনীয় মহামুনি।

অকারের উপাসক অর্থাৎ অকার অবলম্বন করিয়া যিনি ওঁকারের উপাসনা করেন তিনি বিশ্বত্ব---বৈশ্বানরের ভাব প্রাপ্ত হন; উকারের উপাসনা করিলে তৈজসের ভাবে---হিরণ্যগর্ভত্বে নীত হওয়া যায় এবং মকার, প্রাজ্ঞ পুরুষে (অর্থাৎ অব্যাকৃত ভাবে) পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু অমাত্র অর্থাৎ মাত্রা রহিত (যেখানে পাদের ও মাত্রার বিভাগ নাই) সেই চতুর্থের উপাসনা করিলে অন্য কোথাও গমন করিতে হয় না।

এখানে এই বলা হইতেছে—

স্থূল প্রপঞ্চ—জাগ্রদবস্থা—বিশ্ব অভিমানী এই তিন হইতেছে অকার মাত্রারূপ। সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ—স্বপ্নাবস্থা—তৈজস অভিমানী এই তিন হইতেছে উকার মাত্রারূপ। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় প্রপঞ্চের কারণ—সুষুপ্তি অবস্থা—প্রাজ্ঞ অভিমানী এই তিন হইতেছে মকার মাত্রারূপ।

এই তিন মাত্রার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রা উত্তর উত্তর মাত্রার ভাব প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ স্থূল অকার মাত্রা সূক্ষ্ম উকার মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন কারণ স্থূলের কারণ হইতেছে সূক্ষ্ম। আবার সূক্ষ্ম উকার

মাত্রা সমস্তের কারণ যে মকার সেই মকার মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হন ; কারণ স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব কার্য্যই আপন কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রা উত্তরোত্তর মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন সমস্তই ওঁকার। এই রীতি অনুসারে ওঁকারকে ধ্যান করিয়া যিনি স্থিতিলাভ করিতে পারেন তিনি, ওঁকার যাঁহাকে জানাইয়া দিতেছেন সেই শুদ্ধ ব্রহ্মরূপেই স্থিতিলাভ করেন। এই প্রকারে আচার্য্যের উপদেশে উৎপন্ন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানে যিনি মকারকে গ্রহণ করিতে পারেন তিনি পূর্ব্বোক্ত বিভাগ নিমিত্ত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানকে দূর করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। এই-রূপ পুরুষের অন্য কোথায় গমন হইবে ? কারণ, দেশ কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন যে ব্যাপক ভাব এই পুরুষ সেই ব্যাপকভাবেই স্থিতিলাভ করেন। মকারের ক্ষয় হইলে বীজভাবের অভাব হয়। তখন অমাত্র রূপ ওঁকারকে যিনি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহার আর অন্য গতি হয় না। লোকান্তর গমন তাঁহার হইতেই পারে না, কারণ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্যাপকব্রহ্মরূপেই স্থিতিলাভ করেন।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥১২

অমাত্রো মাত্রা যস্য নাস্তি সোঽমাত্রঃ অকারাদি মাত্রারহিতঃ। ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তুরীয় আত্মৈব কেবলঃ অব্যবহার্য্যঃ বাঙ্মনসয়োঃ ক্ষীণত্বাৎ ব্যবহারাযোগ্যঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ জাগ্রদাদিস্থানসম্বন্ধশূন্যঃ। শিবঃ মঙ্গলময়ঃ অদ্বৈতঃ ভেদবিকল্পরহিতঃ। এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারস্ত্রিমাত্রস্ত্রিপাদঃ আত্মা এব এবমুক্তপ্রকারেণ জগদাত্মা প্রণব আত্মেত্যুপাস্যমাত্মাধিষ্ঠানকতয়া প্রণবোনাত্মাতিরিক্তঃ কশ্চিদিত্যাত্মৈব কেবল ইতি বিজ্ঞেয়ং বা। যঃ উপাসকঃ এবং সকলমদ্বৈতচিতং বেদ জানাতি সঃ আত্মনা স্বেনৈব আত্মানং স্বং পারমার্থিকরূপং সংবিশতি রজ্জ্বাং সর্প ইব প্রবিশতি কল্পিতাত্মনা চিদাত্ম ভাবং প্রযাতীতি ভাবঃ।

পরমার্থদর্শনাৎ ব্রহ্মবিৎ তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্ধ্বা আত্মানং প্রবিষ্ট ইতি ন পুনর্জ্জায়তে, তুরীয়স্যাবীজত্বাৎ। ন হি রজ্জুসর্পয়োর্ব্বিবেকে রজ্জ্বাং প্রবিষ্টঃ সর্পো বুদ্ধিসংস্কারাৎ পুনঃ পূর্ব্ববৎ তদ্বিবেকিনামুত্থা-স্যতি। মন্দ-মধ্যমিয়াস্তু প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মার্গগামিনাং সন্ন্যা-সিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্চ কৢপ্তসামান্যবিদাং যথাবদুপাস্যমান ওঙ্কারো ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে আলম্বনী ভবতী। তথা চ বক্ষ্যতি। "আশ্রমাস্ত্রিবিধাঃ" ইত্যাদি ॥১২॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

[ওঙ্কারের স্ফুরণে লক্ষিত যে পৃথক্ চৈতন্য তিনি তিন মাত্রা বিশিষ্ট---অধ্যস্ত—কল্পিত। ওঙ্কারের সহিত তদাত্মতা হেতু ইঁহাদিগকে ওঙ্কার বলা হয়। ওঙ্কারকে 'অমাত্র' ইত্যাদি দ্বাদশ সংখ্যা বিশিষ্টা শ্রুতির মন্ত্র পরব্রহ্মের সহিত একতা দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহারই ব্যাখা জন্য শ্রুতি বলিতেছেন]

মাত্রা নাই যাঁহার এমন যে লক্ষ্যরূপ ওঙ্কার তিনি হইতেছেন অমাত্র। চতুর্থ হইতেছেন তুরীয়রূপ কেবল আত্মা। অব্যবহার্য্য বলা হয় এইজন্য যে বাচক ও বাচ্যরূপ যে বাণী আর মন, মূল অজ্ঞান ক্ষয় হইলে তাহাও ক্ষীণ হয় বলিয়া ব্যবহারের অযোগ্য এই আত্মা। প্রপ-ঞ্চের উপশম হইলে আত্মা প্রকট হয়েন বলিয়া ইনি প্রপঞ্চোপশম। অথবা অদ্বৈত আত্মার জ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ উপশম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই জন্য ইনি প্রপঞ্চোপশম। শিব অর্থাৎ কল্যাণ স্বরূপ এবং অদ্বৈত ইনি। অদ্বৈত বলা যায় এই জন্য যে একের প্রতিযোগী দুই আবার দুয়ের প্রতিযোগী এক–ইহা হইতে রহিত অর্থাৎ এক আর দুই এই যে সংখ্যা তাহা সাপেক্ষিক এবং সম বিষম ভাগযুক্ত। আত্মা কিন্তু সাপেক্ষতা এবং সমবিষম ভাব রহিত এই জন্য সর্ব্বসংখ্যাতীত অদ্বৈত। ইনি সংখ্যাবদ্ধ পরিচ্ছিন্নতা হইতে রহিত বলিয়া সর্ব্বসংখ্যাতীত অদ্বৈত।

ওঙ্কারের লক্ষ্য এই আত্মাই জ্ঞাতা পুরুষ, ইহাঁতে বাচ্য বাচকের ভেদ নাই। ইনি তিন মাত্রা বিশিষ্ট হয়েন ও তিন পাদ বিশিষ্ট হয়েন।

হে সৌম্য! এখানে আর এক বিচারের কথা লক্ষ্য কর।

রজ্জুতে অধ্যস্ত যে সর্পমত সর্প রূপটি আর তার নাম সর্পটি—এই দুইটি অর্থাৎ নামও নামী ইহারা রজ্জুজ্ঞানের অজ্ঞানতা হেতু এক; অর্থাৎ ঐ অধ্যস্ত সর্পের নাম ও রূপ এই দুইই রজ্জু সম্বন্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত বলিয়া ঐ অজ্ঞানে ঐ দুয়ের একতা দৃষ্ট হয়। আবার রজ্জুর জ্ঞান যখন হয় তখন ঐ কল্পিত নামরূপ অসত্য হয় বলিয়া ঐ অসত্যতাতে উহাদের একতা হয়। আবার রজ্জুর জ্ঞান হইলে ঐ কল্পিত সর্পের নামরূপের পরিণাম হয় ঐ সত্যরজ্জু। কারণ সর্পের, রজ্জু হইতে পৃথক্ সত্তার অভাব রহিয়াছে।

এখন দেখ যে যাহার ভিতরে থাকে সেই উহার আদ্যস্থিতি আর আদ্যন্তঃস্থিতি যাহা তাহাই উহার বর্ত্তমান স্থিতি। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা" "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ইত্যাদি প্রমাণ স্মরণ কর।

ভাল করিয়া দেখ। রজ্জু বিষয়ে ভাসমান যে সর্প তাহা ভ্রান্তি-কালের পূর্ব্বে দ্বৈত অভাব হেতু রজ্জুরূপই বটে। আবার ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইয়া গেলেও উহা আপন সত্তার অভাব হেতু রজ্জুরূপই থাকে। ভ্রান্তিকালে যে আপন নামরূপ সহিত ইতরবৎ ভাসা তাহাকেও ভ্রান্তি বলা যায়। কিন্তু সর্পদণ্ড জলধারা ইত্যাদি নামরূপ দ্বারা এক রজ্জুই সুশোভিত হয়; আর সেই বিষয়ে যে সর্পাদির কথন ব্যাপার তাহা **"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং"** ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে বাচারম্ভণ মাত্র। হে সৌম্য! এই দৃষ্টান্ত বিচার অনুসারে অমাত্র নির্ব্বিশেষ তুরীয় রূপ আত্মা বিষয়ে বিশ্বাদি তিন পাদ এবং অকারাদি তিন মাত্রার বিচার হইবে জানিও।

"সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ" ইহার অর্থ হইতেছে যিনি এইরূপে জানেন তিনি আপন আত্মরূপ দ্বারাই আপন পরমার্থরূপ আত্মাতে সম্যক্ প্রকার প্রবেশ করেন। **য এবং বেদ** দুই বার বলায় উপনিষদের পরিসমাপ্তি বুঝাইতেছে। আবার বলি যিনি উক্ত প্রকার অমাত্র---চতুর্থ---তুরীয় আত্মাকে জানিতে পারেন তিনি আপনার

চিদাভাসরূপ আত্মাকে আপনার পরমার্থরূপ প্রত্যক্ চৈতন্য সাক্ষী-রূপী আত্মা বলিয়াই জানেন ইহাই আত্মাকে পরমাত্মাতে প্রবেশ করান।

ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। সুষুপ্তি নামক যে তৃতীয় স্থান সেইটি হইতেছে বীজভাব। ইহাই ক্রম অনুসারে জাগ্রৎ স্বপ্ন স্থানদ্বয় রূপ অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ। চতুর্থ অমাত্র তুরীয় আত্মার সম্যক্ জ্ঞানরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি দ্বারা অঙ্কুরকে দগ্ধ করিয়াই পরমার্থদর্শী আত্মবেত্তা পরমাত্মারূপে স্থিতিলাভ করেন তাঁহার আর জন্ম হয় না। কেন জন্ম হয় না দেখ। চণকের দুইটি অঙ্কুর; এই অঙ্কুর দ্বয়ের উৎপত্তি স্থান রূপ কারণ—বীজটি দগ্ধ হইলে থাকে কি? বীজান্তর স্বরূপ এক মহাসূক্ষ্ম সত্তা অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হইয়া আর কখন বৃক্ষভাব প্রাপ্ত হয় না। এইরূপে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় রূপ অঙ্কুরের উৎপত্তির কারণ স্থান হইতেছে অবিদ্যাত্মক সুষুপ্তি রূপ বীজ। তুরীয়ের জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা জাগ্রৎ স্বপ্ন রূপ অঙ্কুর দগ্ধ হইলে বীজান্তর সূক্ষ্ম মহাসত্তা স্বরূপ চিদা-ভাস নামক জীবসত্তাই থাকে। সম্যক্ প্রকারে বীজ দগ্ধ হইলে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়াত্মক অঙ্কুরভাব বিশিষ্ট সংসাররূপ বৃক্ষ আর কখন জন্মিতে পারে না। কারণ তুরীয়---আশ্রিত মূল---অজ্ঞানের নাশ তখন হইয়াছে, সেই জন্য আত্মা তখন অবীজরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যেমন রজ্জু ও সর্প এই উভয়ের জ্ঞান হইলে প্রথম সর্পটা রজ্জুতেই প্রবেশ করে আর সেই সর্প বিবেকী পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞানের সংস্কার ধরিয়া আর পূর্ব্ববৎ উদয় হইতে পারেনা এখানেও সেইরূপ জানিও।

উত্তম অধিকারীর কথা বলা হইল। মন্দ মধ্যম সাধক সম্বন্ধে বলা হইতেছে—ইঁহারাও যদি সৎপথে থাকে এবং মাত্রা ও পদের একতাকে সম্যক্ প্রকারে নিশ্চয় করে এরূপ সন্ন্যাসীও উক্তপ্রকার মাত্রা এবং পাদের অভেদতা জ্ঞানরূপ যথার্থ ওঁকার উপাসনা দ্বারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি দ্বারা ঐরূপ প্রণবের তিন মাত্রার উপাসককে শেষে ব্রহ্মা স্বয়ং তুরীয় আত্মার সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করেন।

ওঁকারের অমাত্র যে তুরীয় পাদ তাহার উপাসনা যিনি করেন তিনি সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অন্য তিন পাদের উপাসনা যাঁহারা করেন তাঁহারা মন্দ ও মধ্যম সন্ন্যাসী। ইঁহারাও পূর্ব্বোক্ত মাত্রা ও পাদের অভেদতা রূপ উপাসনা দ্বারা ক্রমে মোক্ষ লাভ করেন। এই জন্য শ্রুতি ওঁকার উপাসনা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

আশ্রম ত্রিবিধ হওয়া উচিত এসম্বন্ধে পরে বলিবেন।

গৌড়পাদীয় শ্লোকাঃ॥

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।
ওঁকারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।
ওঁকারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥২৪
যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥২৫
প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ॥২৬
সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্॥২৭
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥২৮
অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনি র্নেতরো জনঃ॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরায়াং গৌড়পাদীয়কারিকায়াং প্রথমমাগম প্রকরণং পূর্ণম্॥ ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ

* ওঁকারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে। পাদ যাহা তাহাই মাত্রা। বিশ্বাদি পাদই অকারাদি মাত্রা আর অকারাদি মাত্রাই বিশ্বাদি পাদ। এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিশ্বাদি পাদের বিভিন্নতা করিয়া

ওঁকারকে জানিবে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ আত্মাকে অনুভব করিবে। এইরূপে জানিয়া দৃষ্ট অর্থরূপ ইহলোক এবং অদৃষ্ট অর্থরূপ পরলোক বা অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না, কারণ ইহা সত্য যে যাহা কিছু আকার বা নাম বা রূপ ধরিয়াছে তাহার মূলে এই ওঁকারই আছেন।

[ওঁকার ধ্যানে যিনি কুশলী তিনি জানেন যে ওঁকারকে জানিলেই সর্ব্বদ্বৈত অপবাদ দূর হয়। ওঁকারের সম্যক জ্ঞানেই মানুষের কৃতার্থতা ; যাঁহার এই সম্যক্ জ্ঞান নাই তাঁহার জন্য ওঁকারকে ধ্যান বা চিন্তা করিতে বলা হইতেছে] প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে—বিশ্বাদি পাদ চিন্তা করিতে করিতে মনকে একাগ্র করিবে কারণ ইহা জানিও যে ওঁকারই নির্ভয় ব্রহ্ম—সংসার ভয় রহিত ব্রহ্ম। যে পুরুষ প্রণবে নিত্যযুক্ত তাঁহার কোন বিষয়ে ভয় থাকে না। যে পুরুষ সর্ব্বদা বিধিপূর্ব্বক ওঁকার উচ্চারণ রূপ জপ করেন, যিনি পদ ও মাত্রা যে এক ইহা বিচার করেন, তাহার পর ভিতরে অনাহত ধ্বনির সাধন করেন তাঁহার সংসার ভয়, মৃত্যুভয়াদি কিছুই থাকে না। শ্রুতিও বলেন "**বিদ্বান্নবিমীনি ক্কুনস্বন হুনি**" প্রণবের লক্ষ্য তুরীয় আত্মার অনুভব কুশল বিদ্বান্ কোন কিছু হইতেই ভয় পান না।

প্রণবই অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। উত্তম অধিকারীর পক্ষে পাদ ও মাত্রা--বুদ্ধি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ইনিই একরস, প্রত্যগাত্মা, পরব্রহ্ম। এই ওঁকারই পরব্রহ্মরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে ক্রম অনুসারে অন্য পাদত্রয়ে প্রকট হয়েন। ফলে ইনি অপূর্ব্ব—ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই ; ইনি অনন্তর-সর্ব্বাধিষ্ঠান বলিয়া ইঁহা হইতে ভিন্ন জাতীয় কোন কিছুই ইঁহার ভিতরে নাই ; ইনি অবাহ্য--ইঁহার বাহিরেও অন্য বস্তু নাই ; ইনি অনপর---ইঁহার কোন কার্য্য নাই ; ইনি অব্যয় ইঁহার নাশ নাই ; **মব্রাহ্মামন্তরীহ্মজ: স ম্মবঘনন্নন্**" ইতি শ্রুতেঃ।

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত, যেমন মায়াবী রচিত হস্তী (মায়াবী যখন হস্তিরূপ ধারণ করে) রজ্জুতে সর্প, মৃগ তৃষ্ণাতে জল,

স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ, ইহাদের আদি, অন্ত, মধ্য, সেই একমাত্র মায়াবী, রজ্জু, ঊষর ভূমি, ইত্যাদি অধিষ্ঠান এখানেও সেইরূপ জানিও। যে বস্তু কল্পিত, ভ্রান্তি মাত্র, তাহার আদি অন্ত ও মধ্য হইতেছে তাহার অধিষ্ঠানটি। মিথ্যা উৎপন্ন অর্থাৎ ভ্রান্তি মাত্র যে আকাশাদি সর্ব্ব-প্রপঞ্চ ইহাদের আদি অন্ত মধ্য সেই এক ওঁকার—তুরীয় আত্মা। মনে করা হউক আকাশে যে নীলিমা ভ্রান্তি, ইহা আকাশ হইতে ভিন্ন নীলিমা বলিয়া কোন কিছু বস্তু। সেই ভ্রান্তিকালের পূর্ব্বে ঐ নীলিমা আকাশ—রূপই ; সেই জন্য ঐ কল্পিত নীলিমার আদি হইতেছে আকাশ। আবার আকাশ ও আকাশে অধ্যস্ত নীলিমা—ইহাদের বিবেক যখন হয় তখন ঐ অধ্যস্ত নীলিমার পরিণাম আকাশ বলিয়াই ঐ নীলিমার অন্তও ঐ আকাশ, আবার যখন ঐ নীলিমা আদিতে ও আকাশ এবং অন্তেও আকাশ তখন উহা আপনার পৃথক্ সত্তার অভাব জন্য ভ্রান্তিরূপ বর্ত্তমান কালেও আকাশরূপ, সেই জন্য উহার মধ্যটাও আকাশরূপ। সেই জন্য বলা হইতেছে আকাশাদি সমস্ত প্রপঞ্চ একমাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্য আত্মাতে অধ্যস্ত বলিয়া ইহাদের আদি অস্ত ও মধ্যে সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য ওঁকারই রহিয়াছেন। এইরূপে ঐ মায়াবী স্থানীয় রজ্জু স্থানীয় প্রণবরূপী আত্মাকে—তুরীয়কে সার বস্তু জানিয়া তৎক্ষণাৎ সাধক আত্মভাবে স্থিতি লাভ করেন।

সর্ব্ব হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ওঁকারকে—অর্থাৎ প্রাণিপুঞ্জের স্মরণ-রূপ বৃত্তির আশ্রয় যে হৃদয় সেই হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ওঁকারকে আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জানিও। এইরূপে জানিলে ধীর ব্যক্তির শোকের কোন অবসর থাকে না। "**নবনি য়োকমাত্মবিদিনি**"।

[তুরীয় ওঁকারকে যিনি সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন] তুরীয় পদ হইতেছেন অমাত্র ও অনন্তমাত্র। যাহাদ্বারা ওঁকারের পরিমাণ করা যায় এইরূপ যে পরিচ্ছেদ তাহা হইল মাত্রা। এই মাত্রা যাঁর পক্ষে অনন্ত এইরূপ ওঁকার হইতেছেন অনন্ত মাত্র। অর্থাৎ এই আত্মা, এত বড়, এই প্রকার পরিচ্ছেদ করিবার শক্তি

কাহারও নাই। ইনি সমস্ত দ্বৈতের উপশম স্বরূপ। দ্বৈতবিশ্রান্তি স্থান বলিয়াই ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। এই ওঁকারকে যিনি বর্ণিত প্রকারে অবগত আছেন তিনি পরমার্থতত্ত্বের মনন করায়, চিন্তা করায়, মুনি। ইহা যিনি জানেন না তিনি মুনিপদ বাচ্য নহেন।

ইতি গৌড়পাদীয় কারিকার প্রথম আগমপাদ সহ মাণ্ডুক্যোপনিষদের মূল মন্ত্র সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

উৎসবের সুসংবাদ।

রামে রাম, দুয়ে রাম, তিনে রাম—এই ভাবে গুণিতে গুণিতে "তেরা রামে" পৌঁছিলে কোন এক সাধকের সিদ্ধি হইয়াছিল। রামের হইলেই সবার সিদ্ধি। উৎসবেরও তেরা রাম হইল। এখন সিদ্ধি কোন্ দিকে হইবে তাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে। উৎসব কিন্তু ত্রয়োদশ বৎসরে পড়িল। নূতন বৎসরের নূতন মাস—বৈশাখ হইতে উৎসবে সম্পূর্ণ নূতন কিছু বাহির হইবে। উৎসবের ইহা গৌরবের বিষয়।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ, পরেলোক, শক্তিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, ভক্তি প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক যিনি—সেই পূজ্যপাদ গ্রন্থকারকে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজে জানেন না এরূপ লোক নিতান্ত কম। গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি যে সমাজে পরিচিত তাহা নহে। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান মানিয়া চলিলে—শাস্ত্রমত জীবন যাপন করিলে মানুষ কিরূপ হইতে পারেন ইনি তাহার দৃষ্টান্ত। শুধু বাঙ্গালা দেশে নয়, ভারতের বহু স্থানের প্রসিদ্ধ লোক তাঁহাকে জানেন, তাঁহার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হয়েন।

লোকে তাঁহাকে যতটুকু জানিয়াছে তদপেক্ষা তাঁহাকে জানিবার আরও অনেক আছে। দেশ তাঁহাকে যত জানিবে ততই দেশের সৌভাগ্য ইহা আমাদের বিশ্বাস।

তাঁহার নূতন প্রবন্ধ "অবতার সন্দর্ভ" এবং "রামায়ণ বেদ-চন্দ্রিকা" বা "শ্রীসীতারাম তত্ত্ব-কৌমুদী" সম্প্রতি এই দুইটি ক্রমশঃ হইয়া উৎসবে প্রকাশিত হইতে চলিল। নূতন বৎসরের প্রথম মাসে এই দুই প্রবন্ধ বাহির হইবে। ইহা উৎসবের গৌরব এবং উৎসবের পাঠক পাঠিকা মহোদয়গণেরও বিশেষ সৌভাগ্য। বহু চেষ্টা করিয়াও যাঁহার দর্শন প্রায় লোকের ভাগ্যে ঘটেনা তাঁহার হৃদয়ের কথা পাইলে মানুষের যে পরম উপকার হইবে—ইহা বলাই বাহুল্য।

এই মহাপুরুষের আরও দুইটি লেখা—"আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ" এবং "প্রাণ ও আয়ুস্তত্ত্ব" এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ হইয়া বাহির হইতেছে। আমরা স্থান করিতে পারিলে পরে ইহাও উদ্ধৃত করিয়া উৎসবে দিতে পারিব।

এতদ্ভিন্ন উৎসবে যাহা বাহির হইতেছিল তাহাও চলিবে। মাণ্ডূক্য উপনিষদের মূল এবং গৌড়পাদের কারিকার আগম প্রকরণ এই চৈত্রমাসে শেষ হইল। মাণ্ডূক্য প্রথম খণ্ড এই বৈশাখেই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। মাণ্ডূক্য দ্বিতীয় খণ্ড, ঋগ্বেদ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, কথা—রামায়ণ, জয়দেব, ভাগবত যেমন চলিতে ছিল সেইরূপই চলিবে। ইহার উপর প্রবন্ধ যেরূপ চলিতেছে সেইরূপ চলিবে। নূতন বৎসরের বৈশাখে থাকিবে।

১। অবলম্বন।
২। নববর্ষে প্রার্থনা।
৩। নববর্ষে—ধর্ম্মের প্রয়োগ।
৪। অবতার সন্দর্ভ।
৫। রামায়ণ বেদ-চন্দ্রিকা বা
শ্রীসীতারাম তত্ত্ব-কৌমুদী।
৬। শ্রীভগবত।

ইহাত থাকিবেই—ইহাতে ৪ কর্ম্মা আর দুই কর্ম্মায় যোগবাশিষ্ঠ কিম্বা ঋগ্বেদ অথবা প্রবন্ধ ও কবিতা থাকিবে। সকল বস্তু অগ্নিমূল্য হওয়ায় আমরা উৎসবের কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি করিতে বিরত থাকিলাম।

পরিশেষে উৎসবের পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণের নিকটে আমাদের নিবেদন—বৎসরের প্রথমে পূর্ব্ব প্রথামত উৎসব ভি, পি, তে প্রেরিত হইলে তাঁহারা যেন ইহা ফেরত না দেন। যদি কাহারও গ্রহণে অনিচ্ছা থাকে তাহা, হইলে এই চৈত্র মাসের কাগজ লইয়াই যেন তাঁহারা একপয়সার এক খানি কার্ডে আমাদিগকে জানান। নতুবা আমাদের এই লোকহিতকর কর্ম্মে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কাহারও অভিপ্রায় হইতে পারে না ইহা আমাদের বিশ্বাস। অন্যপক্ষে আমরা আশা করিতে পারি উৎসবের বহুল প্রচার সম্বন্ধে আর একবার বিশেষভাবে সকলের দ্বারা চেষ্টা হউক।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

সমস্ত বিষয় হইতে যিনি নিবর্ত্ত তিনি অনুমাত্রও দুঃখ বোধ করেন না। অতএব জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে দৃঢ় কর। তাহা হইলে তাহা হইতে দেহাদি বোধরূপ অহম্ভাব আর দেখিবে না। বল তখন জনন মরণরূপ ভ্রান্তি থাকিবে কার? তবেই দেখ যাহাতে যাহাতে জীবের বিরক্তি তাহা তাহা হইতেই জীব মুক্ত। অতএব অহংভাবের প্রতি বিরক্তি আন, অবশ্যই তুমি অহম্ভাব হইতে মুক্ত হইবে। ইহাই ত মুক্তি। আমি আহার করি, আমি নিদ্রা যাই, আমি চলি ফিরি, আমি জন্মি মরি, আমি যুবা হই, আমি বৃদ্ধ হই—এগুলিই প্রধান ভ্রম। এই ভ্রমের স্মৃতিই তোমাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আনয়ন করে। এই জন্মেই সাধনা দ্বারা প্রতিনিয়ত কি ঈশ্বর-চৈতন্য, কি জীব-চৈতন্য যিনি সেই চৈতন্যকে আত্ম-চৈতন্য হইতে অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ অভ্যাস করেন তিনিই জয়লাভ করেন।

উৎপত্তি প্রকরণ ৬২ সর্গ।

মহানিয়তি, দৈব, পুরুষকার।

রাম। ভ্রম না যাওয়া পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া স্থিতি লাভ করা যাইবে না। হরি হইয়া না যাইতে পারিলেও মৃত্যু ভয়াদি হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু ভ্রম যাইবে কিরূপে? ভ্রম যাহা তাহা ত কল্পনা প্রসূত। কল্পনা হইতে ভ্রম। ভ্রম হইতে আত্মবিস্মরণ। আত্মবিস্মরণ হওয়াই হইতেছে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে মনে মাখাইয়া বা দেহে মাখাইয়া মনের দুঃখে বা দেহের দুঃখে হাহাকার করা। আপনাকে হারাইয়াই মানুষ বিষয়-আসক্তিতে ছট্ ফট্ করে। তবেই হইল বিষয়ে অরতি না জন্মিলে, ধ্যানে মনকে ডুবাইতে না পারিলে মুক্তি বা

আত্মভাবে স্থিতি নাই। আত্মভাবে স্থিতি না হইলে ভ্রম যাইবে না। ভ্রমটাও আবার কল্পনা-প্রসূত। তবেই হইল কল্পনাই সমস্ত দুঃখের মূল।

বশিষ্ঠ। হাঁ তাহাই বটে। কল্পনা বড়ই বিষম বস্তু। কল্পনার প্রভাব একবার লক্ষ্য কর। কল্পনাবলে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুকেও লক্ষ-ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেই লক্ষভাগের এক এক ভাগেও সহস্র সহস্র জগৎ উঠিতে পারে। আবার সেই সমস্ত জগৎ সত্যমত প্রতীয়-মান হয়। আবার নিমেষ কত সূক্ষ্ম দেখ। কল্পনাবলে এক নিমেষ-কেও লক্ষভাগে বিভক্ত করা যায়। নিমেষের লক্ষাংশের এক অংশেও সহস্র সহস্র কল্প উঠিতে পারে। সেই সমস্ত কল্পও আবার সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। এই সমস্তই কিন্তু ভ্রান্তি।

বহন্তীমাঃ পরাঃ সত্তাঃ শান্তাঃ সর্গপরম্পরাঃ।
সলিলদ্রবতেবান্তঃ স্ফুটাবর্ত্তবিবর্ত্তিকা ॥৩॥

ইমা বর্ত্তমানাঃ পরা আগামিন্যঃ শান্তা অতীতাশ্চ সর্গপরম্পরাঃ অর্থাৎ বর্ত্তমান, অনাগত ও অতীত সৃষ্টিপ্রবাহ, সলিল রাশির অন্তরে যেমন আবর্ত্ত ও প্রবাহ থাকে—সেইরূপে জীবের অন্তরে কল্পনা প্রভাবেই প্রবাহিত হয়। এই সমস্তই কিন্তু ভ্রান্তি।

মিথ্যাত্মিকৈব সর্গশ্রীর্ভবতীহ মহামরৌ।
তীরদ্রুমলতোন্মুক্ত পুষ্পালীব তরঙ্গিণী ॥৪॥

এই সমস্ত সৃষ্টি-শোভা কিন্তু মিথ্যা। মৃগতৃষ্ণিকার নদী, তটবর্ত্তী দ্রুমলতা-বর্ষিত পুষ্প দ্বারা আকীর্ণ—ইহা যেমন মিথ্যা কল্পনা, সেইরূপ অধিষ্ঠান-চৈতন্যে এই সৃষ্টিপরম্পরাও কল্পনা মাত্র। এজন্য মিথ্যা।

রাম। তাই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি—তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে যখন সকল প্রকার ভ্রমের নাশ হয়, তখন জ্ঞানী ব্যক্তির দেহস্থিতি কিরূপে সম্ভবে ?

একাত্মৈকতয়ৈবং হি জাতে সম্যক্ বিচারণাৎ।
নির্ব্বিকল্পাত্মবিজ্ঞানে পরে জ্ঞানবতাম্বর ॥৬॥

কিমর্থমিহ তিষ্ঠন্তি দেহাস্তত্ত্ববিদামপি।

দৈবেনৈব সমাক্রান্তা দৈবমত্র চ কিং ভবেৎ ॥৭॥

আমি কি, জগৎ কি, ইহার সম্যক্ বিচার দ্বারা যখন এই খণ্ড চৈতন্যই সেই অখণ্ড চৈতন্য হইয়া যান, এই আত্মাই যখন ব্রহ্মভাবে অভেদ স্থিতিলাভ করেন—তখন নির্ব্বিকল্প আত্মবিজ্ঞান লাভ হয়। তখন আর কোন কল্পনাই থাকে না। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সেইরূপ তত্ত্ববিদ্‌গণের দেহও কি জন্য থাকে? বলি প্রভৃতি তত্ত্ববিদের দেহ কি দৈব সমাক্রান্ত হইয়াই ছিল? তত্ত্বজ্ঞ জনের নিকটে দৈবটা কি? শ্রুতি যে বলেন **"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি"** অর্থাৎ তত্ত্ববিদের উপরে দৈবের কোন সামর্থ্য নাই?

বশিষ্ঠ। আচ্ছা দৈবটা কি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

অস্তীহ নিয়তির্ব্বাহ্মী চিচ্ছক্তিঃ স্পন্দরূপিণী।

অবশ্যভবিতব্যৈকসত্তা সকলকল্পগা ॥৮॥

নিয়তি বলে নিয়মকে। কার নিয়ম? সবীজ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের নিয়ম। নির্ব্বীজ ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্মে কি আছে, কি নাই, তাহা বলিবার কেহ থাকে না। নির্গুণ ব্রহ্ম বা নির্ব্বীজ ব্রহ্ম মায়ার সম্পর্ক-শূন্য—ইহা আপনি আপনি ভাব। নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ হয়, কিন্তু সেই স্থিতিলাভ কি—তাহা সেখানে থাকিয়া বলিবার কেহ থাকে না।

তবেই হইল ঈশ্বরের নিয়মের নাম নিয়তি। অগ্নিশিখা উর্দ্ধে উঠিবে, জল নিম্নগামী হইবে, ভারি কোন কিছু দ্রব্য শূন্যে ক্ষেপণ করিলে নীচে পড়িয়া যাইবে—এইগুলি ঈশ্বরের নিয়ম। অস্ত্রঘাতে মানুষ মরে, জলে ডুবে, পর্ব্বত হইতে পড়িলে মরে—এগুলিও নিয়ম। এই জগতের কার্য্য ব্যবস্থা—দিবসে সূর্য্য উঠা, রাত্রিতে কখন চন্দ্র থাকা, কখন না থাকা, ঋতুদিগের সময় মত আগমন ও গমন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগে রাগ দ্বেষ হওয়া—এই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ম অনুসারেই হইতেছে। যে নিয়ম অনুসারে জাগতিক ব্যবহার সমূহের ব্যবস্থা হইতেছে, জ্ঞানীর দেহধারণও সেই ব্যবস্থামতই হইয়া থাকে।

এখন দেখ নিয়মটা কি? নিয়তি যাহা, তাহা মায়াধীশ ঈশ্বরের সঙ্কল্প ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সঙ্কল্প ঈশ্বরে থাকে সত্য, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে সঙ্কল্প ত থাকে না; কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য, মায়ার সমস্ত স্পন্দন অতিক্রম করিয়া তিনি আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত। তাঁহারই এক দেশে যখন চলন উঠে, যখন মায়া ভাসে, তখন তিনি আপন স্বরূপে থাকিয়াই সেই চলন মাখিয়া সগুণব্রহ্ম হয়েন। সগুণ-ব্রহ্ম এক দিকে আপনার আপনি আপনি ভাবরূপ স্বরূপটি ছুঁইয়া আছেন, অন্য দিকে সঙ্কল্প বা চলনাত্মিকা মায়াকেও দেখিতেছেন। তিনি মায়াধীশ, সঙ্কল্পের অধীশ্বর, সর্ব্ববিধ চলনেরও প্রভু। কল্পনাই তাঁহার বহিঃপ্রকাশের ভিত্তি। কল্পনা বা মায়া অবলম্বনেই তাঁহার প্রকাশ হয়। কল্পনাই তাঁহার দেহ। দেহ না ধরিলে চৈতন্যরূপী দেহীর প্রকাশ যেমন অসম্ভব, সেইরূপ মায়া অবলম্বন না করিলে ঈশ্বরের প্রকাশও নাই। চৈতন্যের প্রকাশ যখন নাই; সপ্রকাশ যিনি তিনি যখন আপনাকে ইন্দ্রিয়াদির গোচর না করেন, তখন তিনি আপনা-আপনি ভাব; নির্গুণ ব্রহ্ম; নির্ব্বীজ ব্রহ্ম। কল্পনা তবে ব্রহ্মসত্তার স্ফুরণ। এই স্ফুরণটি ব্যবহারিক জগতের ব্যবস্থারূপেই স্ফুট হয়।

নিয়তি তবে ঈশ্বরের নিয়ম; ঈশ্বরের সঙ্কল্প। নিয়ম কি? ইহা তাঁহারই শক্তি। শক্তির ব্যক্তাবস্থাই এই পরিস্ফুট জগৎ। কিন্তু অব্যক্তাবস্থাতে শক্তি সঙ্কল্পমাত্র। সেই জন্য বলা হইতেছে—অস্তীহ নিয়তির্ব্রাহ্মী চিচ্ছক্তিঃ স্পন্দরূপিণী। ব্রাহ্মী-নিয়তি বা ঈশ্বর-নিয়ম হইতেছে চিৎ বা জ্ঞানেরই শক্তি। ইহা চলনাত্মিকা কল্পনা বলিয়া স্পন্দরূপিণী। কল্পনা ত ভাবনা। যেখানে কল্পনা থাকিবে, যেখানে ভাবনা থাকিবে, সেখানে চলন বা স্পন্দন থাকিবেই। এই নিয়তি, এই ব্রহ্মসত্তার স্ফূর্ত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। যতকাল সৃষ্টি থাকিবে, ততকাল ইহা একরূপেই থাকিবে, সেই জন্য ইহা একসত্তা। এই একসত্তাতে ইহার অবশ্যম্ভাবিনী স্থিতির কথা বলা হইতেছে। সমস্ত কল্প ধরিয়াই জগদ্ব্যবস্থা থাকিবে বলিয়াই নিয়তিকে বলা হইয়াছে—সকলকল্পগা।

এই বহ্নি এইরূপ ঊর্দ্ধজ্বলনাদি স্বভাবসম্পন্ন হইবে—নিয়তি আদি-সৃষ্টিতে সবীজ-ব্রহ্মের এইরূপ সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তিরূপেই ভাসে। এই নিয়তিই মহাসত্তা, মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্টি, মহাক্রিয়া, মহোদ্ভব, মহাস্পন্দ ও মহাত্মা নামে অভিহিত। বুঝিতেছ নিয়তি বা নিয়ম স্পন্দনাত্মিকা মায়াই। এই মায়া, এই শক্তি, আবার পুরুষের প্রযত্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে না।

আকাশে চিত্রলেখন নিতান্ত অসম্ভব। ব্রহ্মের ব্যভিচারও সেইরূপ অসম্ভব। ইহা হইলেও বরং ব্রহ্মের ব্যভিচার অনুমান করা যাইতে পারে কিন্তু নিয়তির অন্যথা কখন হয় না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বিচিত্র সৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মসত্তার প্রচ্ছাদন হয় না কি? ইহাই ত ব্রহ্মসত্তার ব্যভিচার। কোথায় অনন্ত, অপার, অগাধ, চলনরহিত চতুষ্পাদ ব্রহ্ম-সত্তা আর কোথায় বা সেই চতুষ্পাদের এক অতি ক্ষুদ্রদেশে এই মায়া-তরঙ্গের চলন? তথাপি লোকে বলে মায়া, ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই মায়াপ্রভাবে ব্রহ্মসত্তার অন্যথা ভাব। ব্রহ্ম অচল, কিন্তু অজ্ঞ-দৃষ্টিতে তিনি সচলবৎ অনুভূত হয়েন। ইহাই ব্রহ্ম-সত্তার অন্যথা ভাব। কিন্তু নিয়তির অন্যথা কিছুতেই হয় না।

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম, নিয়তি, সৃষ্টি সমস্তই এক। যেমন তরঙ্গ, জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ। অজ্ঞদিগের বোধের নিমিত্ত বিরিঞ্চি প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণ ব্রহ্মরূপিণী ঐ নিয়তিকে সৃষ্টি নামে অভিহিত করেন। অজ্ঞজনের দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি আকাশে বৃক্ষস্থিতির ন্যায় আদ্যন্তবিহীন ব্রহ্মেই ব্যবস্থিত। যেমন স্ফটিক শিলার অন্তরস্থ বন-রেখা ঐ মণির স্বচ্ছতার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মায়াশবলিত ব্রহ্মে অবস্থান করতঃ প্রজাপতি, সুপ্তব্যক্তির আকাশে স্বপ্নকল্পনাবৎ স্বমায়ার অন্তরস্থিত ঐ নিয়তি বিজ্ঞাত হইয়াই তদনুরূপ সৃষ্টি করেন।

যেমন দেহীর দেহে হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ পৃথক্ ভাবে লক্ষিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হিরণ্যভাবাপন্ন হইয়া চিৎস্বভাব-বলে নিয়তি প্রভৃতি অঙ্গ

সমূহ আপনা হইতে অভিন্ন হইলেও পৃথক্ ভাবে দর্শন করেন। এই মহানিয়তিরই নাম দৈব। নিয়তিই সমস্ত, ইহাই সর্ব্বকল্পগামী।

পদার্থমলমাক্রম্য শুদ্ধাচিদিতি সংস্থিতা ॥ ১৮

ইহাই রজস্তমাদি পদার্থমল আক্রমণ করিয়া শুদ্ধ ঈশ্বর-সঙ্কল্প চৈতন্যরূপে এবং জগৎ ব্যবস্থারূপে অবস্থিত।

দৈব আর কি? কেবল "এই পদার্থ এইরূপে স্পন্দিত হইবে, এইরূপে, এই সময়ে, এই প্রকারে উৎপন্ন হইবে" এই প্রকার অবশ্যম্ভাবিতাই দৈব।

পুরুষস্পন্দ যাহা, তাহা এই দৈব আছে বলিয়াই হয়। সেই জন্য এই দৈবকেই পুরুষস্পন্দ বা পুরুষকার বলা হয়। তাদৃশ দৈবই তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি। ভূতগণের আদি, এই জগৎ, এই কাল— এই সমস্তই উক্ত প্রকারের দৈব বা নিয়তি।

দৈব আবার প্রাণীর অদৃষ্ট। কেহ বজ্রাহত হইবে, কাহাকেও ব্যাঘ্রে খাইবে, কেহ বা কুম্ভীরের উদরে যাইবে, কেহ বা যুদ্ধে মরিবে, কেহ বা নৌকাডুবীতে যাইবে ইত্যাদি অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট ও নিয়তি পরস্পর সহায়তা করে।

অনয়া পোরুষীসত্ত্বা সত্তাস্যাঃ পৌরুষেণ চ।
লক্ষ্যতে ভুবনং যাবদ্দে একাত্মতয়ৈব হি ॥ ২১

এই নিয়তি দ্বারাই পুরুষাদৃষ্টের অস্তিত্ব এবং পুরুষাদৃষ্টের দ্বারা নিয়তির সত্তা বা অবস্থিতি। কতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা? না ত্রিভুবন যতদিন থাকিবে ততদিন এই জগৎ ব্যবস্থা। প্রলয়ে কি ব্যবস্থা? মহাপ্রলয়ে দৈব ও নিয়তির ব্রহ্মে একাত্মভাব সম্পন্ন হয়।

রাম। পূর্ব্বে ত বলিয়াছেন "মূঢ়ৈঃ প্রকল্পিতং দৈবং"। আর পুরুষকার দ্বারা দৈব অধঃকৃত করা যায়। এখানে বলিতেছেন নিয়তি বা দৈবকে কেহই পরাভূত করিতে পারে না। এস্থানে যাহা বলিতেছেন তাহার মধ্যে পুরুষকারের স্থান কোথায়?

বশিষ্ঠ। পূর্ব্বে মানুষের কার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি—দৈব

হইতেছে প্রাক্তন কর্ম্ম। ইহাও পূর্ব্বের পুরুষাকারের ফল। বাস্তবিক মানুষের কর্ম্ম সম্বন্ধে দৈব বলিয়া কিছুই নাই। এখানে যে দৈব ও নিয়তির কথা বলিতেছি, পূর্ব্বে বৈরাগ্যপ্রকরণে ও মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণে তাহারও আভাস আছে। বৈরাগ্যপ্রকরণের ২৫ সর্গে বলিয়াছি—মহাকালের অবান্তর ভেদ হইতেছে দৈব ও কাল বা কৃতান্ত।

দীব্যতি ব্যবহরতি প্রাণিনাং কর্ম্মফল দানেন ইতি দৈবম্।

এই দৈবই কৃতান্ত। আর কলয়তি ফলং সম্পাদয়তি ইতি কালঃ। কর্ম্মফল দ্বারা প্রাণিগণকে নানা অবস্থায় ব্যবহার যিনি করেন তিনি দৈব। ফল সম্পাদন যিনি করেন তিনি কাল বা কৃতান্ত।

দৈব কি তবে? ক্রিয়াই ইহার স্বরূপ। কর্ম্মফল নিষ্পাদনই ইহার কার্য্য। এই জগৎ হইতেছে কালের নর্ত্তনাগার। নিয়তি যাহাকে বলিতেছি তাহা এই নর্ত্তনশীল কালের ভার্য্যা। কৃতান্তকামিনী নিয়তির নৃত্য দেখিতে জীব এই জগৎরূপ নর্ত্তনাগারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। মহাপ্রলয়ে কাল ও কালীর নৃত্য অতি ভয়ঙ্কর। এখন দেখ পুরুষকার কি। পুরুষ স্পন্দ একথা এখানেও বলিতেছি। পুরুষং স্পান্দয়তীতি পুরুষস্পন্দো যত্নঃ। পুরুযকার হইতেছে পুরুষ প্রযত্ন।

বাসনা মনসো নান্যা মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মনশ্চ পুরুষঃ পূর্ণাত্মৈব ন বতো ব্যতিরিচ্যতে॥

"তন্মনো কুরুত আত্মন্বীস্যাম্" ইতীত্যাদি শ্রুতের্ম্মনসঃ পুরুষবিবর্ত্তত্বাদিতি ভাবঃ। মনই পুরুষরূপে বা আত্মারূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। অর্থাৎ মন আপন স্বরূপে গমন করিলেই পুরুষ।

লোকে যাহাকে দৈব বলে তাহা তবে কর্ম্ম। সংস্কার ভাব প্রাপ্ত কর্ম্মের আধার মন। মনের আধার পুরুষ। তবে কর্ম্মগুলিই উপচিত বা পরিপুষ্ট বাসনা। বাসনাই মন। মনই পুরুষ। সুতরাং পুরুষ ও পুরুষকার (কর্ম্ম) এই দুই ব্যতীত অন্য দৈব কোথায়?

যদ্দৈবং তানি কর্ম্মাণি কর্ম্মসাধো মনো হি তৎ।

মনো হি পুরুষস্তস্মাদ্দৈবং নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ।

তথাপি পুরুষ-কর্ম্ম যাহা হয়, পুরুষ-স্পন্দ যাহা, তাহারও একটা নিয়ম আছে। এই নিয়মটাই নিয়তি। অজ্ঞ জীব নিয়তির বশ। কিন্তু উহারাও শাস্ত্রমত মন, শরীর ও বাক্যকে স্পন্দিত করিতে পারে। ইহাই তাহাদের পুরুষকার। এই পুরুষকার দ্বারা ইহারা সকলই লাভ করিতে পারে।

কিন্তু পারমার্থিক ভাবে পুরুষকার কি তাহাই দেখ। মনের আধারকেই পুরুষ বলা হইয়াছে।

পুরুষস্য চ পরমার্থতো নির্ব্বিকার চিন্মাত্ররূপত্বাৎ মনসোঽসত্বে কর্ম্মাসত্বাৎ তদাত্মকদৈবাসত্বং ফলিত ইত্যাহ যদ্দৈবমিতি। পরমার্থভাবে দেখিলে পুরুষ নির্ব্বিকার চিন্মাত্ররূপ। কাজেই মনটা তাঁহাতে মায়া মাত্র। মন মিথ্যা। মন মিথ্যা বলিয়া কর্ম্মও মিথ্যা। কর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া কর্ম্মাত্মক যে দৈব তাহাও মিথ্যা প্রমাণ হইল।

এখন নিয়তি ও পুরুষকারের সম্বন্ধ দেখ।

রাম অধিক আর কি বলিব তুমি যে আমাকে দৈব ও পুরুষকারের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিতেছ এবং আমিও যে তোমাকে পুরুষকার করিতে বলিব তাহা তুমি পালন করিও। ইহাও ঐ নিয়তির ফল।

পরমার্থ ভাবে পুরুষ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু পুরুষ যদি পূর্ব্ব হইতে নিষ্ক্রিয় হইয়াই থাকে তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্ম, কর্ম্ম-প্রযুক্ত ভৌতিক বিকার ও আকার এ সমস্ত কিছুই হইত না। অতএব পুরুষ-ক্রিয়ামূলক যাহা কিছু চলিতেছে তৎসমুদায় নিয়তি বশেই চলিতেছে! কেহই নিয়তি অতিক্রমে সমর্থ নহে। কিন্তু শুধু নিয়ম যাহা তাহা কার্য্য করে না। নিয়তি হইতেছে শক্তি আর পুরুষকার হইতেছে পুরুষপ্রযত্ন বা ইচ্ছা। শক্তি আছে, ইচ্ছা নাই ইহাতে কর্ম্ম হয় না, আবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নাই—ইহাতেও কর্ম্ম নাই। যে নিয়তি পুরুষকারে পরিণত হয়, সেই নিয়তির ফল তদ্ভুত্তর

কালে দৃষ্ট হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিয়তি আশ্রয় করিয়া পুরুষকার ত্যাগ করিবেন না কারণ নিয়তি পুরুষ আকারেই কর্ম্মের নিয়ন্তা হন। নিয়তি যখন পুরুষ প্রযত্নে বিবক্ষিত হয় না ঈশ্বর সঙ্কল্প মাত্রেই অবস্থিত হয় তখন তাহা নিয়তি পদবাচ্য হয় এবং যখন সৃষ্টিফল সম্পৃক্ত হয় তখন তাহাকে পুরুষকার বলে। অতএব পুরুষকাররূপে পরিণত না হইলে নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয় না। পুরুষকারে পরিণত হইলেই নিয়তি সফলা হয়।

যেমন জলের দ্রবত্বই তৃণ, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতি রূপে ধরাতলে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বগামী ব্রহ্মই পূর্ব্বোক্ত নিয়তি-বিভাগে স্ফুরিত হয়েন। জ্ঞানীর নিয়তিতে কোন প্রকার দুঃখের লেশমাত্রও নাই। নির্দ্দুঃখা নিয়তিই হইতেছে ব্রহ্মসত্তার স্ফুরণ বিশেষ। শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা নির্দ্দুঃখা নিয়তিকে স্থায়ী করা যায়। উহাতেই অবিদ্যার নাশ হয়। ইহাতেই পরমপদে স্থিতি হয়।

উৎপত্তি-প্রকরণ ৬৩ সর্গ।

মায়াশক্তি বিলাসে ব্রহ্মের যেন স্ফুরণ।

রাম। নিয়তি প্রভৃতির বিলাসে ব্রহ্মই যেন স্ফুরিত হইতেছেন। ইহা কেন হয়? ইহার হেতু কি?

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রকারে, সর্ব্বদা, সকল দেশে—সকল শক্তি সম্পন্ন, সর্ব্ব আকার সম্পন্ন; ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বগামী, ইনিই সমস্ত।

এই ব্রহ্মই আত্মা। ইনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া কখন অন্তঃকরণ উপাধিতে জীবভাব দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া চিৎশক্তি প্রকাশ করেন; কখন সাত্ত্বিক উপাধিতে শান্তি প্রকাশ করেন; কখন তামস উপাধিতে জড়শক্তি প্রকাশ করেন, কখন রাজস উপাধিতে রাগ দ্বেষাদির প্রকট

দ্বারা উল্লাস শক্তি হয়েন আবার সুষুপ্তি প্রলয়াদিতে ক্বচিৎ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিৎ প্রকটয়তি অর্থাৎ সুষুপ্তিতে সর্ব্বপ্রকার স্পন্দনশূন্য হইয়া কোন কিছুই প্রকাশ করেন না।

যদি জিজ্ঞাসা কর এই সমস্ত শক্তির বিকাশ কেন হয়? উত্তরে বলি—

যত্র যদা যদেবাসৌ যথা ভাবয়তি তত্র তদা তদেবাসৌ প্রপশ্যতি ॥৩॥

জীব হইতেছে সঙ্কল্পের অধীন। আত্মা কিন্তু সত্যসঙ্কল্প। এই আত্মা যেখানে যখন যে প্রকার ভাবনাবান্ হয়েন তিনি যখন যেরূপ ভাবনা করেন, সেখানে তখন সেই প্রকার দেখেন বা সেই প্রকারে দেখা দেন। ফলে সর্ব্বশক্তিমানের যে শক্তি যে প্রকারে সমুদিত হয়, তিনি সেইরূপই হয়েন।

তদাস্তি শক্তির্নানারূপিণী সা স্বভাবতঃ ইমাঃ শক্তয়োঽয়মাত্মেতি ॥৫॥

শক্তি স্বভাবতঃ নানারূপিণী। শক্তি কিন্তু আত্মা হইতে অভিন্ন। ব্যবহার দৃষ্টিতে শক্তি নানারূপিণী কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে শক্তি ও শক্তিমান্ যে আত্মা তাহা এক। ধীমানগণ লৌকিক ব্যবহারার্থ এই বিকল্পজালস্বরূপ চিৎশক্তির ভেদসমূহ কল্পনা করেন। বাস্তবিক উহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।

যথোর্ম্মিতরঙ্গপয়সাং সাগরে কটকাঙ্গদ কেয়ূরৈর্ব্বা হেম্নঃ
অবয়বাবয়বিনোঃ সম্বিৎ কাল্পনিকী দ্বিতা ন বাস্তবী ॥৭॥

যেমন জলে ও তরঙ্গে, জলে ও সাগরে; কটক অঙ্গদ কেয়ূরাদি অলঙ্কারে ও সুবর্ণে এবং অবয়ব ও অবয়বীতে ভেদ অবাস্তব-কাল্পনিক, সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির বাস্তবিক ভেদ নাই, অভেদই বাস্তব। যথা—

যচ্চেত্যতে হি তথৈব তন্ন বাহ্যতোনানান্তরতশ্চেতৎ সমুদেতি হি ॥৮॥

রজ্জু যেমন সর্প আকারে চেতিত হয়—বোধ করা হইয়া যায় ব্রহ্মও সেইরূপে বিবর্ত্তিত হন কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত কিছুই হইতেছে না। কারণ এই যে সর্প ইহা রজ্জুর বাহির হইতেও উঠে না,

ভিতরেও উঠে না। ব্রহ্মই এই বিশ্বের আকারে যেন দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বাত্মা বলিয়া ইহা যেন তাঁহারই কোনরূপ প্রকাশ।

সর্ব্বাকারময়ং ব্রহ্মৈবেদং ততং মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিঃ শক্তি শক্তি-মত্বে অবয়বাবয়বিরূপে কল্পিতে ন পারমার্থিকে ॥১০॥

পরমার্থতস্তু ততং বিস্তৃতমিদং সর্ব্বাকারময়ং ব্রহ্মৈব।

ব্রহ্মই সর্ব্ব আকারময় হইয়া বিস্তৃত আছেন এই যে বলা হয় এখানে যদি ভাব শক্তিমান্ ব্রহ্মের অবয়ব হইতেছে এই বিশ্ব আর সৃষ্টিশক্তি আর স্রষ্টা বিভিন্ন, তাহা হইলে বলা যায় যে এইরূপ উক্তি অজ্ঞানীরই কল্পনা—ইহা পারমার্থিক নহে।

সদ্বা ভবত্বসদ্বা চিৎ যৎ সঙ্কল্পয়ত্যভিনিবিশতি
তৎ তৎ পশ্যতি সকলা তৎ সদ্ব্রহ্মৈব চিৎ ভাতি ॥১১॥

[তদভিনিবিশতি = তদ্বিষয়ে উদ্যুক্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ]

সত্যই হউক বা অসত্যই হউক শক্তি সাধু বা অসাধু যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচনা করেন, মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চিৎ সেই সেই বিষয়ে উদ্যুক্ত হয়েন। আর যেমন উদ্যোগ করেন –বিহিত বা নিষিদ্ধ যাহাই হউক না কেন—তাহাই করেন এবং ফলভোগকালে তাহাই দেখেন। অতএব বলা যায় ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশমান আছেন, অন্য কিছুই নাই।

চৈতন্য কিছুই করেন না, করানও না। তিনি থাকাতে তাঁহার শক্তি চৈতন্যদীপ্তা হইয়া সমস্তই করেন। চৈতন্যদীপ্তা যে শক্তি তাঁহা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই ব্রহ্মই। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সে শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন। মিথ্যাজ্ঞানোপহিত চিৎকেই চৈতন্যদীপ্তা শক্তি বলা হইল। ইচ্ছা ব্রহ্মের নহে, ইহা শক্তিরই। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি—ইহা শক্তিরই।

---

৬৪ সর্গঃ।

জীবভাবের উৎপত্তি।

বশিষ্ঠ। যোয়ং সর্ব্বগতো দেবঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ॥
স্বচ্ছঃ স্বানুভবানন্দস্বরূপোঽহন্তাদিবর্জ্জিতঃ॥১
এতস্মাৎ পরমানন্দাচ্ছুদ্ধ চিন্মাত্ররূপিণঃ।
জীবঃ সঞ্জায়তে পূর্ব্বং স চিত্তং চিত্ততো জগৎ॥২

এই যে সর্ব্বগত দেবতা—ইনিই পরমাত্মা মহেশ্বর, ইনি নির্ম্মল, ইনি আপনার অনুভবানন্দস্বরূপ, ইনি আদ্যন্তবর্জ্জিত। এই পরমানন্দ হইতে, এই শুদ্ধ জ্ঞানমাত্ররূপী আত্মা হইতে প্রথমে চিত্তের সহিত জীব জন্মগ্রহণ করে, আবার তাহার চিত্ত হইতে জগৎ জন্মে।

রাম। অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে সখণ্ড সদ্বিতীয় জীবসত্তা কিরূপে জন্মে?

বশিষ্ঠ। সত্যস্বরূপ আপনিআপনি ব্রহ্মে পরমার্থ দৃষ্টিতে জীবসত্তা নাই। কিন্তু অবিদ্যা হইতেই জীবসত্তার সম্ভব।

যাঁহাতে কিছুমাত্র দ্বৈত নাই, যিনি সম্পূর্ণ চলনরহিত, তাঁহার স্বভাবটি হইতেছে মায়া-উপাধি গ্রহণ।

স্বভাবাৎ স্পন্দনং তত্তু জীবশব্দেন কথ্যতে॥ ৬

তস্যোপাধিস্বভাবাৎ যৎ স্পন্দনং—তাঁহার উপাধি-স্বভাব হইতে যে স্পন্দন অর্থাৎ চলনশক্ত্যাত্মক প্রাণধারণ, তাহাই হইতেছে জীব।

ব্রহ্মে চলন নাই। মায়াও গুণসাম্যাবস্থা; এখানেও চলন নাই। কিন্তু মায়া উপাধি গ্রহণ করিলে একটা চলন হয়। মায়াটিই ব্রহ্মের স্বভাব। ঐ উপাধি-স্বভাব হইতেই চলন। এই স্পন্দনস্বভাববিশিষ্ট যিনি, তিনিই জীব। চলনশক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম যেন পরিচ্ছিন্ন মত হয়েন। ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন চলনশক্তিরূপ প্রাণধারণাত্মক যে রূপ উদিত বলিয়া বোধ হয়—তাহাই জীব।

তত্রেমাঃ পরমাদর্শে চিদ্ব্যোম্ন্যনুভবাত্মিকাঃ।
অসংখ্যাঃ প্রতিবিম্বন্তি জগজ্জাল পরম্পরাঃ॥ ৭
ব্রহ্মণঃ স্ফুরণং কিঞ্চিৎ যদবাতাম্বুধেরিব।
দীপস্যেবাপ্যবাতস্য তং জীবং বিদ্ধি রাঘব॥৮

এই চিদাকাশস্বরূপ মহান্ দর্পণে এই অসংখ্য অনুভবাত্মক জগৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। হে রাঘব! বায়ুশূন্য জলধির ন্যায়, নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় ঐ ব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ যে প্রস্ফুরণ, তাহাই জীব।

ব্রহ্মে চলনটা অধ্যারোপ হইলে, তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা যেন অপগত হয়। তখন চিদাকাশের পরিচ্ছেদাত্মক আমি ইত্যাকার যে স্বাভাবিক স্ফুরণ—তাহাই জীব। অগ্নির উষ্ণতা যেমন, তুষারের শীতলতা যেমন—আত্মার চলনরূপ জীবত্বও সেইরূপ। আত্মার জীবভাব স্বভাবসিদ্ধ।

চিদ্রূপস্যাত্মতত্ত্বস্য স্বাভাবশতঃ স্বয়ং।
মনাক্ সম্বেদনমিব যত্তজ্জীব ইতি স্মৃতম্॥ ১১

জ্ঞানস্বরূপ আত্মতত্ত্বের স্বভাবতঃ স্বয়ং যে যৎকিঞ্চিৎ সম্বেদন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপের যে পরিচ্ছেদ তাহাই জীব।

স্বস্য অভাবনমভাবোঽজ্ঞানং তদ্বশতোমনাক্ সম্বেদনং জ্ঞানরূপস্য পরিচ্ছেদ ইব যৎ তৎ।

জীব কে? অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সম্পূর্ণ চলরহিত ব্রহ্মে এক দেশে মায়া ভাসিলে, সেই যে মায়াশবলিত মত ব্রহ্ম, তিনিই আদি জীব প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনিই সমষ্টি জীব তিনিই ঈশ্বর। তাঁহারই ব্যষ্টি-ভাবগুলি এই জীব। কিন্তু এইজীবভাব ও ঈশ্বরভাবও সেই ব্রহ্মেই কল্পিত। শ্রুতি বলেন—"ময়ি জীবত্বমীশ্বত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি" ঈশ্বরভাব ও জীবভাব আমার মায়া আমাতেই কল্পনা করেন।

চিদাকাশের আমি ইত্যাকার যে স্বাভাবিক স্ফুরণ, চিদ্রূপা আত্ম-তত্ত্বের স্বাভাবিক যে যৎকিঞ্চিৎ সম্বেদন বা পরিচ্ছিন্নতা—সেই জীবভাব হইতে কিরূপে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ অহংভাব উঠে, তাহা এখন দেখ।

তদেব ঘনসম্বিত্ত্যা যাত্যহন্তামনুক্রমাৎ।
বহ্ন্যণুঃ স্বেন্ধনাধিক্যাৎ স্বাং প্রকাশকতামিব ॥ ১২

অণুপ্রমাণ বহ্নি যেমন ইন্ধনাধিক্য বশতঃ আপনার প্রকাশকত্ব প্রাপ্ত হয়, অগ্নিকণা ইন্ধন প্রয়োগে যেমন উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ সীমাশূন্য ব্রহ্মের পরিচ্ছেদাত্মক জীব [ঘন সম্বিত্যা—বাসনাদার্ঢ্যেন] দৃঢ় বাসনাবলে, ক্রম অনুসারে অহন্তাবাপন্ন হয়।

ব্রহ্ম যখন আপনিআপনি থাকেন, তখন কোন চলন নাই। মণির ঝলক উঠা যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ তাঁহাতে তাঁহার আত্মশক্তির ঝলক উঠাও স্বাভাবিক। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঝলক উঠেই না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলা হয়, ঝলক উঠে। এই ঝলকটি মায়া। মায়াই ব্রহ্মের স্বভাব। মায়া উঠিলে সেই চতুষ্পাদ ব্রহ্ম যেন খণ্ড-মত হয়েন অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি আপনিআপনিই সর্ব্বদা থাকেন, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মনে হয়—সেই সীমাশূন্য আত্ম-চৈতন্যের এক ক্ষুদ্র দেশে চলনাত্মিকা সঙ্কল্পমালা ভাসে, ভাঙ্গে। সেই সঙ্কল্পজড়িত চেতনই জীব। জীব অগ্নিকণার মত। আর মায়ার মধ্যে যে সঙ্কল্প, তাহাই ইন্ধন। জীবও সঙ্কল্প মিলিত হইলে ঐ সঙ্কল্প যখন ক্রম অনুসারে গাঢ় হয়, তখন জীবে অহংতা মমতারূপ অহঙ্কার ভাসে।

যথা স্বতারকামার্গে ব্যোম্নঃ স্ফুরতি নীলিমা।
শূন্যস্যাপ্যস্য জীবস্য তথাহন্তাবভাবনা ॥ ১৩

স্বস্য দ্রষ্টুস্তারকা কনীনিকোপলক্ষিতং চক্ষুস্তস্য অমার্গে অবিষয়ে ভাগে ব্যোম্নি প্রসৃতং হি চক্ষুর্যাবৎ দূরং গন্তুং ন শক্নোতি, তাবন্নীলিমানং ন পশ্যতি। যত্র তু গত্বা অগ্রে কুণ্ঠী ভবতিঃ ততঃ প্রভৃতি তস্য অমার্গঃ তত্র নৈল্যশূন্যেপি নীলিমা স্ফুরতি। তথা অহন্তাশূন্যস্যাপ্যস্য জীবস্য স্বাবিষয়ে স্বাত্মনি অহন্তাবভাবনেত্যর্থঃ।

নিজের চক্ষুর তারকা অর্থাৎ তারকাবিশিষ্ট চক্ষু আকাশের যে অংশ দেখে না তাহাকে নীল দেখে না। চক্ষুর দৃষ্টি যতদূর গিয়া কুণ্ঠিত

হয়, তাহাই চক্ষের অমার্গ অর্থাৎ চক্ষের দৃষ্টির বাহিরে। সেই অমার্গ নীলিমাশূন্য হইলেও নীলবর্ণ বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ জীবে অহম্ভাব না থাকিলেও, স্বাত্মদর্শনের অভাবে জীব আপনাতে অহম্ভাব ভাবনা করে। আপনাকে অহম্ভাবাপন্ন মনে করে।

জীবোহংকৃতিমাদত্তে সঙ্কল্পকলয়েদ্ধয়া।
স্বয়ৈতয়া ঘনতয়া নীলিমানমিবাম্বরম্॥১৪

সঙ্কল্পকলা পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কারঃ তয়া ইদ্ধয়া উদ্বুদ্ধয়া অর্থাৎ জীব যে অহং অহং করে, তাহা পূর্ব্বসঙ্কল্পের সংস্কার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই করে। আকাশে প্রত্যক্ষ নীলিমা যেমন ভ্রান্তিমাত্র, সেইরূপ জীবের অহংতাও উদ্বুদ্ধ পূর্ব্বসঙ্কল্প সংস্কারের অধ্যাস মাত্র। এই জন্য ইহাও ভ্রান্তি। বাস্তবিক জীবে অহংতা নাই। মায়ার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কার ইহাতে মিথ্যা আরোপিত হয় মাত্র।

জীবের এই অহম্ভাবটাই আত্মাকে দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করে। স্ব সঙ্কল্প বশতই ঐ অহম্ভাব জীবকে দেহধারণ করায়। বায়ুর স্পন্দনের যেমন স্ফুরণ, আত্মার দেহধারণও সেইরূপ।

অহঙ্কার যখন সঙ্কল্পমুখতা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সঙ্কল্পপ্রবল অহংটাই চিত্ত, জীব, মনোমায়া, প্রকৃতি এই সমস্ত নামে অভিহিত হয়। অহম্ভাব অধ্যাসেই এই সমস্ত ভেদ। অহঙ্কারই হয়েন রুদ্র, চিত্তই বিষ্ণু, জীব হইতেছেন ব্রহ্মা। এই ক্রমেই মনোমায়া, প্রকৃতি ইত্যাদি নাম হয়।

তখন সঙ্কল্পময় চিত্ত সঙ্কল্পবলে ভূততন্মাত্র কল্পনা করেন এবং চেতনাত্মক পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইয়া জড়পঞ্চীভাব প্রাপ্ত হয়েন।

চিত্তই তন্মাত্রভাব ও পঞ্চীভাব প্রাপ্ত হইয়া তখন পর্য্যন্ত অনুৎপন্ন আকাশে অস্ফুট-প্রকাশ তারকার ন্যায় তেজঃকণরূপে পরিণত হয়েন।

বীজ যেমন অঙ্কুরত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পঞ্চতা প্রাপ্ত চিত্ত ও সঙ্কল্প দ্বারা তেজঃকণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তেজঃকণ বলে দুর্ল্লক্ষ্য চেতনকে।

জল যেমন ঘনভাব ধারণ করিয়া করকাদি হয়, সেইরূপ সেই

তেজঃকণ কল্পনা দ্বারা খণ্ডতা প্রাপ্ত হয় এবং উহার ভিতরে ব্রহ্মা স্ফুরিত হয়েন। তখন দিব্য দেহাদি কল্পনায় ঝটিতি প্রাপ্ত হইয়া অহম্ভাবশূন্য পদার্থে অহম্ভাবরূপে ভ্রান্তিপ্রাপ্ত হয়েন এবং গন্ধর্ব্বাদি-পালিত অমরাবতী প্রভৃতি পুরীতে গমন করেন। কোথাও এই তেজঃকণ স্থাবর, কোথাও জঙ্গম, কোথাও খেচর ভাব ধারণ করেন। এই সমুদায়ই তাঁহার স্বীয় সঙ্কল্প মহিমায় হয়।

সৃষ্টির প্রথমে সঙ্কল্পসম্ভূত যে প্রথম জীবদেহ তাহাই ক্রমে ব্রহ্মা হয়েন এবং জগৎ নির্ম্মাণ করেন! প্রজাপতি যাহা সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ স্বভাব বশতঃ তিনি তৎস্বরূপে পরিণত হন। চিৎস্বভাব বশতঃ তিনি সকলের কারণস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন এবং পরে সাংসারের কারণ হইয়া কর্ম্ম নির্ম্মাণ করিতে থাকেন।

চিত্তং স্বভাবাৎ স্ফুরতি চিতঃ ফেন ইবাম্ভসঃ।
কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে পশ্চাড্ডিণ্ডীরমিব রজ্জুভিঃ ॥২৬

ডিণ্ডীরং = ফেনপিণ্ডঃ।

জ্ঞানস্বরূপ যে চিৎপদার্থ, তাহার স্বভাব হইতেই চিত্তটি স্ফুরিত হয়। জলের স্বভাব হইতে যেমন ফেনা জন্মে সেইরূপ। চিত্ত তাহার পরে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। ফেনপিণ্ড যেমন নৌকাবন্ধন-রজ্জু দ্বারা নিরুদ্ধ হয় সেইরূপ। রাম! বুঝিতেছ—চিৎবস্তুটি হইতেছে জ্ঞান। এই জ্ঞান যখন আপনিআপনি থাকেন তখন ইনি কোনরূপেই স্ফুরিত হন না। কিন্তু জ্ঞানের স্বভাব হইতেছে স্ফুরণ হওয়া। "চিতঃ স্বভাবাৎ চিত্তং স্ফুরতি"। চিতের স্বভাব হইতে চিত্তের স্ফুরণ হয়। জলে ফেনা যেমন, চিদ্বস্তুতে চিত্তও সেইরূপ। নৌকাবন্ধন রজ্জুদ্বারা যেমন ফেনাটা রুদ্ধ হয়—জল কিন্তু রুদ্ধ হয় না—সেইরূপ চিত্তটা দেহনিবন্ধন কর্ম্মরজ্জু দ্বারাই আবদ্ধ হয় চিদাত্মা বদ্ধ হন না। চিত্তস্পন্দন-কল্পনাই হইতেছে কর্ম্মের সূক্ষ্মাবস্থা। কল্পনাই কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। এই চিত্তস্পন্দন-কল্পনাই কর্ম্মরূপে চিত্তকে বন্ধন করে। চিত্ত, কর্ম্মের ফল

যে সুখ ও দুঃখ তাহা দ্বারাই আবদ্ধ হয়। ইহা হইতেই রাগ দ্বেষ জন্মে। রাগ দ্বেষই চিত্তমল। ইহাই চিত্তকে বদ্ধ করে।

সঙ্কল্পঃ কলনাবীজং তদাত্মৈব হি জীবকঃ।
কর্ম্ম পশ্চাৎ তনোত্যুচ্চৈরুত্থায়াকর্ম্মতঃ ক্রমাৎ ॥২৭

কলন—কলয়তি অনেন। কল—গতৌ গত্যর্থস্য জ্ঞানার্থত্বাৎ জ্ঞানে। কলনা—জ্ঞানে গ্রহণে আমোচনে ইত্যাদি। কলনা হইতেছে ত্যাগগ্রহণাত্মক গতিশীল যাহা কিছু। এই জগৎকে গতিশীল বলা হয়। গতিশীল এই জগতের সমস্ত বস্তুর বীজ হইতেছে সঙ্কল্প। আবার সঙ্কল্পের আত্মা হইতেছেন জীবচৈতন্য। কলনার সর্ব্বপ্রকার গতির বীজ হইতেছে সঙ্কল্প। আবার সঙ্কল্পকে বিস্তার করেন জীবচৈতন্য। জীবচৈতন্য হইতেছেন চলনরহিত অকর্ম্ম অবস্থা। এই অকর্ম্ম অবস্থা হইতে ক্রম অনুসারে উত্থিত হইয়া জীব পরে কর্ম্ম বিস্তার করেন। (অকর্ম্মতঃ নিষ্ক্রিয়াত্মসন্নিধানাদিতি যাবৎ)

আমরা যেমন প্রথমে নিঃসঙ্কল্প থাকি—পরে সঙ্কল্প দ্বারা মনে মনে ঘটপটাদি রচনা করি—পশ্চাৎ তাহাই বাহিরে গড়ি, সেইরূপ জীবচৈতন্যও নিষ্ক্রিয় পরমাত্মচৈতন্যের সন্নিধান বশতঃ নিষ্ক্রিয়ই থাকেন। জীব সেই নিষ্ক্রিয়ভাব হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্কল্প রচনা করেন, পশ্চাৎ কর্ম্মকলাপ বিস্তার করেন।

ক্রোড়ীকৃতাঙ্কুরং পূর্ব্বং জীবোধত্তে স্বজীবিতম্।
পশ্চাৎ নানাত্বমায়াতি পত্রাঙ্কুরফলক্রমৈঃ ॥ ২৮

সঙ্কল্প হইতেছে বীজ। বীজের অন্তরে জীব। জীবের জীবন হইতেছে বীজের অন্তর্ধৃত অঙ্কুরবৎ। অঙ্কুর হইতে পরে পত্র, কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্প, ফল ক্রম অনুসারে এক বীজই নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। আদি জীব হিরণ্যগর্ভ হইতেও সেইরূপে নানা হয়।

যথা বীজস্থো জীবঃ পূর্ব্বং ক্রোড়ীকৃতঃ সূক্ষ্মতয়ান্তর্ধৃতঃ অঙ্কুরো যেন তথাবিধং স্বজীবিতং ধত্তে পশ্চাৎ ত্বঙ্কুর পত্রকাণ্ড শাখাপল্লব পুষ্পফল ক্রমৈর্নানাত্বমায়াতি তথা হিরণ্যগর্ভ জীবোপীত্যর্থঃ।

বীজের অন্তরে অঙ্কুর প্রথমে সূক্ষ্মভাবে থাকে। বীজ সূক্ষ্মভাবে অন্তরে অঙ্কুর ধারণ করে। পরে সেই অঙ্কুরই সহকারী কারণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া পত্র, কাণ্ড শাখা, পল্লব, পুষ্প, ফল ক্রমে নানা আকার ধারণ করে। আদি জীব বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্ধৃত জীবনস্বরূপ এই বিচিত্র সূক্ষ্ম সৃষ্টিও প্রথমে অঙ্কুর মত থাকে। সঙ্কল্পের অন্তরে এই আদি জীব হিরণ্যগর্ভ। এই আদি জীবের জীবনস্বরূপ এই বিচিত্র সৃষ্টি প্রথমে তাঁহার মধ্যে অঙ্কুররূপেই থাকে। ক্রমে এই অঙ্কুরই সৃষ্টিরূপে ফুটিয়া উঠে। বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর তাহার সহকারী কারণ হইতেছে জল, মৃত্তিকাইত্যাদি। সেইরূপ হিরণ্যগর্ভের অন্তস্থিত সৃষ্টি-অঙ্কুর তপস্যাজলরূপ সহকারী কারণ দ্বারা নানাঙ্গ ধারণ করে।

অন্যে স্ব এব যে জীবা এবমেবাকৃতিং গতাঃ।
পূর্ব্বোৎপন্নে জগতি তে যান্তি ভূতাশ্রয়াং স্থিতিম্ ॥২৯

অন্যান্য ব্যষ্টি জীবও আপন আপন বাসনাতে স্থিত দেহাদি আকার প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোৎপন্ন জগতে ইহারাই মাতা পিতা প্রভৃতিরূপে যেরূপ ছিল, সেইরূপ দেহলাভই প্রাপ্ত হয়। [স্থিতিং দেহলাভম্] পরে জন্মমৃত্যুর কারণস্বরূপ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ঊর্দ্ধদেশে বা অধোদেশে গমন করে। এই সমস্ত কর্ম্ম কি? আপন আপন চিত্তস্পন্দনই জীবের কর্ম্ম।

বেশ করিয়া স্মরণ রাখ—চিতের স্বভাব হইতে চিত্তের স্ফুরণ। চিত্ত হইতেছে সঙ্কল্পময়। সঙ্কল্প হইতেছে সৃষ্টির বীজ। বীজের মধ্যে যেমন বীজের জীবনস্বরূপ অঙ্কুর থাকে সেইরূপ সঙ্কল্পবীজের অন্তরে আত্মাভাবে জীব থাকেন। জীবের জীবন যাহা, তাহাই বহু হইয়া প্রকাশ হইবার অঙ্কুর। এই অঙ্কুর হইতেই দেহাদি আকার বিশিষ্ট সৃষ্টি।

চিৎস্পন্দনং ভবতি কর্ম্ম তদেব দৈবং
চিত্তং তদেব ভবতীহ শুভাশুভাদি।
তস্মাৎ জগতি ভুবনানি ভবন্তি পূর্ব্বং
ভূত্বা নিজাঙ্গকুসুমানি তরোরিবাত্মাৎ ॥

যাহা কৰ্ম্ম তাহাই চিৎস্পন্দ। তাহাই দৈব, তাহাই শুভাশুভ-লক্ষণ চিত্ত। "তরোর্নিজাঙ্গানি শাখাদীনি কুসুমানি চ যথা প্রাগ্‌ভূত্বা পুনর্ভবন্তি তথা আদ্যাৎ কারণাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ তস্মাৎ চিৎস্পন্দন লক্ষণাৎ শুভাশুভ লক্ষণাৎ কর্ম্মাণোনিমিত্তাৎ জগন্তি ভোক্তৃ প্রাণি-নিকায়াস্তদাধার তদ্ভোগ্য ভুবনানি চ পুনঃ পুনর্ভবন্তীত্যর্থঃ"।

তরুর নিজ অঙ্গস্বরূপ শাখা কুসুমাদি প্রথমে সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যেমন পরে উৎপন্ন হয় সেইরূপ আদি কারণস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে চিৎ-স্পন্দন—তাহা হইতে শুভাশুভ কৰ্ম্ম নিমিত্ত ভোক্তৃ প্রাণিসমূহ তাহাদের আধার তাহাদের ভোগ্য ভুবনসমূহ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়।

রাম। ব্রহ্মই ত চিৎ। ব্রহ্ম ত চলনরহিত অস্পন্দ। তবে চিৎস্পন্দ কি?

বশিষ্ঠ। পরে আরও বিশদ করিয়া বলিব। এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, চিৎ আপনার স্বাভাবিক চিৎ ভাবকে অর্থাৎ স্বভাবকে স্বাশ্রিত অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান দ্বারা চিত্ত বলিয়া কল্পনা করেন অথাৎ চিৎ আপনিই আপনার দৃশ্য হয়েন—ইহাই চিৎস্পন্দ। চিতের এই যে স্পন্দন তাহাই সংসার আর অস্পন্দনটিই ব্রহ্ম। চিৎস্পন্দনই জীব এবং সংসারের বীজ।

---

৬৫ সর্গঃ।

ব্রহ্ম-চিত্ত-জীব-অহম্ভাব-চিত্ততা-ইন্দ্রিয়-দেহভ্রম-কৰ্ম্ম।

রাম। চিৎ চিত্ত, হিরণ্যগর্ভ, জীব ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আর একবার বলুন। এমন সহজ করিয়া বলুন যাহা সাধারণেও আয়ত্ত করিতে পারে।

বশিষ্ঠ। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের পাদৈক দেশে মন ভাসে। এই মনই

মায়া। এই মন সঙ্কল্পময়। সঙ্কল্প ঘন হইয়া স্থূল দৃশ্য হয়। ভোগ্য যাহা কিছু তাহাই এই জন্য মনোময়। সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারটি প্রথমেই উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। পরে ব্যাখ্যা শুনিও। পরমপদ বা আত্মা—আত্মার চেত্যোন্মুখতা বা শক্তির স্ফুরণ হইতেছে—সৃষ্টির উদ্রেক—চিত্ত-জীবত্ব-অহম্ভাব-চিত্ততা বা তন্মাত্র-ইন্দ্রিয়াদি-দেহ-মোহাদি।

রাম। এখন ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ। পরস্মাৎ কারণাদেব মনঃ প্রথমমুত্থিতং।
মননাত্মকমাভোগি তৎস্থমেব স্থিতিং গতম্ ॥১
ভাবাভাবলসদ্দোলং তেনায়মবলোক্যতে।
সর্গঃ সদসদাভাসঃ পূর্ব্বগন্ধ ইবেচ্ছয়া ॥২

পরমকারণ পরমপদ যিনি, তিনি চলনরহিত। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বদাই চলন-রহিত—আপনি আপনি। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহার অবিদ্যাপাদের একদেশে চলনাত্মিকা মায়া ভাসে। ইহাই মন। তাই বলা হইতেছে, পরমকারণ হইতে প্রথমে মন উৎপন্ন হয়।

মনন করাটাই ভোগ। মনই ভোক্তা। কিন্তু ভোগ্যবস্তু না থাকিলে ভোগ হইবে কিরূপে ? তাই বলা হইতেছে—ভোগ্য যাহা কিছু তাহাই মনোময়। আবার ভোগ্য দৃশ্যবস্তুর স্থিতিও মনে। মনের কারণ বলা হইল পরমপদ। এজন্য তরঙ্গ যেমন জল হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ মনও আপনার কারণ সেই পরমপদ হইতে অন্য নহে। মণির যেমন ঝলক হয়, মেঘে যেমন বিদ্যুৎ খেলে, সেইরূপ পরমপদে যখন স্বভাবতঃ ঝলক উঠে, তখন ঝলকজড়িত পরমপদ যেন খণ্ডমত হয়েন। ইনি আপন স্বরূপ যেন একবার বিস্মৃত হন—হইয়া সৃষ্টিটা দেখেন, আবার স্মরণ করিয়া যেন স্বরূপ দেখেন। পূর্ব্বানুভূত গন্ধ স্মরণের যে ইচ্ছা সেইরূপ ইচ্ছা দ্বারা মন, সৎ ও অসদের আভাস এই সৃষ্টিকে অবলোকন করেন।

মণি ও ঝলকের যে ভেদ অথবা ব্রহ্ম ও সৃষ্টির যে ভেদ সেটা মনঃকল্পিত। যেহেতু ইহা মনঃকল্পিত সেই জন্য মনের অপগমে

ভেদের অপগম হয় এবং একের প্রতিষ্ঠা হয়। মনের বিলয়ে যখন এক অদ্বয় আত্মা অবস্থিতি করেন, তখন কোন ভেদ থাকে না অর্থাৎ ব্রহ্মা, জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ এ সকল ভেদ তখন লোপ পায়।

অপারাবারবিস্তার সম্বিৎ সলিল বল্গনৈঃ।
চিদেকার্ণব এবায়ং স্বয়মাত্মা বিজৃম্ভতে ॥৪

ভেদের অপগমে আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। আত্মা সম্বিৎ লক্ষণ জলরাশির সীমাশূন্য প্রসার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াই থাকেন। আত্মা যেন সম্বিৎরূপ সীমাশূন্য সলিলসঙ্কুল চিৎসমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন।

অসত্যমস্থৈর্য্যবশাৎ সত্যং সম্প্রতি ভাসতঃ।
যথা স্বপ্নস্তথাচিত্তং জগৎ সদসদাত্মকম্ ॥৫

জ্ঞানসলিলময় একার্ণবে আত্মা বিজৃম্ভিত। এই আত্মাই সম্পূর্ণ চলনরহিত সত্যবস্তু। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভিতরে সঙ্কল্পময় চিত্ত জগৎ এবং বাহিরে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই স্থূল জগৎ আত্মমায়ায় ভাসিয়াছে। ভিতরে সংস্কার-স্মরণরূপ স্বপ্ন-জগৎ আর বাহিরে দৃশ্যদর্শনরূপ জাগ্রৎজগৎ—এই দুই জগৎ যখন না থাকে তখন আত্মা কিরূপ ভাবে থাকেন? সৎস্বরূপে অবস্থান করেন। এই যে পরি-দৃশ্যমান জগৎ এবং সঙ্কল্পময় চিত্তজগৎ ইহা সেই পরমশান্ত আত্মাকে লইয়াই ত অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে? তবে এই স্থির ও অস্থির এই উভয় সম্বলিত জগৎকে সৎ ও অসদাত্মক বল। এই সৎ ও অসদাত্মক জগতের অস্থিরাংশ বাধ হইলে, স্থির শান্ত চলনরহিত যিনি, তিনিই থাকেন।

চিত্ত ও জগৎ অস্থির বলিয়া অসত্য। কিন্তু সেই অসত্য স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ সম্প্রতি সত্যরূপেই ভাসিতেছে। স্বপ্নটি যে পদার্থ, চিত্তটিই তাই। আর জগৎটি তাই। ইহারা সৎ ও অসৎ উভয়ই। সৎ হইতেছেন আত্মা, অসৎ হইতেছে মায়ার খেলা—এই ভিতরের সঙ্কল্পময় চিত্তজগৎ ও বাহিরের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ।

চিত্তের এই জগদ্দর্শন ভ্রমটা সৎ ও নয়, অসৎও নয় এবং হয়ও নাই। আচ্ছা এই সবই যদি মিথ্যা হইল, তবে বহুলোকের এক প্রকার জগৎভ্রান্তি কিরূপে হইতেছে যদি ইহা জিজ্ঞাসা কর—ইহার উত্তরে বলি—ইন্দ্রজাল-মায়াক্ষুব্ধ সকল লোকের বুদ্ধি একরূপেই কার্য্য করিতেছে—তাই একরূপ ভ্রান্তিই সবাই দেখিতেছে। দেখনা ইন্দ্র-জালটা ত ভ্রম। কিন্তু সকল দর্শকই ভ্রমটাকে একরূপই দেখে।

মন বা চিত্ত দ্বারাই অর্থাৎ মনঃকৃত আসক্তি দ্বারাই সংসার নামক দীর্ঘ স্বপ্ন স্থিতিলাভ করিতেছে। সম্যক্ দর্শনের অভাবেই মানুষ স্থাণুতে পুরুষ দর্শন করে।

রাম। আত্মার এই যে চিত্ত হওয়া ইহাত নিতান্ত দুঃখের অবস্থা। কারণ ইহাতে আপনার পূর্ণ আনন্দভাবের প্রচ্যুতি ত হয়। তথাপি চিত্ত ও জগদ্দর্শন-ব্যাপারে আনন্দচ্যুত হইয়াও ত আত্মা দুঃখ করেন না ইহার কারণ কি ?

অনাত্মালোকনাচ্চিত্তং চিত্তত্বং নানুশোচতি।
বেতাল কল্পনাদ্বাল ইব সঙ্কল্পিতে ভয়ে ॥৮

আত্মাকে না দেখাই হইতেছে অনাত্মালোকন। ইহাই হইতেছে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান। এই অজ্ঞান জন্যই চিত্তত্ব। আত্মা চিত্তভাব প্রাপ্ত হইলেও চিত্তভাবকৃত অনর্থে শোক করেন না—যেমন বালক বেতাল কল্পনা করিয়া, ভয়ে সেই কল্পনাতে এরূপ অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হয় যে সেই বেতাল কল্পনাতে অনুশোচনা করে না সেইরূপ।

রাম। চিতের চেত্যতাটাই সমস্ত অনর্থের মূল। ইহাই ইহার স্বভাব ইহাও বলিতেছেন।

বশিষ্ঠ। হাঁ শ্রবণ কর।

অনাখ্যস্য স্বরূপস্য সর্ব্বাশাতিগতাত্মনঃ।
চেত্যোম্মুখ তয়া চিত্তং চিত্তাজ্জীবত্ব কল্পনম্ ॥৯
জীবত্বাদপ্যহন্তাবস্তুহন্তাবাচ্চ চিত্ততা।
চিত্তত্বাদিন্দ্রিয়াদিত্বং ততো দেহাদি বিভ্রমাঃ ॥১০

দেহাদিমোহতঃ স্বর্গনরকৌ মোক্ষবন্ধনে।
বীজাঙ্কুরবদারম্ভ সংরূঢ়ে দেহকর্ম্মণোঃ ॥১১

আত্মার—নির্ব্বীজ আত্মার—কোন নাম নাই বলিয়া ইনি অনাখ্য। আপনি আপনি স্বরূপের নাম থাকিবে কাহার কাছে বল? এই আত্মা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পকে দূরে রাখিয়াছেন। ইনি সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত পরমশান্ত সম্পূর্ণ চলনরহিত। এই চিতের স্বভাব হইতেছে চেত্যোন্মুখতা বা চেত্যতা। ইহাই হইতেছে সৃজনেচ্ছা। প্রকৃতির গুণসাম্য ভেদই চেত্যোন্মুখতা। ইহাই হইতেছে আত্মার চিত্তভাব গ্রহণ। চিত্ত হইতে জীবত্ব কল্পনা। জীবত্ব হইতে অহম্ভাব। অহম্ভাব হইতে আবার চিত্ততা। চিত্ততা হইতেছে চিত্তের বিষয়-তন্মাত্রারূপে পরিণতি। চিত্তত্ব হইতে ইন্দ্রিয়ত্ব। ইন্দ্রিয়াদি ভাব গ্রহণ হইতে দেহাদি ভ্রম। দেহ-ভ্রম জন্য অহংতা, মমতা, ইহা হইতে স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, বন্ধন ইত্যাদি। দেহ হইতে কর্ম্ম, আবার কর্ম্ম হইতে দেহ। এই সমস্ত আরম্ভ সংরূঢ় বীজাঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে।

দ্বৈতং যথা নাস্তি চিদাত্মজীবয়োঃ
তথৈব ভেদোঽস্তি ন জীবচিত্তয়োঃ।
যথৈব ভেদোঽস্তি ন জীবচিত্তয়োঃ
তথৈব ভেদোঽস্তি ন দেহকর্ম্মণোঃ ॥১২

চিদাত্মা ও জীবের যেমন বাস্তব ভেদ নাই, সেইরূপ জীব ও চিত্তেরও ভেদ নাই। জীব এবং চিত্তের যেমন ভেদ নাই, সেইরূপ দেহ এবং কর্ম্ম এই দুয়েও ভেদ নাই।

কর্ম্মৈব দেহো ননু দেহ এব
চিত্তং তদেবাহমিতীহ জীবঃ।
স জীব এবেশ্বর চিৎ স আত্মা
সর্ব্বঃ শিবস্ত্বেকপদোক্তমেতৎ ॥১৩

বাস্তবিক কর্ম্মই এই দেহ। কর্ম্ম ভিন্ন পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট দেহ নাই। কর্ম্মই দেহ, দেহটাই চিত্ত। চিত্তই অহম্ভাববিশিষ্ট জীব। জীবই ঈশ্বর; ঈশ্বরই চিৎ; চিৎই আত্মা। সমস্তই তবে একমাত্র শিব। শিব ভিন্ন অন্য কিছুই জগতে নাই। সমস্তই শিব ব্রহ্ম।

---

৬৬ সর্গঃ।

সংসার-নিবৃত্তি।

বশিষ্ঠ। সংসার কিরূপে হইতেছে দেখ, তবেই সংসার-নিবৃত্তি করিতে পারিবে।

রাম। এখন আর একবার সৃষ্টিক্রমের সঙ্গে সংসার-নিবৃত্তির কথা বলুন।

বশিষ্ঠ। শ্রবণ কর।

এবমেকং পরং বস্তু রাম নানাত্বমেত্যলম্।
নানাত্বমিব সঞ্জাতং দীপাৎ দীপশতং যথা॥১

পরম বস্তু একটিই। সেই এক পরম বস্তুই নানারূপে প্রতীত হইতেছেন। যেমন নানাত্বপ্রাপ্ত দীপশত এক দীপ হইতেই জাত সেইরূপ।

রাম। একই কি বহু হইতেছেন?

বশিষ্ঠ। না। এক পরম বস্তুই স্বভাবতঃ যেন চেত্যতা-বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হন। চেত্যের নানাত্বই হয় বলিয়াই চিৎও যেন নানাত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রুতিও এই কথা বলেন—**অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ইতি।** অগ্নি এক, কিন্তু কাষ্ঠাদি বহুরূপ বলিয়া অগ্নিকে বহুরূপ দেখায়।

যথাভূতমসদ্রূপং আত্মানং যদি পশ্যতি।
বিচার্যতেস্তস্তদনু-ভাবহীনং ন শোচতি॥২

অগ্নির বহুরূপ গ্রহণের মত আত্মার বহুরূপ গ্রহণটা একবারে মিথ্যা। বিচার দ্বারা দ্বৈতাভিনিবেশ হীন আত্মাকে রূপ গ্রহণাদি অসৎ ভাব বর্জ্জিত করিয়া যদি দেখিতে পার তবে শোক করার কিছুই থাকে না। চেত্যোন্মুখতাই চিত্ত। চিত্তই জীবত্ব কল্পনা করে। জীবত্ব কল্পনা দ্বারাই বন্ধন আবার চিত্তই যখন কল্পনা—ত্যাগরূপ বিচার বোধ প্রাপ্ত হয় তখন মুক্ত হয়। তবেই হইল বিচার দ্বারা আত্মাকে নামরূপ শূন্য দেখাই মুক্তি। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব যাহা তাহা নামরূপ বর্জ্জিত।

চিৎটিই বস্তু। চিতের একটি স্বভাব হইতেছে চেত্যতা বা বিষয়োন্মুখতা। চেত্যতা প্রাপ্ত যে চিৎ তাহাই চিত্ত। চেত্যতা প্রাপ্ত মত চিৎ যখন আপনার অখণ্ড স্বরূপ বিস্মৃত হয়েন তখনই ইনি যেন খণ্ড মত হয়েন। ইহাই জীবভাব। চেত্যতাপ্রাপ্ত চিৎই ভ্রম বশতঃ আপনিই আপনার জন্ম বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা মরণ, স্বর্গ গমন, নরক পতন ইত্যাদি বিবিধ নৃত্য দর্শন করিতেছেন। চেত্যভাব প্রাপ্ত চিৎই বলেন

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রা মিত্র মরাতয়ো বসুবলং বিদ্যাসুহৃদ্বান্ধবাঃ।
চিত্তস্পন্দিত কল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি।

আমি জন্মিয়াছি, ইনি আমার জনক, ইনি জননী, এই আমার দেহ, এই স্ত্রী, এই কুল, এইসব পুত্র কন্যা, এই মিত্র, এই শত্রু, এই ধন, এই বল, এই বিদ্যা, এই সুহৃৎ, এই বান্ধব—অবিদ্যাময়ী মায়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া জীব এই সকল চিত্তস্পন্দন কল্পনা অনুভব করেন। অবিদ্যাময়ী নিদ্রার ঘোরে এই স্বপ্ন তিনিই দেখেন। যেমন আকাশে পরস্পর সংশিষ্ট অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ পরম্পরা দেখাইবার সামর্থ্য সুরার আছে সেইরূপ চিত্তেরও বিচিত্র সৃষ্টি দেখাইবার সামর্থ্য আছে। চিত্ত সমাক্রান্ত চিৎই বহুবিধ সংসার ভ্রান্তি দর্শন করেন। যেমন মাতাল প্রমত্ত হইয়া বৃক্ষকে ভ্রমণ করিতে দেখে সেইরূপ চিত্ত সমাক্রান্ত

চিৎও সংসার দর্শন করেন। চেত্যতা প্রাপ্ত না হইলেই চিত্তের বিষয় দর্শন উপশান্ত হয়। চেত্য না থাকিলেই চিত্তের বিষয় দর্শন লুপ্ত হয়। দৃশ্য দর্শন শূন্য হওয়াই নির্ব্বিকল্প সমাধি। এই অবস্থায় ব্যবহার রত থাক বা না থাক তুমি মুক্ত। অল্প নেশায় মাতলামি বেশী কিন্তু অধিক নেশায় বুঁদ হওয়া একবারে জড়বৎ পড়িয়া থাকা। সেইরূপ চৈতন্যের অল্প প্রকাশেই চিত্তের চেত্য দর্শন কিন্তু চৈতন্যের নিবিড়তায় চেত্য দর্শনের উপশান্তি। ঘনতাপ্রাপ্ত, নিবিড় চৈতন্যই পরমপদ।

চিত্ত যাহা অনুভব করে, যাহা দেখে তাহাই চেত্য। সে দর্শনটা কিন্তু রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায়। রজ্জুতে সর্প দর্শনটা যেমন ভ্রান্তি বশতঃই হয় সেইরূপ চিত্তের চেত্য দর্শনও সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সংসার মিথ্যা আত্মাই সত্য সমকালে ইহার অভ্যাস ভিন্ন সংসার ভ্রমের নিবৃত্তি হইবে না।

বাহিরে দৃশ্য দর্শন ও ভিতরে বাসনা ত্যাগ ইহা যখন করিতে পারিবে তখনই মুক্ত হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিলেই দেখিবে আত্মা সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত। তুমি এই মুহূর্ত্তেই ভাবনা কর আমার কোন সঙ্কল্প নাই। এই ভাবে কিন্তু থাকিতে পারিবে না। কিন্তু ঘটাকাশ যেমন আকাশ ধরিয়া মহাকাশ চিন্তা করে সেইরূপ তোমার আত্মার পূর্ণতা স্বরূপ যে তোমার ইষ্টদেবতা যিনি সমকালে অবতার, আত্মা, বিশ্বরূপ ও নির্গুণ সেই ইষ্টের ধ্যান কর, চিত্তকে তাহাতেই আটকাইয়া রাখ দেখিবে সঙ্কল্প আর উঠিতেছে না। সমকালে তত্ত্বাভ্যাস এবং বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়।

সহজ কথা সকল অভিলাষ ত্যাগ কর তুমি মুক্ত হইবে। যাহাতে আসক্ত হও, যাহার জন্য প্রবল অভিলাষ কর, তাহার জন্য প্রাণকেও তৃণবৎ ত্যাগ করিতেও ত কষ্টবোধ কর না, তবে অভিলাষ মাত্র ত্যাগের জন্য কৃপণতা করিবার কারণ কি ?

অপি প্রাণাংস্তৃণমিব ত্যজন্তীহ মহাশয়াঃ।

যত্রাভিলাষ স্তন্মাত্র ত্যাগে কৃপণতা কথম্ ॥২২

অভিলষণীয় ত্যাগ কর আর অভিলাষ ত্যাগ কর, করিয়া নিশ্চল নিষ্কম্প নির্ব্বিকারচিত্তে অবস্থান কর এই মুহূর্ত্তেই কৃতার্থ হইবে। ইহা কর দেখিবে আত্মা জন্মেন না, মরেনও না, সর্ব্বদা সমভাবে সর্ব্বত্র তিনিই আছেন; ইহা করতলস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায়, সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায় প্রত্যক্ষ।

আত্মৈব ভাতি জগদিত্যুদিতস্তরঙ্গৈঃ

কল্লান্ত একইব বারিধিরপ্রমেয়ঃ।

জ্ঞাতঃ স এব হি দদাতি বিমোক্ষ সিদ্ধিং

ত্বজ্ঞাত এব মনসে চিরবন্ধনায় ॥২৫

আত্মাই অজ্ঞদৃষ্টিতে জগৎবেশে আবির্ভূত হইয়া ভাসিতেছেন যেমন এক অপ্রমেয় সমুদ্রই তরঙ্গ ভেদ দ্বারা নানাকারে প্রতিভাত হয় সেইরূপ। আত্মাকে জান দেখিবে মোক্ষ ও সিদ্ধি করস্থ হইয়াছে। যতদিন তাঁহাকে না জানিতে পারিতেছ ততদিন সংসার বন্ধনে যাতনা পাইবে।

বুঝিলেত ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা উভয়ই কিন্তু অভিলাষ, সব অভিলাষ ত্যাগ কর সংসার নিবৃত্তি হইবে, স্বরূপ বিশ্রান্তি পাইবে।

---

৬৭ সর্গঃ।

পরমাত্মা আমার কে?

ভ্রমে সংসার ভ্রমণ—সত্য উপদেশ।

রাম। মায়া আশ্রয় করিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন সগুণব্রহ্ম হয়েন সেইরূপ মনকে উপাধি করিয়াই চৈতন্য জীব নামে অভিহিত হয়েন। মন উপাধিবিশিষ্ট যে চৈতন্য তিনিই জীব। এই জীব পরমাত্মার কে ইহাই আর একবার বিশদ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ। পরম শান্ত সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত চতুষ্পাদ গুণাতীত ব্রহ্মই হইতেছেন আপনি আপনি স্থিতি; ইঁহাকে প্রকাশ করিবারও কেহ নাই; কোন কিছু সেখানে নাই বলিয়া কোন কিছু দিয়াই সেই পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। ইনি স্বপ্রকাশ। অথচ এই তুরীয় ব্রহ্ম **নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।** এই তৃতীয়, বিশ্বপুরুষ নহেন, তৈজসও নহেন, জাগ্রৎ স্বপ্নের সন্ধিরূপ মধ্য অবস্থাও নহেন। ইনি সুপ্তপুরুষও নহেন ইনি সর্ব্বজ্ঞও নহেন। ইনি অচেতনও নহেন।

শ্রুতি আবার বলেন ইনি **অদৃষ্টং অব্যবহার্য্যং অগ্রাহ্যং অলক্ষণং অচিন্ত্যং অব্যপদেশ্যং একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।**

ইঁহার একটি স্বভাব হইতেছে মায়া। মণির ঝলকের মত মায়া যেন ইঁহাতে উঠে বলিয়া বোধ হয়। আজকালকার বিজ্ঞানে বলে মণিতে ঝলক উঠেই না। তথাপি মনে হয় যেন উঠে। পরব্রহ্মে মায়া উঠাও সেইরূপ।

মায়াই সর্ব্বশক্তি। মায়া সমাশ্রিত হইলেই নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণব্রহ্ম বলা হয়। সগুণ ব্রহ্ম যিনি তিনি মায়াসমাশ্রিত বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্। ব্রহ্মের স্ফুরণ বলিয়া কোন কিছুই নাই। শক্তিরই অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনকে স্ফুরণ বলা হয়। ইহাই শক্তির স্ফুরণাবস্থা। ব্রহ্মে যখন যে শক্তির স্ফুরণ হয় ব্রহ্ম তখন আপনাকে সেই শক্তিসম্পন্ন দেখেন।

সমস্ত শক্তি খচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরং সদা।
যয়ৈব শক্ত্যা স্ফুরতি প্রাপ্তাং তামেব পশ্যতি ॥২

তাই স্বয়ং যাং বেত্তি সর্ব্বাত্মা চিরং চেতনরূপিণীং।
সা প্রোক্তা জীব শব্দেন সৈব সঙ্কল্পকারিণী ॥৩

চিরং=অনাদি কালাৎ॥ চেতনরূপিণীং=চিত্তসংস্কারোপহিত চিদ্রূপাম্। সর্ব্বাত্মা সগুণব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে যে চিৎরূপিণী—জ্ঞান-

রূপিণী আপন শক্তিকে জানিতেছেন সেই চৈতন্যরূপিণাশক্তিই জীব। এই শক্তি আবার সঙ্কল্পকারিণী। শ্রীগীতাও বলিতেছেন জীবরূপা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। জীব যিনি তিনি ব্রহ্মের পরা-প্রকৃতি।

স্বভাবাৎ কারণং দ্বিত্বং পূর্ব্বসঙ্কল্প চিৎস্বয়ং।
নানা কারণতাং পশ্চাৎ যাতি জন্মমৃতি স্থিতেঃ ॥৪

মণির ঝলকের মত এই যে আত্মাতে শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণের মত একটা বোধ হয় তাহাই আত্মাতে স্বাভাবিক দ্বৈতভাব। এই দ্বিতীয়ত্বটিই উত্তর কালে সংসার প্রবৃত্তির মুখ্যকারণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবাসিত জীবচৈতন্যই হইতেছে পশ্চাত্তন বৈচিত্র্যের হেতু।

চিৎশক্তিটি চিত্তসংস্কারময়ী। চিত্ত কাহাকে বলা হইতেছে লক্ষ্য কর।

চিৎ যিনি তাঁহার দুই স্বভাব। একটি স্পন্দস্বভাব আর একটি অস্পন্দস্বভাব। অস্পন্দ স্বভাব যে চিৎ তাহাই শান্ত চলন রহিত ব্রহ্ম। স্পন্দ স্বভাব যে চিৎ তাহাই উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন। চিতের এই উল্লাসই হইতেছে সৃষ্ট্যুন্মুখতা। চিৎ আপনার স্পন্দ স্বভাব দ্বারা যখন সৃষ্ট্যুন্মুখতা প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ যখন চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন তখন ঐ স্পন্দমাখা চিৎটিই চিত্ত নাম ধারণ করেন। স্পন্দন হইতেছে সঙ্কল্প। বুঝিলে চিত্ত কোন্ বস্তু?

রাম। এইখানে বলুন দৈব কর্ম্ম কারণ এ সব কি?

বশিষ্ঠ। সুপ্ত পুরুষ যিনি তিনি যতক্ষণ সুপ্ত থাকেন ততক্ষণ সর্ব্বপ্রকার মনঃস্পন্দন শূন্য হইয়াই থাকেন। পরে সুপ্ত পুরুষই যখন স্বপ্নময় পুরুষরূপে প্রকট হন তখন তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন। অহং বহু স্যাম্ ইচ্ছা করিলেও তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। তখন এই পুরুষই তপস্যা করেন। ইঁহার এই তপস্যাই জ্ঞানময় তপস্যা। এই জ্ঞানময়

তপস্যা হইতেছে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা। এই তপস্যা দ্বারা ইনি মহানিয়তিকে জানিতে পারেন। সুপ্তব্যক্তির আকাশে স্বপ্ন কল্পনাবৎ এই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ আপনার মায়ার ভিতরে ঐ নিয়ম বিজ্ঞাত হইয়াই সেই নিয়ম মত সৃষ্টি করেন। এই জন্য সৃষ্টির মূলে সৃষ্টির নিয়মের জ্ঞান আছে। আর নিয়ম মত সৃষ্টি হয় বলিয়াই সৃষ্টির সর্ব্বত্রে একটা নিয়মও দেখা যায়। অগ্নির জ্বালা উর্দ্ধে উঠে, জল নিম্নে ছুটে, জীবের জন্মমৃত্যু হয়, ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারা এই সমস্ত নিয়তি বিজ্ঞাত হইয়াই তদনুরূপ সৃষ্টি করেন। তাই বলা হইতেছে পুরুষকারে মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু নিয়তিতে বা দৈবে কার্য্য হয় না।

রাম। নিয়তিকে অতিক্রম যদি কেহ করিতে না পারে তবে বজ্রাঘাতে যে মৃত্যু নিশ্চিত আছে তাহার অন্যথা কেন হয়? অথবা মানুষ পুরুষকার বলে জরামরণ অতিক্রম কিরূপে করে? গ্রহশান্তিই বা কিরূপে হয়?

বশিষ্ঠ। নিয়ম অনুসারে কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগ হয়। তাহার ফলেই সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি ঘটে। কিন্তু ঘটনার যোগ সম্বন্ধে যেমন নিয়ম আছে ঘটনার বিয়োগ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম আছে। ঘটনার যোগ ও বিয়োগ উভয়ই নিয়তির অধীন। ঘটনা যোগের নিয়মে ব্যাঘ্রের হস্তে মৃত্যু যার নিয়তি সে ব্যক্তি যদি ঘটনার বিয়োগরূপ নিয়তি আনয়নে পুরুষার্থ করে তবে সে ব্যক্তি ব্যাঘ্র হস্তে যে মৃত্যু তাহা অতিক্রম করিতে না পারিবে কেন? ইহাতে এক প্রকার নিয়তির অন্যথা হইল সত্য কিন্তু অন্য প্রকার নিয়তি মত কার্য্য হইল। তাই বলা হইতেছে পুরুষকার বলেই বৃহস্পতি দেবগুরু হইয়াছেন, পুরুষার্থ দ্বারা শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু হইয়াছেন। পুরুষকারবলেই মানুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করে, মানুষ জীবন্মুক্ত হয়।

রাম। কোন্ নিয়তিতে মানুষ চলিবে অর্থাৎ ব্যাঘ্র হস্তে মানুষ মরিবে কি রক্ষা পাইবে ইহা যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি ত জানেন? মানুষ

নিয়তির বশ না হইয়া স্বাধীনভাবে যদি কার্য্য করিতে পারে তবে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা কিরূপে থাকে ?

বশিষ্ঠ। রাম! তুমি অজ্ঞানীর মঙ্গল জন্য যখন এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছ তখন আরও সহজ করিয়া এই প্রশ্ন কর।

রাম। তুরীয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি "সর্ব্বজ্ঞ" বলেন নাই। বরং **"ন প্রজ্ঞ"** ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু সুষুপ্তিস্থান প্রজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে বলিতেছেন **"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।"** নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া অবলম্বনে যখন সগুণমত হয়েন তখনি তিনি মায়াধীশ। এই মায়াধীশ ঈশ্বরই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। স্বরূপ অবস্থাপন্ন এই প্রাজ্ঞই-ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই যদি নিয়তির অধীন তবে জীবের স্বাধীনতা থাকিবে কিরূপে ? নিয়মের অধীন হইলে মানুষের আবার স্বাধীনতা কি ? আর জীবের স্বাধীনতাই যদি না থাকে তবে পাপ পুণ্যের জন্য মানুষকে নিন্দা স্তুতি করা হয় কেন ? নিয়তির অধীন হইয়াই যখন মানুষ কর্ম্ম করে তখন পাপীর দণ্ড হইবে কেন ? আর যদি বলা যায় যে জীবের স্বাধীনতা আছে তবে বলিতে হইবে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন। কেন না যে স্বাধীন সে কখন্ কি করিবে তাহা জানিবে কে ? কখন্ কি করিবে যদি জানাই থাকিল তবে স্বাধীনতা থাকিবে কিরূপে ?

বশিষ্ঠ। জীবের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই আছেন। জীব-চৈতন্য যখন পুরুষে অভিমান করেন তখন তিনি স্বাধীন। কারণ অখণ্ড চৈতন্য সর্ব্বদা স্বাধীন। আর যখন ইনি প্রকৃতিতে অভিমান করেন তখন প্রকৃতি সর্ব্বদা পরাধীন বলিয়া ইনিও নিয়মের অধীন। জীবের স্বাধীনতা আছে কি নাই ইহার উত্তর তবে এই হইল যে জীব যখন আপন চৈতন্য স্বরূপে লক্ষ্য রাখিতে পারে, জীব যখন আপনাকে চেতন বলিয়া অভিমান করিতে পারে এবং চৈতন্যের যখন খণ্ড হয় না

ইহা বুঝিয়া আপনাকে অখণ্ড চৈতন্য ভাবিতে পারে তখন জীব স্বাধীন। জীব সর্ব্বদাই আপন চৈতন্য স্বরূপে লক্ষ্য করিতে পারে বলিয়াই বলা হয় জীবের স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই বলা হয় জীব তুমি "জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাং অনন্যভাক্" ইত্যাদি। পরাধীন যে তাহার প্রতি আজ্ঞা আর কি চলিবে? সেত প্রকৃতির অধীন! সেত প্রকৃতির বশেই চলিবে! সে কখন ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিতে পারিবে না! অথচ শাস্ত্রের সমস্ত আজ্ঞা প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য। যে প্রকৃতির অধীন সে প্রকৃতিকে জয় করিবে কিরূপে?

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩।৩৪

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলেই রাগদ্বেষ হইবেই। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু আমার নিয়মও আছে। সে নিয়ম হইতেছে রাগদ্বেষের বশে যাইও না। জীব যদি সর্ব্বদাই প্রকৃতির বশীভূতই থাকে তবে রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে কে? তবেই বলিতে হয় জীবের স্বাধীনতা আছে।

প্রকৃতির বশে আসাই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ। জন্মকালে জীব পূর্ণমাত্রায় প্রকৃতির অধীন। সেইজন্য জন্মপত্রিকা নিশ্চয় করিয়া দিতে পারে জীবের জীবনে কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটিবে। যাহারা কোন প্রকার পুরুষার্থ করে না তাহাদের জীবনের ফলাফল ঠিক হয়। কিন্তু যাহারা পুরুষার্থ করে তাহারা কতকগুলি ঘটনার যোগ প্রাপ্ত হইলেও আবার পুরুষার্থ বলে ঘটনার বিয়োগও করিতে পারে।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার এই ঘটনার যোগ ও বিয়োগ জানিবার বাধা কি? যিনি সর্ব্বজ্ঞ [তিনি যদি কিছু করেন তবে] তিনি কখন্ কি করিবেন তাহা যদি তিনি আপনি জানেন তবে জীব চৈতন্য কখন্ কি

করিবে তাহা জানিতে তাঁহার বাধা কি? কারণ জীব চৈতন্যের পূর্ণত্বই হইতেছে ঈশ্বর চৈতন্য।

এইস্থানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে চৈতন্য কিছুই করেন না। চৈতন্যের সান্নিধ্যে চৈতন্য দীপ্ত প্রকৃতিই কর্ম্ম করে আর সেই কর্ম্ম চৈতন্যে আরোপ হয় মাত্র। প্রকৃতি কখন্ কোন্ ভাবে নৃত্য করিবে তাহা পুরুষ জানিবেন না কেন? পুরুষকে সাক্ষী করিয়াই প্রকৃতি নৃত্য করিতে যাইতেছে। ভৃত্য কোন্ টাকাটি ভাঙ্গাইয়া কোন্ বস্তু ক্রয় করিবে তাহা ভৃত্যের সঙ্কল্পে ভাসিবামাত্র ভৃত্যের জীবচৈতন্য যেমন তাহা জানিল, সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞও তখন যে উহা জানিবেন ইহা আর বিচিত্র কি? যদি জিজ্ঞাসা কর সঙ্কল্পে ভাসিবা মাত্র তাহা জানিবেন ইহাত নিশ্চয় করা সহজ কিন্তু ভৃত্য ঐরূপ সঙ্কল্প করিবে বা করিবে না ইহা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ জানেন কি না? ইহার উত্তরে বলি সর্ব্বজ্ঞ আপনার ভবিষ্যৎ সঙ্কল্প যেমন জানেন সেইরূপ ইহাও জানেন। কারণ ব্যষ্টির কার্য্য সমষ্টি পুরুষ সর্ব্বদাই জানেন। আরও যাহাকে তুমি ভবিষ্যৎ সঙ্কল্প বলিতেছ তাহা কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকটে ভবিষ্যৎ সঙ্কল্প নহে। কারণ "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" পূর্ব্বে যেমন যেমন ভাবে পুরুষের বক্ষে প্রকৃতি নৃত্য করিয়াছিল, ভবিষ্যতেও ইহা সেই সেই ভাবেই নৃত্য করিবে। এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি প্রতিকল্পে এক ভাবে এক কার্য্যই করিয়া যাইতেছে ইহা সর্ব্বজ্ঞ জানেন। তোমার নিকট যাহা নূতন তাহা সর্ব্বজ্ঞের নিকট চির পরিচিত। বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতি যদি নৃত্য করে তবে এক ভাবেই সেই চৈতন্যে উঠিতেছে পড়িতেছে।

দেখিতেছ চৈতন্য চিরদিনই স্বাধীন। চৈতন্য যখন জড়ে ঢুকিয়া জড়ে আত্মবিক্রয় করেন—যদি ইহা হয় তবে তিনি প্রকৃতির অধীন।

এই পর্য্যন্ত যাহা বুঝাইলাম তাহাও নিম্নস্তরের কথা। প্রকৃত কথা কি জান? স্বাধীনতা অর্থে লোকে বুঝে স্বাধীনভাবে কার্য্য করা। চৈতন্য কোন কালে কোন কার্য্যই করেন না আর কোন কালে কোন

ইচ্ছাও করেন না। চৈতন্য সর্ব্বকালেই আপনি আপনি—চলনরহিত—পরম শান্ত—সচ্চিদানন্দ। যিনি পূর্ণ তিনি চলিবেন কোথায়? সূক্ষ্মভাবে বা স্থূলভাবে যিনি কোন ইচ্ছাও করেন না, কোন কার্য্যও করেন না—বল দেখি তিনি স্বাধীন কি পরাধীন এই প্রশ্ন উঠে কি না? আপনার অধীনকে বলে স্বাধীন। কার্য্য করা বা ইচ্ছা করা এই বিষয়ে না অধীনতা থাকে? যিনি কোন সঙ্কল্পও করেন না; কোন কার্য্যও করেন না তাঁহাকে স্বাধীন বা পরাধীন কি বলিতে চাও? কর্ম্ম বা ইচ্ছা প্রকৃতির। এই কর্ম্ম এই ইচ্ছা পুরুষে আরোপ হয় মাত্র। এখন বুঝ জীবের স্বাধীনতা যদি থাকে তবে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না ইহার প্রকৃত উত্তর কি!

রাম। সৃষ্টিতত্ত্ব না জানিলে কোন প্রশ্নের যে প্রকৃত উত্তর হয় না তাহা জানিলাম। এখন বলুন চিৎ বস্তুর স্পন্দ ও অস্পন্দ এই যে দুই স্বভাব বলিলেন ইহা কি?

বশিষ্ঠ। স্পন্দস্বভাবং রজঃপ্রধানমায়োপহিতম্। অস্পন্দস্বভাবং শুদ্ধম্। মায়াটাই স্বভাব। রজঃ প্রধান মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তাঁহাকেই স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট বলা হয়। আর শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য তাহাকেই অস্পন্দ স্বভাব বলা হইতেছে। কিন্তু যিনি মায়াতীত তাঁহাকে স্পন্দ অস্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট তিনি বা ইহা তিনি নহেন ইহার কিছুই বলা যায় না। আরও শ্রবণ কর—

চিত্ত্বং চিত্তং ভাবিতং সৎ স্পন্দ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
দৃশ্যত্বাভাবিতং চৈতদস্পন্দনমিতি স্মৃতম্॥

স্বীয়ং স্বাভাবিকং চিত্ত্বমেব চিত্তং চেত্যাকারং স্বাবিদ্যয়া ভাবিতং কল্পিতং চেৎ তদাকারং সৎ স্পন্দ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ।

চিৎ আপনার স্বাভাবিক চিত্ত্বাবকে আপনার অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যা দ্বারা চিত্ত বলিয়া কল্পনা করেন। অর্থাৎ চিৎ ভাবটাই চিত্তরূপে কল্পিত হয়। এই কল্পনা করেন অবিদ্যা বা মায়া। চিত্তরূপে কল্পনা

করাটাই চেত্যতা প্রাপ্তি বা সৃষ্ট্যুন্মুখতা প্রাপ্তি। এইরূপ কল্পনা দ্বারা চিৎটিই চিত্তাকারে আকারিত হয়েন। চিতের এই চিত্তাকার কারিতাই হইল স্পন্দ। আবার চেত্যতা প্রাপ্তি যখন না হয় তখন চিৎটি অস্পন্দ স্বভাব। চিতের স্পন্দ ভাবটাই এই প্রপঞ্চ আর অস্পন্দ ভাবটাই অপ্রপঞ্চাত্মতা।

স্পন্দাৎ স্ফুরতি চিৎসর্গো নিঃস্পন্দাৎ ব্রহ্মশাশ্বতম্।
জীব কারণ কর্ম্মাখ্যা চিৎস্পন্দস্যাভিধা স্মৃতা ॥৮

স্পন্দভাব দ্বারাই চিৎকে সৃষ্টিরূপে ভাসিতে দেখা যায়। যেমন স্পন্দনটি থাকে বলিয়াই স্থির জলকে তরঙ্গরূপে দেখা যায় সেইরূপ। আবার নিস্পন্দ ভাব দ্বারাই চিৎকে শাশ্বৎ ব্রহ্মরূপে স্থিত দেখা যায়। জীব, কারণ, কর্ম্ম, দৈব ইত্যাদি চিৎস্পন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। প্রাণস্পন্দন হইলে এই চিৎকেই জীব বলা হয়। নিজের অন্তর্গত কার্য্য সমূহের আবির্ভাব উপলক্ষে এই চিৎস্পন্দকেই বলা হয় কারণ আবার শরীরাদি পরিচালনা উপলক্ষে ইহারই নাম কর্ম্ম, তাহারও সূক্ষ্মাবস্থা যাহা তাহা চিরস্থিত ফলারম্ভোন্মুখ দৈব ইত্যাদি।

য এবানুভবাত্মায়ং চিৎস্পন্দোস্তি স এব হি।
জীব কারণ কর্ম্মাখ্যো বীজমেতদ্ধি সংসৃতেঃ ॥৯

যে অনুভবের কথা সকলেই জানে সেই সাক্ষাৎ অনুভূতিটিও চিৎস্পন্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই চিৎস্পন্দই জীব, কারণ, কর্ম্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত এবং সংসারের বীজ বলিয়া কথিত।

এখন দেখ দ্বৈতটা কোথা হইতে আইসে। অস্তির সহিত নাস্তির কল্পনা যেমন স্বাভাবিক অর্থাৎ কোন কিছু আছে বলিলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন তার অভাব বা নাই এটা কল্পনা করা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা একটা কল্পনা করাও স্বাভাবিক। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানে চিতের যে স্ব প্রতিবিম্ব ইহাই হইল চিদাভাস। অবিদ্যায় চিতের যে প্রতিবিম্বের স্ফুরণ তাহাই দ্বৈত। সেই দ্বৈত হইতে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে দেহাদির উৎপত্তি।

চিৎস্পন্দই অন্তর্নিহিত সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টির আদিতে বিবিধ আকার প্রাপ্ত হয়েন। চিৎস্পন্দই জীব। এই জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে মরণ প্রাকালে বুদ্ধিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে দেব তির্য্যগাদি দেহ এবং বিবিধ ভোগ প্রাপ্তিভাব প্রাপ্ত হয়েন। সঙ্কল্পানুসারে এই চিৎ-স্পন্দই নানা যোনিতে ভ্রমণ করেন। কোন চিৎস্পন্দ বহুকাল পরে মুক্ত হন, কেহবা কেহবা সহস্র জন্মে, কেহ বা এক জন্মে মুক্তিলাভ করেন।

চিত্তের স্বভাব হইতেছে, যে উপাধির সহিত ইহা সংসৃষ্ট হইবে সেইরূপে স্ফুরিত হওয়া। আলোক যেমন নীল পটে নীলরূপ দেখায়, রক্তপটে রক্তবর্ণ দেখায় সেইরূপ। সেই কারণে চিৎস্পন্দ আপনা হইতে উৎপন্ন যে সূক্ষ্ম ভূতসমূহ সেই সূক্ষ্ম ভূত সকলের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশরীর হইতে শুক্রাদিরূপে নির্গত হয়, পরে নানা দেহ প্রাপ্ত হয়। অতএব ইনি পিতা, ইনি পুত্র, ইনি স্ত্রী চিৎস্পন্দের এই সমস্ত প্রভেদ উপাধিকৃত।

উপাধিটাই হইতেছে শরীর। উপাধিটা ভিন্ন বলিয়া চিৎস্পন্দও যেন ভিন্ন ইহা মনে হয়। ফলে চৈতন্য একই। সুবর্ণ একই কিন্তু আকারের ভেদে ইহা কেয়ূর, ইহা কটক এইরূপ যেমন বলা হয়, সেইরূপ চৈতন্য একই কিন্তু চৈতন্যের উপাধি যে দেহ সেই দেহের প্রভেদে চৈতন্য-প্রভেদের ভ্রম হয়।

বলা হইল চৈতন্যের উপাধি এই দেহ আবার এই দেহের উপাদান হইতেছে মহাভূত। মহাভূতের বিকার অসংখ্য। চিৎ বস্তু কিন্তু অজাত তথাপি ইহা যেমন যেমন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন তেমন তেমন রূপে স্ফুরিত হয়েন বলিয়া "আমি জাত" "আমি মৃত" "আমি অবস্থিত" ইত্যাদি প্রকার ভ্রান্তি অনুভব করেন। এই ভ্রান্তি অনুভব হয় কিন্তু তাঁহার, যিনি স্বীয় অজ্ঞানে প্রতিফলিত চৈতন্যচ্ছায়া। যেমন ভ্রান্ত বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি আপনার মিথ্যা পতন অনুভব করে, সেইরূপ অহংতা মমতা 'যুক্ত বহির্ম্মুখ চিৎস্পন্দ বা চেত্যতা প্রাপ্ত চিৎ বা চিত্তজড়িত

চৈতন্যই বিবিধ আশাপাশে জড়িত হইয়া সেই সেই মিথ্যাদর্শন বা ভাব অনুভব করে।

আর একবার সৃষ্টির ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর—

শিবাৎ প্রাক্কারণাৎ পূর্ব্বং চিচ্চেত্যকলনোন্মুখী।
উদেতি সৌম্যাজ্জলধেঃ পয়ঃ স্পন্দোমনাগিব ॥১৮
স্ফুরণাজ্জীব চক্রত্বমেতি চিত্তোর্ম্মিতাং দধৎ।
চিদ্বারিব্রহ্মজলধৌ কুরুতে সর্গবুদ্বুদান্ ॥১৯
স্বস্থঃ সৌম্য সমস্যৈতৎ যৎ সিংহস্য বিজৃম্ভণম্।
ব্রহ্মণঃ সম্বিদাভাসস্তৎ সঞ্চেত্যমিব স্বয়ম্ ॥২০
চিৎ সম্বিত্ত্যোচ্যতে জীবঃ সঙ্কল্পাৎ স মনো ভবেৎ।
বুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারোমায়েত্যাদ্যভিধং ততঃ ॥২১
তন্মাত্র কল্পনাপূর্ব্বং তনোতীদং জগন্মনঃ।
অসত্যং সত্যসঙ্কাশং গন্ধর্ব্বং নগরং যথা ॥২২
যথা শূন্যে দৃশঃ স্ফারান্ মুক্তাবল্যাদি দর্শনম্।
যথা স্বপ্নে ভ্রমশ্চৈব তথা চিত্তস্য সংসৃতিঃ ॥২৩
শুদ্ধ আত্মা নিত্যতৃপ্ত ইব শান্তসমস্থিতঃ।
অপশ্যন্ পশ্যতীবেমং চিত্তাখ্যং স্বপ্নবিভ্রমম্ ॥২৪
সংসৃতির্জ্জাগ্রদিত্যুক্তং স্বপ্নং বিদুরহঙ্কৃতিম্।
চিত্তং সুষুপ্তভাবঃ স্যাৎ চিন্মাত্রং তুর্য্যমুচ্যতে ॥২৫
অত্যন্তশুদ্ধে সন্মাত্রে পরিণাম নিরাময়ম্।
তুর্য্যাতীতং পদং তৎস্যাৎ তৎস্থোভূয়ো ন শোচতি ॥২৬
তস্মিন্ সর্ব্বমুদেতীদং তস্মিন্নেব প্রলীয়তে।
ন চেদং ন চ তত্রেদং দৃষ্টৌ মুক্তাবলী যথা ॥২৭

পরম ব্যোমরূপী পরমপদে মায়া ভাসিলেই সেই মায়ামণ্ডিত চৈতন্য হয়েন সগুণ ব্রহ্ম। ইনিই মঙ্গলময়, ইনিই সৃষ্টির আদি কারণ।

মঙ্গলময় আদি কারণ হইতে প্রথমেই চেত্যকলনোন্মুখী—সৃষ্টি-

সঙ্কল্পোন্মুখী—চেত্যতাপ্রাপ্ত চিৎ সমুদিত হয়েন। সৌম্য অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ জলধি হইতে যেমন প্রথমে অল্পস্পন্দ অল্প তরঙ্গ প্রকটিত হয় সেইরূপ। সগুণ ব্রহ্মকেই নিস্তরঙ্গ জলধি বলা হয়। কারণ পরমপদে প্রথমে যে মায়ামত কিছু ভাসে বলা হয়, সেই মায়া প্রথমাবস্থায় গুণসাম্যাবস্থা মাত্র। ইহা সাম্যাবস্থা বলিয়া অব্যক্ত। এই অব্যক্ত সাম্যাবস্থা জড়িত অব্যক্ত সগুণ ব্রহ্ম কিন্তু অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের মত; অনুত্তরঙ্গ জলনিধির মত, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত। অর্থাৎ ভিতরে সমস্ত বৈষম্যের বীজ ধারণ করিয়াও এই সবীজ সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রাক্কালে স্থির শান্ত। এই শান্ত জলনিধি হইতেই প্রথমে স্বল্পতরঙ্গ উঠিতে থাকে ॥১৮

সেই স্ফুরণ হইতে, সেই স্পন্দন হইতে, জীবচক্রত্ব—জীবাবর্ত্ত নামক চিত্তরূপ ঊর্ম্মিভাব সেই চিৎস্পন্দই প্রাপ্ত হয়েন। সগুণ ব্রহ্ম জলধিতে সেই চিৎবারি সৃষ্টিবুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন করিতে থাকেন ॥১৯

হে সৌম্য! স্ববোধমাত্রেণ সিং মায়াবন্ধনং হন্তীতি সিংহস্তথা-বিধস্য সিংহবদচিন্ত্যশক্তিমতো বা ব্রহ্মণো যন্মায়য়া বিজৃম্ভণং গাত্র বিনমনং স এব স্বস্থঃ স্বাত্মস্থঃ সম্বিদাভাসো জীব ইব স্থিতং তদেব সঞ্চেত্যং বিষয়রূপমিব স্থিতং ন পৃথ্যগস্তীত্যর্থঃ।

হে সৌম্য রাম! সিং বলে মায়া বন্ধনকে। সিংকে যিনি জাগ্রত হইলে ভঙ্গ করিতে পারেন তিনি সিংহ। সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হইলে যেমন জালবন্ধন ছিন্ন করে, সেইরূপ প্রবুদ্ধ হইবামাত্র সমস্ত মায়াবন্ধন ছেদন করিবার শক্তি যাঁহার আছে, সেই সিংহের মত অচিন্ত্যশক্তিমান্‌ ব্রহ্মের যে মায়া বিজৃম্ভণ তাহাই হইল তাঁহার স্বাত্মস্থ সম্বিদাভাসরূপ জীবভাব। তাহাই আবার প্রকারান্তরে বিষয়রূপে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে প্রকটিত ও ব্যবহৃত হয়। বলা হইতেছে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সগুণ ব্রহ্মের যে মায়িক বিজৃম্ভণ তাহাই মায়া-প্রতিফলিত চিদাভাস। ইহাই জীব। আবার এই চিদাভাসই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ॥২০

চিৎ সম্বিৎ যিনি, চিদাভাস যিনি, তিনি জীব। সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া সেই চিদাভাস জীবই মন হয়েন। অধ্যবসায় তুলিয়া তিনিই বুদ্ধি। স্মরণ দ্বারা তিনিই চিত্ত, অভিমান দ্বারা তিনিই অহঙ্কার; বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা তিনিই মায়া। মায়া ইত্যাদি বলাতে ইনি প্রাণ, চক্ষু, বাক্ ইত্যাদি। আদি পদাৎ প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যং চক্ষুরিত্যাদি শ্রুত্যুক্তাভিধাসংগ্রহঃ। জীবিত রাখেন বলিয়া তিনিই প্রাণ, বলেন বলিয়া তিনিই বাক্, দেখেন বলিয়া তিনিই চক্ষু ইত্যাদি ॥২১

সঙ্কল্পপ্রধান হইয়া যিনি মন হয়েন, সেই মন যখন শব্দাদি সূক্ষ্মভূত নামক তন্মাত্র কল্পনা করেন তখন এই জগৎ সৃষ্ট হয়। এই জগৎ অসত্য তথাপি সত্যমত প্রতীত হয় যেমন গন্ধর্ব্ব নগর সেইরূপ ॥২২

শূন্যে আকাশে দৃষ্টিবিস্তার করিলে মুক্তাবলী ইত্যাদির দর্শন যেমন, স্বপ্নে ভ্রান্তিদর্শন যেমন, চিত্তের সংসারদর্শনও সেইরূপ ॥২৩

আত্মা কিন্তু শুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত, শান্ত, সমভাবে স্থিত মত। তাঁহাতে কাজেই কোন কালিমা নাই, কোন ইচ্ছা নাই, কোন সৃষ্টিতরঙ্গ উঠে না। তিনি সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত পরমব্যোম পরমপদ। ইনি কিছুই দেখেন না। কারণ সেথায় দেখিবারও কিছুই নাই তথাপি আত্মমায়ারচিত এই চিত্তনামক স্পন্দ বা বিভ্রম অনুভব ইনিই করেন।

এই আত্মার জাগ্রদবস্থা তখন, যখন ইনি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহিরের বস্তু অনুভব করেন। অন্তরে অহম্ভাববাসিত এই আত্মার হৃদয় হইতে কণ্ঠা পর্য্যন্ত যে সংস্থিতি তাহাই স্বপ্নাবস্থা, আবার স্মৃতিবাসনাবীজ মাত্র হইয়া যে হৃদিস্থিতি তাহাই সুষুপ্তি। ইহাও অতিক্রম করিয়া চিন্মাত্র ভাবে যে স্থিতি তাহাই তুরীয় অর্থাৎ অবস্থা ত্রিতয়ের অতীত অবস্থা জানিও। দেখিতেছ সংসার-দর্শনটা জাগ্রৎ; অন্তরের অহম্ভাবটাই অহঙ্কাররূপ স্বপ্ন; সুষুপ্তি অবস্থাই চিত্ত এবং চিৎস্বরূপে স্থিতিই তুরীয় ॥২৫

চিন্মাত্রের পরে অত্যন্ত শুদ্ধ সন্মাত্র ব্রহ্ম যখন আত্মভাবে পরিণতি

প্রাপ্ত হন, হইয়া নিরাময় হয়েন—তখন আত্মার তুর্য্যাতীত পদে স্থিতি হয়। ইহাই পরমপদ। সেই পরমপদে অবস্থিত হইলে সর্ব্ব শোকের চিরতরে নিবৃত্তি হয়। ইহাই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি। ইহাই মুক্তি ॥২৬

এই পরমপদ হইতে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান্ জগৎ উঠিতেছে; ইহাতেই সমস্ত দৃশ্যজগৎ বিলীন হইতেছে। নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অসৎ মুক্তাবলীর উদয় ও লয় যেরূপ সেইরূপ। কিন্তু মুক্তাবলী যেমন নিজেও নাই, আকাশেও নাই সেইরূপ এই দৃশ্যদর্শনাদি নিজেও নাই আর সেই পরমপদেও নাই ॥২৭

আকাশ বৃক্ষবৃদ্ধির কারণ নহে কিন্তু বৃক্ষের উন্নতির রোধক ইহা নহে বলিয়া লোকে যেমন ইহাকে বৃক্ষসমুন্নতির হেতু বলে, সেইরূপ এই চৈতন্য-সমুদ্র মায়াকৃত সৃষ্টির বাধা দেন না বলিয়া ইনি অকর্ত্তা হইয়াও মায়িক জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশের কর্ত্তা। লৌহ অর্থাৎ লৌহের বিকার যে আয়না তাহা কি প্রতিবিম্বের কারণ? সন্নিধান মাত্রটাই কারণ। সেইরূপ সন্নিধানমাত্র কারণে আত্মচৈতন্যকে এই সকল অর্থবেদনের অর্থাৎ জগৎ জ্ঞানের কারণ বলা হয়। বীজ যেমন অঙ্কুর পত্রাদি যুক্ত হইয়াই ফলরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিন্মাত্র যিনি তিনিও চিত্তজীবাদিক্রমে মনরূপে উৎপন্ন হয়েন।

যদি বল মহাপ্রলয়ে যখন সমস্তই লয় হইয়া যায় তখন চিৎ যিনি তিনি ত সুস্থ হইয়া থাকিতে পারেন—আবার সৃষ্টি হইবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তরে বলি—জীববাসনাবাসিত যে চিৎ তিনিই প্রলয়ান্তে চেত্যতা প্রাপ্ত হন, পরে চিত্ত হন, হইয়া সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত হন—যেমন বৃষ্টিজলবিন্দুতে শয়ান জীব, বৃক্ষ শস্যাদিতে অনু প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বীজত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। জীবই বীজ ইহা স্মরণ রাখিও।

রাম—আচ্ছা এই সকল বিচার করিলে ব্রহ্মকে জানা যাইবে কিরূপে? আর দৃশ্যদর্শন ভ্রমের শেষ হইবে কিরূপে? প্রশ্নটি আবার করি। বীজে সূক্ষ্মভাবে বৃক্ষ থাকে। বীজকে কেহ জানুক বা না

জানুক তাহাতে বীজের বৃক্ষজননশক্তির কার্য্যের ত কোন ক্ষতি হয় না। সেইরূপ চিৎই চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন, চিত্ত হয়েন, জগৎ হয়েন অর্থাৎ চিৎ-বীজের জগৎ-বৃক্ষত্ব প্রাপ্তির জ্ঞান কেহ লাভ করুক বা না করুক তাহাতে কিরূপে বলা যাইবে যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি আর জগৎ ভ্রম উঠিতে দেখেন না ?

বশিষ্ঠ—আচ্ছা শ্রবণ কর। বীজটাই বৃক্ষ এই বোধ জন্মিলে কোন তাত্ত্বিক অখণ্ডিত রূপের অভিব্যক্তি হয় না ; কিন্তু ব্রহ্ম বোধ হইলে দীপের দ্বারা যেমন রূপশ্রীর অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই চিত্তভূত এই জগৎ এই রূপ অভিব্যক্তি হয়। বীজই বৃক্ষ এই বোধের সহিত, ব্রহ্মই এই জগৎ এই বোধের পূর্ব্বোক্ত ভেদ আছে। ব্রহ্মবোধের পূর্ব্বোক্ত শক্তি আছে।

আর একবার দেখ।

যদ্যপ্যবোধে বোধে বা বীজান্তস্তরুবীজয়োঃ।
ইয়ান্ ভেদোস্তি ন জগদ্ব্রহ্মণোরপি চিত্তয়োঃ ॥৩২
তথাপি ব্যজ্যতে বোধে সত্যাত্মকমখণ্ডিতম্।
রূপশ্রীরিব দীপেন চিন্মাত্রালোকরূপি যৎ ॥৩৩

বীজান্তর্ব্বর্ত্তী বৃক্ষ এবং বীজ একই বস্তু এই বোধ হইলে কোন সত্য অখণ্ডিত বোধের অভিব্যক্তি হয় না। কিন্তু জগদ্ব্রহ্ম এবং চিত্ত এক বস্তু এই বোধ হইলে একটা অখণ্ডিত সত্যের বোধ হয়—পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে এই একটা ভেদ দৃষ্ট হয়। দীপের আলোকে যেমন রূপশ্রীর অভিব্যক্তি হয় সেইরূপ বিচারদীপের দ্বারা চিন্মাত্রালোকরূপী বৃক্ষের অভিব্যক্তি হয়। বিচার জন্য বোধের এই সামর্থ্য আছে।

যৎ যৎ নিখন্যতে ভূমৌ যথা তৎ তন্নভোভবেৎ।
যা যা বিচার্য্যতে বিদ্যা তথা সা সা পরং ভবেৎ ॥৩৪

যেমন যেখানে যেখানে ভূমি খুঁড়িবে সেইখানে সেইখানেই আকাশ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ পটের যে যে ছবি বিচার করিবে সেই সেই ছবিই অধিষ্ঠানচৈতন্যে পর্য্যবসিত হইবে।

স্ফটিকান্তঃ সন্নিবেশঃ স্থাণুতাবেদনাৎ যথা।
শুদ্ধে নানাপি নানেব তথা ব্রহ্মোদরে জগৎ ॥৩৫

স্ফটিক শিলা উদরে বনের প্রতিবিম্ব ধারণ করে। যে তাহা না জানে সে প্রতিবিম্বকেই সত্যের বন মনে করে। সেইরূপ যে নাজানে সে শুদ্ধ ব্রহ্মের উদরে কিছু না থাকিলেও এই জগৎকে নানারূপেই দেখে।

ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদ্বস্তু পিণ্ডমেক মখণ্ডিতম্।
ফল পত্র লতা গুল্ম পীঠ বীজমিব স্থিতম্ ॥৩৬

ব্রহ্মই জগদাকারে অবস্থিত। স্ফটিকশীলা বনভূমি না হইলেও যেমন আপনাতে প্রতিবিম্বিত বন ফল লতা পত্র গুল্ম ও সে সকলের আধার মৃত্তিকাদির আকারে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও দৃশ্যজগদাকারে প্রতিভাত হইতেছেন।

রাম। অহো চিত্রং জগদিদমসৎ সদিব ভাসতে।
অহো বৃহদহো স্বস্থমহো স্ফুটমহো তনু ॥৩৭
ব্রহ্মণি প্রতিভাসাত্মা তন্মাত্রগুণগোলকঃ।
অবশ্যায়কণাভাসো যথা স্ফুরতি তৎশ্রুতম্ ॥৩৮
যথাসৌ যাতি বৈপুল্যং যথা ভবতি চাত্মভূঃ।
যথা স্বভাবসিদ্ধার্থাত্তথা কথয় মে প্রভু ॥৩৯

অখণ্ড এক স্ফটিক শিলার ভিতর হইতে এই পরিদৃশ্যমান বনদৃশ্য উঠিয়াছে। এই দৃশ্য জগৎটা দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর মত। স্ফটিক শিলায় বাহিরের বৃক্ষলতার ছায়া পড়িয়া মনে হয় যেন স্ফটিকের ভিতর হইতে বৃক্ষলতা উঠিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্ফটিকে যে জগৎ বন দেখা যায় তাহা বাহিরের কোন কিছুর ছায়া নহে, তাহা ভিতরেরই ইন্দ্রজাল; তাহা কেবল মাত্র কল্পনা। কাজেই সত্য সত্যই এই জগৎ নাই। ইহা উঠেই না। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। মায়া সেই ব্রহ্মের উপরে বহু বিচিত্র চিত্র দেখাইতেছেন। যেমন বায়স্কোপের ক্যানভাসের উপরে মিথ্যা ছবির খেলা সেইরূপ।

অহো! কি বিচিত্র! জগৎটা অসৎ হইয়াও সত্যমত ভাসিতেছে! অহো! ইহা বৃহৎ; ইহা আত্মার ভিতরে! ইহা বাহিরে প্রস্ফুট! অহো! ইহা আবার কল্পনা-সূক্ষ্ম। তন্মাত্রগুণসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ডগোলক নীহারকণার মত পরব্রহ্মে যেরূপে স্ফুরিত হইতেছে তাহা শুনিলাম। এই সৃষ্টি যেরূপে বিশালতা প্রাপ্ত হয়—যেরূপে ইহা সমষ্টি ব্যষ্টি দেহ-রূপতা প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রকারে আত্মভূ অর্থাৎ সমষ্টি-ব্যষ্টি-দেহাভিমানী বৈশ্বানর ও বিশ্ব অর্থাৎ বিরাট দেহী ও একটি একটি দেহী উৎপন্ন হয় এক্ষণে তাহাই বলুন।

বৈপুল্যং—ব্যষ্টিসমষ্টিস্থূলদেহভাবম্। আত্মবস্তুনঃ সকাশাৎ যথা আত্মভূর্ব্ব্যষ্টিসমষ্টি স্থূলভূগ্বিশ্ববৈশ্বানরাত্মা যথা ভবতি তথা কথয় মে ইত্যর্থঃ।

বশিষ্ঠ। পরব্রহ্মে যে জীবভাবের উদয় হয় তাহা বাল হৃদয়ে বেতালের স্ফুট্ উদয়ের মত। বেতালের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নাই অস্তিত্বও নাই। ইহা সম্পূর্ণই মনের কল্পনা। তাই বলা হইতেছে বেতাল উদয় অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও তথাপি বালহৃদয়ে যেমন ইহার উদয় স্ফুটরূপেই হয়, সেইরূপ জীবভাব অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও পরব্রহ্মে ইহার উদয় হয়। চিৎপরব্রহ্মের স্পন্দ ও অস্পন্দ যে দুইটি স্বভাব আছে তন্মধ্যে স্পন্দস্বভাব হইতেই জীবভাবের উদয় হয়।

জীবভাব যাহা তাহা পরব্রহ্মেরই বৃংহন বা স্ফুরণ। ইহা ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, সত্য হইয়াও অসত্যবৎ স্থিত, শুদ্ধ হইয়াও বাসনোদ্ভব।

যথা ব্রহ্ম ভবত্যাশু জীবঃ কলনজীবিতঃ।
তথা জীবো ভবত্যাশু মনো মনন বেদনাৎ ॥৪৩

ব্রহ্ম যেমন অতি শীঘ্র স্পন্দন প্রাণ জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন, জীবও সেইরূপ মননরূপ বাসনার উদ্ভবে মন হয়েন। মন্বানো মন ইতি শ্রুতেঃ। মনন করে বলিয়া ইহার নাম মন। অনবরত স্পন্দিত হওয়াই ইহার ধর্ম্ম। মন অনবরত চিন্তা করে। অনিরূপ্যমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্। মন যাহা তাহাকে নিরূপণ করাও যায় না

তাহাকে দেখাও যায় না। ইহা একপ্রকার জ্ঞানেরই প্রকার মাত্র। ব্রহ্ম বা স্পন্দস্বভাব চিতের চেত্যতাপ্রাপ্তি হইতেই জীবভাব। আবার জীবের সঙ্কল্প হইতেই জীবের মনোভাব প্রাপ্তি। সঙ্কল্প যাহা তাহা স্পন্দনবিশিষ্ট হইবেই। যেখানে স্পন্দন সেইখানে প্রাণ আছেই। তবেই হইল স্পন্দনবিশিষ্ট চৈতন্য যিনি অর্থাৎ প্রাণমিশ্রিত চৈতন্য যিনি তিনিই আদি জীব। জীবের মনন ব্যাপার চলিলেই মন হইল। প্রাণ ও মন অত্যন্ত চমৎকার বস্তু। আদিপ্রাণ বা, মহাপ্রাণ যিনি তিনি হইতেছেন শান্তব্রহ্মে আদিস্পন্দন। আদি মন যিনি তিনি হইতেছেন আতিবাহিক দেহবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ।

চিত্তং তন্মাত্রমননং পশ্যত্যাশু স্বরূপবৎ।

[আত্মা স্পন্দনযুক্ত হইয়া বা প্রাণযুক্ত হইয়া হয়েন জীব। জীব সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া মনন ব্যাপার আরম্ভ করিলেই হইলেন মন। মনের আদি মনন হইতেছে তন্মাত্র।

মন তন্মাত্র বিষয়ক মনন করিয়া আপনাকে তান্মাত্রারূপে আবির্ভূত দেখেন।

এষ সদ্যোনিললব-প্রখ্যঃ স্ফুরতি খান্তরে ॥৭৪

অস্তনিমেষোনুভবত্যবশ্যায়কণোপমম্।

সম্বেদনাত্মকং কালকলিতং কান্তমাত্মনি ॥৪৫

অস্তনিমেষঃ অবিচ্ছিন্নদৃক্‌রূপঃ অনিললবপ্রখ্যঃ অতিসূক্ষ্মঃ এষঃ তন্মাত্রাত্মা খান্তরে চিদাকাশে স্ফুরতি স্বতঃ প্রকাশমানে সতি তৎস্ফূর্ত্যা সম্বেদনাত্মকং সৃষ্টিকালবশেন পঞ্চীকরণদ্বারোৎপাদিতং কান্তং হিরণ্ময়ত্বাৎ সূর্য্যবৎ প্রকাশমানং অপরিচ্ছিন্ন চিদ্দৃষ্ট্যা অবশ্যায়-কণোপমং ব্রহ্মাণ্ডরূপং মনুষ্যাদিদেহরূপং চাত্মনি পশ্যতীত্যনু-ষজ্জতে ॥

তন্মাত্রারূপী এই সমষ্টি মন তখনও ব্যষ্টিভাব প্রাপ্ত হয় নাই ইহা অবিচ্ছিন্নরূপেই দৃষ্ট হয়; ইহা অতি সূক্ষ্ম-সদ্যোজাত বায়ুকণার মত। অতিসূক্ষ্ম এই সমষ্টি মন চিদাকাশে প্রকাশিত হইলে কালবশে ইহা

পঞ্চীকরণ প্রাপ্ত হয়। পঞ্চীকরণোৎপাদিত মনের এই রূপ বড়ই মনোহর। ইহা হিরণ্ময় বলিয়া সূর্য্যবৎ প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই সূর্য্যই মনের সেই রূপ। অপরিছিন্ন দৃষ্টি দ্বারা যদি কেহ ইহা দেখিতে পারেন তবে দেখেন যে, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধারণ করেন; মনুষ্যাদির দেহরূপও এই মনেরই। আত্মাতে এই সমস্তই তখন দেখা যায়। যেমন আকাশে অসঙ্খ্য নীহারকণা সূর্য্যের আলোকে ভাসিতে দেখা যায় সেইরূপ সমষ্টি মনোরূপ হিরণ্যগর্ভ যে চিত্ত তাহাতে অসঙ্খ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত সূক্ষ্ম দেহাদি অঙ্কিতের ন্যায় দেখা যায়।

অহং কিমিতি শব্দার্থবেদনাভোগ সম্বিদম্।
সম্বিদং তত্ত্বশব্দার্থং জীবঃ পশ্যতি সার্থকম্।৪৬

এই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সাকারতা প্রাপ্ত হইয়াও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। ইনিই তখন জ্ঞানময় তপস্যা করেন। এই তপস্যার ফলে আমি কি ইত্যাকার সম্বিদ্ অর্থাৎ শব্দার্থ বিভাগের অস্ফুরণে ইনি সম্মুগ্ধ জ্ঞান অনুভব করেন। আবার তপস্যা চলে। তখন সেই সম্মুগ্ধ জ্ঞান প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধে সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষে জগত্তত্ত্ব-শব্দার্থ ও তত্তদ্ বিষয়ক অস্ফুট জ্ঞানকে উদয় করে।

সেই অস্ফুট অহম্ভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার দেহোপরি প্রস্ফুট হওয়ায় বাহিরে রসের ও মুখগর্ত্তাদিপ্রদেশে রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জিহ্বার উৎপত্তি অনুভব করেন। ঐরূপে বাহিরে রূপ ও শরীরে রূপ-গ্রাহক চক্ষু হওয়া দর্শন করেন। সেই সেই প্রকারে গন্ধ ও গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় হওয়া অনুভব করেন।

জীব যতদিন ঐরূপে শ্রোত্রাদি ভাবে অবস্থিত থাকেন, ততদিন শব্দাদিদৃশ্য পদার্থ সকল ঐরূপে ভোগ করেন। জীবাত্মা ঐ প্রকারে অল্পে অল্পে আপনার বাসনারূপ দেহিত্ব অনুভব করেন।

দেখিতেছ ত জীবভাব অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়। তাহাতে আবার ইন্দ্রিয়াদিঘটিত ব্যাপারও সন্নিবিষ্ট হয়। সেই ইন্দ্রিয়াদিঘটিত সন্নিবেশের শব্দ ভাবৈক দেশকে শ্রবণার্গ 'স্বরূপে' জীব

গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমার বলিয়া জ্ঞান বা কল্পনা করেন। এইভাবে স্পর্শভাবৈক দেশকে ত্বক্ শব্দার্থরূপে, রসভাবৈক দেশকে রসনার্থরূপে, রূপভাবৈক দেশকে নেত্রার্থরূপে এবং গন্ধভাবৈক দেশকে নাসিকার্থ-রূপে গ্রহণ করেন। তখন ঐ সমস্ত ভাবময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভাবময় দেহকে বাহ্যার্থ সত্তা প্রকাশ করণ যোগ্য ইন্দ্রিয় নামক রন্ধ্র সম্পন্ন দেখিতে পান।

এই প্রকারে আদি জীবের ও অদ্যতন জীবের অর্থাৎ সমষ্টি জীব-ঘন ব্রহ্মার ও ব্যষ্টি জীবের ভাবময় আতিবাহিক দেহ জন্মে। সর্ব্ব-প্রকার উপাধিশূন্য পরাসত্তা যে ব্রহ্ম তিনিই এইরূপে অজ্ঞানাবৃত হইয়া আতিবাহিকতা প্রাপ্তের ন্যায় হয়েন আবার জ্ঞান হইলে যে অসঙ্গ পুরুষ সেই অসঙ্গ পুরুষই থাকেন। সত্য সত্য সেই পরাসত্তা ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং পৃথক্ জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ জীবাদি ভাবে ব্যবস্থিত হয়েন।

রাম। ভগবন্ আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে জীবের মধ্যে যে প্রাণ ও মন দেখা যায় তাহাদের আদি চিন্তা না করিলে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ব্রহ্ম ও জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইল তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। এবং স্পন্দনাত্মক প্রাণ ও মননাত্মক মন ধরিয়াই সাধারণ সাধনার কথা শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রভো! প্রাণ ও মন এই উভয়ই মায়ার বিকার মাত্র। মুখ্য প্রাণ যিনি তিনিই সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে চিন্মাত্র পরম ব্যোম এই পরব্রহ্মে মায়ার অবস্থানের সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ যিনি তাঁহাতে অজ্ঞানাবস্থানের সম্ভাবনা কি? তাঁহাতে অজ্ঞান নাই। তবেই ত হইল অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মে দ্বৈত ভাব আদৌ নাই। কাজেই মোক্ষ মোক্ষ-প্রাপক বিচার এবং তদুপযোগী জীবাদি কল্পনা এ সমস্ত নিরর্থক ত হইয়া পড়ে।

বশিষ্ঠ। রাম! তোমার প্রশ্ন সময়োচিত হইল না। উৎপত্তি প্রকরণে ইহা হওয়া উচিত নহে। ইহা সিদ্ধান্ত কালেরই উপযুক্ত।

যেমন অকালজাত কুসুমের মালা শোভাবিশিষ্ট হইলেও অমঙ্গল জনক বলিয়া শোভমান হয় না সেইরূপ অসাময়িক প্রশ্নও ফলপ্রদ হয় না। অকালের বস্তু তাৎকালিক সুখোৎপাদক হইলেও ভবিষ্যৎ অনিষ্ট জন্মাইতে পারে এই আশঙ্কায় হর্ষোৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া নিরর্থক হয়।

জীব উপযুক্ত কালে সাধনা দ্বারা উপাসনার ফল স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ-রূপে আবির্ভূত হন। সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক এবং প্রণবের অর্থে যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাহা সন্দেদন পূর্ব্বক এই মনোরাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। সেই শূন্যরূপী সমষ্টি মনোরাজ্য পরমাত্মায় যে প্রকারে অসৎ, ব্যষ্টি মনোরাজ্যরূপ শূন্যাত্মক সুমেরু প্রভৃতি অতি উচ্চ পর্ব্বত বিশিষ্ট এই জগৎও চিদাকাশে সেইরূপ অসৎ।

এই জগতে বাস্তবিক কিছুই জাত বা বিনষ্ট হয় না। "নেহ প্রজায়তে কিঞ্চিন্নেহ কিঞ্চিদ্বিনশ্যতি"। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় মিথ্যা জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। "জগদ্‌গন্ধর্ব্ব-নগররূপেণ ব্রহ্ম জৃম্ভতে" ॥৬৬

ব্রহ্মার সত্তা যেমন সদসন্ময়ী অতি ক্ষুদ্র জীবের সত্তাও সেইরূপ। জীব সকল আছে চলিতেছে ফিরিতেছে দেখা গেলেও বাস্তবিক ঐ সমস্ত রজ্জু-সর্পের ন্যায় ভ্রমজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমস্ত মিথ্যা। তাই সম্যক্‌ জ্ঞানের উদয়ে আব্রহ্ম কীটাদির বিলয় হয়। ব্রহ্মার উৎপত্তিও যেমন অতি ক্ষুদ্র একটি কীটের উৎপত্তিও সেইরূপ। প্রভেদ এই যে কীট রজস্তমের প্রচ্ছাদনে তুচ্ছ কর্ম্ম করে আর ব্রহ্মা নির্ম্মল সত্ত্বের প্রাবল্যে উচ্চ কর্ম্ম করেন।

যেমন উপাধি সেইরূপ জীব; যেমন জীব সেইরূপ পৌরুষ আবার যেমন পৌরুষ সেইরূপ কর্ম্ম এবং যেমন কর্ম্ম সেইরূপ ফলানুভব। সুকৃতের ফলে ব্রহ্মার উৎপত্তি কিন্তু দুষ্কৃতের ফলে কীটের উৎপত্তি। সুকৃত বা দুষ্কৃত সমস্তই আপন আপন স্বরূপ যে 'চিন্মাত্র তাহা না জানাতেই ঘটে। অর্থাৎ উহা আত্মভ্রান্তি মূলক অথবা

স্বরূপের অন্যথাবলোকনেই হয়। শুদ্ধ চিৎ যে ব্রহ্ম তাঁহাতে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় এই সব ভাব নাই। দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়ই সেখানে শশবিষাণ বা আকাশপদ্মের সমান।

যতদিন জীব জ্ঞাতারূপে ভেদ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় দর্শন করে ততদিনই দ্বৈত বিদ্যমান থাকে। জ্ঞেয় দর্শন না করিলেই অদ্বৈত স্থিতি।

যেমন কোশকার কীট আপনার লালাতেই আপনি বদ্ধ ইহা অনুভব করে সেইরূপ "ব্রহ্মানন্দাত্মক আত্মৈব বন্ধকভুবনাদিভাবদার্ঢ্যাত্মকং দ্বৈতমিতি ভ্রান্ত্যানুভূয়তে"। অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দাত্মক মায়াশবলিত আত্মাই ভুবনাদি বন্ধক দৃঢ়াত্মক এই দ্বৈত, ভ্রান্ত বুদ্ধিতে অনুভব করেন। স্বরূপ বিশ্রান্তিই এই ভ্রমের হেতু।

মনসা ব্রহ্মণা যৎ যৎ যথা দৃষ্টং বিভাবিতম্।
তৎ-তথা দৃশ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ স্বভাবস্যৈষ নিশ্চয়ঃ ॥৭৪

ব্রহ্মা হইতেছেন সকল প্রাণীর মনের সমষ্টি অর্থাৎ সমষ্টিমন। তিনি বহু জীবের মনের সমষ্টি বলিয়া ভোক্তা জীবের অদৃষ্টানুসারে যে বস্তুকে যেরূপে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, যে কার্য্যের জন্য যে বস্তুকে ভাবনা করেন অন্য জীবও তাহা সেইরূপই দেখে। কেন দেখে? কারণ স্বভাবের এইটিই নিয়তি বা নিশ্চয় ব্যবস্থা।

বটবীজ হইতে বটের অঙ্কুরই হয় কূটজ বীজ হইতে বটবৃক্ষ হয় না। বুদ্‌বুদ্ কতিপয় নিমেষ মাত্র থাকে ব্রহ্মাণ্ড কল্পান্ত পর্য্যন্তই থাকে। ইহাই নিয়তির ব্যবস্থা। তুমি আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু কল্পনা করিলে নিয়তি তাহার বাধা দিবেই।

অলীকমিদমুৎপন্নমলীকঞ্চ বিবর্দ্ধতে।
অলীকমেব স্বদতে তথালীকং বিলীয়তে ॥৭৬

যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে মনে হয় তাহা অলীক, তাহা মিথ্যা মিথ্যাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, মিথ্যাই ভোক্তার ভোগকালে রুচিকর হইতেছে, অলীক যাহা তাহাই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। এইটি মনে রাখিয়া